বর্তমান বিশ্বের অন্যতম আধ্যাত্মিক রাহবার
পীরে কামেল মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশ্‌বন্দী-এর বয়ান

খুতুবাতে যুলফিকার



খুতুবাতে যুলফিকার
[উনবিংশতি ও বিংশতি খণ্ড]

মূল

মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী

অনুবাদ

মুফতী শিহাবুদ্দীন খান

প্রথমরেখ, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ

লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক

সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন

দাওরায়ে হাদীছ (১৯৯০)

মাদরাসা-ই নূরিয়া, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা

সাবেক ওস্তাদ, জামেয়া রশীদিয়া ঢাকা

প্রাক্তন সহ-সম্পাদক, মাসিক রহমত

দারুল উলুম লাইব্রেরী

[অভিজাত ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]

ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)

১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০



টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১৭

প্রকাশক : মাওলানা শহীদুল ইসলাম
দারুল উলূম লাইব্রেরী
ইসলামী টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৮১৮৮০৮৫, ০১৭১২৫০৭৮৭৭
স্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
বর্ণবিন্যাস : পরশ কম্পিউটার, রায়েরবাগ, ঢাকা
প্রচ্ছদ : দি ব্রাইট

মূল্য : ৫০০ ত্র

এক নজরে খুতুবাতে যুলফিকার-১৯

- আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্য /৩১
- অন্তরকে জীবিত করা /৬৯
- মায়ের ভালোবাসা /৯৭
- পর্দা আবশ্যক কেন? /১২৩
- মহিলাদের উদ্দেশে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা /১৫৩
- জীবন-যাপনের দিকনির্দেশনামূলক
- নীতিমালা /১৭৩
- যুবকদের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ /১৯৭
- চারটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ/২৩৩
- সময়ের মূল্য /২৪৯

এক নজরে খুতুবাতে যুলফিকার-২০

- গ্রহণযোগ্য কে? /২৭৭
- আল্লাহর নেয়ামতসমূহ /৩১৩
- কলব জারি হওয়া /৩৪৩
- আমাদের জবান হৃদয়ের ভাষ্যকার /৩৬৭
- ওলামায়ে দেওবন্দের ইল্‌মি কৃতিত্ব /৩৮৭
- পবিত্র জীবন অর্জনের সোপান /৪০৯
- বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ওপর আল্লাহর শাস্তি /৪৫৯
- আম্মাজি (রহ.)-এর আখেরাতের সফর /৪৮১

সূচি নির্দেশিকা

খুতুবাতে যুলফিকার-১৯

আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্য /৩১
তাক্ওয়া কাকে বলে? /৩১
তাক্ওয়ার স্তর তিনটি /৩২
হযরত যুন্নুন মিসরি (রহ.)-এর দৃষ্টিতে তাক্ওয়া /৩৩
তাক্ওয়ার পুরস্কার /৩৩
উপকারী ইল্মের পরিচয় /৩৪
উম্মতের কিশতি কীভাবে তীরে আসবে? /৩৫
নূরে নবুওত হতে বঞ্চিত হওয়ার কারণ /৩৬
ইল্ম ও আল্লাহ তা'আলার ভয় /৩৭
ইল্মকে সুরক্ষিত রাখার পদ্ধতি /৩৮
ওলামায়ে কেরামের প্রতি ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর উপদেশ /৩৮
كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ-এর যোগ্যপাত্র কারা? /৩৯
আল্লামা আলুসি (রহ.) ও كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ-এর বহিঃপ্রকাশ /৪০
মানুষ তার বন্ধুর ধর্মানুসারী হয় /৪০
লোভী ব্যক্তির সান্নিধ্যের প্রভাব /৪১
আল্লামা রুমি (রহ.)-এর উপদেশ /৪১
শাহ আবদুল গনী ফুলপুরি (রহ.) ও সান্নিধ্যের তাগিদ /৪২
মুফতী আযম (রহ.)-এর প্রশ্নের সমাধান /৪২
ঈমাম জাফর সাদেক (রহ.)-এর সান্নিধ্যে
ইমাম আবুহানীফা (রহ.) /৪৪
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) হযরত আবু হাশেম
সূফী (রহ.)-এর সান্নিধ্যে /৪৫
আবু হাওয়াস ইবনে সারীর (রহ.) হযরত জুনায়েদ
বাগদাদি (রহ.)-এর সান্নিধ্যে /৪৬
আল্লামা ইবনে আবেদীন শামি ও সৈয়দ মাহমুদ আলূসি (রহ.)

বিভিন্ন শায়খের সান্নিধ্যে /৪৬
হযরত কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথি (রহ.) শায়খ মাযহার
জানে জানাঁ (রহ.)-এর সান্নিধ্যে ৪৭
বড়-বড় ওলামায়ে কেরামের সত্যায়ন /৪৭
দেওবন্দের বড়-বড় ওলামায়ে কেরাম হাজী এমদাদুল্লাহ
মুহাজিরে মাক্কী (রহ.) সান্নিধ্যে /৪৮
আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্য অপরিহার্য /৪৯
কাজী ছানউল্লাহ পানিপথি (রহ.) ও বাতেনি নূর /৪৯
হযরত যয়নুল আবেদীন (রহ.)-এর নিকট যিকিরের গুরুত্ব /৪৯
আল্লামা রুমি (রহ.) আলোচনা থেকে প্রকৃতির দিকে পরিবর্তন /৫০
আল্লামা আবদুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহ.)-এর উপদেশ /৫১
হযরত সুলাইমান নদভী (রহ.)-এর আল্লামা থানভী (রহ.)-এর
নিকট বায়'আত /৫১
হযরত মুরশিদে আলম (রহ.)-এর প্রদত্ত আশ্চর্য উদাহরণ /৫১
ওলীগণের নজরে সেই প্রভাব দেখবেন /৫২
মোল্লা আলী কারী (রহ.)-এর সান্নিধ্যের প্রভাবের প্রমাণ /৫২
একটি আশ্চর্য সূক্ষ্মতা /৫৩
যৌক্তিক দলিল /৫৪
যে-পরিমাণ ত্যাগ সে পরিমাণ মূল্যায়ন /৫৪
আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্যে কল্যাণের কারণসমূহ /৫৬
একটি প্রশ্নের প্রভাবপূর্ণ জবাব /৫৮
আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার প্রেসক্রিপশন (ব্যবস্থাপত্র) /৫৮
উত্তম সাথি তোমার সজীবতা /৫৯
সৎ সাথির উদাহরণ /৬০
আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্য অবলম্বনের যৌক্তিক দলিল /৬০
আল্লাহর জন্য ভালোবাসার মহা প্রতিদান /৬২
মহব্বতের অনুমান নির্জনে /৬২
মাওলানা রুমি (রহ.)-এর হৃদয়বিদারক দৃষ্টান্ত /৬৪
মিরাজের ঘটনার শিক্ষণীয় সূক্ষ্মতা /৬৫
অন্তরকে জীবিত করা /৬৯
পৃথিবী একটি অনুসন্ধানে নিয়োজিত /৬৯
বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় /৭০
মনুষ্যত্বের উপকরণ কোথায় আছে? /৭০

আপন হৃদয়ে ডুব দাও জীবনের সমাধান পেয়ে যাও /৭১
মানুষের দেহ একটি বিরাট পৃথিবী /৭২
হৃদয়ের পৃথিবী ও আম্বিয়ায়ে কেরাম /৭৩
বিপর্যয়ের মূল কী? /৭৩
বিপর্যয়ের রাস্তা /৭৪
ছোট একটি বিস্ময়ের বস্তু /৭৫
হৃদয় জগতের অনুসন্ধান /৭৫
কী আশ্চর্য নগদ সওদা; এ হাতে প্রদান সে হাতে গ্রহণ /৭৭
ফেতনার মূল ভিত্তি হচ্ছে মানুষের অন্তরের অভিপ্রায় /৭৮
হৃদয়ের চিকিৎসা কী? /৭৮
সাহাবায়ে কেরাম কেমন ছিলেন /৭৯
ইমাম যায়নুল আবেদীন (রহ.)-এর ইখলাছ /৭৯
বর্তমান পৃথিবী /৭৯
আত্মদান ও সহানুভূতির বিরল দৃষ্টান্ত /৮০
সাহাবায়ে কেরামের আদর্শিক আমলের পদ্ধতি /৮০
হযরত আবু তালহা (রাযি.)-এর আপ্যায়ন /৮১
হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর খেদমতের রূপরেখা /৮১
আম্বিয়ায়ে কেরামের মেহনতের ফল /৮৩
আল্লামা আবুল হাসান নূরী (রহ.)-এর আত্মদান /৮৪
একটি বিরল উদাহরণ /৮৪
মহব্বতের প্রভাব /৯০
কথা ও কাজের বৈপরীত্ব /৯১
হযরত আবদুল্লাহ (রাযি.)-এর শাহাদাতের মুহূর্ত /৯৩
মায়ের ভালোবাসা /৯৭
গুপ্ত ধনভান্ডার /৯৭
শরীয়তের পরিধি /৯৭
প্রকৃতিগত ভালোবাসা /৯৮
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা /৯৮
মায়ের ভালোবাসা /৯৯
বিগত শতাব্দীর বিস্মরকর ঘটনা /৯৯
মায়ের ভালোবাসার দাবি /১০০
মায়ের দু'আ /১০১
মায়ের সম্মান /১০১

একটি দৃষ্টান্ত /১০২
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মপদ্ধতি /১০২
মায়ের ভাবনা /১০৩
আদর্শ মায়ের অনন্য শিক্ষা /১০৩
মায়ের তরবিয়তের ধরন /১০৫
বর্তমান যুগের মা /১০৬
কবীরাহ গুনাহ /১০৭
গ্রাম্য যুবকের শিক্ষণীয় ঘটনা /১০৭
মায়ের অসন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর পাকড়াও /১০৮
বর্তমান যুবসম্প্রদায়ের পিতামাতার সঙ্গে আচরণ /১০৯
মায়ের কোল সন্তানের জন্য মহান রহমত /১০৯
চোখে দেখা ঘটনা /১০৯
অমূল্য ধনভান্ডার /১১০
কেয়ামতের আলামত /১১০
মায়ের দু'আ /১১০
রহমতপূর্ণ গুণ /১১১
মায়ের হাকীকত /১১১
একটি সত্য ঘটনা /১১৩
মায়ের ভালোবাসার মাপকাঠি /১১৬
সাহাবায়ে কেরামের আমল ও নবীজির জবাব /১১৭
একটি ইংরেজি বাগ্‌ধারা /১১৭
এখলাছের চিত্র /১১৮
পর্দা আবশ্যক কেন? /১২৩
উদ্বেগের সময় /১২৩
সতীত্ব ও পবিত্রতা সংরক্ষণের প্রতিদান /১২৪
বিজয়ী মহিলা কে? /১২৪
নির্জনতায় চরিত্র গঠন হয় /১২৫
সতীত্বের সংরক্ষণ কীভাবে? /১২৬
একটি সোনালি উপদেশ /১২৬
নবীজির সম্মানিতা স্ত্রীগণের চরিত্র /১২৭
মহিলাদের গুরুদায়িত্ব /১২৭
একটি স্বীকৃত মূলনীতি /১২৭
দৃষ্টির দুর্বলতার বিপদ /১২৮

একটি উদাহরণ /১২৯
শরীয়তে লজ্জা ও নিষ্কলুষতার শিক্ষা /১২৯
দৃষ্টি ও অন্তরের পবিত্রতা /১৩০
জাহান্নামের ফোন /১৩২
পবিত্র কুরআনের উপদেশ /১৩৩
গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো /১৩৫
ইজ্জত ও সতীত্বের হেফাযত এবং আল্লাহর পুরস্কার /১৩৫
আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মূল্যায়ন /১৩৬
অতি মনোযোগের বিষয় /১৩৬
সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা /১৩৭
গুনাহের বিপদ পৃথিবীতেই /১৩৮
বোরকার সরলতা /১৩৯
মহিলা ও সুগন্ধি ব্যবহার /১৪০
একটি সূক্ষ্ম ব্যাপার /১৪০
মহা প্রতিদান /১৪১
শরয়ী সতকর্তাসমূহ /১৪১
যৌবনকালে তাওবা করা নবীগণের চরিত্র /১৪১
যুবকদের দু'আ আল্লাহর দরবারে গৃহীত /১৪২
শয়তানের বাধাদানকারী বাহিনী /১৪২
সতীত্ব ও পবিত্রতা রক্ষার সহজ উপায় /১৪৩
শাহ আতাউল্লাহ বোখারি (রহ.)-এর বেদনাপূর্ণ উপদেশ /১৪৩
মহিলাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব /১৪৩
চোখের পলক কত ছোট! কেমন দ্রুতগামী! /১৪৩
আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর বয়ান /১৪৪
লাজুকতা হচ্ছে ঈমান /১৪৪
না-মাহ্‌রামের সঙ্গে নির্জনতা বিপদের সংবাদ /১৪৪
সংস্কৃতির ভয়াবহ ক্ষতি /১৪৫
সবচেয়ে উত্তম রমণী /১৪৫
শাহ আবদুল আযীয (রহ.) মুহাদ্দিছে দেহলবী-এর
শিষ্যের ঈমানদীপ্ত ঘটনা /১৪৬
প্রকৃত সৌন্দর্য /১৪৭
চরিত্র গঠনের কতিপয় দীপ্যমান নীতিমালা /১৪৮
জৈবিক চাহিদার শুরু ও শেষ /১৪৯

হৃদয়ে আসন দাও /১৪৯
আল্লাহর রহমতের নজর থেকে বঞ্চিত মহিলা /১৪৯
মহিলাদের উদ্দেশে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা /১৫৩
দুটি মৌলিক কথা /১৫৩
সমাজের প্রভাব /১৫৩
আল্লাহর অপূর্ব দয়াসমূহ /১৫৪
তাওবার প্রভাব /১৫৪
অস্থিরতার কারণ কী? /১৫৫
প্রশান্তি অর্জিত হচ্ছে না কেন? /১৫৬
একটি বিস্ময়কর সূক্ষ্মতা /১৫৬
গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার উপকারিতা /১৫৭
প্রকৃত পর্যবেক্ষণ /১৫৭
একটি শিক্ষণীয় উদাহরণ /১৫৮
এক স্বামীর বিরল দৃষ্টান্ত /১৫৯
গুনাহের অকল্যাণ /১৫৯
ফুযায়েল ইবনে আয়াযের বাণী /১৬০
আমাদের আক্ষেপপূর্ণ অবস্থা /১৬০
অস্থিরতা কেন আসে? /১৬১
শরীয়ত থেকে দূরত্ব /১৬১
আল্লাহপ্রদত্ত রহমত /১৬২
আদি যুগের মানুষের আমল ও তার পরিণাম /১৬৩
একটি মূল্যবান উপদেশ /১৬৩
অস্থিরতার সমাধান ইস্তেগফার /১৬৩
দীনের মধ্যেই সফলতা /১৬৪
গুনাহের ক্ষতিসমূহ /১৬৪
বরকতশূন্য জীবন /১৬৪
আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে পুরস্কার /১৬৫
দু'আ কবুল হয় না কেন? /১৬৬
দু'আ কবুল হওয়ার রহস্য /১৬৬
একটি বিরল উদাহরণ /১৬৬
আল্লাহর সাহস কত বড়! /১৬৬
বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা /১৬৯
নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্থল কে? /১৬৯

জীবন-যাপনের দিকনির্দেশনামূলক নীতিমালা /১৭৩
ঈমানদারদের পারস্পরিক সম্পর্ক /১৭৩
শরীয়তের অপূর্ব শিক্ষা /১৭৪
শরীয়তের তিনটি অলংকারপূর্ণ কথা /১৭৫
ভালোবাসার সম্পর্কের উপযুক্ত কে /১৭৫
মনুষ্যত্বের সম্মান /১৭৬
নবীজির হাদীছের কারিশমা /১৭৭
মুসলমানের মৌলিক পরিচয় /১৭৮
অন্যের প্রতি সুদৃষ্টি রাখার ক্ষেত্রে নবীজির বরকতময় অভ্যাস /১৭৮
সায়্যেদুনা আবুবকর (রাযি.)-এর প্রজাদের ঘুমের প্রতি খেয়াল /১৭৮
হযরত ওমর (রাযি.) ও বিধবা মহিলার সেবা /১৮০
সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যাধি /১৮২
আকাবিরের জীবনী নবীজির জীবনীর প্রতিচ্ছায়া ছিল /১৮২
আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.)-এর প্রতিবেশিত্বের মূল্য /১৮৪
ইমাম আজম (রহ.) ও উত্তম আচরণ /১৮৪
শত্রু কীভাবে মিত্র হয় /১৮৫
এক বুযুর্গের অপূর্ব অভ্যাস /১৮৬
আজ ক্ষমা চেয়ে নাও /১৮৬
ভেবে দেখুন, সেদিন আমাদের অবস্থা কী হবে? /১৮৮
ইসলামের বিশ্বজনীন ব্যবস্থা /১৮৮
হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর বিস্ময়কর ঘটনা /১৮৯
অন্যের হক সম্পর্কে বেপরোয়া হওয়ার মসিবত /১৯০
আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.)-এর ঈমানদীপ্ত ঘটনা /১৯০
ঈমানদারদের সঙ্গে উত্তেজিত হওয়া অপছন্দনীয় কাজ /১৯২
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানত /১৯২
বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা /১৯২
একটি উদাহরণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ /১৯৩
যুবকদের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ /১৯৭
মানবজীবনের বিভিন্ন স্তর /১৯৭
কাজের জিম্মাদারি কার ওপর সমর্পণ করবেন /১৯৮
ঐতিহাসিক প্রমাণাদির প্রতি কিঞ্চিৎ আলোকপাত /১৯৮
হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দাওয়াতের অনুমান /১৯৯

আম্বিয়ায়ে কেরামের পরস্পর সাদৃশ্য /২০০
আসহাবে কাহফের ঘটনা /২০১
যৌবনকালের কৃতিত্ব /২০১
একটি গুরুত্বপূর্ণ নসীহত /২০২
মুরুব্বীদের বরকত /২০২
উম্মতের খ্যাতিমান যুবসম্প্রদায় ২০৩
ইমাম গাযযালি (রহ.)-এর মায়ের শিক্ষা ২০৩
তাসাওউফ জগতের বুযুর্গদের যৌবনকাল /২০৫
মুসলিম সেনাপতি ছিলেন যুবক /২০৫
একটি মৌলিক পার্থক্য /২০৬
ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর জীবন /২০৬
হযরত খাজা মাসুম (রহ.)-এর পরিশ্রম /২০৬
প্রতিপালনের প্রভাব /২০৭
যৌবনকালের পেশা /২০৭
নীরব ঘাতক /২০৮
বিস্ময়কর ঘটনা /২০৯
চিন্তার বিষয় /২১০
মিউজিক একটা মারাত্মক বিষ /২১০
বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব /২১২
বৈজ্ঞানিক গবেষণার ঐতিহাসিক দৃশ্য /২১২
মানবমস্তিষ্কে পৌঁছা কীভাবে সম্ভব হবে /২১৩
মিউজিক একটি বাদ্যযন্ত্র /২১৪
Back Track System /২১৪
Effects of Back Track System - বেক ট্রেক
সিস্টেমের অপকার /২১৫
অন্তর্নিহিত প্রভাব /২১৬
ঈমান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা /২১৭
মিউজিকের ভয়ানক প্রভাব /২১৭
একটি চাক্ষুষ ঘটনা /২১৭
দুশমনের মিষ্ট বিষ /২১৮
মিডিয়া হচ্ছে নষ্টের উৎস /২১৯
ঈমানের টিবি /২২০
তরুণরা কেমন জীবন যাপন করবে /২২১

এদিকও থাকতে পারছি না সেদিকও থাকতে পারছে না /২২১
ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা /২২২
যেমন কর্ম তেমন ফল /২২২
দুটি শিক্ষণীয় ঘটনা /২২৩
যিনা কি ঋণ? /২২৫
ব্যভিচার একটি ঋণ /২২৫
ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা /২২৫
দল কাকে বলে? /২২৬
শয়তানি জাল //২২৭
বাহ্যিক সৌন্দর্য একটি ধোঁকা /২২৭
তাক্ওয়া ও ধৈর্যের ওপর আল্লাহ তা'আলার পুরস্কার /২২৮
দুটি রাস্তা /২৩০
চারটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ/২৩৩
নসীহত বা উপদেশ কাকে বলে? /২৩৩
নসীহতের প্রভাব নিজের সত্তার ওপর /২৩৩
পিঁপড়ার কল্যাণকামিতা /২৩৪
আমাদের পূর্বপুরুষদের নসীহতের পদ্ধতি /২৩৪
ইমাম যায়নুল আবেদীন (রহ.)-এর মাতাপিতার উপদেশ /২৩৪
সন্তানের প্রতিপালন শত কিতাবের সারসংক্ষেপ /২৩৮
ইসলামের বিজয় /২৩৮
হযরত ওমর (রাযি.) ও কথার সংরক্ষণ /২৪০
আপন সন্তানকে হযরত লুকমান (আ.)-এর নসীহত /২৪২
হযরত লোকমান (আ.)-এর নসীহতসমূহের সারসংক্ষেপ /২৪২
দুটি কথার আলোচনা করবে না /২৪৫
দুটি বিষয় কখনো ভুলবে না /২৪৫
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা /২৪৬
সময়ের মূল্য /২৪৯
নেয়ামতের বর্ষণ /২৪৯
সময়ের গুরুত্ব কেন? /২৫০
অদৃশ্য নেয়ামত /২৫১
সৌভাগ্যবান মানুষ কে? /২৫১
ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর মূল্যবান উক্তি /২৫১
সম্মানপূর্ণ জীবনের রহস্য /২৫২

ইবনে আবু কায়েছ (রহ.)-এর বিজ্ঞোচিত জবাব /২৫২
ইবাদাতের উত্থান /২৫২
ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর ফিকহি জ্ঞান /২৫৩
মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেবের দীনের জন্য আত্মত্যাগ /২৫৩
আশ্চর্যপূর্ণ ঘটনা /২৫৩
হযরত আবু যুরআ (রহ.)-এর অন্তিমকাল /২৫৪
অধ্যয়নের আশ্চর্য অনুমান /২৫৫
ইমাম রাযি (রহ.)-এর অধ্যয়নের আগ্রহ /২৫৫
পৃথিবী যার ওপর উল্লাস করে /২৫৬
হাদীছে নববীর প্রতি মহব্বতের একটি উপমা /২৫৬
হযরত ইমাম ইবনে সফুন (রহ.)-এর গভীর মনোযোগ /২৫৬
ইমাম নববী (রহ.)-এর বিরল শর্ত /২৫৭
মূল্যবান নসীহত /২৫৭
ছাত্রদের জন্য পথপ্রদর্শক দৃষ্টান্ত /২৫৭
ইমাম ইবনে জারীর তাবারি (রহ.)-এর প্রচারমূলক কাজ ও
আমাদের করুণ অবস্থা /২৫৮
কুরআন বোঝার আশ্চর্য দৃষ্টান্ত /২৫৮
ইবনে জাওযির অবস্থা /২৫৯
এক সময় দুটি কাজ /২৫৯
আল্লামা ইবনে আকীল (রহ.)-এর ইলমি উদ্যম /২৫৯
ফুযায়েল ইবনে ইয়ায (রহ.)-এর হিসাব /২৬০
আল্লামা জিয়া আল মাকদিসী (রহ.)-এর রাতযাপন /২৬০
শিক্ষার সম্মান /২৬০
নবীজির হাদীছের প্রতি আল্লামা মুনযিরি (রহ.)-এর মহব্বত /২৬০
ইমাম আলুসি (রহ.) একজন আদর্শ শিক্ষক /২৬১
তিনি যাঁর সত্যিকারের আশেক /২৬১
ইমাম নববী (রহ.)-এর কথা /২৬১
অল্প আহারের উপকার /২৬১
আল্লামা বাখিল্লানি (রহ.)-এর বরকতময় অভ্যাস /২৬২
সময় বরফের মতো /২৬২
হেদায়াতের কারণ /২৬২
The golden words (সোনালি অক্ষরমালা) /২৬৩
সেল ফোন, নাকি হিলফোন (জাহান্নামের ফোন) /২৬৩

আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ কীভাবে সময় ব্যয় করতেন /২৬৪
হযরত ফযল আলী কোরাইশি (রহ.)-এর যিকিরের ধরন /২৬৪
হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া (রহ.)-এর আগ্রহ /২৬৪
হযরত মুরশিদে আলম (রহ.)-এর আলিশান বাণী /২৬৪
হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর রমজানের আমল /২৬৪
মুফতী শফী সাহেব (রহ.)-এর বরকতময় অভ্যাস /২৬৫
কাজের দায়িত্ব কার ওপর অর্পণ করবেন /২৬৫
পরকালের চিন্তা /২৬৫
হযরত খাজা মাসুম (রহ.)-এর নসীহত ও তার বিশ্লেষণ /২৬৫
পৃথিবীটা পরীক্ষার হল /২৬৬
চাষাবাদে উন্নতির রহস্য /২৬৭
যুবসম্প্রদায়ের অজানা অবস্থা /২৬৭
ধারকৃত বস্তু /২৬৮
একটি বিরল উদাহরণ /২৬৮
চিন্তার বিষয় /২৬৯
সময় সোনা-রুপার টুকরা /২৬৯
পাঁচটি বস্তুর মূল্যায়ন করো /২৬৯
নবীজির দিন-রাত /২৭০
সময়ের ধ্বনি /২৭০

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

খুতুবাতে যুলফিকার-২০

গ্রহণযোগ্য কে? /২৭৭

قبولیت (গ্রহণযোগ্য) শব্দের বিশ্লেষণ /২৭৭

গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠির বিশ্লেষণ /২৭৯

বিখ্যাত ওলী আল্লামা আতাউল্লাহ সেকান্দরি (রহ.)-এর বরকতময় উক্তি /২৮০

মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.)-এর শাহী ফরমান /২৮১

প্রিয়নবীর বন্দেগির স্তর /২৮১

ইমাম আবুহানীফা (রহ.)-এর প্রার্থনা /২৮১

ইবাদত কবুল হয় কীভাবে /২৮২

জান্নাতে প্রবেশাধিকার হবে কীভাবে /২৮২

ওপরোক্ত প্রশ্নের জবাব /২৮৪

আল্লামা ইবনে জাওযি (রহ.)-এর বিজ্ঞতাপূর্ণ দলিলসমূহ /২৮৫

কবুল হওয়ার আলামত /২৮৭

আল্লাহ তা'আলার পছন্দীয় আমল /২৮৯

চোখে দেখা অবস্থা /২৮৯

হৃদয়ে দুর্বলতার কারণ কী? /২৯১

আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল /২৯২

আত্মার শান্তি /২৯৩

স্থিতিশীল আমল /২৯৪

আমলের নিরবচ্ছিন্নতা বজায় থাকা /২৯৫

হানাফি ফেকাহ শাস্ত্রের (মাযহাবের) গ্রহণযোগ্যতা /২৯৬

দারুল উলূম দেওবন্দের অবস্থান /২৯৭

আম্বিয়ায়ে কেরামের ভাবনা /২৯৯

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা /৩০১

আল্লাহ তা'আলার অমুখাপেক্ষিতা /৩০২

বনী ইসরাইলের এক দরবেশ /৩০৪

আবু আবদুল্লাহ উন্দুলুসি (রহ.)-এর ঘটনা /৩০৫

আল্লাহর নেয়ামতসমূহ /৩১৩
সৃষ্টির সেরা মানুষের ওপর আল্লাহর নেয়ামতরাজি /৩১৩
মানুষ সোনা-রুপার মতো /৩১৪
মানুষের আত্মার দুই অবস্থা /৩১৪
আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যের মাধ্যম হচ্ছে কান্না /৩১৬
যৌবনকাল কীভাবে কাটাবে /৩১৭
আল্লাহর ইবাদতে পাগল যুবক /৩১৭
জ্ঞান ও ইচ্ছার দ্বারা গুনাহ বর্জনের ওপর পুরস্কার /৩১৮
জীবন একটি আমানত /৩১৮
নেয়ামতসমূহের প্রত্যাবর্তন /৩১৯
একটি বিরল উদাহরণ /৩১৯
নেয়ামতসমূহের উত্থান-পতন /৩২০
চোখের মতো নেয়ামতের অপব্যবহার /৩২০
কান নামক নেয়ামতের প্রত্যাবর্তন /৩২১
জবান নামক নেয়ামতের অপব্যবহার /৩২১
পা নামক নেয়ামতের ব্যবহার /৩২২
সুন্নতের মূল্যায়ন /৩২৩
বেহেশতি ও দোযখিদের বিপরীতমুখী পুরস্কার /৩২৩
দুনিয়া পরীক্ষার হল /৩২৭
উম্মতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ /৩২৭
একটি আশ্চর্য ঘটনা /৩২৭
গুনাহের হাকীকত /৩২৯
আট সাক্ষী /৩৩০
আট সাক্ষী কী-কী? /৩৩১
আমলনামা নবীজির সম্মুখে উপস্থিত করা হবে /৩৩৩
শিক্ষণীয় ঘটনা /৩৩৪
এক বুযুর্গের মোবারক বাণী /৩৩৬
সুবর্ণ সুযোগ /৩৩৬
হযরত আবুহুরায়রা (রাযি.)-এর দু'আ /৩৩৭
ঈমান রক্ষা করবেন কীভাবে /৩৩৭
অন্ধ লোকের বুদ্ধিমত্তা /৩৩৮
হে আল্লাহ! তোমারই কাছে চাই; তুমিই আমাদের দান করো /৩৩৯

কলব জারি হওয়া /৩৪৩
অধিক পরিমাণে যিকিরের প্রভাব /৩৪৩
যিকিরের প্রভাবসমূহের আলামত /৩৪৩
এক তরুণের ঘটনা /৩৪৪
খোদাপ্রেমিকদের কথা /৩৪৫
একটি বিরল উদাহরণ /৩৪৫
বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ /৩৪৬
আল্লাহ তা'আলা মানুষের নিয়ত দেখেন /৩৪৬
যিকিরকারীদের ওপর সাকীনার অবতরণ /৩৪৭
মানবিক পর্যবেক্ষণ /৩৪৭
রহমতের বর্ষণ /৩৪৭
যিকিরের মধ্যে আলাদা বৈশিষ্ট্য না পাওয়ার কারণ /৩৪৮
আশ্চর্য ঘটনা /৩৪৮
নবীজির মোবারক ফরমান /৩৪৯
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় /৩৪৯
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত /৩৪৯
আল্লাহর নবীর বৈশিষ্ট্য /৩৫০
হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.)-এর মর্যাদা /৩৫১
একটি ব্যাধি ও তার লক্ষণ /৩৫১
আধ্যাত্মিক চিকিৎসা /৩৫১
বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ /৩৫১
হাদীছের আলোকে নজর লাগা /৩৫২
ইংরেজি ভাষার মূল তত্ত্ব /৩৫৩
মৌলিক বিষয় /৩৫৪
একটি চিত্তাকর্ষক উদাহরণ /৩৫৪
বর্তমান যুগের মুরীদ /৩৫৪
মুরাকাবার নিয়মানবর্তীতার প্রভাব /৪৫৫
অন্তর জারি হওয়া কাকে বলে? /৩৫৫
অন্তরের অবস্থা /৩৫৫
প্রাথমিক অবস্থা /৩৫৫
হৃৎকম্প ও উদ্বেগ /৩৫৬
হৃৎকম্পের একটি জরিপ /৩৫৬
তীক্ষ্ম স্থানের অবস্থা /৩৫৬

বাস্তব বিশ্লেষণ /৩৫৬
দৃষ্টি আকর্ষণ /৩৫৬
আন্তরিক অবস্থাসমূহ /৩৫৭
অন্তর জারি হওয়ার লক্ষণ /৩৫৯
নির্ভরযোগ্য মূলনীতি /৩৬০
সবকের উন্নতি হয় কীভাবে /৩৬০
যিকিরকারী প্রেমিক কে? /৩৬০
যিকিরের বিশেষ অবস্থার কষ্ঠিপাথর সুন্নতের সীমারেখা /৩৬২
মূল বস্তু /৩৬৩
হে আল্লাহ! আপনারই ইচ্ছা /৩৬৪
আমাদের জবান হৃদয়ের ভাষ্যকার /৩৬৭
মুমিনের শব্দসমূহ /৩৬৭
জবানের হাকীকত /৩৬৯
কুফরি শব্দসমূহ /৩৭০
দুটি বস্তুর জিম্মাদারি /৩৭০
সায়্যেদুনা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর আমল /৩৭১
প্রকৃত মুসলমান /৩৭১
জবানের শক্তি /৩৭১
আশ্চর্যের বিষয় /৩৭৩
ভয়ানক ব্যাপার /৩৭৩
আল্লাহওয়ালাদের উপদেশ /৩৭৩
একটি বিরল উদাহরণ /৩৭৪
জবানের হেফাযত /৩৭৪
একটি ইল্‌মি সূক্ষ্মতা /৩৭৫
মুমিনের পরিচয় /৩৭৬
বুদ্ধিমান কে? /৩৭৬
কথাবার্তা কেমন হবে? /৩৭৬
আল্লাহর ঘৃণা কীসের প্রতি /৩৭৭
জবান আল্লাহ তা'আলার অপূর্ব নেয়ামত /৩৭৮
কার দু'আ কবুল হয় /৩৭৮
সত্য ও মিথ্যা /৩৭৯
ওমর (রাযি.)-এর সত্য বলা এবং কাফেরের ইসলাম গ্রহণ /৩৭৯
সত্যের জয় /৩৮১
আল্লাহর প্রিয়পাত্র কারা? /৩৮৩

ওলামায়ে দেওবন্দের ইল্‌মি কৃতিত্ব /৩৮৭
তিনটি ঘাঁটি বাস্তব /৩৮৭
দারুল উলূম দেওবন্দের তিন স্তর /৩৮৭
দুটি জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি /৩৮৮
দ্বিতীয় স্তরে আল্লামা শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.)-এর জন্ম গ্রহণ /৩৮৮
শাহ আবদুল কাদির (রহ.)-এর এলহামি অনুবাদ /৩৮৮
হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহ.)-এর ফতোয়া /৩৮৯
হযরত কাসিম নানুতবী (রহ.)-এর ব্যথিত অন্তর /৩৯০
দারুল উলূম দেওবন্দের ভিত্তিপ্রস্তর /৩৯১
উসূলে হাশতেগানা বা আট নীতিমালা /৩৯১
তোমরাই ভবিষ্যতের কর্ণধার /৩৯১
ওলামায়ে দেওবন্দের কতিপয় উল্লেখযোগ্য গুণ /৩৯২
মূর্তিপূজা, যৌনপূজা, কবরপূজা ও আত্মপূজার অবসান /৩৯২
আকাবিরে দেওবন্দ ও নবীজির মহব্বত /৩৯২
কারও হাতে শরীয়তের পেয়ালা, কারও হাতে হামানদিস্তা /৩৯৫
ওলামায়ে দেওবন্দের ইল্‌মি কৃতিত্ব /৩৯৫
হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি (রহ.)-এর স্মৃতিশক্তি /৩৯৬
হযরত থানভী (রহ.)-এর ইল্‌মি স্তর /৩৯৬
হযরত মাদানী (রহ.)-এর হাদীছের দরস /৩৯৭
হযরত মাওলানা ইয়াহয়াহ (রহ.)-এর ইল্‌মি ব্যস্ততা /৩৯৭
শিক্ষা বিষয়ে ওলামায়ে দেওবন্দের খেদমত /৩৯৭
ওলামায়ে দেওবন্দের ঐতিহাসিক কৃতিত্ব /৩৯৮
ওলামায়ে দেওবন্দের বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্ব /৩৯৯
ওলামায়ে দেওবন্দ পূর্বপুরুষদের সঠিক ধারক-বাহক /৪০০
আল্লাহপ্রদত্ত সম্পর্ক /৪০১
যেখানকার খামির, মাটি সেখানেই পৌঁছে যায় /৪০২
ওলামায়ে দেওবন্দের সম্পর্ক /৪০৫
পবিত্র জীবন অর্জনের সোপান /৪০৯
আমলের শক্তি /৪০৯
فلاح বা সফলতার সংজ্ঞা /৪১০
তাক্‌ওয়ার ওপর পুরস্কার /১০
ক্ষমা ও রিযিকের প্রশস্ততার প্রতিশ্রুতি /৪১১
প্রভাবসমূহ /৪১১

আমলের ওপর বিশ্বাস /৪১১
নামাযের দরুন সফলতার প্রতিশ্রুতি /৪১২
কুরআন শিক্ষার আমন্ত্রণ /৪১২
হযরত সুলাইমান (আ.)-এর রাজত্ব /৪১৩
হযরত আইয়ূব (আ.)-এর ধৈর্যের পুরস্কার /৩১৩
আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়ার উপকরণসমূহ /৪১৪
দুটি সুসংবাদ /৪১৪
দুটি শাস্তি /৪১৫
একটি সোনালি নীতি /৪১৭
কেয়ামতের দিন এবং সফলতার মাপকাঠি /৪১৭
দ্বিতীয় পার্থক্য /৪১৮
ছাত্রদের জন্য সূক্ষ্ম বিষয় /৪১৯
ঈমানদারদের কষ্ট পরীক্ষাস্বরূপ /৪২০
অলসতা শয়তানের একটা ফাঁদ /৪২০
কতিপয় উদাহরণ /৪২১
শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচার হাতিয়ার /৪২২
বিসমিল্লাহর বরকত /৪২৩
শয়তানি প্রভাবসমূহের কারণ /৪২৩
সন্তানদের বিসমিল্লাহ্ পাঠে অভ্যস্ত করুন /৪২৪
উজুর বরকত /৪২৫
যিকিরের বরকত /৪২৫
বিনয় ও নম্রতার সাথে নামায আদায় করার বরকত /৪২৬
রোযার বরকত /৪২৬
বর্তমান যুগে মহিলাদের অসতর্কতা /৪২৬
বর্তমান যুগে মেয়েরা দীন থেকে দূরে কেন? /৪২৭
এক বৃদ্ধার অসতায়ত্ব /৪২৭
পবিত্রতার ফযিলত /৪২৭
হজ ও ওমরার ফযিলত /৪২৮
আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার প্রতিদান /৪২৮
সদকার প্রতিদান /৪২৮
আল্লাহর ভয়ের ওপর পুরস্কার /৪২৯
দরূদ শরীফের বরকত /৪২৯
উত্তম চরিত্রের ওপর পুরস্কার /৪৩০

সফলতার ভিত্তি আমলের ওপর /৪৩০
সফলতার ভিত্তি /৪৩০
উপকার ও ক্ষতির মালিক কে? /৪৩১
মুমিনের দৃষ্টি /৪৩১
দার্শনিক সূক্ষ্মতা /৪৩২
বিশ্বাসের বরবাদি /৪৩২
অবাধ্য আত্মা /৪৩৩
আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়ার ফলাফল /৪৩৪
মানুষের আশ্চর্য কথা! /৪৩৫
অদৃশ্য ব্যবস্থাপনার পেছনে আশ্রয় /৪৩৫
সুন্নতের অনুসরণ /৪৩৬
সায়্যেদুনা ওমর ফারুক (রহ.)-এর শাসন /৪৩৮
ফকিরের মধ্যে বাদশাহি /৪৪০
প্রভুর সঙ্গ /৪৪০
উম্মতে মুহাম্মদীর বিশেষ পুরস্কার /৪৪১
নবীজির প্রস্তুতকৃত জামাত /৪৪৬
তিনটি মূল্যবান কথা /৪৪৬
শ্রমের মাঠ /৪৪৭
আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা /৪৪৭
সাধারণ প্রকৃতি /৪৪৮
শরীয়তের স্বভাব /৪৪৮
গুনাহের ওপর সাক্ষী /৪৪৯
একটি দার্শনিক সূক্ষ্মতা /৪৪৯
আল্লহপাকের চারটি পুরস্কার /৪৫২
খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (রহ.)-এর বাংলা মুলুক সফর /৪৫৪
দীনকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরো /৪৫৪
গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে কান্না /৪৫৪
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ওপর আল্লাহর শাস্তি /৪৫৯
মানবজাতির পরীক্ষা /৪৫৯
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত /৪৬০
নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের প্রতি কিঞ্চিৎ আলোকপাত /৪৬০
বাতাসের শাস্তি /৪৬১
সামুদ সম্প্রদায়ের ভুল /৪৬২

হযরত লুত (আ.)-এর সম্প্রদায় এবং আল্লাহর পাকড়াও /৪৬২
মাপে কম দেওয়ার পরিণাম /৪৬৩
ফেরাউন ও কারুনের অবস্থা /৪৬৩
ধর্ম হচ্ছে উপদেশ /৪৬৪
কুরআন মাজীদের শর্তসাপেক্ষ অনুমান /৪৬৪
لو (যদি) فلما (যখন) শব্দদ্বয়ের চমৎকার বিকাশ /৪৬৫
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রার্থনা /৪৬৬
দানের প্রতিদান /৪৬৬
ইবনে কায়্যিম (রহ.)-এর উপদেশ /৪৬৭
কুরআনের আলোকে পাপ ও পুণ্যের পরিণাম /৪৬৭
পাঁচের বদলা পাঁচ /৪৬৮
সুবিচারের মূলতত্ত্ব /৫৬৯
যাকাত না দেওয়ার কুফল /৪৭০
ওয়াদা ভঙ্গের ওপর আল্লাহর শাস্তি /৪৭০
আল্লাহর বিধানের অবাধ্যতা /৪৭১
একটি আশ্চর্য ঘটনা /৪৭১
চিন্তার বিষয় /৪৭৩
একটি শিক্ষণীয় স্থান /৪৭৩
আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতার পরিণাম /৪৭৩
সায়্যেদা আয়েশা (রাযি.)-এর নসীহত /৪৭৩
অপরাধের শাস্তি পাওয়ার পদ্ধতি /৪৭৪
শিক্ষণীয় ঘটনা /৪৭৫
আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের প্রতিপালন /৪৭৬
তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কথা /৪৭৬
মালের হাকীকত /৪৭৬
অস্থিরতা কীভাবে কমবে /৪৭৭
নবীগণের পন্থা /৪৭৯
হযরত ইউনুস (আ.)-এর দু'আ /৪৮০
আম্মাজি (রহ.)-এর আখেরাতের সফর /৪৮১
এ পৃথিবী ধ্বংসের দাগে কলঙ্কিত /৪৮২
মৃত্যুর স্মরণ মহান নেয়ামত /৪৮৪
رحمن ও رحيم গুণের তাজাল্লি /৪৮৪

ছোট্ট চড়ুই পাখির তার বাচ্চাদের প্রতি ভালোবাসা /৪৮৫
নিজের বাচ্চাদের প্রতি মুরগির মহব্বত /৪৮৬
রাশিয়ায় এক হৃদয়বিদায়ক ঘটনা /৪৮৬
বিয়ের পরে প্রথম কামনা /৪৮৭
হযরত ইমরান (আ.)-এর স্ত্রীর প্রার্থনা /৪৮৭
মায়ের ভালোবাসার মেরুদণ্ড /৪৮৮
মায়ের ভালোবাসার অনুমান /৪৮৮
মায়ের মর্যাদা /৪৮৯
মায়ের দু'আ জান্নাতের হাওয়া /৪৮৯
মানবজীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা /৪৮৯
ﷺ পাঠ করার প্রতিদান /৪৯০
মায়ের দু'আর প্রতিদান কিছু নেই আল্লাহর রহমত ব্যতীত /৪৯০
দূরে বসে মানুষ দু'আ-ই দিতে পারে শুধু /৪৯১
মায়ের ভালোবাসা হিমালয় পর্বত / ৪৯২
আমার সন্তানকে হেদায়াত দান করো আল্লাহ! /৪৯২
কুরআনি সংবাদ /৪৯

খুতুবাতে যুলফিকার-১৯

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্য

'হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্য গ্রহণ করা আমি একান্ত কতর্ব্য বলি। এটি হাকীমুল উম্মতের ভাষ্য। দায়িত্ব মনে করে ব্যক্ত করছি। হযরত আবদুল্লাহ বাহলভী (রহ.) ফজলে আলী কোরাইশী (রহ.)-এর খলীফা ছিলেন। অনেক উচ্চ স্তরের বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর শিক্ষাদান ও তাফসীর প্রসিদ্ধ ছিল। পবিত্র রমজান মাসে অসংখ্য ওলামায়ে কেরাম তাঁর নিকট তাফসীর শিক্ষার জন্য আগমন করতেন। আল্লাহ তাঁকে মাকবুল ওলামায়ে কেরামের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি হযরত শায়খ অনোওয়ার শাহ কাশ্মিরি (রহ.)-এর নিকট দাওরায়ে হাদীছ সমাপণ করেছি। তিনি বোখারি শরীফের পাঠদান শেষ করার পর বলেছিলেন, যতবার ইচ্ছা বোখারি শরীফ পাঠ করবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহওয়ালাদের জুতা ভাঁজ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইল্‌মের আত্মা পাবে না। তাই হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) বলতেন, আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্য ব্যতীত পরিপূর্ণ এখলাছ হাসিল করা পাহাড় কেটে দুধের ঝরনা প্রবাহিত করার আশা করার নামান্তর।'

আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ .

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীগণের সঙ্গে থাকো।'[১]

তাক্ওয়া কাকে বলে?

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا

হে ঈমানদারগণ!

মানে যারা আল্লাহ ও তাঁর হাবীব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মান্য করার অঙ্গীকার করেছ, যারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছ যে, আমরা আল্লাহর আদেশ পালন করব এবং মানবতার শান্তির দূত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত পথে জীবন গড়ব, তোমরা

اِتَّقُوا اللّٰهَ

'আল্লাহকে ভয় করো, ধর্মানুরাগী হও।'

তাক্ওয়া বলে এমন বস্তু পরিহার করা, যেগুলো গ্রহণ করলে মহান প্রভুর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পথে ব্যাঘাত ঘটে। আল্লাহর সঙ্গে ভালোবাসা সৃষ্টির পথে যে বস্তু-ই প্রতিবন্ধক হবে, তা বর্জন করার নাম তাক্ওয়া।

---

১. সূরা তাওবা : আয়াত ১১৯

তাক্ওয়ার স্তর তিনটি

এক. কুফরি ও অংশীবাদিতা ত্যাগ করা।

কুফর ও শির্ক থেকে তাওবা করা চিরস্থায়ী জাহান্নামি হওয়া থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার মাধ্যম। যেব্যক্তি কুফরি ও শির্ক থেকে বেঁচে গেল, সে জাহান্নামের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া থেকে বেঁচে গেল, স্থায়ী শাস্তি থেকে সে মুক্তি পেয়ে গেল।

দুই. গুনাহের কাজ বর্জন করা।

এটা চিরস্থায়ী জাহান্নামি হওয়া থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করার মাধ্যম। প্রথম স্তর জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়। তারপর গুনাহের কাজ বর্জনের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করার উপযোগী হয়।

তিন, সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে বেঁচে থাকা। এই স্তরের মানুষ আল্লাহর দরবারে জান্নাতে মহান মর্যাদার অধিকারী হয়ে যায়। সুতরাং যে-পরিমাণ তাক্ওয়া অর্জন করবে, সেই পরিমাণ মর্যাদার অধিকারী হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

'তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তোমরা তাক্ওয়া অর্জন করো।'[২]

তোমাদের ঘোড়া (আমলের) যত দ্রুত দৌড়াতে পারে ময়দানে তাকে দৌড়িয়ে নাও। তোমাদের অনুমতি দেওয়া হলো। এটা এমন আমল, যার ব্যাপারে মহান আল্লাহ উপদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন–

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهَ

'আমি তোমাদের পূর্ববতীদের অসিয়ত করেছিলাম; তোমাদেরও অসিয়ত করছি, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।'[৩]

একটি কথা এক নিঃশ্বাসে দুবার পুনরাবৃত্তি করলে অবশ্যই তার গুরুত্ব প্রকাশ পায়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে একটি কথা এক আয়াতে দুবার উল্লেখ করে বলেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ

---

২. সূরা তাগাবুন : আয়াত ১৬

৩. সূরা নিসা : আয়াত ১৩১

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।'[৪]

একটু পরে আবার বলেছেন,

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

'এবং প্রত্যেক আত্মা যেন ভেবে দেখে, আগামী দিনের জন্য সে কী সঞ্চয় করছে এবং আল্লাহকে ভয় করো।'[৫]

একই আয়াতে কয়েক শব্দ পরেই আবার اتَّقُوا اللَّهَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ আল্লাহর দরবারে তাক্ওয়ার অত্যন্ত গুরুত্ব রয়েছে। কারণ, তাক্ওয়া ব্যতীত মানুষ আল্লাহর ওলী হতে পারে না।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ

'একমাত্র মুত্তাকী বা ধর্মানুরাগী ব্যক্তিবর্গই আল্লাহর ওলী হয়।'[৬]

কাজেই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদেরকে তাক্ওয়াপূর্ণ জীবন গড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হযরত যুন্নুন মিসরি (রহ.)-এর দৃষ্টিতে তাক্ওয়া

হযরত যুন্নুন মিসরি (রহ.)কে কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল, হযরত! তাক্ওয়া কাকে বলে? তিনি বললেন, তোমাদের অন্তরে যত আকাঙ্ক্ষা আছে, সেগুলোকে যদি দৈহিক রূপ প্রদান করে কোনো পাত্রে রাখা হয়, তাহলে এমন কোনো দেহ যেন প্রকাশ না পায়, যার কারণে তোমাকে লজ্জিত হতে হবে। গুনাহের ধারণা অন্তরে ঠাঁই না দেওয়ার নাম তাক্ওয়া। আরও সহজ কথায় বুঝে নিন, তাক্ওয়া বলা হয়, মানুষ এমন নিষ্কলুষ জীবন গড়বে, যাতে কেয়ামতের দিন কেউ তার কলার ধরতে না পারে।

তাক্ওয়ার পুরস্কার

বন্ধুগণ! নিজের জীবনের প্রতি অবলোকন করুন যে, আমার জীবনে কি এমন কোনো বিষয় আছে যে, কারও অন্তরে আঘাত দিয়েছি, কারও প্রাপ্য আদায় করিনি, কাউকে কষ্ট দিয়েছি? কারও সঙ্গে এমন আচরণ করিনি তো

---

৪. সূরা তাওবা : আয়াত ১১৯
৫. সূরা হাশর : আয়াত ১৮
৬. সূরা আনফাল : আয়াত ৩৪

যে, কেয়ামতের দিন সে আমার ঘাড় ধরতে না পারে, এমন তাক্ওয়া অর্জন করতে পারলে আল্লাহ তাকে এমন কিছু জ্ঞান দান করবেন, যা কিতাব পড়ে অর্জন করা সম্ভব নয়।

উপকারী ইল্মের পরিচয়

علم نافع বা উপকারী ইল্ম একটি বিশেষ ইল্ম। এই ইল্মের প্রার্থনা করা চাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ইল্মের প্রার্থনা করতেন। হাদীছে এসেছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا

'হে আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে উপকারী ইল্মের প্রার্থনা করছি।'

উপকারী ইল্ম কী? কী তার পরিচয়, যা নূর হয়ে মানবদেহে আবির্ভূত হয়? এক প্রকার ইল্ম তো হচ্ছে বাহ্যিক জ্ঞান, যা ইহুদি-খ্রিষ্টান তথা বিধর্মীরাও অর্জন করে। আর একটি হচ্ছে প্রকৃত ইল্ম। এটি ভিন্ন বিষয়। একদা হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব (রহ.) ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করলেন, ইল্মের মর্ম কী? কেউ বলল, জানা, কেউ বলল, পরিচয় লাভ করা। প্রত্যেকেই যার-যার জবাব দিল। হুজুর নীরব রইলেন। কেউ জিজ্ঞাসা করল, হুজুর! অনুগ্রহপূর্বক আপনি কিছু বলুন। হুজুর উত্তর দিলেন, ইল্ম হচ্ছে এমন একটি নূর, যা শিক্ষা করার পর তার ওপর আমল না করে প্রশান্তি লাভ করা যায় না, মনে কেমন জানি, মনে এক রকম অস্থিরতার ভাব বিরাজ করে। এক প্রকার ইল্ম বিপদ হয়ে সামনে আসে। সেটা শিক্ষা করা সত্ত্বেও মানুষ ভ্রষ্ট হয়। পবিত্র কুরআন কী বলে শুনুন–

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ

'আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে নিজের প্রবৃত্তিকে আপন প্রভু বানিয়েছে?'[৭]

وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ

'এবং ইল্ম থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন।'[৮]

---

৭. সূরা জাছিয়া : আয়াত ২৩

৮. সূরা জাছিয়া : আয়াত ২৩

উম্মতের কিশতি কীভাবে তীরে আসবে?

ইমাম মালেক (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, হুজুর! এ উম্মতের কিশতি অথৈ সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার কারণ কী হবে? তিনি বললেন, ওলামায়ে কেরামের কারণে। প্রশ্নকারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, হুজুর! উত্তাল সমুদ্র থেকে এ-উম্মতের কিশতি পরিত্রাণ পেয়ে তীরে ভেড়ার উপায় কী? তিনি বললেন, ওলামায়ে কেরাম। প্রশ্নকারী হতভম্ব হয়ে গেল। বলল, হুজুর! আপনার বক্তব্যের মর্ম আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। হযরত মালেক (রহ.) বললেন, ভাই! কতিপয় আলেম কুচক্রী আলেম হিসেবে স্বীকৃতি পাবে; তারা আত্মপূজারি হবে। নামধারী আলেম সাজবে। তাদের কারণে উম্মতের কিশতি অথৈ সাগরে নিমজ্জিত হবে। আর যারা হকপন্থী আলেম হবেন, তাদের প্রচেষ্টায় উম্মতের নিমজ্জমান তরী কূলে পৌঁছবে।

এজন্যই তাক্ওয়ার ক্ষেত্রে স্বল্প ইল্ম তাক্ওয়ার স্বল্পতার কারণ হবে। এর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, যার নিকট তাক্ওয়া নেই, সে জালালাইন শরীফ, বায়জাবি শরীফ, বোখারি শরীফ ও মুসলিম শরীফ পড়াতে পারবে না। এগুলো সে অনর্গল পড়াতে পারবে। কিন্তু তার থেকে ইল্মের নূর প্রকাশ পাবে না। সে যদি তাক্ওয়া অবলম্বন করত, তাহলে সে যা শিক্ষা করেছে, যে-পরিমাণ ইল্ম তার স্মৃতিপটে বিদ্যমান আছে, তার দ্বিগুণ ইল্ম তাকে দান করা হতো। আল্লাহ তাকে আপন করে নিতেন। এটা মনে করবেন না যে, আমার নিকট তাক্ওয়া নেই তো কী হয়েছে; আমার স্মরণশক্তি প্রখর– যা শুনি মুখস্থ হয়ে যায়। আমি ক্লাসের ফাস্ট ছাত্র। হাদীছের মর্ম সবার আগে বুঝতে পারি। হে আল্লাহর বান্দা! তুমি যদি গুনাহের সাথে জড়িত থেকেও হাদীছ-কুরআনের জ্ঞান লাভ করতে পার, এর যোগ্য পাত্র হতে পার, তাহলে গুনাহ বর্জন করে তাক্ওয়া অর্জন করলে আল্লাহ তোমাকে হাদীছের হাফেজ হিসেবে গণ্য করতেন। তুমি নিজেই তোমার অবস্থানকে নিম্নতর করছ। ইমাম শাফেয়ি (রহ.) কত সুন্দর বলেছেন,

شَكَوْتُ إِلَى وَكِيْعٍ سُوْءَ حِفْظِيْ * فَأَوْصَانِيْ إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِيْ

فَإِنَّ الْعِلْمَ نُوْرٌ مِّنْ إِلٰهِيْ * وَنُوْرُ اللهِ لَا يُؤْتَى لِعَاصِيْ

'আমার ওস্তাদ ওয়াকী' (রহ.)-এর নিকট আমার স্মৃতিশক্তির অভিযোগ করলাম। তিনি বললেন, গুনাহের কাজ ছেড়ে দাও। করণ, ইল্ম হচ্ছে মহান স্রষ্টার নূর। আর সেই নূর কোনো গুনাহগারকে দেওয়া হয় না।'

সুতরাং হে বন্ধুগণ! এই ইল্‌ম দ্বারা উদ্দেশ্য সাদা কাগজে কালো কালির লিখিত শব্দের ইল্‌ম নয়; বরং এটা ইল্‌মের নূর, যা গুনাহের কারণে হরণ করে নেওয়া হয়। সেই নূর থেকে বান্দাকে বঞ্চিত করা হয়। সুতরাং উপকারী ইল্‌মের পরিচয় কী? তার পরিচয় হচ্ছে, যে-পরিমাণ ইল্‌ম শিক্ষা করেছ, এর চেয়ে বেশি আল্লাহর ভয় অন্তরে ঠাঁই দেওয়া। যেমন– পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

'নিশ্চয় আলেমরা আল্লাহ তা'আলাকে অধিক ভয় করে।'[৯]

অতএব, যদি প্রশ্ন করা হয়, আলেম কাকে বলে? তবে সহজ ভাষায় এর উত্তর জেনে নাও, গুনাহের কাজ করা যার নিকট যে-পরিমাণ কষ্টকর হবে, আল্লাহর দরবারে সে তত বড় আলেম হিসেবে গণ্য হবে। অবশেষে যখন গুনাহের ধারেকাছে ও যাবে না, তখন সে আল্লাহর দরবারে সবচেয়ে বড় আলেম হিসেবে পরিগণিত হবে।

নূরে নবুওত হতে বঞ্চিত হওয়ার কারণ

মানুষের মধ্যে যখন তাক্‌ওয়া থাকে না, তখন সে গুনাহের জীবন গড়তে থাকে। এমতাবস্থায় আল্লাহ ইল্‌ম নামক নূর যা নূরে নবুওয়ত তা থেকে তাকে বঞ্চিত করেন। সে ওই নূর অর্জন করতে পারে না। সুতরাং ওই ব্যক্তি নিজের আমলের ক্ষেত্রে অপব্যাখ্যা করে থাকে। নিজের আত্মকেন্দ্রিক বিষয় হলে মনমতো ফতোয়া প্রদান করে। জনগণের ক্ষেত্রে ফতোয়া প্রদান করার সময় ভিন্ন ফতোয়া দিয়ে থাকে। এটাই কুচক্রী আলেম হওয়ার প্রমাণ।

বন্ধুগণ! এ নিখিল ধরায় আজ পর্যন্ত যা কিছু আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা হয়েছে, যে বস্তুর মাধ্যমেই আল্লাহর অংশীদারি স্থাপন করা হয়েছে, যে সকল বস্তুকেই প্রভু মেনে নেওয়া হয়েছে, সেগুলো কোনোটি এতটা বড় হতে পারে না, যতটা বড় নিজের আত্মা হতে পারে। এটা সবচেয়ে বড় প্রভু। আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ছেড়ে মানুষ তার ইবাদত করতে থাকে। বনী ইসরাইলের বেআমল আলেমদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا

'বোঝা বহনকারী গাধার ন্যায়।'[১০]

---

৯. সূরা ফাতির : আয়াত ২৮

১০. সূরা জুমুআ : আয়াত ৫

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাদের উপমা দিতে গিয়ে গাধা শব্দ উল্লেখ করেছেন এবং বনী ইসরাইলের বেআমল পীর-মুরশিদদের কুকুরের সঙ্গে তুলনা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ

'তাদের দৃষ্টান্ত কুকুরের মতো।'[১১]

বলআম বাউর নামে এক ব্যক্তি বনী ইসরাইলের মধ্যে তার যুগের শ্রেষ্ঠ পীর ছিল। কিন্তু তাক্ওয়া ছিল না, আমল ছিল না। মূসা (আ.) তার বিরুদ্ধে দু'আ করলেন। ফলাফল কী হলো? আল্লাহ তা'আলা কুকুরের সঙ্গে তার উপমা দিলেন। সুতরাং মানুষ আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে আলেম হতে হলে মুত্তাকী হওয়া আবশ্যক। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন ইল্ম দান করবেন, যা সাধারণত কিতাবাদিতে পাওয়া যায় না।

ইল্ম ও আল্লাহ তা'আলার ভয়

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

عَلَّمَنِيْ رَبِّيْ فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمِيْ

'আমাকে আমার প্রভু শিক্ষা দিয়েছেন এবং উত্তম শিক্ষা দিয়েছেন।'

অন্যত্র এসেছে

عَلَّمَنِيْ رَبِّيْ فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبِيْ

'আমাকে আমার প্রভু শিক্ষা দিয়েছেন এবং উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন।'

ইল্ম দান করেন কে? আল্লাহ তা'আলা দান করেন এবং মুত্তাকীগণকে দান করেন। তাক্ওয়ার পরিমাণ যত বেশি হবে, আল্লাহ তা'আলার রহস্য তত বেশ প্রকাশ পাবে। ইহুদি আলেমদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

'যদি তারা জানত!'

অথচ তারা ছিল আলেম সম্প্রদায়। এর মমার্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে তারা ইল্মশূন্য ছিল। এজন্যই বলেছেন,

---

১১. আরাফ : আয়াত ১৭৬

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

'যদি তারা জানত!'

অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

তোমরা কিতাব পড় অথচ তোমাদের নিকট বিবেকের লেশমাত্র নেই।[১২]

সুতরাং ইল্‌ম বলা হয়, যার দ্বারা মানবমনে আল্লাহর ভয় বৃদ্ধি পায়।

ইল্‌মকে সুরক্ষিত রাখার পদ্ধতি

এবার এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয় শুনে নিন। আমরা বলে থাকি, ঈমানের সংরক্ষক ইল্‌ম। ইল্‌মের সংরক্ষক তাক্‌ওয়া। তাক্‌ওয়া না থাকলে ইল্‌ম থেকে বঞ্চিত হবে এবং ইল্‌ম না থাকলে ঈমান থেকে বঞ্চিত হবে। সুতরাং যেব্যক্তি ঈমানকে সুরক্ষিত রাখতে চায়, সে যেন নিজের ইল্‌মকে সংরক্ষণ করে। আর যেব্যক্তি নিজের ইল্‌মকে সংরক্ষণ করতে চায়, সে যেন তাক্‌ওয়া অর্জন করে। এজন্যই ইমান মালেক (রহ.) বলেন, অধিক পরিমাণে হাদীছ বর্ণনা করার নাম ইল্‌ম নয়; বরং আমলের অপর নাম হচ্ছে ইল্‌ম।

সুতরাং ইমাম শাফেয়ি (রহ.)কে বলেছিলেন, নিজের আমলকে আটা বানাও এবং নিজের ইল্‌মকে লবণ বানাও। পৃথিবীতে যত বাতিল সম্প্রদায়ের জন্ম হয়েছে, সবকটির প্রতিষ্ঠাতা আলেম ছিল। কিন্তু নামধারী আলেম ছিল। প্রকৃতপক্ষে তারা অজ্ঞ ছিল। সুতরাং এতক্ষণের আলোচনায় প্রতিভাত হলো, মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করবে, উপকারী ইল্‌ম অর্জনের জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করবে এবং নিজের আমলের ওপর আল্লাহ তা'আলার ভয়কে কায়েম রাখবে।

ওলামায়ে কেরামের প্রতি ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর উপদেশ

ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেন, প্রত্যেক আলেমের জন্য উচিত তার ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যে তার কোনো আমলের কোষাগার গচ্ছিত থাকবে। মানুষের আগোচরে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য কিছু আমলের অভ্যাস করবে। এ-ব্যাপারে কাউকে অবগত হতে দেবেঁ না। আমাদের পূর্বসূরীগণ

---

১২. সূরা বাকারা : আয়াত ৪৪

এ-রকম করতেন। জীবনে এমন কিছু আমল করতেন, যে সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানত না। এগুলো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করতেন। এজন্যই একটি কথা স্মরণ রাখবেন যে, আল্লাহ তা'আলা যখনই কোনো দীনের কাজ সম্পাদন করেছেন, তখন এমন লোকের মাধ্যমে করেছেন, যারা আলেম ছিলেন এবং তাদের জাহেরি ও বাতেনি অবস্থা সংশোধিত ছিল। আপনি ইতিহাস খুলে দেখুন, আল্লাহ তা'আলা যাকে দীনের ক্ষেত্রে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, দীনের ব্যাপারে যাকে কবুল করেছেন, তারা জাহেরি-বাতেনি উভয় ইল্‌মের অধিকারী ছিলেন। শরীয়তও তরিকত উভয়ের সমষ্টি ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের উভয় নেয়ামত দান করেছিলেন।

এজন্যই মাওলানা রুমি বলেন–

علم چو بر تن زمیں مارے بود * علم چوں بر دل زمین مار بود

بنی اندر خود علوم انبیاں * بے کتاب وبے معین اوسطی

ইল্‌মকে যদি তোমার বাহ্যিক দেহের ওপর রাখ, তাহলে সেটা বিষাক্ত সাপে পরিণত হবে। আর যদি ইল্‌মকে অন্তরের গহ্বরে ঠাঁই দিতে পার, তাহলে সেটা তোমার ঘনিষ্ট বন্ধু হবে। আর যদি তোমরা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করতে পার, তাহলে তোমরা নবীগণের ইল্‌মের অধিকারী হবে। আল্লাহ তোমাদের এমন ইল্‌ম দান করবেন, যা সাধারণত কিতাবাদিতে পাওয়া যায় না। কিতাব ও ওস্তাদের সাহায্য ব্যতীত আল্লাহ তোমাদের হৃদয়ে ঢেলে দেবেন। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো।[১৩]

كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ-এর যোগ্যপাত্র কারা?

كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

'তোমরা সত্যবাদীগণের অন্তভুর্ক্ত হয়ে যাও।'[১৪]

---

১৩. সূরা তাওবা : আয়াত ১১৯

১৪. সূরা তাওবা : আয়াত ১১৯

كُونُوا এটা امر -এর সীগাহ। এতে বোঝা যায়, আল্লাহ তা'আলার এ আদেশটি পালন করা ফরজ। সত্যবাদী হয়ে যাও। কোন্ সত্যবাদিতা? যার ভেতরে ও বাইরে পার্থক্য থাকে না, যার কথায় ও কাজে পার্থক্য থাকে না। আল্লাহ যাদের আধুনিক কালচার থেকে মুক্ত রেখে নিজের রঙে রঙিন করেন। মুফাসসিরীনে কেরাম এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, এর মর্ম হচ্ছে সমকালীন ওলামায়ে কেরাম। অর্থাৎ– তোমরা বর্তমানে ওলামায়ে কেরামের সান্নিধ্য অর্জন করো, তাদের থেকে কল্যাণ গ্রহণ করো। সুতরাং ইল্‌মের ভালোবাসা আল্লাহর মহব্বতে সৃষ্টি হয়। আর আল্লাহর ভালোবাসা ওলামায়ে কেরামের সন্নিধ্যে হাসিল হয়।

আল্লামা আলুসি (রহ.) ও كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ-এর বহিঃপ্রকাশ

রুহুল মায়ানী কিতাবে আল্লামা আলুসি (রহ.) বলেন, كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ এর মর্ম হচ্ছে, তাদের (সত্যবাদীগণের) সাথে মিলেমিশে থাকো, যাতে তাদের মতো হতে পার। তোমরা তাদের সঙ্গে এ পরিমাণ মহব্বত ও সংশ্রব রাখ যে, তোমরা তাদের অনুরূপ হয়ে যাও। বলা হয়, তরমুজ দেখে তরমুজে রং ধারণ করে। অতএব, তোমরা তাদের সঙ্গে ওঠাবসা, চলাফেরা, আসাযাওয়া করো, যাতে তাদের চরিত্র তোমাদের মধ্যে এসে যায়।

فَكُلُّ قَرِيْنٍ بِالْقَارِنِ يَقْتَدِىْ

'সব সাথি তার সাথির চরিত্র ধারণ করে তার অনুসরণ করতে শুরু করে।'

একথাটি বাস্তবেও সত্য। সুতরাং আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্য অর্জন করে মানুষ তার বাতেনি পূর্ণাঙ্গতা হাসিল করে এবং নিজের ভেতরে আমলের জযবা সৃষ্টি করে। কোনো খোদাপ্রেমিক বলেন, এ পর্যন্ত চোষণ করে লও, যাতে তোমার সৌন্দর্য পূর্ণতা লাভ করে। তোমাকে দেখে সব কিছু বলে উঠবে, আমি যে দিকে আছি সেদিকে তুমি মুখ করো। আমি যেদিকে যাচ্ছি, লোকেরা তোমাকে স্মরণ করছে।

মানুষ তার বন্ধুর ধর্মানুসারী হয়

মেশকাত শরীফে হযরত আবুহুরায়রা (রহ.) থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اَلْمَرْءُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهٖ

'মানুষ তার বন্ধুর ধর্মানুসারী হয়।'

সুতরাং মানুষ যখন তার বন্ধুর সান্নিধ্যে থাকে, তখন তার স্বভাব-চরিত্র মেনে চলে।

লোভী ব্যক্তির সান্নিধ্যের প্রভাব

হযরত মোল্লা আলী কারী (রহ.) মেরকাতে হযরত ইমাম গাযযালি (রহ.) -এর একটি আশ্চর্য বাণী উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন–

مُجَالَسَةُ الحَرِيْصِ وَمُخَالَطَتُهُ تَحْرِثُ الْحِرْصَ

'লোভী মানুষের সান্নিধ্য এবং তার সঙ্গে ওঠাবসা মানুষের অন্তরে লোভ সৃষ্টি করে।'

وَمُجَالَسَةُ الزَّاهِدِ وَمُخَالَطَتُهُ تَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا

'এবং ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের সান্নিধ্য এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্ক মানবমনে দুনিয়াবিমুখতা সৃষ্টি করে।'

কেননা, আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তরকে এই প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে, সে সাদৃশ্য গ্রহণ করবে এবং তার অনুসরণ করবে। অর্থাৎ– মানুষের প্রকৃতিই এভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, সে যার সাথে থাকবে, তার চরিত্র গ্রহণ করবে। তার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে চলবে। এমনকি বলেছেন,

والطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدريه اذًا

'মানুষের প্রকৃতি অন্যের চরিত্রকে এভাবে চুরি করে, সে টেরও পায় না যে, আমার চরিত্র সে হরণ করে নিয়েছে।'

এমনিভাবে একে অপরের প্রকৃতি গ্রহণ করা অভ্যাসে পরিণত করে। সুতরাং আমাদের উচিত আমরা আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্য গ্রহণ করব। তাহলে আমাদের অন্তরে তাদের চরিত্রের উদ্রেক হবে। এখন তো আমরা শুধু বলছি, এক সময় এর পরিপূর্ণ আমেল হয়ে যাব।

আল্লামা রুমি (রহ.)-এর উপদেশ

قال را بگزار مرد حال شو * پیش مرد کامل پامال شو

صد کتاب وصد ورق در نار کن * جان دل را جانب دلدار کن

কোনো অবস্থাবান ব্যক্তিত্বের সামনে নিজের কথোপকথন ঢেলে দাও এবং কোনো পুণ্যবানের সম্মুখে নিজেকে বিলীন করে দাও। শত কিতাব ও শত

অধ্যায় জ্বালিয়ে দাও। নিজের জান ও দিলকে আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পৃক্ত করো।

হযরত শাহ আবদুল গনী ফুলপুরি (রহ.) ও সান্নিধ্যের তাগিদ

হযরত শাহ আবদুল গনী ফুলপুরি (রহ.)কে কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল, হুজুর! আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্যের এত গুরুত্ব কেন? তিনি বললেন, আচ্ছা বলো তো, তুমি কি সাহাবি হতে পারবে? না। তাবেয়ী হতে পারবে? না। তাবে তাবেয়ী হতে পারবে? না; কিছুই হতে পারব না। কারণ, সাহাবি বলে, যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য পেয়েছে। তাবেয়ী বলে, যে সাহাবির সান্নিধ্য পেয়েছে এবং তাবে তাবেয়ী বলে, যে তাবেয়ীর সান্নিধ্য পেয়েছে, (প্রত্যেকটির জন্য ঈমান থাকা শর্ত) যে তিন যুগ সম্পর্কে কল্যাণের সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। তারা সেই তিন যুগের ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। সেগুলো তো এখন কিতাবাদির মাধ্যমে পাওয়া যাবে না। তিনি বললেন, দেখো! صحابی শব্দ ব্যতীত অন্য কোনো শব্দ আল্লাহর দরবারে পছন্দ হলে আল্লাহ তার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাত্রদের ক্ষেত্রে সেই শব্দই চয়ন করতেন। কিন্তু না; তিনি এর জন্য صحابی শব্দকেই মনোনীত করেছেন। এর দ্বারা প্রতিভাত হয়, صحابی শব্দের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। তাই তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের জন্য সেই শব্দই নির্বাচন করেছেন। সুতরাং صحبت বা সান্নিধ্যে যে নেয়ামত রয়েছে, তা অন্য কোথাও থেকে অর্জন করা যায় না। কোনো আল্লাহওয়ালা বলেন–

ہر کہ خواہد ہم نشینی با خدا * تو نشیند در حضور اولیاء

'যেব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য পেতে চায় সে যেন আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্য গ্রহণ করে, তারা খোদাপ্রেমিক, তারা আল্লাহ তা'আলার সাহচর্য পান।'

সুতরাং তাদের সঙ্গে একটি মুহূর্তের সান্নিধ্য বান্দার জীবনের চাকা ঘুরিয়ে দিতে পারে?

মুফতী আযম (রহ.)-এর প্রশ্নের সমাধান

পাকিস্তানের প্রধান মুফতী হযরত মাওলানা মুফতী শফী সাহেব (রহ.) একবার হযরত হাকীমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ থানভী (রহ.)-এর নিকট

গিয়ে বললেন, হুজুর! সাধারণত দেখা যায়, কবিরা তাদের কথাবার্তায় উগ্রতা ও শিথিলতার শিকার হন। কবিতা লিখতে যে দিকে ধাবিত হন সেদিকেই অতিরঞ্জিত করে ফেলেন। আমার মনে হয়, আল্লামা রুমি (রহ) নিম্নোক্ত কবিতায় এমনটা-ই করেছেন।

ایک زمانہ صحبت بااولیاء * بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

'আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্যে একটি মুহূর্ত ব্যয় করা শত বছর লৌকিকতাহীন ইবাদাতের চেয়ে উত্তম।'

সুতরাং হুজুর! এখানে শুধু ইবাদাতের কথা বলে দিলেই যথেষ্ট হতো, রিয়া বা লৌকিকতাহীন বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বললেন, তাহলে এই কবিতাটি আমি পাঠ করি। তিনি বললেন,

ایک زمانہ صحبت بااولیاء * بہتر از لاکھ سالہ طاعت بے ریا

আউলিয়ায়ে কেরামের একটি মুহূর্তের সান্নিধ্য লক্ষ বছর রিয়া বা লৌকিকতাহীন ইবাদাতের চেয়ে উত্তম।

হযরত শফী সাহেব (রহ.) বললেন, হুজুর! একশ বছরের কথাই আমার নিকট প্রশ্ন; আর আপনি লক্ষ বছর বলছেন, এটা কীভাবে উপলব্ধি করতে পারি? হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বললেন, এক লোক একশ বছর পর্যন্ত রিয়াবিহীন ইবাদত করল। সে কি এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে যে, তার সমস্ত আমল সঠিক হয়েছে। নিশ্চয়তা তো কারও নিকট নেই। ইবলিসের দিকে তাকাও। সারা দুনিয়ার আনাচে-কানাচে সে সেজদা করেছিল। ফেরেশতাদের গুরু তার উপাধি হয়ে গেল। কিন্তু কেমন তিরস্কার ও অভিশাপ আপতিত হলো তার ওপর! আল্লাহ বলেন–

فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۝ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ۝

'এখান (জান্নাত) থেকে বের হয়ে যাও। কেয়ামত পর্যন্ত তোমার ওপর আমার অভিশাপ।'[১৫]

সুতরাং এ-পরিমাণ ইবাদত; কিন্তু পরিণাম অত্যন্ত খারাপ। পৃথিবীতে দেখুন, বলআম বাউর বনী ইসরাইলের বিরাট আবেদ ছিল। তার দু'আ

---

১৫. সোয়াদ : আয়াত ৭৭, ৭৮

সরাসরি কবুল হতো। কিন্তু এমন তিরস্কার এসে গেল যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ

'অবশ্যই আমি ইচ্ছা করলে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিতাম সে-সকল নির্দশনের বদৌলতে। কিন্তু সে নিজেই অধঃপতিত হলো এবং নিজের রিপুর অনুগামী হয়ে রইল।'[১৬]

সুতরাং নিজের রিপু বা কুপ্রভৃত্তির অনুসরণ করার কারণে তিরস্কার আপতিত হলো। তিনশ বছর ইবাদত করার পরও অভিশপ্ত হলো। এই সমস্ত ঘটনা পাঠ করলে অন্তর শিউরে ওঠে। আমাদের ইবাদত এ-পরিমাণ হতেই পারে না। তিনি বললেন, ঠিক আছে আমি আপনাকে হাদীছ শোনাচ্ছি। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'পুণ্যবানবান্দাগণ আকৃতিতে ও মাপকাঠিতে সর্বক্ষেত্রে পুণ্যবান।'

সুতরাং লক্ষ বছর ইবাদাতের পরও কি কেউ এই গ্যারান্টি দিতে পারবে যে, সে আল্লাহর ওলী হয়েছে। অতএব, আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্যে আসা-যাওয়া চাই।

هُمْ رِجَالٌ لَّا يَشْقٰى جَلِيْسُهُمْ

তারা এমন লোক, যাদের সান্নিধ্য গ্রহণকারী ভ্রষ্ট হতে পারে না।

হতভাগা সেই ব্যক্তি, যে মৃত্যুকালে ঈমান থেকে বঞ্চিত হয়। বন্ধুগণ! হাদীছ বলছে, আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্যে থাকলে তার শেষ বিদায় উত্তম হয় এবং নিরাপদ ঈমান নিয়ে বিদায় হতে পারে। সুতরাং লক্ষ বছরের ইবাদতে যেখানে গ্যারান্টি নেই, সেখানে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্যে তা হাসিল করা যায়। আল্লাহ তা'আলা তাদের সেই নেয়ামত দান করুন।

ঈমাম জাফর সাদেক (রহ.)-এর সান্নিধ্যে ইমাম আবুহানীফা (রহ.)

ইমাম কুশায়রী (রহ.) বলেন, বড়-বড় ওলামায়ে কেরাম ও ফোকাহায়ে কেরাম যাঁরাই অতিবাহিত হয়েছেন, তাঁরা কারও-না-কারও সান্নিধ্য গ্রহণ

---

১৬. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৭৬

করেছেন। তাঁদের সর্বপ্রথম হলেন হযরত ইমাম আবুহানীফা (রহ.)। এজন্য যে, এপর্যন্ত যত মুহাদ্দিছ ও ফোকাহায়ে কেরাম অতীত হয়েছেন, তাঁরা সবাই কোনো-না-কোনোভাবে ইমাম আবুহানীফা (রহ.)-এর শাগরেদ ছিলেন। হয় সরাসরি, না হয় কারও মাধ্যমে। বলা হয়, হযরত আবুহানীফা (রহ.) আমাদের নকশ্‌বন্দি তরিকার হযতর জাফর সাদেক (রহ.)-এর সান্নিধ্য পেয়েছেন। ইমাম জাফর সাদেক (রহ.) হযরত কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর সান্নিধ্য পেয়েছেন। ইমান কাসিম (রহ.) মদীনায় বিশিষ্ট সাতজন মুফতীর একজন ছিলেন। তিনি এ পরিমাণ ধর্মানুরাগী ছিলেন যে, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনি বর্তমান পৃথিবীতে খেলাফতের উপযোগী কাকে মনে করেন? তিনি বললেন, আমাকে শাসক নিযুক্ত করার অধিকার দেওয়া হলে আমি কাসিম (রহ.)কে খেলাফতের দায়িত্ব দেব। তিনি বরকত গ্রহণ করেছিলেন হযরত সালমান ফারসি (রাযি.) থেকে আর তিনি হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর সংশ্রব পেয়েছিলেন এবং তাঁর থেকে কল্যাণ গ্রহণ করেছিলেন। ইমাম আবুহানীফা (রহ.) হযরত জাফর সাদেক (রহ.)-এর সান্নিধ্যে দু-বছর ছিলেন। এই দু-বছরের আসা-যাওয়াতে তিনি কী পেলেন? ইমাম আবুহানীফা (রহ.) নিজেই বলেন–

لَوْ لَا سَنَتَانِ لَهَلَكَ نُعْمَانُ

'যদি আমার জীবনের এই দুটি বছর না হতো, তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম।'

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) হযরত আবু হাশেম সূফী (রহ.)-এর সান্নিধ্যে

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) এক বুযুর্গের সান্নিধ্যে আসা যাওয়া করতেন। তাঁর নাম ছিল আবু হাশেম। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) তাঁকে আবু হাশেম সূফী ডাকতেন। এই সূফী শব্দ তাঁর নামের সঙ্গে তিনিই যুক্ত করেছিলেন। বর্তমানে দাবি করে হাম্বলী; কিন্তু তাসাওউফ মানে না। অথচ এই সূফী শব্দ তাদের ইমাম ব্যবহার করতেন। কেউ জিজ্ঞাসা করল, আপনি এত বিখ্যাত একজন আলেম এবং ফকীহ; তারপরও এই সাধারণ ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসেন কেন? ইমাম সাহেব জবাব দিলেন, আমি তাঁর কারুকার্য গ্রহণ করি। আমি কিতাবের আলেম। কিতাবের সাথে আমার পরিচয়। আর তিনি আলেম বিল্লাহ। আল্লাহর সম্পর্কে আলেম। আল্লাহর

সঙ্গে তাঁর পরিচয়। আর আল্লাহর আলেম কিতাবের আলেম থেকে শ্রেষ্ঠ। কেননা, আমি তাঁর সান্নিধ্যে না বসলে রিয়া বা লৌকিকতার সূক্ষ্ম রহস্য সম্পর্কে অবগত হতাম না। তিনি রিয়া চেনেন। রিয়ার বিস্তারিত ব্যাখ্যা বুযুর্গদের সান্নিধ্যে পাওয়া যায়।

আবু হাওয়াস ইবনে সারীর (রহ.) হযরত জুনায়েদ বাগদাদি (রহ.)-এর সান্নিধ্যে

আবু হাওয়াস ইবনে সারীর (রহ.)ও সেকালের বিখ্যাত ফকীহ ছিলেন। তৎকালের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তিনি হযরত জুনায়েদ বাগদাদি (রহ.)-এর সান্নিধ্য পেয়েছেন। তবে পরবর্তী কালে তিনি বলতেন, জুনাইদ বাগদাদির কথা আমার বোঝে আসে না। অথচ তাঁর কথা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট ছিল। কোনো বাতিল কথা এরকম স্পষ্ট থাকে না। তবাকাতুল কুবরায় ইমাম আহমদ (রহ.) তাঁর সন্তানকে উপদেশ দিচ্ছেন, বাবা ওই বুযুর্গরা এখলাছের যে স্তরে পৌঁছেছিলেন, আমরা সেখানে পৌঁছা সম্ভব নয়।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামি ও সৈয়দ মাহমুদ আলূসি (রহ.) বিভিন্ন শায়খের সান্নিধ্যে

আমাদের তরিকায় উচ্চস্তরের এক বুযুর্গ ছিলেন মির্যা মাযহার জানে জানাঁ (রহ.)। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সকল প্রকার পুণ্যের প্রতিচ্ছবি বানিয়েছিলেন। হযরত শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলবী (রহ.)-এর সমকালের ব্যক্তিত্ব ছিলেন। হযরত ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলবী নিজের সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে অন্তরদৃষ্টির নূর দান করেছেন। আমার বাতেনি দৃষ্টিশক্তি এমন প্রখর করে দিয়েছেন যে, আমি পৃথিবীকে এভাবে দেখতে পাই, যেভাবে মানুষ তার হাতের তালুতে একটি গমের দানা দেখতে পায়। এমন কাশফ বা অন্তরদৃষ্টি হাসিল করার পর আমি মির্যা জানে জানাঁ (রহ.)কে দেখলাম যে, বর্তমান পৃথিবীতে তাঁর সমপর্যায়ের কোনো ওলী বিদ্যমান নেই। সুবহান্নাল্লাহ! এই শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলবী (রহ.) শায়খ মির্যা মাযহার জানে জানাঁ (রহ.)-এর খলীফা ছিলেন। হযরত গোলাম (রাযি.) ও আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) তাঁকে তেরো শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর খলীফা ছিলেন মাওলানা খালেদ রুমি (রহ.)। তিনি কুরদিস্তানের বাসিন্দা ছিলেন। তার কিতাবাদিতে মাওলানা খালিদ রুমি এবং মাওলানা খালিদ কুরদির নাম উল্লেখ করা

হয়েছে। অসংখ্য ওলামায়ে কেরাম তাঁর সংশ্রব গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে দুজন আল্লামা ইবনে আবেদীন ও আল্লামা সৈয়দ মাহমুদ প্রসিদ্ধ ছিলেন। আল্লামা ইবনে আবেদীন হলেন ফতোয়ায়ে শামীর লেখক। তিনি তার জীবনের সফলতা সম্পর্কে স্বতন্ত্র একটি কিতাবও লিখেছেন। আর আল্লামা সৈয়দ মাহমুদ আলূসি হলেন তাফসীরে রুহুল মা'আনীর লেখক। এবার ভেবে দেখুন, ওই বড়-বড় মুফাসসির ও ফকীহগণ বুযুর্গদের সান্নিধ্যে এসে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

হযরত কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথি (রহ.) শায়খ মাযহার জানে জানাঁ (রহ.)-এর সান্নিধ্যে

হযরত কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথি (রহ.) হযরত মির্যা মাযহার জানে জানাঁ (রহ.)-এর খলীফা ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পুণ্যের প্রতিচ্ছবি বানিয়েছিলেন। তিনি মুফাসসিরও ছিলেন। একটি তাফসীর লিখে নিজের শায়খ মাযহার (রহ.)-এর নামানুসারে তাফসীরে মাযহারী নামে নামকরণ করেছেন। আপনি তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন পড়লে দেখবেন, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় তাফসীরে মাযহারীর রেফারেন্স রয়েছে। একে উম্মুল কিতাব বা তাফসীরের কিতাবের মূল বলা হয়। বড়-বড় কিতাবের তথ্যসূত্র এই কিতাব থেকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তিনি (ছানাউল্লাহ পানিপথি) মুফাসসিরও ছিলেন, মুহাদ্দিছও ছিলেন, ফকীহও ছিলেন। সমকালের প্রধান বিচারপতিও ছিলেন এবং তৎকালের বিখ্যাত বুযুর্গ ও সাধক ছিলেন।

বড়-বড় ওলামায়ে কেরামের সত্যায়ন

'মালাবুদ্দা মিনহু' নামে ফার্সি ভাষায় লিখিত তাঁর একটি প্রসিদ্ধ কিতাব রয়েছে। প্রাইমারী স্তরের ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হয়। তাঁর লিখিত কিতাব তুহফাতুস সালিকীনে তিনি বলেন, প্রচুর সংখ্যক লোক আছে, যাদের মিথ্যাবাদী হওয়ায় বিষয়টি বিবেক মেনে নিতে পারে না। কারণ, এই জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তি তাকওয়ার দ্বারা সজ্জিত। সুতরাং যারা মুত্তাকী হবে, তারা মিথ্যাবাদী হতে পারে না। তিনি বলেন, এরকম অসংখ্য লোকের জামাত তাদের কলমের ভাষা দ্বারা লিখেছেন যে, আমরা আমাদের বুযুর্গদের মাধ্যমে এই নেয়ামত পেয়েছি। তারা আমাদের বাতেনি ঘুমন্ত অবস্থাকে জাগ্রত করেছেন। এ ব্যাপারে উম্মতের সত্যায়ন বিদ্যমান রয়েছে যে, বুযুর্গদের সান্নিধ্যে থেকে আমাদের বাতেনি উদাসীনতা দূর হয়েছে। আল্লাহ

তা'আলার ভালোবাসা অন্তরে উদ্রেক হয়েছে। আমাদের অন্তরে আমলের জযবার আবির্ভাব হয়েছে। কিছুদিন আগের পানে তাকাও। সৈয়দ ইসমাইল শহীদ (রহ.) কত বড় বুযুর্গ ছিলেন! তিনি শায়খুল ইসলাম মাওলানা আবদুল হাই (রহ.)-এর সান্নিধ্য গ্রহণ করেছিলেন। সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহ.) শাহ আবদুল আযীয (রহ.)-এর সান্নিধ্যে ছিলেন। বাহ্যিক ইল্‌ম শিক্ষার জন্য গিয়েছিলেন। একদা স্বপ্নে দেখলেন, কিতাবের পাতাগুলো একেবারে সাদা; তাতে কোনো লেখা নেই। নিজ শায়খকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি স্বপ্নের তাবীর করলেন, আল্লাহ তোমাকে সরাসরি ইল্‌ম দান করবেন এবং তোমার মাধ্যমে দীনের গুরুত্বপূর্ণ সেবা নেবেন। তাঁরা বুযুর্গদের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন।

দেওবন্দের বড়-বড় ওলামায়ে কেরাম হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (রহ.) সান্নিধ্যে

সামান্য আগের বুযুর্গদের প্রতি তাকিয়ে দেখুন। দেওবন্দের বড়-বড় ওলামায়ে কেরামের মধ্যে হযরত মাওলানা কাসিম নানুতভী (রহ.), মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহি (রহ.), মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) প্রমুখের ন্যায় মহান ব্যক্তিত্বগণ হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)-এর সান্নিধ্যে কল্যাণ পেয়েছিলেন। কেউ হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহি (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, জনাব! আপনার ন্যায় ফকীহ মহান ব্যক্তিত্ব হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)-এর সান্নিধ্যে আগমনের কারণ কী? তিনি কী অপূর্ব জবাব দিয়েছিলেন যে, জনাব! আমরা ছাত্র যামানায় মিষ্টান্ন দ্রব্যের নাম শুনেছিলাম। কিন্তু এর স্বাদ আস্বাদন করে তৃপ্তি পাইনি। এবার হযরত হাজী সাহেবের সান্নিধ্যে এসে সেই মিষ্টির স্বাদ আস্বাদন করছি। সে মিষ্টিদ্রব্য কী? সেগুলো হলো, তাওয়াক্কুল, তাসলীম ও সন্তুষ্টি। এ সমস্ত বুযুর্গের সান্নিধ্যে ওই সমস্ত নেয়ামত পাওয়া যায়। বিশ্ববিখ্যাত দৃষ্কৃতিকারীরা এদের সান্নিধ্যে এসে মহান ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হয়ে যায়। শাহজাদারা এদের সান্নিধ্যে এসে খোদাপ্রেমিক হয়ে যায়। একটি মুহূর্ত তাঁদের সান্নিধ্যে থাকলে জীবনের চাকা কোন দিকে মোড় দিয়ে সোজা রাস্তা ধরে, তা টেরও পাওয়া যায় না। তাই আমাদের জন্য উচিত, আমরা বাতেনি নেয়ামত অর্জনের জন্য সচেষ্ট হই এবং এর জন্য আত্মসত্তাকে বিলীন করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।

আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্য অপরিহার্য

হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্য গ্রহণ করা আমি একান্ত কতর্ব্য বলি। এটি হকীমুল উম্মতের ভাষ্য। দায়িত্ব মনে করে ব্যক্ত করছি। হযরত আবদুল্লাহ বাহলভী (রহ.) ফজলে আলী কোরাইশী (রহ.)-এর খলীফা ছিলেন। অনেক উচ্চ স্তরের বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর শিক্ষাদান ও তাফসীর প্রসিদ্ধ ছিল। পবিত্র রমজান মাসে অসংখ্য ওলামায়ে কেরাম তাঁর নিকট তাফসীর শিক্ষার জন্য আগমন করতেন। আল্লাহ তাঁকে মাকবুল ওলামায়ে কেরামের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি হযরত শায়খ অনওয়ার শাহ কাশ্মিরি (রহ.)-এর নিকট দাওরায়ে হাদীছ সমাপণ করেছি। তিনি বোখারি শরীফের পাঠদান শেষ করার পর বলেছিলেন, যতবার ইচ্ছা বোখারি শরীফ পাঠ করবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহওয়ালাদের জুতা ভাঁজ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইল্মের আত্মা পাবে না। তাই হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) বলতেন, আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্য ব্যতীত পরিপূর্ণ এখলাছ হাসিল করা পাহাড় কেটে দুধের ঝরনা প্রবাহিত করার আশা করার নামান্তর।

কাজী ছানউল্লাহ পানিপথি (রহ.) ও বাতেনি নূর

কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথি (রহ.) বলেন, বাতেনি নূর আল্লাহওয়ালাদের সিনা থেকে সন্ধান করো। এটি এক সিনা থেকে অন্য সিনায় স্থানান্তরিত হয়।

হযরত যয়নুল আবেদীন (রহ.)-এর নিকট যিকিরের গুরুত্ব

দাওয়াতে তাবলীগের ক্ষেত্রে হযরত যয়নুল আবেদীন (রহ.)কে আল্লাহ উচ্চ মর্যাদা দান করেছিলেন। একদা তিনি বয়ান করেছিলেন। আমি অধমও তাঁর সেই ভাষণ শুনেছিলাম। আজ আমি তাঁর কথাটি-ই পুনরাবৃত্তি করছি। তিনি বলেছিলেন, কারও নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করে যিকির করলে, তাবলীগের দাওয়াতে সফর করে জুতা ক্ষয় করা ছাড়া কোনো উপকার নেই। ভরমজলিসে তিনি একথাটি বলেছিলেন। কথাটি স্মরণ রাখবেন, আমাদের আকাবিরে দেওবন্দের মধ্যে হযরত ইলিয়াছ (রহ.) যে-পরিমাণ যিকিরগোযার ছিলেন, অন্য কেউ তাঁর সমপর্যায়ের হননি। সেই যিকিরের বদৌলতে আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে দাওয়াত-তাবলীগের কাজ আনজাম দিয়েছেন। আর আজ দেখুন, সারা বিশ্বে আল্লাহ এই দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষের ঈমান হেফাযত করছেন।

আল্লামা রুমি (রহ.) আলোচনা থেকে প্রকৃতির দিকে পরিবর্তন

মাওলানা রুমি (রহ.) বলেন–

بے عنایت حق وخاصان حق * گر ملک باشد سیاہ تست ورق

'মহা মহীয়ান প্রভুর করুণা ব্যতীত তোমরা ফেরেশতা হয়ে গেলেও তোমাদের আমলনামার অন্ধকার অবশিষ্ট থাকবে।'

এজন্য বলেন–

مولوی ہر گز نہ شد مولائے روم * تا غلام شمس تبریزی نہ شد

রুমের ক্রীতদাস কখনো মৌলভী হতে পারত না যদি শামসুতিবরিযীর গোলাম না হতো।'

এটি একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। আল্লামা রুমি (রহ.) ছাত্রদের পড়াচ্ছিলেন। পুকুরও নিকটে ছিল। এমন সময় আল্লামা শামসুতিবরিযী আগমন করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, মাওলানা রুম! এটা কী? তিনি বললেন, জনাব এটা বক্তৃতার কিতাব। শায়খ কিতাবটি চাইলেন এবং হাতে নিয়ে পানিতে ফেলে দিলেন। আল্লামা রুমি অস্থির হয়ে গেলেন। কারণ, তখনকার সময় বর্তমান যুগের ন্যায় কম্পিউটার বা ফটো মেশিন ছিল না। হাতে কলমের লিখা কিতাব ছিল। তাই পানি থেকে বাঁচিয়ে রাখা অপরিহার্য ছিল। একবার পানির ফোঁটা পড়লে সেটা আর পড়ার যোগ্য থাকত না। তাঁর এই অস্থিরতা দেখে আল্লামা শামসুতিবরিযী (রহ.) হাত বাড়িয়ে কিতাবটি পানি থেকে উঠিয়ে একটা ঝাঁকি দিলেন। এবার কিতাব থেকে ধুলা বালি উড়ে গেল। আল্লামা রুমি (রহ.) জিজ্ঞাসা করলেন, হুজুর এটা কী? তিনি বললেন, এটা হচ্ছে প্রকৃতি। এটাই মূল অবস্থা বা হাকীকত। সুতরাং এটা হচ্ছে অপূর্ব নেয়ামত। এটা আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্যে পাওয়া যায়। এর দ্বারা কেবল আলোচনার মানুষ প্রকৃত অবস্থাবান হয়ে যায়।

আল্লামা আবদুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহ.)-এর উপদেশ

আল্লামা আবদুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহ.) বলেন, আমি ইল্‌ম শিক্ষার জন্যে গেলাম। আমার আব্বাজান চিঠি দিয়ে আমাকে জানালেন, বাবা শুকনা আর অনুপযোগী মোল্লা হবে না। তাই আপনারা বুঝে থাকবেন যে, কিছুলোক শুকনা মোল্লাও হয়।

হযরত সুলাইমান নদভী (রহ.)-এর আল্লামা থানভী (রহ.)-এর নিকট বায়'আত

হযরত সোলাইমান নদভী (রহ.) আল্লামা থানভী (রহ.)-এর খেদমতে এসে বায়'আত হলেন। কেউ জিজ্ঞাসা করল, হুজুর আপনি আরবি ভাষায় এত দক্ষ, আপনার ভাষায় রয়েছে মাধুর্য; আপনি এখানে বায়'আত হলেন কেন? তিনি জবাব দিলেন, আমি আল্লামা থানভী (রহ.)-এর সান্নিধ্যে এসে আমার অজ্ঞতার পরিচয় পেয়েছি। আপনারা তো আমাকে বড় আলেম বলেন। কী সূক্ষ্ম কথা বলেছেন! আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে একটি প্রার্থনা করাতেন, যার মধ্যে আছে, আল্লাহওয়ালাদের ভালোবাসা আমলের ঊর্ধ্বে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُّبَلِّغُنَا اِلٰى حُبِّكَ

'হে আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে আপনার ভালোবাসা প্রার্থনা করি এবং যারা আপনাকে ভালোবাসে, তাদেরও ভালোবাসা প্রার্থনা করি। আমি এমন আমলের ভালোবাসা প্রার্থনা করি, যে আমল আপনার ভালোবাসা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়।'

তিনি বলেন, দেখুন, এখানে আল্লাহওয়ালাদের ভালোবাসার দু'আ অগ্রে। তারপর আমলের দু'আ। এটা প্রমাণ করে যে, আল্লাহওয়ালাদের মহব্বতের মাধ্যমে বান্দা আমলের তাওফীক লাভ করে। তারপর তিনি এ কবিতাটি পাঠ করলেন–

ان سے ملنے کی ہی یہی ایک راہ * ملنے والوں سے راہ پیدا کرو

আল্লাহর সঙ্গে মিলনের মাত্র একটিই রাস্তা। সেটি আল্লাহওয়ালাদের থেকে সংগ্রহ করো।

হযরত মুরশিদে আলম (রহ.)-এর প্রদত্ত আশ্চর্য উদাহরণ

একদা মুরশিদে আলম (তাঁর নিজের শায়খ) (রহ.) বললেন, সন্তান দান করেন কে? সকলে এক বাক্যে বলে উঠল, আল্লাহ তা'আলা। তিনি বললেন, তবে পিতামাতা মাধ্যম। পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, বৃষ্টি বর্ষণ করেন কে? বলল, আল্লাহ তা'আলা। তিনি বললেন, তবে মেঘ হচ্ছে উসিলা। আবার জিজ্ঞাসা করলেন, হৃদয়ে নূর দান করেন কে? সবাই বলল, আল্লাহ

তা'আলা। তিনি বললেন, কিন্তু শায়খ ও ওস্তাদ সেই নূর আগমনের মাধ্যম। এটি খুবই আশ্চর্য কথা, যা অতি সহজে উপলব্ধি করা যায় না।

ওলীগণের নজরে সেই প্রভাব দেখবেন

মোল্লা আলী কারী (রহ.) বলতেন, একপ্রকার নজর আছে বদনজর। হাদীছ শরীফে এসেছে, اَلْعَيْنُ حَقٌّ "বদনজরের প্রভাব সত্য।' যার কারণে মানুষ অসুস্থ হয়ে যায়। শিশুদের ওপর এর প্রভাব বেশি পড়ে। কারণ, শিশুরা অধিক আদুরে হয়। আমার অভিজ্ঞতা হলো, শিশুদের ওপর মা-বাপের নজর বেশি লাগে। মোটকথা, নজর লাগে। সেই বদনজর উপশমের দু'আও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন। আসমা বিনতে উমাইর (রহ.) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে বললেন, হুজুর! জাফরের সন্তানদের ওপর বদনজর লেগে যায়, এখন আমি কী করব? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি দু'আ শিখিয়ে দিলেন এবং বললেন, এটি পাঠ করে ফুঁ দেবে। সুতরাং এতে প্রতীয়মান হয় যে, বদনজরের প্রভাব পড়ে এবং গভীর ভালোবাসার দৃষ্টিতে কারও প্রতি তাকালেও এর প্রভাব তার ওপর লেগে যায়। এবার বলুন, যে নজরের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা, ক্রোধ ও ঘৃণা রয়েছে, সেই নজর যদি অন্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে, তাহলে আল্লাহওয়ালাদের যে-নজরে দয়া, ভালোবাসা, এখলাছ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে, সেই নজর অন্যের ওপর প্রভাব ফেলবে না কেন?

মোল্লা আলী কারী (রহ.)-এর সান্নিধ্যের প্রভাবের প্রমাণ

মোল্লা আলী কারী (রহ.) বলতেন, আমি বলি, বদনজরের বিপরীত হলো আল্লাহওয়ালাদের নজর। কেননা, আল্লাহওয়ালাদের নজরের বিরাট প্রভাব হয়। তা কাফেরকে মুসলমান বানিয়ে দেয়। পাপিষ্ঠকে পুণ্যবান বানিয়ে দেয়। অজ্ঞকে বিজ্ঞ বানিয়ে দেয়। এমনকি আল্লাহওয়ালাদের নজর কুকুরকে মানুষ বানিয়ে দেয়। দেখুন, জান্নাতে কে যাবে? মানুষ যাবে। কিন্তু এমন দৃষ্টান্তও আছে যে, একটা কুকুর কতিপয় আল্লাহওয়ালার সংশ্রব গ্রহণ করল। তাদের পিছু ছাড়ল না। তারা বললেন, যাও; আমাদের ছেড়ে চলে যাও। সে পেছনে-পেছনে তাদের সঙ্গে চলে গেল। আল্লাহু আকবার! সেই কুকুরের ভালোবাসা আল্লাহর পছন্দ হয়ে গেল।

পবিত্র কুরআনে তাঁর আলোচনা আছে এভাবে–

وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ

'তাদের কুকুর সামনের দুটি পা প্রসারিত করে গুহাদ্বারে (বসা) ছিল।'[১৭]

পাঞ্জাবের কোনো কবি বলেন, যখন তারা কুকুরকে বলেছিল, তুমি চলে যাও তখন কুকুর জবাব দিয়েছিল–

نہ میں بھونکاں تے نہ میں ٹونکاں * تے نہ میں شور مچاواں

تے نیکاں دے لڑگیاں سائیاں * میں وی جنت وچ وڑ جاواں

আমি ঘেউ-ঘেউও করিনি, আঘাতও করিনি। আমি কোনো প্রকার হট্টগোলও করিনি। আমি আল্লাহওয়ালাদের সাথে জড়িয়ে আছি, যাতে আমিও বেহেশতে যেতে পারি।

মুফসসিরীনে কেরাম লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা সেই কুকুরকে সুসংবাদ জানালেন, হ্যাঁ; অবশ্যই পুণ্যবানদের সংশ্রব গ্রহণ করার কারণে আমি তোমাকে কেয়ামতের দিন মানুষের আকৃতি দান করে জান্নাতে দেব। সুতরাং ভাই! যে-নজর কুকুরকে যদি মানুষ বানাতে পারে, তাহলে সেই নজর মানুষকে ভালো মানুষ বানাতে পারবে না কেন? তিনি বলেন, তা এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলার সৌন্দর্যের দৃষ্টিতে তাঁরা মহান দৃশ্যবান হয়ে যান। সুতরাং সে সান্নিধ্য বিস্ময়কর! অতএব, অনুগামী হওয়ার কল্যাণ দেখুন, যাঁরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন সত্যবাদীগণ, শহীদগণ, আশেকগণ। তারা ওই দল ছিলেন, যাদের ওপর আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য নেয়ামত বর্ষণ করেছেন।

একটি আশ্চর্য সূক্ষ্মতা

اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ

'আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর নেয়ামত দান করেছেন– নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণও নেককারগণের ওপর।'[১৮]

এখানে এক বিখ্যাত তাফসীরবিশারদ আশ্চর্য একটি সূক্ষ্মতা বর্ণনা করেছেন। তা হলো অনুসরণের কল্যাণ। তা এভাবে যে, নবীগণ নিষ্পাপ।

---

১৭. সূরা কাহ্ফ : আয়াত ১৮

১৮. সূরা নিসা : আয়াত ৬৯

আর কেউ নিষ্পাপ নয়। কিন্তু আল্লাহ এ আয়াতে, واو عاطفہ এর মাধ্যমে সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও নেককারগণকে নবীগণের সঙ্গে জুড়িয়ে দিয়েছেন। অতএব, অনিষ্পাপদের যেহেতু একটি আয়াতে আল্লাহ নিষ্পাপদের সঙ্গে জুড়িয়ে দিয়েছেন, তাহলে কেয়ামতের দিন কি তাদের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারেন না?

যৌক্তিক দলিল

বর্তমান বিজ্ঞানের যুগ যৌক্তিক বিষয় অধিক গ্রহণ করে থাকে? এক প্রকার আম আছে, যাকে লেংড়া আম বলে। নামে লেংড়া কিন্তু সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়ায় পাওয়ালা থেকে ভালো। কানাডায় আমরা দেখেছি, যেখানে আম যায়। জিজ্ঞাসা করলেন, কী আম? লেংড়া আম। আমি বললাম, দেখো; লেংড়া এখান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। লেংড়া তো শুধু নামে লেংড়া, কিন্তু স্বাদে-ঘ্রাণে অতুলনীয়। মানুষ দেশি আম রোপন করে। তারপর এর এক ডালে লেংড়া আমের Grafting করে, জুড়িয়ে দেয়। যেহেতু দেশি আমে এ পরিমাণ রস হয় না এবং স্বাদ-ঘ্রাণও তেমন হয় না এবং ফসলও কম হয়। কিন্তু যখন লেংড়া আমের সঙ্গে Grafiting জুড়িয়ে দেওয়া হয়, তখন তার শাখার সঙ্গে মিলে যাওয়ার পর বলা হয়, কলম করা হয়েছে। এই কলম করার কার্যকারিতা এমন হয় যে, গাছের ডাল বৃদ্ধি হতে থাকে। ফলে এই ডালেও আম আসতে থাকে। এটা সংখ্যায়ও অধিক হয়, রস, স্বাদ এবং ঘ্রাণও বেশি হয়ে থাকে। এটি হচ্ছে আল্লাহওয়ালাদের দৃষ্টান্ত। যখন কোনো বান্দা আল্লাহওয়ালাদের সঙ্গে কলম করবে, তখন তার সান্নিধ্যের বরকতে আল্লাহ তা'আলা ওই ব্যক্তির ফলও বাড়িয়ে দেবেন এবং তার বিপরীত দিককে আল্লাহ সংশোধন করে দেবেন।

যে-পরিমাণ ত্যাগ সে পরিমাণ মূল্যায়ন

আমলকি একটি গাছের ফল। হাকীমদের নিকট এটা বহু মূল্যবান। এটা বিভিন্ন রোগের ওষুধরূপে ব্যবহৃত হয়। মাশায়েখগণ বলেন, দুটি আমলকি রাস্তায় পড়ে আছে। কোনো হাকীম (বিশেষজ্ঞ) আমলকিদ্বয়কে লক্ষ করে বললেন, ভাই! আমি তোমাদের নিয়ে যেতে চাই। তারপর তোমার গায়ে সুঁই বিদ্ধ করব। আগুনে তাপ দেব। যদি তোমরা এই কষ্ট সহ্য করতে পার, তবে তোমাদের মূল্য অনেক বৃদ্ধি পাবে। দুটার একটা আমলকি হাকীমের কথায় সাড়া দিয়ে তার হাতে নিজেকে উৎসর্গ করে দিল। হাকীম সাহেব সেটা নিয়ে

প্রথমে ইনজ্যাকশনের সুঁই দিয়ে তার ভিতর থেকে তিক্ত রস বের করে নিলেন। তারপর তাকে পানির মধ্যে ছেড়ে দিয়ে আগুনে তাপ দিতে শুরু করলেন। এ পরিমাণ তাপ দিলেন যে, পানি গরম হয়ে উথলে শক্ত আমলকি নরম হয়ে গেল। তারপর সেটা বের করে এর মধ্যে সোনা-রুপার চূর্ণ সংযোজন করলেন এবং দুধ ও চিনির শিরায় রাখলেন। এবার এর নাম হলো আমলকির মোরব্বা। এই আমলকির মোরব্বা মানুষের হৃৎপিণ্ডকে শক্তিশালী করে। আগেকার যুগে হাকীমগণ হৃৎপিণ্ড দুর্বলতার চিকিসা আমলকির মোরব্বার দ্বারাই করতেন। কেউ এ রোগের অভিযোগ করলে এই মোরব্বার পরামর্শ দিতেন। এর দ্বারা রাজা-বাদশাহদের চিকিৎসা করা হতো। কারণ, সোনা-রুপার চুর্ণের সঙ্গে মিশ্রিত আমলকির মোরব্বা অনেক মূল্যবান হতো। সাধারণ মানুষ সেটা ক্রয় করতে পারত না। ফলে এর এক-একটি দানা কয়েকটি রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে ক্রয় করতে হতো।

সুতরাং মাশায়েখগণ বলেন, যে এত সাধনার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দিল, তার বৈশিষ্ট্য কী পরিমাণ বৃদ্ধি হলো! রাজা-বাদশাহদের হাতে গেল, সোনা-রুপার সংমিশ্রণ পেয়ে তাদের আহার্যে পরিণত হলো। পক্ষান্তরে আমলকির দ্বিতীয় দানা বলেছিল, এরকম সাধনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং সেটা সেখানেই পড়ে রইল। তার ওপর সূর্যের তাপ পড়ল, বাতাসের ছোঁয়া লাগল, বৃষ্টির স্পর্শ পেল। পরিশেষে তার সতেজতা শুকিয়ে গেল, দৈহিক সৌন্দর্য মলিন হলো, তার প্রতি তাকাতেও ইচ্ছে হয় না। এবার রাস্তা পরিষ্কারকারী ঝাড়ুদার এসে অন্যান্য ময়লার সঙ্গে একেও একত্রিত করল। এতক্ষণে এই অশুভ প্রকৃতির আমলকিকে ঝাড়ুদার অন্য কোনো হাকীমের নিকট পৌঁছাল। হাকীম সাহেব স্বল্পমূল্যে এটা রাখলেন। এবার কী করলেন? পিশে চূর্ণ করলেন। চূর্ণ পরিষ্কার করে একে বড়ি বানালেন। কেন? কোষ্ঠকাঠিন্যের নিরাময়ের জন্য এখন এটা মানুষকে দেওয়া হয়।

এবার ভেবে দেখুন, আল্লাহ তা'আলা তাকে দায়িত্ব দিলেন পায়খানা নরম করে দেওয়ার জন্য। আপনি ও আমাদের মতো সাধারণ মানুষের উদরে গিয়ে পায়খানা নরম করে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করবে। সুতরাং যে সাধনা করেছিল, কষ্টকে বরণ করে নিয়েছিল, তার মূল্যও বৃদ্ধি পেল, সাথে-সাথে রাজা-বাদশাহদের আহার্য হলো। আর যে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারল না, তার দাম কমে গেল। পরিণামে পায়খানার দায়িত্ব পেল।

তিনি বলেন, ভাই! অনুরূপভাবে যেব্যক্তি নিজেকে আপন শায়খের নিকট উৎসর্গ করে দেবে, তিনি প্রচেষ্টা করে তার অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসার বীজ

বপন করে দেবেন। তাদের অন্তরকে জাগ্রত করে দেবেন। তারা ওই সমস্ত ব্যক্তিত্ব, যাদের জুতা সমকালের বাদশাহগণ মাথায় উঠিয়ে রাখতেন। তাকে মাথার মুকুট মনে করতেন।

পক্ষান্তরে আরেকটা দল আছে, যারা আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্যে আসে না। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়ার পেছনে জুড়িয়ে দেন। যেমনিভাবে আমলকি পায়খানা পরিষ্কারের কাজে নিয়োজিত হয়, তেমনিভাবে এদেরও পৃথিবীর নাপাকি নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় এবং নাপাকির পেছনেই ঘুরতে হয়। সুতরাং ভাই! এতে প্রতীয়মান হয়, আমরা যদি আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্য গ্রহণ করি, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমরা কল্যাণ লাভ করব। এজন্যই বলা হয়, শায়খ মাজযুব ইংরেজি শিক্ষিত লোক ছিলেন। সেকালের অনেক বড় অফিসার ছিলেন। কেউ জিজ্ঞাসা করল, জনাব! আপনি তো মাস্টার ছিলেন। আপনার গর্জন কোথায় গেল? তিনি বললেন, হযরত থানভী (রহ.)-এর সান্নিধ্যে গিয়েছিলাম। তাঁর একটি মুহূর্তের সান্নিধ্য আমাকে সেই উদাসীন জীবন থেকে পরিত্রাণ দিয়ে আল্লাহর ওলীদের কাতারে দাঁড় করিয়েছে। তিনি বলতেন,

نقش بتاں مٹایا ہمکھا یا جمال حد
آنکھوں کو آنکھیں، دل کو میرے دل بنادیا
آہن کو سوز دل سے کیانرم آپ نے
نا آشنائے درد، کو بسمل بنا دیا

তিনি আমাকে মন্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন এবং সবকিছু ধ্বংস করে আল্লাহর সৌন্দর্য শিক্ষা দিয়েছেন। আমার নয়নকে নয়ন এবং হৃদয়কে হৃদয় তিনিই বানিয়েছেন এবং লোহাকে হৃদয়ের তাপ দিয়ে কোমল করেছেন এবং অস্বস্থিকর ব্যথাকে ঘায়েল করে দিয়েছেন। এখন আল্লাহর ভালোবাসায় অস্থির করে রেখেছেন। তাই আমি আল্লাহর ভালোবাসায়ই অধীর হয়ে আছি।

আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্যে কল্যাণের কারণসমূহ

আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্যে উপকার পাওয়ার কারণ চারটি।

১. তাদের অন্তর যেদিকে ধাবিত হয়, আল্লাহ তা'আলার রহমতও সেদিকে ঝুঁকে যায়। কোনো বুযুর্গকে এক খাদেম জিজ্ঞাসা করল, হুজুর!

আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্যে বসে যে বলে, আমি কল্যাণ ভোগ করি, এর মতলব কী? শায়খের উত্তর শোনার পূর্বে একটি কথা শুনুন; আগেকার যুগে হাতচালিত পাখা ছিল। বিরাট একটা পাখা ছাদের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হতো। এই পাখা কাপড় অথবা চাটাই দিয়ে তৈরি করা হতো। তারপর রশি বেঁধে দূর থেকে একজন টান দিত। এতে তার নিচে উপবিষ্ট সবাই বাতাস পেত। আমরা এমন করেছি। যাক ওই শায়খের কামরায়ও এমন পাখার ব্যবস্থা ছিল। এবার শায়খ বললেন, বলো তো, এই পাখার বাতাস তোমাদের সবার গায়ে লাগছে কিনা। সবাই একবাক্যে বলল, জি হুজুর! আমাদের গায়েও বাতাস লাগছে। আচ্ছ! বলো তো, এই পাখা কার জন্য স্থাপন করা হয়? বলল, বিশেষ ব্যক্তির জন্যে। তাহলে ঠিক এরকমই মনে করুন। আল্লাহর রহমত তার বিশেষ বান্দার জন্য অবতীর্ণ হয়। কিন্তু তার আশপাশে বসা কেউই তার থেকে বঞ্চিত হয় না।

২. ওই বুযুর্গদের বয়ান শুনে মানুষ তার নিজের হৃদয়ের হীনম্মন্যতা সম্পর্কে অবগত হয়। অন্যথায় তার হৃদয়ের নাপাকির কোনো খবরও থাকত না। এবার যদি কেউ প্রশ্ন করে, জনাব! কুমন্ত্রণা শয়তানের পক্ষ থেকেও হয় আবার মানুষের নফসে আম্মারা বা খারাপ আত্মা থেকেও হয়। তাহলে আল্লাহর পথের যাত্রীরা কীভাবে অনুভব করবে, তার হৃদয়ে জাগ্রত কুমন্ত্রণা কার পক্ষ থেকে হচ্ছে? সাধারণ কোনো ছাত্র এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না। এই প্রশ্নের জবাব কে দিতে পারবে? যাকে আল্লাহ অন্তরদৃষ্টির নূর দিয়েছেন, তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত আছেন যে, এই প্রবঞ্চনা কার পক্ষ থেকে হচ্ছে। তাঁরা উভয় প্রকার প্রবঞ্চনার পরিচয় জানেন।

৩. আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্যে থেকে যখন মানুষ তার বিস্তারিত অবস্থা শায়েখকে বলে, তখন বিশেষ প্রর্থনার সময় ওই বান্দার কথা স্মরণ করেন। ফলে সেই দু'আর অংশ এই বান্দাও ভোগ করে।

৪. মানবপ্রকৃতি শোধরানোর প্রকল্পে নফল ইবাদত বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সুতরাং আল্লাহওয়ালাদের মাহফিল থেকে মানুষ নেক আমলের সৌভাগ্য অর্জন করে। এজন্যই বলা হয়েছে, পুণ্যবানদের মাহফিলে অংশ গ্রহণ করে প্রার্থনা করা মোস্তাহাব। কারণ, পুণ্যবানদের আলোচনার প্রেক্ষিতে রহমত বর্ষিত হয়। সুতরাং যেখানে তারা সশরীরে উপস্থিত আছেন, সেখানে কী পরিমাণ রহমত নাযিল হতে পারে!

একটি প্রশ্নের প্রভাবপূর্ণ জবাব

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্যে আসতে হবে এটা মেনে নিলাম, কিন্তু কোনো একজনের নিকট বায়'আত হওয়ার অবশ্যকতা কী? আমরা যেখানে সুযোগ পাব, সেখানে যাব। কারণ, নফস বা আত্মা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অবাধ্য। সে কারও অনুসারী হতে চায় না। সে বলে, কারও অনুগামী হওয়ার প্রয়োজন নেই। সুতরাং যেখানে মন চায়, সেখানে যাব। আমি বলি, এটা ও একটা ধোঁকা। এটা এমন যে, কোনো রোগী বলল, আমি কোনো এক ডাক্তারের চিকিৎসা নেব না, সকালে একজনের ওষুধ সেবন করব, দুপুরে আরেকজনের এবং বিকালে অন্য ডাক্তারের ওষুধ খাব। এক ডাক্তারের ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন কী? বন্ধুগণ! এক্ষেত্রে আমরা বলি, ডাক্তার আছে অথবা অমুক ডাক্তার খুব বিজ্ঞ। সে আমাদের এলাকার লোক। সে আমাদের History সকল বিষয় সম্পর্কে অবগত। সে আমাদের অবস্থা অনুযায়ী ওষুধ দেবে। ফলে একজন ডাক্তারের চিকিৎসা-ই আমরা গ্রহণ করি এবং এর দ্বারা উপকার লাভ করি। ঠিক তেমনিভাবে একজন শায়খের মাধ্যমেও অনুরূপ উপকার হয়। তার সান্নিধ্যে থাকলে তিনি বান্দার প্রকৃতি উপলব্ধি করে সে অনুযায়ী তার চিকিৎসা করেন। এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, আল্লাহ একজন; কিন্তু তাঁর বান্দা অনেক। রাসূল একজন; কিন্তু তাঁর উম্মত অনেক। আমাদের ইমাম একজন; কিন্তু তার অনুসারী অসংখ্য। বাপ একজন; কিন্তু তার সন্তান অনেক। স্বামী একজন; কিন্তু তাঁর স্ত্রী কয়েকজন। চিকিৎসা এক; কিন্তু ডাক্তার অনেক। পীর একজন; কিন্তু তাঁর মুরীদ অনেকজন। এতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যদি ব্যাপারটির এরকম হয় যে, স্ত্রী একজন; স্বামী কয়েকজন, বান্দা একজন; তার খোদা কয়েকজন, মুরীদ একজন; তার পীর কয়েকজন, তাহলে কি সংশোধন পাওয়ার আশা করা যায়? এজন্যই একজনকে গ্রহণ করো। সুন্দর জীবন গড়ো। এরপর আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য নেয়ামত অবলোকন করো।

আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার প্রেসক্রিপশন (ব্যবস্থাপত্র)

হাকীমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছার একটি প্রেসক্রিপশন দিয়েছেন। এতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা লিখেছেন; পড়লে আবাক হয়ে যাবেন। তিনি বলেন, আমি একটি প্রেসক্রিপশন লিখছি; সেটি গ্রহণ করো। কী প্রেসক্রিপশন?

১. হিম্মতের সাথে আমল করে জাহেরি ও বাতেনিভাবে শরীয়তের অনুসারী হও।

২. অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করো।

৩. একজন শায়খের সান্নিধ্য গ্রহণ করো।

৪. যখন তাদের নিকট থেকে চলে যাবে, তখন তাদের লিখিত কিতাব ও ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে উপকার গ্রহণ করো।

তিনি বলেন, যদি এই চারটি কাজ তোমরা করতে পার, তাহলে আমি গ্যারান্টি দিতে পারি, তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাবে। আল্লাহু আকবার!

উত্তম সাথি তোমার সজীবতা

এক বুযুর্গ কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে দেখলেন, একব্যক্তি কমলালেবু বিক্রি করছে আর উচ্চৈঃস্বরে বলছে, ভালো কমলা লেবু। বুযুর্গ তার কথা শোনামাত্রই তাঁর জযবা এসে গেল। তিনি দেওয়ানার মতো আল্লাহ আল্লাহ বলতে লাগলেন। সাথের খাদেমগণ বলল, হুজুর! কী হয়েছে? তিনি বললেন, তোমরা কি শুনছ না লোকটা কী বলছে? তারা বলল, হুজুর! সে তো কমলালেবু বিক্রি করছে। বুযুর্গ বললেন, কান লাগিয়ে শোনো; সে কী বলছে? তারা বলল, হুজুর সে কমলালেবু বিক্রি করছে। বুযুর্গ বললেন, না শোন কী বলছে। এবার তারা বলল, হুজুর! আমরা তো বুঝতে পারছি না। তিনি বললেন, সে ভালো কমলা লেবু একথা বলেনি, বরং সে বলছে, উত্তম সাথিই সজীবতা। সুতরাং যে ভালো সাথির সাহচর্য পাবে, তার অন্তর সিক্ত হয়ে যাবে। তার কিশতি তীরে এসে যাবে। কেউ বলেন, পুণ্যবানরা আমার হাতে ছড়ি দিয়ে আমার শিথিলতা দূর করবেন। আর দুষ্ট সাথি আমার ভবিষ্যৎ ডুবিয়ে দেবে। কোনো কবি বলেন,

جہاں عطر بکتا ہے جاؤ وہاں گر
تو آؤ گے ایک روز کپڑے بسا کر
جہاں آگ جلتی ہے جاؤ وہاں گر
تو آؤ گے ایک روز کپڑے جلا کر

'যেখানে আতর বিক্রি হয়, সেখানে গেলে তুমি একদিন সুগন্ধিযুক্ত অনেক কাপড় নিয়ে ফিরে আসবে। পক্ষান্তরে যেখানে আগুন জ্বলছে, সেখানে গেলে তুমি একদিন কাপড়চোপড় জ্বালিয়ে ফিরে আসবে।

কেউ বলল, যেখানে আগুন জ্বলছে, সেখানে গিয়ে আমি এমন স্থানে বসে থাকব, যাতে আগুন আমাকে স্পর্শ করতে না পারে; তাহলে আমার কাপড় জ্বলবে কী করে? কবি তার জবাব দেন-

یہ مانا کہ کپڑے بچاتے رہے تم
مگر آگ کی سینک کھاتے رہے تم

এটা মেনে নেওয়া যায়। তুমি কাপড় বাঁচিয়ে থাকতে পারবে। তবে আগুনের শিঙ্গের আঘাত তোমাকে অবশ্যই খেতে হবে।

সৎ সাথির উদাহরণ

এ ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, সৎ বন্ধুর দৃষ্টান্ত হলো আতরবিক্রেতার মতো। তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করলে সে কোনো-না-কোনো সময় তোমাকে আতর দেবেই। আর যদি না দেয়, তবু যতক্ষণ তার নিকট বসে থাকবে, ততক্ষণ আতরের সুঘ্রাণ উপভোগ করবে। পক্ষান্তরে অসৎ বন্ধুর দৃষ্টান্ত হলো কর্মকারের চুলার মতো। কালো কয়লা যদিও না দেয়, তবু তার কৃষ্ণতা তোমার গায়ে লাগবেই। এজন্যই আমরা আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্য গ্রহণ করব; তাহলে আল্লাহর রহমতের ভাগীদার হব।

আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্য অবলম্বনের যৌক্তিক দলিল

আপনারা দেখে থাকবেন, রেলগাড়িতে বিভিন্ন প্রকার বগি থাকে। কিছু থাকে ফাস্টক্লাস (প্রথম শ্রেণি)। কিছু থাকে থার্ডক্লাস (সুলভ)। প্রথম শ্রেণির বগি তৃতীয় শ্রেণির বগিকে বলছে, তুমি কী? মহা বিপদ, সারা গায়ে মরিচা! চলার সময় শাঁ-শাঁ শব্দ করতে থাক। তোমার বসার আসনও ভালো নয়। তাপানুকুলেরও ব্যবস্থা নেই। এছাড়া কোনো আরামদায়ক বস্তু নেই। আর আমার বৈশিষ্ট্য দেখো। ফোমের আসন, এসি চলছে। কী মনোরম পরিবেশ। থার্ডক্লাস বগি বলছে, ভাই! তোমার বৈশিষ্ট্যের কথা আমি স্বীকার করছি। তা আমি নতশিরে মেনে নিচ্ছি। তদুপরি একটি কথা স্বীকার করতে হবে যে, আমার শিকল তোমার সঙ্গে সংযোগ করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তুমি যে লাইনে চলবে, যে স্টেশনে যাবে, আমিও তোমার পেছনে-পেছনে সেই লাইনে চলে সেই স্টেশনে পৌঁছে যাব।

আল্লাহওয়ালাদের ব্যাপারও অনুরূপ। তারা ফাস্ট ক্লাসের বগি, যারা আল্লাহওয়ালার সন্তুষ্টির স্টেশনের দিকে যাচ্ছেন। সুতরাং যারা নিজের শিকল তাদের সঙ্গে বেঁধে দেবে, আল্লাহ তাদেরও তাঁর সন্তুষ্টির স্টেশনে পৌঁছার তাওফীক দেবেন। তুমি এর প্রমাণ চাইবে? তাহলে কুরআন-হাদীছ থেকে এর প্রমাণ শোনো। দিলের কানে শ্রবণ করো। আল্লাহ বলেন–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

'যারা ঈমান গ্রহণ করেছে এবং তাদের বংশধর ঈমানের সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আমি বংশধরকে তাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিয়ে দেব।'[১৯]

আমলের মধ্যে কোনো প্রকার উঁচু নিচুও রইল না। যেহেতু সম্পর্ক তাদের সঙ্গে করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, অনুসরণের কারণে এপথে চলার প্রচেষ্টা তারা করেছে। মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন, বংশধর দু প্রকার। (১) দেহের সঙ্গে সম্পর্ক (২) আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক। এই বিধান দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত বংশধরের জন্যও প্রযোজ্য যে, আল্লাহওয়ালাদের সন্তানাদি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার চেষ্টা করবে। কিন্তু সেই উচ্চ স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না, যেখানে তাদের পিতৃপুরুষেরা পৌঁছেছিলেন। তবু তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই সম্পর্কের কারণে আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন তাদেরকে তাদের পূর্বপুরুষদের সাথে মিলিয়ে দেবেন। মুফাসসিরীনে কেরাম বলেন, এতে আত্মাসম্পর্কিত বংশধরও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যদি কারও সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক থাকে আর ওই বান্দা এ পরিমাণ ধর্মানুরাগী ও এত উচ্চ মর্যাদা অর্জন করতে না পারে; কিন্তু কোনো আল্লাহওয়ালার সঙ্গে মহব্বতের সম্পর্ক স্থাপন করে হৃদয়ের শিকল তাদের সঙ্গে বেঁধে দেয়, তাহলে আল্লাহ বলেন, কেয়ামতের দিন আমি আত্মাসম্পর্কিত ওই সকল বান্দাকে তার আত্মাসম্পর্কিত পিতার সঙ্গে মিলিয়ে দেব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহজ-সরল ভাষায় বিষয়টি প্রকাশ করে দিয়েছেন–

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ

'যার সাথে মহব্বত তার সাথে কেয়ামত।'

মনে করুন, আমি অধমের মহব্বতের সম্পর্ক আমার ওস্তাদের সঙ্গে। তাঁর মহব্বত তাঁর ওস্তাদের সঙ্গে। এভাবে ক্রমধারা চলতে থাকলে দেখা

---

১৯. সূরা তুর : আয়াত ২১

যাবে, অবশেষে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর সঙ্গে সবার সম্পর্ক জড়িত হয়েছে। সুতরাং সবাই আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর সঙ্গে একত্রিত হবে। এবার Final সম্পর্ক কার সাথে হবে? কার পায়ের নিচে আমাদের সমাসীন হবে? এতে প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহওয়ালাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে কাল কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ের নিচে আমাদের আসন দেবেন। এটা কোনো সাধারণ কথা নয়। অনেক বড় ব্যাপার। তাঁর জন্যই তো মানুষ জীবন ব্যয় করে। তাই এই সওদা করে নাও হে মানব সম্প্রদায়! কারণ, এটি দীনের মহব্বত।

আল্লাহর জন্য ভালোবাসার মহা প্রতিদান

হাদীছ শরীফে এসেছে, যাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা থাকবে, তারা যে তরিকায় থাকবে, এর মধ্যেও আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা রয়েছে। اَلْمُتَحَابُّوْنَ فِيْ اللهِ 'আল্লাহ তা'আলার জন্য মহব্বতকারী।' আরশের নিচে ছায়া পাওয়ার সৌভাগ্য যাদের হবে, তাদের মধ্যে ওই দুই ব্যক্তি ও থাকবে, যারা একমাত্র আল্লাহর জন্যে একে আপরকে ভালোবেসেছে। সুতরাং সেই ভালোবাসার মূল্যায়ন করা চাই। সেই মহব্বতকে শক্ত থেকে দৃঢ় করা চাই, যাতে আল্লাহ আমাদেরকে সেই মহব্বতের ওপর বাঁচিয়ে রাখেন এবং সেই মহব্বতের ওপর দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার তাওফীক দান করেন। তারপর কেয়ামতের দিন সেই দৃশ্য দেখব। তবে সেই মহব্বতে জড়িত হয়ে কেউ যেন আত্মম্ভরিতা করতে না থাকে। নিজেকে একজন মনে না করে। শয়তান সেই রাস্তায়ও মানুষকে প্রবঞ্চনা দেয় যে, আমি তো অমুক বুযুর্গের খুব কাছের লোক হয়ে গেছি। তার সঙ্গে আমার গভীর সম্পর্ক আর আমি একজন। না-না, এমনটা কখনো যেন না হয়। এই আমিত্ব বান্দাকে নাশ করে দেয়। এজন্যই অন্তরে বিনয় আনয়ন করতে হবে। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে। প্রকৃতিতে আমিত্বের পরিবর্তে বিনয় আনয়ন করা চাই। বিনয় যত বৃদ্ধি পাবে, আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্যতা তত বেড়ে যাবে।

মহব্বতের অনুমান নির্জনে

কিতাবের মধ্যে একটি আশ্চর্য কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। বলখের বাদশাহ ইবরাহীম ইবনে আদহাম যখন তাওবা করলেন, তখন বাইতুল্লাহ শরীফ যিয়ারত করতে ইচ্ছা করলেন। বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলেন। প্রতি

কদমে দু-রাকাত নামায পড়তে শুরু করলেন। একটি কদম অগ্রসর হয়ে মুসল্লা বিছিয়ে দু-রাকাত নামায পড়েন। এভাবে প্রায় আড়াই বছরে মক্কায় পৌঁছেন। হে আমার খোদা, তোমার মর্যাদা কত মহান আর দুনিয়াতে তোমার কত রকমের প্রেমিক রয়েছে। এতক্ষণে রাবেয়া বসরিও পৌঁছে গেলেন। ইবরাহীম ইবনে আদহাম দেখলেন, রাবেয়া বসরির ওপর আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমত বর্ষিত হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলার সত্তাগত তাজাল্লি তাঁর ওপর নিপতিত হচ্ছে। তিনি অধীর হয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, রাবেয়া! তুমি এ মর্যাদা কীভাবে অর্জন করলে? বলুন তো কীভাবে হতে পারে? রাবেয়া বললেন, আমরা উভয়ে একই উদ্দেশ্যে এসেছি। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, আপনি মাথার প্রার্থনা নিয়ে এসেছেন আর আমি হৃদয়ের প্রার্থনা নিয়ে এসেছি। আল্লাহ আমার সেই প্রার্থনা কবুল করে নিয়েছেন।

সুতরাং ভাই! আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্যে বিনয়ের সাথে বসে থাক। দেখবে আল্লাহর রহমত কীভাবে বর্ষিত হয়। তারপর তাঁদের মহব্বত মানুষের অন্তরে পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। ফলে মানুষ আল্লাহ তা'আলার আশেক ও দেওয়ানা হয়ে যায়। তারপর হৃদয় আল্লাহর জন্য অস্থির হয়ে যায়। আল্লাহর ভালোবাসায় ব্যাকুল হয়ে যায়। ফলে সে রাতে নিদ্রা ত্যাগ করে আল্লাহর দরবারে কাঁদে। বুঝতে পারছে মহব্বত কী। কোনো কবি বলেন,

محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا
متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا
قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی
یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو!
کوئی آسان نہیں ہے سرمد و منصور ہو جانا
بسا لینا کسی کو دل میں، دل کا ہی کلیجہ ہے
پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا

ভালোবাসা কী? হৃদয়ের ব্যথায় ব্যথিত হয়ে যায়।

আসবাবপত্র, ধনসম্পত্তি কাউকে দিয়ে নিজে অপরাগ হয়ে যায়।

ভালোবাসার রাস্তায় পদচারণ! তবে ঘরবাড়ির অনুভূতি আসবে কোথা থেকে।

এখানেই মূল ঠিকানা।

তবে এখানে মাথার আগে হৃদয়ের মত্ততা উৎসর্গ করা শর্ত। হে আমার জান!

এত সহজ নয় যে, চিরঞ্জীব ও সফল হয়ে যাবে।

কাউকে হৃদয়ে বসিয়ে নেওয়া সে তো হৃদয়েরই কলিজা। পাহাড়ের পক্ষেও তো সম্ভব পুড়ে তুর হয়ে যাওয়া।

তুর পাহাড়ের ওপর আল্লাহর তাজাল্লি পড়েছিল; ফলে পাহাড়টা চূর্ণবিচূর্ণ গিয়েছিল এবং সুরমা হয়ে গিয়েছিল।

মাওলানা রুমি (রহ.)-এর হৃদয়বিদারক দৃষ্টান্ত

আল্লামা রুমি (রহ.) মারেফতের খুব আশ্চর্য কথা লিখেছেন। তিনি বলেন, পাহাড়ে সূর্যের আলো পড়লে প্রতিবিম্বিত হয়। তারপর আমাদের দৃষ্টিতে আসে। যদি প্রতিবিম্বিত না হতো, তাহলে আমাদের দৃষ্টিতে আসত না। আমরা তার প্রতি তাকাতে পারতাম না, আমরা পাহাড় দেখতে পেতাম না। সূর্যের আলো পাহাড়ের ছাদে পড়ে প্রতিবিম্বিত হয়। তারপর আমাদের নজরে আসে। সাধারণ নিয়ম তো ছিল, আল্লাহ তা'আলার সত্তাগত তাজাল্লি পাহাড়ের ছাদে পড়বে।

কিন্তু না; পাহাড় ভাবল, যদি সাধারণ কিরণের ন্যায় এই বিশেষ নূরও আমার ছাদে ঘর্ষণ খেয়ে চলে যায়, তাহলে আমার অভ্যন্তরীণ অংশ এই বিশেষ নূর থেকে কোনো ফায়েদা হাসিল করতে পারবে না। তাই সেই পাহাড় টুকরো-টুকরো হয়ে গেল, যাতে তার ভেতরের অংশও এই বিশেষ নূরের ভাগ গ্রহণ করতে পাবে। আল্লাহু আকবার। ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, শায়খের প্রতি এই দৃষ্টিতে মহব্বত রাখ যে, তাঁরা আল্লাহর প্রার্থী, তাঁরা আল্লাহ তা'আলাকে মহব্বতকারী। তাঁদের রাত-দিন, তাঁদের সকাল-সন্ধ্যা মহা মহিমের প্রেমাণুরাগে অতিবাহিত করেন। সুতরাং আমি আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যশীল বান্দার প্রতি ভালোবাসা রাখছি। এবার একটি সূক্ষ্ম কথা শুনুন। হযরত মূসা (আ.) প্রার্থনা করেছিলেন–

رَبِّ اَرِنِیْٓ اَنْظُرْ اِلَیْكَ

'আপনাকে দেখতে চাই হে আমার রব! আপনি আমাকে দেখা দিন।'

لَنْ تَرٰىنِیْ

'তুমি আমাকে দেখতে পারবে না।'

অথচ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজের সময় বাইতুল মাকদিসে হযরত মূসা (আ.) আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়েছে।

মিরাজের ঘটনার শিক্ষণীয় সূক্ষ্মতা

আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজের সময় বেহেশত-দোযখ ভ্রমণ করে আল্লাহ তা'আলার আরশ পর্যন্ত গেলেন। আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথন হলো। প্রত্যাবর্তনের সময় উম্মতের জন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের হাদিয়া নিয়ে এলেন। পথে হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ হলে মূসা (আ.) বললেন, আমার উম্মতের অনেক নামায ছুটে যেত। সুতরাং আপনি আরও কমিয়ে নিয়ে আনুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দরবারে উম্মতের দায়িত্ব লঘু করার আবেদন জানালেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায হ্রাস করে দেওয়া হলো। মূসা (আ.) পুনরায় বললেন, আরও কমিয়ে নিয়ে আনুন। নবীজি পুনরায় আবদার জানালেন। আরও পাঁচ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দেওয়া হলো। আবার মূসা (আ.) একই পরামর্শ দিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় আরজ করলেন, আরও পাঁচ ওয়াক্ত কমল। এভাবে নয়বারে পয়তাল্লিশ ওয়াক্ত নামায কমানো হলো। মূসা (আ.) আরও কমাতে পরামর্শ দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার নজ্জাবোধ হয়; আর যেতে পারব না। অধিকন্তু প্রত্যেকবার পাঁচ ওয়াক্ত করে কমানো হচ্ছে। এখন মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত আছে। আবার গেলে হয়তো পূর্বের ক্রমধারায় পূর্ণ পাঁচ ওয়াক্তই কমে যাবে। তাহলে আমার উম্মতের জন্য কী নিয়ে যাব? সুতরাং এই পাঁচ ওয়াক্ত আমার উম্মতের জন্য থাকুক।

এখানে ওলামায়ে কেরাম খুব আশ্চর্যপূর্ণ দুটি সূক্ষ্ম কথা বর্ণনা করেছেন। ওলামায়ে কেরাম বলেন,

১. এভাবে বারবার ওপরে উঠা আর নিচে আসায় নবীজির শান বৃদ্ধি পায়। কেননা, কেবল একবার গেলে কতিপয় মানুষ বলত, তিনি মাত্র একবার গিয়েছেন। এটা তো হতেই পারে। তাই নয়বার আল্লাহর দরবারে আসা-যাওয়া করায় প্রতিভাত হয়, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ পাওয়ার দিয়েছেন। তিনি যতবার ইচ্ছা সেখানে যেতে পারেন, সর্বদার জন্য সে অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

২. দ্বিতীয় সূক্ষ্মতা হলো, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে এক লাখ চব্বিশ হাজার নবী পাঠিয়েছেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)ও তাঁদের একজন ছিলেন। তিনি তো আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ আগলে বসলেন না। আল্লাহর কালীম হযরত মূসা (আ.) বসলেন কেন? ওলামায়ে কেরাম বলেন, ব্যাপার হলো, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমাকে দেখতে পারবে না। এখানে মূসা (আ.)-এর অনুভূতি হলো, আল্লাহ তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের দিদারের জন্য আমন্ত্রণ করছেন। সুতরাং যদিও আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পারিনি, তবে আল্লাহ তা'আলাকে যিনি দেখেছেন, তাঁকে তো আমি দেখতে পারছি। তাই আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ আগলে বসে রইলেন। যখন তিনি আল্লাহর দর্শন লাভ করে ফিরে আসবেন, তখন যেন সবার আগে আমি তাঁকে দেখতে পাই।

এজন্যই ওলামায়ে কেরাম বলেন, শায়খের প্রতি মহব্বত রাখো। কারণ, তাঁরা এমন হৃদয়ের অধিকারী, যেখানে সর্বক্ষণ আল্লাহ তা'আলার রহমত বর্ষিত হয়। আল্লাহর নূর টপকাতে থাকে। হে আমার খোদা! আমি অধম যদিও সেই সৌভাগ্য অর্জন করতে পারিনি, তবে যে হৃদয় সেই সৌভাগ্য লাভ করেছে, তাঁর সঙ্গে আমি সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করছি। এ কাজ করতে পারলে দেখবে, আল্লাহর রহমত কীভাবে বর্ষিত হয়। কীভাবে আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া যায়। আল্লাহ কীভাবে বান্দার প্রতি কল্যাণের মুআমালা করেন।

আল্লাহর দরবারে সবিনয় প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের সকলকে কবুল করেন এবং তাঁর ভালোবাসায় আমাদের হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে দেন।

কোনো কবি বলেন–

أُحِبُّ الصَّالِحِيْنَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ * لَعَلَّ اللهَ يَرْزُقُنِيْ صَلَاحًا

'আমি পুণ্যবানদের ভালোবাসি; অথচ আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।
হতে পারে, আল্লাহ আমাকে পুণ্যবান হওয়ার সৌভাগ্য দান করবেন।'

অন্তরকে জীবিত করা

'দেখবেন, আমাদের অবস্থায় পরিবর্তন আসবে। ঘরের অবস্থায় পরিবর্তন আসবে। সমাজের পরিবর্তন হবে। সভ্যতার পরিবর্তন হবে। দেশের অবস্থায় পরিবর্তন হবে। যদি মানুষের অন্তরের অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যায়, তবে সবকিছুর পরিবর্তন হয়ে যাবে। কাজেই স্মরণ রাখবেন, অন্তর পরিবর্তন হলে মানুষের অবস্থার পরিবর্তন হবে। জীবনের পরিবর্তন হবে। জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পরিবর্তন হবে। শত্রুতা-মিত্রতার মাপকাঠির পরিবর্তন হবে। উপার্জন ও ব্যবসার অবস্থা বদলে যাবে। চরিত্রের রূপরেখা পাল্টে যাবে। আধুনিক কৃষ্টি-কালচার সোনালি সভ্যতার রূপ নেবে। ইতিহাসের পরিবর্তন হবে। দিন-রাতের অবস্থা অন্যরকম হয়ে যাবে। সহপাঠীদের আচরণ মনোমুগ্ধকর হবে। পরিমাপ পাল্টে যাবে। এমনকি আমিত্বের বিলাসবহুল নীড় নির্মূল হয়ে যাবে।'

অন্তরকে জীবিত করা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ .

'তোমাদের মধ্য হতে যে-নারী বা পুরুষ নেক আমল করবে এমতাবস্থায় সে মুমিন, তাহলে আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব।'[২০]

পৃথিবী একটি অনুসন্ধানে নিয়োজিত

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে তাঁর পরিপূর্ণ কুদরতের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। এটি আল্লাহর অপূর্ব শৈলী। আল্লাহ মনুষ্যজাতিকে বিবেক দান করেছেন। এর মাধ্যমে তাদেরকে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। প্রত্যেক মানুষের বিবেকে তার নিজের চিন্তা থাকে। অতএব, যখন তারা একই বস্তু কয়েকবার বিভিন্ন পাত্রে দেখে, তখন এ বিষয়ে তার বিভিন্ন প্রকার মতামত প্রকাশ পায়। এই মতানৈক্য এমন ব্যাপক যে, পৃথিবীর সর্বস্তরে, প্রত্যেক দলে, প্রত্যেক স্থানে এর অস্তিত্ব পাবে। এমনকি এক ঘরের ছাদের নিচেও বিভিন্ন প্রকার মতানৈক্য বিদ্যমান রয়েছে। এক ধর্মের মানুষ কোনো বিষয়ে ঐকমত্য হলে অন্য ধর্মের মানুষ তাতে দ্বিমত পোষণ করে। এক দেশের মানুষ একটি বিষয়ে একমত হলে অন্যরা এতে মতানৈক্য করে। এক বংশের লোক কোনো বিষয়ে একমত হলে অন্য গোত্রের লোকেরা এতে ভিন্নমত ব্যক্ত করে। সর্বক্ষেত্রে এই মতানৈক্য দেখতে পাবে। কিন্তু এমন একটি বিষয় আছে, যার ওপর গোটা বিশ্ব একমত। যেকোনো ধর্মের হোক,

---

২০. সূরা নাহল : আয়াত ৯৭

যেকোনো দেশের হোক, যেকোনো সম্প্রদায়ের হোক, চাই আরবি হোক চাই অনারবি হোক। শ্বেতবর্ণ হোক কিংবা কৃষ্ণবর্ণ হোক, মুসলমান হোক কিংবা অমুসলমান হোক একটি বিষয়ে সবাই একমত। সেই বিষয়টি কী? সেই বিষটি হলো, বর্তমানে আমরা যেযুগে বাস করছি, এক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী একটি বিপর্যয় বিরাজ করছে। প্রত্যেক ব্যক্তিই একথা স্বীকার করবে যে, চতুর্দিকে ফেতনা ও বিপর্যয় প্রকাশ পাচ্ছে, অশান্তি বিরাজ করছে। হতাশার বাতাস বয়ে যাচ্ছে। অস্থিরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী বিপর্যয়

আপনি উন্নত জাতির নিকট চলে যান। প্রতি দুজনের একজনই জবাব দেবে Life is very Difficult জীবনটা অত্যন্ত কঠিন। সারা পৃথিবীর সহজতা সে অর্জন করেছে, স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপন করছে, নির্বিঘ্নে নিজের কুবাসনা পূরণ করে যাচ্ছে। তার পরও বলে Life is very Difficult জীবনটা অত্যন্ত কঠিন। অতএব, বোঝা যায়, বর্তমান পৃথিবীতে সমস্ত মানুষ এ বিষয়ে একমত যে, পৃথিবীতে বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। মনে হয় যেন মানুষ তার হৃদয়ের কাঁধে নিজের মরদেহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে।

এই বিপর্যয়ের কোনো সমাধান তো হবে। সেই সন্ধানে সকল মানুষ নিজ-নিজ স্তরে নিজের পক্ষ থেকে সর্বপ্রকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, আমার অশান্তি দূর হয়ে যাক। আমার অন্তর প্রশান্তি লাভ করুক। আমি সম্মানের জীবন গড়ি। কিন্তু এটা এমন একটা কঠিন মাসয়ালা, যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না। এর কারণ কী? কারণ হচ্ছে, মানুষ বিশৃঙ্খলায় পেঁচিয়ে যাওয়া একটি রশির মাথায় পেঁচিয়ে আছে, যার সমাধানের জন্য সবাই ব্যস্ত রয়েছে। কিন্তু তার মাথা কারও হাতে আসেনি। পৃথিবীর দার্শনিকরা এ বিষয়ে নিবিষ্ট রয়েছে এবং এই অশান্তি দূর করার জন্য সর্বক্ষণ সমাধান খুঁজছে। কিন্তু তারা এর সমাধানের মূল তত্ত্ব পাচ্ছে না।

মনুষ্যত্বের উপকরণ কোথায় আছে?

সমাধান না পাওয়ার একটি মৌলিক কারণ হচ্ছে, আমাদের মুরুব্বীদের থেকে একটি কথা শুনে আসছি যে, এক ব্যক্তি আলোর মধ্যে টাকা খুঁজছে। তার সহপাঠীরা জিজ্ঞাসা করল, কী করছ? বলল, আমি টাকা সন্ধান করছি। টাকাটা পড়ে গিয়েছিল। এবার তারাও সন্ধান করতে লাগল। সকলে মিলে সন্ধান করছে; কিন্তু টাকা পাওয়া যাচ্ছে না। যখন সবাই ক্লান্ত হয়ে গেল,

তখন একজন জিজ্ঞাসা করল, ভাই তুমি কি নিশ্চিত, তোমার টাকা পড়েছে? সে বলল, এটা তো সত্য যে, আমার টাকা পড়েছে; কিন্তু টাকাটা ঘরে পড়েছে। তারা জিজ্ঞাসা করল, তবে এখানে খুঁজছেন কেন? যেখানে পড়েছে, সেখানে তালাশ করো। বলল, এখানে আলোর মধ্যে সন্ধান করছি। এবার যদি তারা সকলে মিলে সারা জীবন এখানে টাকা সন্ধান করে, তবু টাকা পাবে না। ঠিক তেমনি হলো বর্তমান বিশ্বের অবস্থা মানুষের। তারা যে সম্পদ হারিয়েছে, তা হৃদয়ের সাথে সম্পর্কিত। আর তারা সেটা পৃথিবীতে তালাশ করছে। এজন্যই এই বিপর্যয়ের সমাধান পাওয়া যাচ্ছে না, কোনো কবি বলেন,

ڈھونڈ نے والا ستاروں کی گزر گاہوں پر
اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا
جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا
زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا

সন্ধানীরা সন্ধান করছে নক্ষত্রের কক্ষপথে,
কিন্ত আপন বিবেকের জগতে ভ্রমণ করতে পারছে না।

যে সূর্যের কিরণ হস্তগত করেছে, সেও তার জীবনের অন্ধকারকে আলোকময় করতে পারবে না।

আপন হৃদয়ে ডুব দাও জীবনের সমাধান পেয়ে যাও

বিদ্যুতের আলো দিয়ে সারা পৃথিবী আলোকিত করার দাবিদার মানুষের হৃদয় আজ অন্ধকার। এজন্যই তারা ফেতনার সামাধান খুঁজে পাচ্ছে না। নিজের অন্তরে সন্ধান করো। তাহলে যা কিছু হারিয়েছ, তা ফিরে পাবে। যুগপৎ দার্শনিকগণ সমাধান বের করেছেন যে, অর্থনৈতিক অবস্থার যাতে উন্নতি করা যায়, সেই চেষ্টা করতে হবে। ফলে সবার আহার্য পূর্ণরূপে যেখানের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো বিলাসপূর্ণ জীবন যাপন করছে, যেখানের জনগণ পেট পুরে খেয়ে অন্যের সম্পদ আত্মাসাতে মত্ত হয়ে যায়। খাও-দাও ফুর্তি করো, দুনিয়াটা মস্ত বড়। বরং এতে তাদের মস্তিষ্ক আরও বিকৃত হয়। অন্যের অধিকার খর্ব করে। ফলে আরও অশান্তি বিরাজ করে, ক্ষুধার্ত অবস্থায় শুধু পেটের জ্বালা ছিল, এখন সর্বপ্রকার বিপর্যয়ে ছেয়ে গেছে। অস্থিরতা

আরও বৃদ্ধি হয়েছে। সুতরাং কেউ বলতে পারেনি, এই অশান্তি দূর করার উপায় কী? সবাইকে শিক্ষিত বানাও। এটি ভালো একটি সমাধান। তবে সকল সমাজে সবাই কিছু-না কিছু-শিক্ষিত রয়েছে। শিক্ষার হার প্রায় ৯৯% হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় দেখা যাচ্ছে, মানুষ তার শিক্ষা নিজ পেশায় এমনভাবে ব্যবহার করছে যে, জনগণের সকল টাকা তার পকেটে চলে আসছে, তবু শান্তি পাচ্ছে না। কেউ-কেউ বলে নিজের মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করো; এর সমাধান পেয়ে যাবে। অতএব, ওই সমস্ত দেশের নিয়ম-শৃঙ্খলা সুচারু ও উত্তম, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি রয়েছে, নিয়ম কানুনের কঠোরতা রয়েছে, জনগণ রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী জীবন যাপন করছে। সে সমস্ত সম্প্রদায় আজ নিজের পেট ভরে চাহিদার বশীভূত হয়ে অন্যের ওপর আগ্রাসন চালাচ্ছে। তোমরা এভাবে চলতে পারবে না, তোমরা সেভাবে চলতে পারবে না, ঘর তোমার; কিন্তু ক্ষমতা চলবে আমার। আমাদের আঙুলের ইশারায় চলবে। এতেও শান্তি আসছে না। তাহলে সবশেষে কি কোনো সমাধান আছে? এ সমাধান পৃথিবীর দার্শনিকরা বলতে পারবে না, কারণ, এ-বিষয়টি তাদের জ্ঞানের ধরাছোঁয়ার ঊর্ধ্বে।

মানুষের দেহ একটি বিরাট পৃথিবী

মূল কারণ হচ্ছে, মানুষের দেহে এত গভীরতা রয়েছে যে, স্বয়ং দেহ হচ্ছে একটা পৃথিবী। এজন্য আমাদের বুযুর্গগণ বলেছেন, মানুষের দেহ ছোট পৃথিবী। পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে, মানবদেহেও তা বিদ্যমান রয়েছে। আপনি ভেবে দেখুন, মানুষের দেহ পৃথিবীর অনুরূপ। পৃথিবীতে পাহাড়ের যোগসূত্র রয়েছে। তেমনি মানুষের দেহে হাড়ের যোগসূত্রে রয়েছে। পৃথিবীতে সমুদ্র রয়েছে। মানুষের দেহে রক্তের প্রবাহ রয়েছে। পৃথিবীতে জমি কর্ষিত হয়। মানুষের দেহে চুল, লোম ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। পৃথিবীতে বন-জঙ্গল রয়েছে। মানুষের দেহে মাথার চুল রয়েছে। পৃথিবীতে বাতাস রয়েছে। মানুষের দেহে শ্বাস-প্রশ্বাস রয়েছে। সুতরাং এতে প্রতিভাত হয় যে, মানুষের দেহ একটি পৃথিবী আর পৃথিবীর বিষয়বস্তু এমন পেঁচানো যে, মানুষ অতি সহজে আয়ত্ত করতে পারে না।

হৃদয়ের পৃথিবী ও আম্বিয়ায়ে কেরাম

মানুষের হৃদয় এত গভীর যে, সমুদ্রের গভীরতা মানুষ অনুমান করতে পারে; কিন্তু মানুষের হৃদয়ের গভীরতা কেউ পরিমাণ করতে পারে না। এমন বিদঘুটে মানুষকে সংশোধন করা যায় কীভাবে? তার বিপর্যয়ের সমাধান পাওয়া যায় কীভাবে? এজন্য মহা মহিম সৃষ্টিকর্তা নিজের বান্দাদের ওপর অনুগ্রহ করে। যুগে-যুগে নবী-রাসূলগণ প্রেরণ করেছেন। নবীগণ পৃথিবীতে এসে একই শিক্ষা দিতেন যে, হে মানবসকল! আমি যে-জীবনব্যবস্থা নিয়ে এসেছি, আমি যে-শিক্ষানীতি আনয়ন করেছি, সেগুলো মেনে চলো; তবে হৃদয়ে প্রশান্তি পাবে, অস্থির অবস্থার বিপরীতে শান্তি হবে, সম্মানের জীবন গড়বে। আর যদি আমার প্রদর্শিত রাস্তা থেকে বিমুখ হও, তাহলে নিজের গবেষণা ও নিরীক্ষণের ধাক্কা খেয়ে ঘুরে বেড়াবে। আপন গন্তব্যে পৌঁছা কখনো সম্ভব হবে না।

বিপর্যয়ের মূল কী?

আম্বিয়ায়ে কেরাম পৃথিবীতে আগমন করে মূলতত্ত্ব সম্পর্কে অবগত করে দিয়েছেন যে, পৃথিবী সমস্ত বিপর্যয়ের শিকড় হচ্ছে মানুষ। পৃথিবীতে যত রকম ফেতনা পরিলক্ষিত হচ্ছে, সবকিছুর ভিত্তি হলো মানুষ, অন্য কোনো প্রাণী নয়। আপনারা দেখেন, হিংস্র প্রাণীর দ্বারা মানুষ এমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, যেমন বিদ্রোহী ও বিপথগামী মানুষের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আপনারা কি কখনো শুনেছেন যে, কতিপয় নেকড়ে বাঘ ঐক্যবদ্ধ হয়ে অন্য কোনো নেকড়ে বাঘের ওপর আক্রমণ করেছে? বাঘেরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মানবজাতির ওপর আক্রমণ চালিয়েছে? না এরূপ কখনো হয়নি। হ্যাঁ, স্বতন্ত্রভাবে কখনো কোনো বাঘ ক্ষুধাতুর হয়ে কোনো মানুষের ওপর আক্রমণ চালাতে পারে। তারা সংহত হয়ে এমন কাজ কখনো করেনি। অথচ মানুষ মানুষের ওপর এরকম আক্রমণ করে। কিছু মানুষ নিজের চাহিদা সিদ্ধির জন্য পৃথিবীর সকল মানুষকে অবজ্ঞা করে চলে। সুতরাং ফেতনা-ফাসাদের মূল শিকড় হচ্ছে মানুষ। হিংস্র প্রাণীরা কি কখনো কোনো আইন প্রণয়ন করছে? কখনো কি তারা সকল জাতি মিলে কোনো জোট গঠন করেছে যে, এবার আমরা মানবজাতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করব? তাদের ক্ষমতার আপসারণ ঘটাব। তাদের ক্ষতি করব। মানুষ এ-ধরনের বোর্ড গঠন করে এবং নিজের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য অন্যের বেঁচে থাকা হারাম করে দেয়, নবী রাসূলগণ এসে এ মূলতত্ত্ব উদ্ভাসিত করেছেন। হে মানবজাতি! বিপর্যয়ের মূল কারণ তোমরা

বলা হয়েছে। শোনো, একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

'জলে ও স্থলে বিপর্যয় প্রকাশ পাচ্ছে। এটা মানুষের স্বহস্তে আমদানিকৃত।'

সুতরাং ফেতনা-ফাসাদের উৎস হচ্ছে মানুষ।'[২১]

বিপর্যয়ের রাস্তা

এবার প্রশ্ন হয়, মানুষ যদি বিপর্যস্ত হয়ে যায়, তাহলে মানুষকে এই অবস্থা থেকে উত্তরণের কোনো পন্থা আছে কি? নবী-রাসূলগণ সেই বাগডোর হাতে তুলে দিয়েছেন। তারা বলেছেন, দেখো; মাছ যখন পচতে শুরু করে, তখন মাথার দিক থেকে নষ্ট হওয়া আরম্ভ হয়। অনুরূপ মানুষের মধ্যে যখন ফাসাদ আসে, তখন সেটা তার অন্তর থেকে শুরু হয়। সর্বপ্রথম মানুষের যে অঙ্গ বিনষ্ট হয়, সেটা মানুষের অন্তর। অন্তরের সংশোধনির দ্বারা মানুষ পরিশুদ্ধ হয়। আর হৃদয়ের বিপর্যয়ের দ্বারা মানুষ বিপর্যস্ত হয়। কোনো কবি বলেন–

دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی

جس نے اسے سنوار لیا وہ سنوار گیا

'হৃদয়ের বিকৃতির দ্বারা মানুষ বিপর্যস্ত হয়।

যেব্যক্তি তার হৃদয়কে সংশোধন করেছে, সে সংশোধিত হয়ে গেছে।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা নবুওতের নূর দান করেছেন, দৃষ্টির নূর দান করেছেন, ঈমানের নূর দান করেছেন, নৈকট্যের নূর দান করেছেন। তাই তিনি উল্লেখযোগ্য ব্যাধিসমূহকে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁর মনোনীত বান্দাদের সাহায্য করেছেন, প্রত্যেক বস্তুর মূলতত্ত্ব সম্পর্কে তাদের অবগত করেছেন। আল্লাহ বলেন–

وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ إِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

'এমনিভাবে আমি ইবরাহীমকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ দেখাতে লাগলাম।'[২২]

---

২১. সূরা রূম : আয়াত ৪১

২২. আন'আম : আয়াত ৭৫

স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ এ সমস্ত নেয়ামত দান করেছিলেন। হাদীছ শরীফে এসেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'আ করতেন–

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا حَقَائِقَ الدُّنْيَا كَمَا هِيَ

'হে আল্লাহ! পৃথিবীর বস্তুসমূহের মূল হাকীকত আমাকে দেখিয়ে দাও।'

সুতরাং প্রত্যেক বস্তুর মূলতত্ত্ব নবীগণ জানতেন। আল্লাহ তাঁদেরকে সুস্থ মস্তিষ্ক দান করেছিলেন। সুস্থ প্রকৃতি দান করেছিলেন। এজন্যই তাঁরা এই ব্যাধির সঠিক কারণ নির্ণয় করেছিলেন যে, মানবদেহে বিকৃতি কীভাবে আসে। অতএব, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

اِنَّ فِيْ جَسَدِ بَنِيْ اٰدَمَ لَعَضْوًا اِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ

প্রত্যেক আদম সন্তানের দেহে একটি অঙ্গ রয়েছে। যখন সেটা বিকৃত হয়ে যায়, তখন তার সারা দেহ বিকৃত হয়ে যায়। দেখুন, নবুওতের জবানে এই নির্ণয় কেমন সঠিক হয়েছে। সুতরাং এতে বোঝা গেল, এ বিশ্বব্যাপী বিপর্যয়ের মূল শিকড় হচ্ছে মানুষ আর মানুষের বিপর্যয়ের ভিত্তি তার বিকৃত হৃদয়।

ছোট একটি বিস্ময়ের বস্তু

এই যে মানুষের হৃদয় এটা অতি ছোট একটি বস্তু। কিন্তু তার গভীরতা অনেক। এটা ছোট একটি বিস্ময়কর বস্তু। এটা নির্মলও হয়, খাঁদপূর্ণও হয়। ধোঁকাবাজও হয়, মাটির মতো সরলও হয়। চতুরও হয়, আবার উদাসীনও হয়। রোগও হয়, ওষুধও হয়। ধর্মানুরাগীও হয়, পাপিষ্ঠও হয়। শক্তিশালীও হয়, দুর্বলও হয়, বশীভূতও হয়। স্বাধীনও হয়, নিহতও হয়। ফুলও হয়, কাঁটাও হয়। বিক্রিও হয়, ক্রেতাও হয়। এশকের মাহফিলে দেওয়ানা হলে জ্ঞানের মাহফিলে চালাকও হয়। বিকৃত হলে প্রতিমার বান্দা হয় আর সংশোধিত হলে আপন প্রভুর উপসনাকারী হয়।

হৃদয় জগতের অনুসন্ধান

আজকের মাহফিলে আমাদের যাচাই করে দেখতে হবে, আমার হৃদয়ের মনোনিবেশে কোন দিকে রয়েছে– আল্লাহ তা'আলার দিকে, নাকি দুনিয়ার চাহিদা পূরণের দিকে। আমাদের হৃদয় নামক গাড়িটি কোন রাস্তায় চলছে।

দুনিয়ার মহব্বত পরিতৃপ্ত হয়ে শুধু পার্থিব চাহিদা পূরণে ব্যস্ত রয়েছে, নাকি আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসায় অধীর রয়েছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সর্বদা সচেষ্টা রয়েছে, নাকি অন্যমনস্ক রয়েছে। বর্তমানে এটি আমাদের জন্য আবশ্যক হয়ে পড়েছে। তাই বলা হয়, নবীগণের শিক্ষার নির্যাস হলো, স্বর্ণ-মুদ্রার কোষাগার জয় করার সৌভাগ্য তোমার হয়েছে। তবে হৃদয়ে আলো না থাকলে কোনো আলো পাবে না। এই আলো হৃদয়ের দ্বারা অর্জন করা যায়। এটা মানুষের নূরের মিনার। সুতরাং বর্তমানে মানুষের হৃদয় এতটা বিকৃত হয়েছে যে, মনুষ্যত্বের সহমর্মিতা তার থেকে নিঃশেষ হয়ে গেছে। এই আড়ম্বরপূর্ণ পৃথিবীতে মানুষ নিজের কল্যাণের প্রতি অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছে। নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়টি মানুষের জীবন থেকে পলায়ন করেছে।

কী আশ্চর্য নগদ সওদা; এ হাতে প্রদান সে হাতে গ্রহণ

যখন মানুষের হৃদয়ে কারও প্রতি সহানুভূতি না থাকে, তখন সে কাউকে ভয় করে না। কারও পরোয়া করে না। বলুন তো, অনেক সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন বিভিন্ন স্থানে লাখ-লাখ মশার প্রাণহানি ঘটে। আপনি কখনো কি সংবাদপত্রে দেখেছেন, অমুক জায়গায় লাখো মশার প্রাণহানি ঘটায় কোনো সম্প্রদায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। না। কারণ, এতে মানুষের কোনো পরোয়া নেই। ঠিক তেমনিভাবে কোনো মানুষ যখন বিদ্রোহী হয়ে যায়, তার হৃদয় বিকৃত হয়ে যায়, তখন সে অন্যান্য মানুষের কোনো পরোয়া করে না। দুনিয়ার সকল মানুষ তার নিকট মশার মতোও মনে হয় না। তাদের ঘরবাড়ি উজাড় হচ্ছে, তাদের নিষ্পাপ সন্তান তাদের সামনে মারা যাচ্ছে। তাদের ইজ্জত কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। তাদের নাস্তানাবুদ করা হচ্ছে। এতে সেই আক্রমণকারীরা কারও পরোয়া করছে না। তারা তাদের নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকে যে, আমার কথা মেনে নেওয়া হচ্ছে না কেন?

এজন্য ভাই! মানুষ সংশোধন হতে হলে সর্বপ্রথম তার অন্তরের সংশোধনি জরুরি। পক্ষান্তরে হৃদয় সংশোধন না করার কারণে তোমার জীবনে বিপর্যয় নেমে এসেছে।

কোনো কবি বলেন–

رام رام جپ دیاں میری جیا گھس گئی
رام نہ دل وچ وسیا اے کی دھاڑیئ

রাম রাম জপনায় আমার জিহ্বা শুধু ঘর্ষণই খাচ্ছে।

রাম রাম জপনার শোরগোল ছাড়া আমার হৃদয়ে প্রশান্তি দিতে পারে না।

گل وچ مالا کاٹ دی تے منکے لے پرو

دل وچ گھنڈی پاپ دی رام جپیاں کی ہو

হৃদয়ে যখন পূর্বপুরুষদের কারুকার্য ছেয়ে আছে,

তবে রাম রাম জপনা করার আলাদা ফায়েদা কী?

সুতরাং বর্তমানে মানুষ মুখে বলে, মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে যাও; কিন্তু তাদের কাজকর্ম দেখে মনে হয়, তারা মনুষ্যত্বের জানাযা বের করছে। কারণ, তাদের অন্তরে খচিত কারুকার্য দূর করা যাচ্ছে না। বর্তমানে মানুষের ওপর এক অদ্ভূত অবস্থা বিরাজ করছে। মনুষ্যত্বের ওপর অস্থিরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু এর মূল কারণ হচ্ছে আমাদের উদাসীনতা। যদি আমরা আমাদের হৃদয়ের চিকিৎসা করাতে পারতাম, তাহলে আজ অশান্তির এই দুর্যোগময় দিনের সম্মুখীন হতাম না।

কোনো কবি বলেন–

صیاد کو بھی تھا خوف کہ ہمراہ ملا سکے

اب خوف ہے مدت سے دلوں رجا ہے

جو کچھ ہیں وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت

شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے

دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت

سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے

اک مدت عمر ہم نے غفلت میں گزار دی اپنے دلوں سے غافل

اپنے جہاں سے بے خبر سارے جہاں سے با خبر

শিকারীর ভয় ছিল, যাতে কোনো সাথি মিলে যায়।

এখন ভয় হচ্ছে, যুগের কারণে অন্তর ভীত।

কালের অভিযোগ ভাগ্যের– পণ্যের নয়।

ভেবে দেখো, সামনে যা কিছু দেখছ, সবই তোমার উদাসীনতার প্রতিদান।

এটাই সত্য যে, মন্দ কর্মের পরিণাম মন্দই হয়।

এক যুগ পেরিয়ে গেল আমার উদাসীনতায়। আমি হৃদয় সম্পর্কে উদাসীন, নিজপৃথিবী হতে উদাসীন। তারা বাহ্যিক পৃথিবী নিয়ে ব্যস্ত।

ফেতনার মূল ভিত্তি হচ্ছে মানুষের অন্তরের অভিপ্রায়

অন্তরের সেই অভিসন্ধির মধ্যে আমরা জীবনের সফলতা ভাবছি, কাজেই দিন-দিন ফেতনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্মরণ রাখবেন, সমস্ত ফাসাদের মূল ভিত্তি হচ্ছে মানুষের অন্তরের অভিলাষ। হৃদয়ের গহ্বরে নিজের যে-অভিলাষ আত্মগোপন করে আছে এবং স্বার্থপরতা লুকিয়ে আছে, সেটা যেকোনো রকম হোক এটাই মানুষের অস্থিরতার মূল কারণ।

হৃদয়ের চিকিৎসা কী?

এর চিকিৎসা হচ্ছে, মানুষ তার হৃদয়কে ঈমানের নূর দ্বারা পরিপূর্ণ করবে। আল্লাহর ভালোবাসায় অন্তর ভরপুর করবে। তাহলে মানুষের অন্তরে মনুষ্যত্বের সহমর্মিতা উদয় হবে। আর যখন সহানুভূতি সৃষ্টি হবে, তখন তার মনোভাব সর্বদা মানুষের প্রতি হবে। বন্ধুগণ! একটি জিনিস হচ্ছে মানুষের কাহিনী বর্ণনা করা। আর কাহিনী বর্ণনা করতে মানুষের অবস্থা বিন্দুপরিমাণও নড়চড় করে না। আরেকটি জিনিস হচ্ছে কোনো মহিলা তার স্বামীর পেরেশানি বর্ণনা করা। স্বামীর অশান্তির কথা বর্ণনা করতে তার দু-নয়নে অশ্রুর ঝরনাধারা বয়ে যায়। উভয়টিই কাহিনী কিন্তু উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে। আজ আমরা মনুষ্যত্বের অস্থিরতার আলোচনা করছি সাধারণ কল্পকাহিনী বর্ণনাকারীদের মতো। তাই আমাদের কোনো অনুভূতি হচ্ছে না। পক্ষান্তরে যদি হৃদয়ে আল্লাহর ভালোবাসা থাকে, তাহলে মানুষের বর্তমান দুর্যোগের কথা বলার সময় আমাদের অবস্থা ওই মহিলার মতো হবে, যে নিজের স্বামীর দুরবস্থা বর্ণনা করতে তার চক্ষুদ্বয় থেকে আষাঢ়-শ্রাবণের ঝড় নেমে আসে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবায়ে কেরামকে আত্মশুদ্ধির শিক্ষা দিতেন, তখন অন্তর মনুষ্যত্বের সহমর্মিতায় ভরে যেত। অতএব, তাদের মধ্যে পরস্পরে এমন সমবেদনা ও সহানুভূতির জবাব সঞ্চার হয়েছিল যে, তারা এমন কিছু দৃষ্টান্ত রেখেছেন, যার উপমা পেশ করতে পৃথিবী ব্যর্থ।

সাহাবায়ে কেরাম কেমন ছিলেন

আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবি সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাঁদেরকে প্রচুর ধনসম্পত্তি দিয়েছিলেন। তাঁরা চাইতেন, আমরা আমাদের দরিদ্র ভাইদের সাহায্য করি। কিন্তু উপকার করে খোঁটা দেওয়া প্রকাশ হওয়া এটাও তাঁরা পছন্দ করতেন না। সুতরাং তারা রাতের অন্ধকারে এদের বাড়িতে দরজার সামনে সেই দানের মাল রেখে আসতেন। খাদ্যসামগ্রী আর চিরকুট রেখে আসতেন যে, এটা মেহেরবানিপূর্বক আমার পক্ষ থেকে গ্রহণ করবেন। সরাসরি এজন্য দিতেন না, যাতে সরাসরি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী না হয়। তারা নিজের উদারতার প্রতি এমনই বিমুখ হতেন। সুবহানাল্লাহ!

ইমাম যায়নুল আবেদীন (রহ.)-এর ইখলাছ

ইমাম যায়নুল আবেদীন (রহ.)-এর জীবনীতে বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁর মৃত্যুর পর তাকে গোসলদানকারীরা তাঁর ডান কাঁধে কালো দাগ দেখতে পায়। তিনি অত্যন্ত সুদর্শন ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু দেহ অত্যন্ত জীর্ণশীর্ণ ছিল। তারা হতভম্ব হয়ে গেল যে, এই ছাপটা কীসের। তারা মানুষকে জিজ্ঞাসা করল। তাঁর সহধর্মিণীকে জিজ্ঞাসা করা হলো। কেউ বলতে পারেনি। যখন তাঁর মৃত্যুর সপ্তাহ-দশদিন অতিক্রান্ত হলো। তখন সেকালের নিঃস্ব, অপারগ ও বিধবাদের ঘর থেকে আওয়াজ বেরিয়ে আসছে, হায়! সে কোথায় গেল, যে রাতের আঁধারে আমাদের ঘরে পানি পৌঁছিয়ে দিত। তখন সেই রহস্য উদঘাটন হলো। তিনিই রাতের অন্ধকারে পানির মশক কাঁধে নিয়ে সেই অসহায়দের ঘরে পৌঁছিয়ে দিতেন, যার দরুন তাঁর কাঁধে দাগ পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু এমন গোপনে এ কাজ করতেন যে, তাঁর জীবদ্দশায় কেউ, এমনকি তাঁর স্ত্রী পর্যন্ত সে বিষয়ে জ্ঞাত ছিলেন না।

বর্তমান পৃথিবী

বর্তমান পৃথিবীর মানুষ খুব স্লোগান দিচ্ছে, আমরা মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল। আমরা লোকদের সাহায্য করছি। সাহায্য কী করা হয়? সুদের ওপর ঋণ প্রদান করা হয়। নাম দেয় সাহায্য করে আর সুদে ঋণ দিয়ে জনগণকে চুষে খায়। ফলে সেই সুদ এমন বৃদ্ধি পায় যে, সারা জীবন পরিশ্রম করেও সেই ঋণ পরিশোধ করতে পারে না। এ হলো বর্তমান শিক্ষিত সমাজের সাহায্য।

আত্মদান ও সহানুভূতির বিরল দৃষ্টান্ত

একটা সময়ে সাহাবায়ে কেরামের স্মরণ, তাঁদের অবদান নিয়ে আলোচনা সতেজ ছিল। তাঁরা কী সাহায্য করতেন? অন্যের প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজনের ওপর প্রাধান্য দিতেন। সুতরাং এক সাহাবির ঘরে বকরি জবাই হয়েছে। তিনি সেই বকরির মাথা তার বন্ধুর বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন। বন্ধু ভাবলেন, কোনো সমস্যা ব্যতীতই আমার দিন কাটছে। তাহলে অমুক বন্ধুর বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া যাক। সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। সেই বন্ধু তার পাশের বন্ধুকে বেশি উপযোগী মনে করে তার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। সেই বন্ধু তার প্রতিবেশির প্রয়োজন অধিক মনে করে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে পাঁচ-সাত ঘর অতিক্রম করে এক সাহাবির কাছে গেল। তিনি ভাবলেন, আমার চেয়ে আমার অমুক বন্ধুর সন্তান বেশি; সুতরাং আমার থেকে তার প্রয়োজন বেশি হবে। তাই সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। অতএব, সেই ছাগলের মাথা তার ঘরেই এসে পৌঁছল, যিনি সেটা জবাই করেছিলেন। যেখান থেকে হাদিয়া শুরু হয়েছিল, সেখানেই এসে পৌঁছল! সুবহানাল্লাহ!

সাহাবায়ে কেরামের আদর্শিক আমলের পদ্ধতি

সাহাবায়ে কেরাম কোথাও সমবেত হলেন। সাহসা কারও উজু ছুটে গেল। দুর্গন্ধ প্রকাশ পাচ্ছে। এখন তো একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, কেউ অবশ্যই উঠবেন। উজু করবেন। কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রহ.) দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি অনুমতি দিলে আমরা সকলেই উজু করে নেব। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিলে সবাই উজু করলেন, যাতে ভরমজলিসে তাদের কোনো ভাই লজ্জিত হতে না হয়। একে আল্লাপাক তাঁর ভাষায় বলেন–

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

'তারা পরস্পরে সহানুভূতিশীল।'[২৩]

এ হলো মনুষ্যত্বের সহানুভূতির রূপরেখা। সহানুভূতি এমন হওয়া চাই যে, যদি একজন আঘাত পায়, তাহলে অন্যের চোখে অশ্রু প্রকাশ পায়। এটিই হচ্ছে মূল মাকসাদ। আর সাহাবায়ে কেরামের যুগে এরকম অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

---

২৩. সূরা ফাতাহ : আয়াত ২৯

হযরত আবু তালহা (রাযি.)-এর আপ্যায়ন

আপনারা শুনে অবাক হবেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এক মেহমান এল। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের মধ্যে কেউ আছেন, যে আজকের মেহমানকে নিজের ঘরে নিয়ে যাবেন। হযরত আবু তাহলা (রহ.) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মেহমানকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিন। তিনি মেহমান নিয়ে ঘরে গেলেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, মেহমান এসেছেন। ঘরে খাবার কিছু আছে কি? স্ত্রী বললেন, অল্প কিছু খাবার আছে; বাচ্চাদের খাওয়াতে পারব। আপনার ও আমার খাবারের জন্যও কিছু থাকবে না। তিনি বললেন, আচ্ছা, ঠিক আছে; তুমি ঘুমপাড়ানি বাণী শুনিয়ে বাচ্চাদের শুইয়ে দাও আর যে খাবার আছে, তা দস্তরখানায় উপস্থিত করো। মেহমান যখন খাবারের জন্য উপস্থিত হবেন, তখন তুমি ঠিক করার বাহানা করে বাতিটা নিভিয়ে দেবে আর আমি মেহমানকে সঙ্গে নিয়ে দস্তরখানায় বসে যাব। অন্ধকারের মধ্যে আমি শুধু হাত নাড়াচাড়া করব, যাতে মেহমানের জন্য খাবার যথেষ্ট হয়ে যায় আর মেহমান বুঝতেও পারবেন না যে, আমি খাইনি। সুতরাং এরূপই করা হলো। খাবার খেয়ে মেহমান চলে গেলেন। এবার তারা বাতি জ্বালালেন। ফলে আগামী দিন আবু তালহা (রহ.) আল্লাহর রাসূলের দরবারে উপস্থিত হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ এল–

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ওপর আরেক ভাইকে প্রাধান্য দেয়।[২৪]

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারবে? আমাদের ইতিহাসে এর উদাহরণ থাকার কারণ হচ্ছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অন্তরকে সহানুভূতি দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন।

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর খেদমতের রূপরেখা

একদা হযরত ওমর (রাযি.) খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর দরবারে গেলেন, সেখানে একটি কাগজে লিপিবদ্ধ দেখলেন, যারা অতিশয় বৃদ্ধ, অসহায় ও বিধবা তাদের নামের তালিকা

---

২৪. সূরা হাশর : আয়াত ৯

রয়েছে। এর পাশে তাদের ঠিকানাও লেখা আছে এবং তাদের যারা সেবা করবে, তাদেরও নাম লিখিত রয়েছে।

তিনি সম্পূর্ণ তালিকা পাঠ করলেন। এক জায়গায় দেখলেন, একজন বৃদ্ধ মহিলার নাম-ঠিকানা লেখা আছে; কিন্তু তার খাদেমের নাম নেই। তখন হযরত ওমর (রাযি.) ভাবলেন, এ মহিলার দায়িত্ব আমি নেব। অতএব, পরদিন ফজরের নামায পড়ে সোজা ওই মহিলার বাড়িতে চলে গেলেন। দরজার কড়া নাড়া দিলেন। মহিলা জিজ্ঞাসা করল, কে? তিনি বললেন, খাদেম এসেছে; কোনো কাজ থাকলে বলুন। তখনকার সময় দুটি কাজ করা হতো। ঘর ঝাড়ু দেওয়া এবং দূরে থেকে পানি সংগ্রহ করে ঘরে পৌঁছিয়ে দেওয়া। অন্যান্য কাজ তারা নিজেই করতে পারত। বৃদ্ধা জবাব দিল, আমার কাজ হয়ে গেছে। কীভাবে হলো? কে যেন এসেছিল আর আমার কাজগুলো সেরে চলে গেছে। জিজ্ঞাসা করলেন, কবে থেকে আসছে? বলল, অনেক দিন যাবৎ সে আমার কাজ করছে। বললেন, আচ্ছা! তার নামটা কী জানেন? মহিলা বলল, না; আমি কোনোদিন জিজ্ঞাসাও করিনি এবং তিনিও বলেননি। বাড়িতে এসে দরজার কড়া নাড়া দিয়ে বলে, খাদেম এসেছে; পর্দা করুন। আমি আমার কামরায় চলে যাই আর সে সমস্ত কাজ সেরে আবার বলে, খাদেম চলে যাচ্ছে; নিজের কাজ করতে পারেন। ফলে আমি বের হয়ে যাই। আমি কোনোদিন তাকে দেখিনি। নামও জিজ্ঞাসা করিনি।

হযরত ওমর (রাযি.) বুড়ির কথা শুনে অবাক হলেন, কে সেই খাদেম? পরদিন তাহাজ্জুদের নামায পড়ে বৃদ্ধার বাড়িতে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, খাদেম এসেছে; কোনো প্রয়োজন আছে কি? বৃদ্ধা উত্তর দিল, আমার কাজ করা হয়ে গেছে। পরদিন ঈশার নামায পড়ে তিনি বৃদ্ধার বাড়ির পাশে রাস্তায় আত্মগোপন করে বসে রইলেন। ওই বান্দাকে আমার দেখতে হবে, যে রাতের অন্ধকারে মহিলার সকল কর্ম সম্পাদন করে যায়। রাত যখন গভীর হলো, অন্ধকার ছেয়ে গেল, পড়শীরা সবাই সুখনিদ্রায় বিভোর রইল, তখন হযরত ওমর (রাযি.) দেখলেন এই অন্ধকারে খালি পায়ে শব্দবিহীনভাবে চুপিসারে হেঁটে-হেঁটে একজন এই মহিলার বাড়িতে প্রবেশ করছে। এত আস্তে হাঁটছে যেন তার পায়ের আঘাত জমিনও টের পাচ্ছে না। হযরত ওমর (রাযি.) কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে? উত্তরে আমীরুল মুমিনীনের আওয়াজ এল, আমি আবুবকর! ওমর (রাযি.) বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আপনি রাতের অন্ধকারে এই মহিলার কাজ সম্পদন করেন? বললেন, হ্যাঁ আমিই করি। হযরত ওমর (রাযি.) তাঁর খালি পা দেখে

বললেন, জুতা পরে আসছেন না কেন? বললেন, জুতা ঘরে রেখে এসেছি। কারণ, জনগণ নিদ্রারত অবস্থায় আছে। রাতের অন্ধকারে আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। এমতাবস্থায় আমার জুতার আওয়াজে যেন কারও ঘুম ভেঙে না যায় আর মানুষের কষ্ট না হয়।

আম্বিয়ায়ে কেরামের মেহনতের ফল

এই সহমর্মিতা আজ কাদের হৃদয়ে? নবীগণ মানুষের অন্তর পরিশোধিত করেছেন এবং হৃদয়ে মানবতার চেতনা ভরে দিয়েছেন। এ-কারণেই তাঁদের জন্য আত্মদান এবং অন্যের হক আদায় করা এবং নিজে সাধনা করা সব কিছু সহজতর হয়েছে। এগুলো তারা তাদের দয়ার বহিঃপ্রকাশের জন্য করেননি। বর্তমানে তো শিক্ষিত সমাজ অন্যের ওপর দয়া করে। কী করে? ঋণের সুদ মাফ করে আর বলে, আমরা অমুকের ওপর, অমুক দেশের ওপর দয়া করেছি। এটাই হচ্ছে বর্তমান যুগের দয়া যে, আমরা তোমাদের যে ঋণ দিয়েছিলাম, তার সুদ মাফ করে দিলাম। এতে তোমাদের ওপর অনেক দয়া করলাম। আপনারা অনুমান করে থাকবেন যে, নবী-রাসূলগণ যে-সভ্যতা পৃথিবীকে উপহার দিয়েছেন, সেটি হচ্ছে মানবতার প্রকৃত সভ্যতার ভিত্তি। তারা মানুষের অন্তরকে পরিশোধিত করেছেন এবং হৃদয়কে শ্রমের জন্য উন্মুক্ত প্রান্তর বানিয়ে দিয়েছেন।

ফলাফল কী হলো? মানুষ পরস্পর ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হলো, ভালোবাসাপূর্ণ জীবন গড়ল। এমনকি মানুষের নিজের ঘরে তালা লাগানোর প্রয়োজন হতো না। কিতাবে এসেছে, যদি কেউ রাস্তা অতিক্রমকালে তার উষ্ট্রি থেকে কম্বল পড়ে যেত, তাহলে এই কম্বল কেউ স্পর্শও করত না। বছরখানেক গেলে সেই কম্বল বৃষ্টির পানির কাদা ও রোদের তাপে পচে নষ্ট হয়ে যেত, তবে সেটা ওই জায়গায়ই থাকত, যেখানে পড়েছিল। কেমন সত্যের যুগ ছিল। কী আত্মসম্ভ্রম রক্ষার জিন্দেগি ছিল। মানবতার সেই সহমর্মিতা এজন্যই ছিল যে, মানুষের অন্তর পরিশোধিত হয়েছিল। সুতরাং আজ সেই ভুলে যাওয়া অধ্যায় পুনরাবৃত্তি করা দরকার এবং আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসার সেই পেয়ালা পুনরায় ভাগ্যে আনা দরকার। সাহাবায়ে কেরামের যুগের পরেও এধরনের আত্মদান ও ত্যাগের বহু দৃষ্টান্ত ইসলামের ইতিহাসে বিদ্যমান রয়েছে। আল্লামা আবুল হাসান নূরী (রহ.)-এর জীবনীর প্রতি তাকাও, তাঁর আত্মদানের ঘটনা অকলোকন করো।

আল্লামা আবুল হাসান নূরী (রহ.)-এর আত্মদান

তৎকালের বাদশাহ কোনো একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি মাসআলার সত্য-সত্য জবাব দিলেন। কিন্তু তা বাদশাহর মনঃপূত হয়নি। তাই ক্ষিপ্ত হয়ে বাদশাহ তাদের কয়েকজনকে গ্রেফতার করলেন এবং তাদের হত্যার নির্দেশ দিলেন। শিরোচ্ছেদের মঞ্চ তৈরি করা হলো। সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি সবার আগে। জল্লাদ তাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। এক্ষুনি কতল করা হবে। তিনি যেহেতু সবার আগে আছেন, তাই প্রথমে তাঁরই পালা হবে। তবে তার প্রতি বাদশাহর আলাদা মহব্বত ছিল। তাই বাদশাহ ভাবলেন, আগে অন্যদের হত্যা করা হোক। তারপর কোনো বাহানায় তাকে ক্ষমা করে দেব। সুতরাং বাদশাহ নির্দেশ দিলেন, এখানে নয়– ওখানে সারিবদ্ধ হও। বাদশাহর ইচ্ছা ছিল, নতুন করে কাতার বাঁধলে হয়তো তিনি এক-দুজনের পেছনে পড়ে যাবেন। কিন্তু না; দ্বিতীয় দফায়ও তিনি সবার আগে রইলেন। বাদশাহ পুনরায় সারিবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দিলেন। এবারও তিনি সবার অগ্রে। অবশেষে বাদশাহ তার অভিপ্রায় প্রকাশ করে ফেললেন যে, আমি এ-রকম চাচ্ছি; কিন্তু আপনি প্রত্যেকবার সবার অগ্রবর্তী হচ্ছেন কেন? তিনি বললেন, এরা সবাই আমার ভাই। আমরা একই অপরাধের আসামি। আমি সবার আগে উপস্থিত হওয়ার কারণ হলো, আমাকে যখন জল্লাদ হত্যা করবে, তখন আমাকে হত্যা করতে যে সময়টুকু লাগবে, সেই সময়টা তো আমার আরেক ভাই অবকাশ পাবে। তাই আমি এমন করছি। সুবহান্নাল্লাহ! এই হলো আত্মদানের দৃষ্টান্ত! এই হলো তাঁর চেতনা! কতই-না সুন্দর সেই চেতনা। মানুষ একে অপরের জন্য এ-পরিমাণও সহমর্মী হয়! এই মহান স্বভাব আসে নববী শিক্ষার মাধ্যমে। এজন্যই আল্লাহ তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন–

وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۝

'হে আমার হাবীব! নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।'[২৫]

তাঁর এই মহান চরিত্র তিনি উম্মতদের শিক্ষা দিয়েছেন।

একটি বিরল উদাহরণ

আমরা চাই, আমাদের এই অশান্তি দূর হয়ে যাক। এই অশান্তি দূর করার উপায় আমরা বাইরে পাব না। আমাদের ভেতরে তার বাস; সেখান থেকেই

---

২৫. সূরা কলম : আয়াত ৪

অনুসন্ধান করে তাকে বের করতে হবে। অথবা উদাহরণটি এভাবে বুঝে নিন যে, হাদীছ শরীফে এসেছে, খেজুর গাছ মানবজাতির খালা। এ-বিষয়টি আমি বহু দিন পর্যন্ত গবেষণা করেছি। অবশেষে আমার খেজুর গাছ লাগানোর সুযোগ হলো। আমি বৃক্ষবিশেষজ্ঞদের স্মরণাপন্ন হলাম। তারা বললেন, খেজুর বৃক্ষ রোপনের পর প্রথমে তার সকল পাতা মরে শুকিয়ে যায়। তারপর ভেতর থেকে নতুন পল্লব গজিয়ে তা বৃদ্ধি হতে থাকে। ফলে সবুজ-শ্যামল বৃক্ষ দৃশ্যমান হয়। ঠিক তেমনিভাবে মানবতার অধঃপতিত বৃক্ষের অভ্যন্তর থেকে সবুজ-শ্যামল অবস্থা প্রকাশ হতে থাকে। এবার যদি আমরা সেই সবুজ শ্যামলতায় আত্মনিয়োগ করি, তাহলে অবশ্যই আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে যাব। অতএব, আজকের মাহফিলে সবাই এ নিয়ত করুন যে, আমাদের হৃদয়কে আমরা শোধন করব এবং আল্লাহর ভালোবাসায় সাজাব। এমনভাবে পরিপূর্ণ করব, যেন আল্লাহ তা'আলা হৃদয়ে এসে যান, আল্লাহ নামের প্রতিধ্বনিতে যেন আমাদের অন্তর ছেয়ে যায়। আল্লাহ নামের এমন নিপুণ জীবন গড়া চাই। আমাদের ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, হৃদয়ে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা সৃষ্টি করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। যে-সমস্ত পদ্ধতিতে আল্লাহর ভালোবাসা সৃষ্টি করা যায়, সেগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি– মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

প্রথম কারণ

আল্লাহ তা'আলার অমূল্য অবদানের প্রতি চিন্তাভাবনা করলে বিবেকবান মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর মহব্বত সৃষ্টি হয়। তাই আরবি ভাষায় একটি বাগ্‌ধারা আছে–

اَلْاِنْسَانُ عَبْدُ الْاِحْسَانِ

'মানুষ দয়ার দাস।'

আপনারা হিংস্র প্রাণীদের দেখে থাকবেন। মানুষ বাঘের মুখে হাত দেয়; অথচ সে তাকে কিছুই করে না। কারণ কী? কারণ হচ্ছে, সে প্রত্যেক দিন ওই বাঘের মুখে গোশত তুলে দেয়। এজন্যই এই হিংস্র বাঘ পর্যন্ত তার প্রহরী হয়ে যায়। সুতরাং যেখানে হিংস্র বাঘ তার প্রতি অবদানকারীর অবদানে নমনীয় হয়ে যায়, সেখানে মানুষ যতই হিংস্র হোক শেষ পর্যন্ত অবশ্যই তার মধ্যে সেই অনুভূতি থাকবে। যে কেউ কারও প্রতি সদ্ব্যবহার করবে, আল্লাহ প্রকৃতিগতভাবে মানুষের মন তার প্রতি আকৃষ্ট করে দেবেন। আপনারা দেখে থাকবেন, কেউ কারও চাকরির ব্যবস্থা করে দিলে সারা জীবন

সে তার গুণগান করতে থাকে। তবু সে ক্লান্ত হয় না। কোনো ডাক্তার যদি কারও অপারেশনে সফল হয়, তাহলে যখনই ওই রোগের আলোচনা হবে, তখনই সে ওই ডাক্তারের প্রশংসায় মেতে উঠবে। সুতরাং মানুষ যখন মানুষের অনুগ্রহের কথা ভুলতে পারে না, তখন সে তার ওপর আল্লাহর নেয়ামতের কথা আলোচনা করবে, তা নিয়ে ভাবতে থাকবে। তখন অবশ্যই আল্লাহর অবদান বিবেকে উপস্থিত হবে। এতে আল্লাহ তা'আলার প্রতি তার মহব্বত বৃদ্ধি পাবে। তিনি কত মহান শাসনকর্তা, যিনি চাওয়া ব্যতীত আমাদের এ সুস্বাস্থ্য দান করেছেন। আমার বন্ধুগণ! যদি আল্লাহ আমাদের দৃষ্টিশক্তি না দিতেন, তাহলে আমরা অন্ধ থাকতাম। বাকশক্তি না দিলে আমরা বোবা হতাম। কান (শ্রবণশক্তি) না দিলে আমরা বধির হতাম। সুস্থতা না দিলে আমরা ব্যাধিগ্রস্ত থাকতাম। পোশাক না দিলে আমরা উলঙ্গ থাকতাম। উপার্জন না দিলে আমরা ক্ষুধাতুর থাকতাম। পানি না দিলে আমরা তৃষ্ণার্ত থাকতাম। ধনসম্পদ না দিলে দৈন্য আমাদের ওপর আক্রমণ করত। বিবেক না দিলে আমরা পাগল থাকতাম। আল্লাহ সম্মান না দিলে আমরা লাঞ্ছিত হতাম। এই যে আমরা সম্মানের জীবন কাটাচ্ছি, এটি আমাদের প্রতি আল্লাহর মহা অনুগ্রহ। সুতরাং আমাদের উচিত, আমরা আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি চিন্তাশীল হব। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন–

أُولِي الْأَلْبَابِ

'এরা প্রকৃতি চিন্তাশীল মানুষ।'

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

'তারা আসমান জমিনের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করে।'[২৬]

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

'হে আমাদের প্রভু! আপনি এগুলো অনর্থক সৃষ্টি করেননি। আপনি মহা পবিত্র। আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দান করুন।'[২৭]

দ্বিতীয় কারণ

অন্তরে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত সৃষ্টি হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, মানুষ দৃঢ়তার সাথে নেক আমলে নিয়োজিত থাকবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু

---

২৬. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৯১

২৭. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৯১

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের প্রতি অটল থেকে তার ওপর আমল করবে। সময়ের সাথে-সাথে সুন্নতের ওপর আমল করার ফায়েদা হলো, আল্লাহ তার অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন।

মনে করুন যে, আমরা যে-সুন্নতই গ্রহণ করব, সেই সুন্নতের সাথে আল্লাহর ভালোবাসার একটি পরিমাণও সম্পৃক্ত রয়েছে। সে আমাদের হৃদয়ে উদ্ভাবিত হতে থাকবে। সুতরাং যদি আমরা মাথার চুল থেকে নিয়ে পায়ের নখ পর্যন্ত নিজেকে সুন্নতের দ্বারা সজ্জিত করি, তাহলে আমাদের হৃদয়জগৎ আল্লাহর ভালোবাসার তৃপ্তি লাভ করবে। সুতরাং খুঁজে-খুঁজে সুন্নতের ওপর আমল করা চাই। সুন্নতের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া চাই। যদি চিন্তা করেন, আমাদের জীবনের মধ্যে সুন্নত আছে কি? কমই পাবেন। বরং আমাদের ঘর, আমাদের বাজার, গলি, রাস্তা-ঘাট সবকিছু যেন সুন্নতকে জবাই করার কেন্দ্র হয়ে গেছে। এক টাকা দামের পেয়ালা ভেঙে ফেললে মা তার সন্তানকে শায়েস্তা করে। তার প্রতি আড়চোখে তাকায়। অথচ কোনো সন্তান যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে ভেঙে টুকরো-টুকরো করে দেয়, তবু মাতাপিতা তার প্রতি শাসনের চোখ রাঙা করে না। বরং তাদের প্রতি চোখ রাঙানো পছন্দও করে না।

সুন্নতের মূল্য আমরা এক টাকার পেয়ালার সমপরিমাণও মনে করি না। বিয়ে-শাদীতে সবাইকে ফুসলিয়ে সম্মত করা হয়। বন্ধুবান্ধবদের রাজি করে আমন্ত্রণ জানাও। আত্মীয়স্বজনকে দাওয়াত করো। কেউ অসম্মত থাকলে তার কাছে বারবার গিয়ে তাকে সম্মত করো। এমনকি ঘরের চাকর-চাকরানিও যদি রাগ করে, তবে তাকেও রাজি করানো হয়। বলা হয়, বিয়ের সময় কোনো প্রকার কথা শুনতে চাই না। হাসি-খুশিভাবে বিয়ের কাজ সমাধা করো; আপনাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় পরে দেখা হবে। এমতাবস্থায় কি কখনো এই চিন্তা করা হয় যে, আমাদের প্রভুকে রাজি করানো দরকার? আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘরের চাকরের সমতুল্যও মনে করা হয় না। কেউ এদিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। কিন্তু মাশাআল্লাহ বিয়ের অনুষ্ঠানে ইচ্ছেমতো যা খুশি করা হয়। এ কর্মে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল রাজি থাকেন বা না থাকেন। যদিও তাঁরা কষ্ট পান তবু সেদিকে খেয়াল করা হয় না। সুতরাং বন্ধুগণ! সুন্নতের গুরুত্ব দিয়ে নিজের বাহ্যিক অবস্থাকে সজ্জিত করো। এর ফলে আল্লাহ তোমার অন্তরকে তাঁর ভালোবাসায় পূর্ণ করে দেবেন।

তৃতীয় কারণ

আল্লাহ তা'আলার প্রতি মহব্বত সৃষ্টি হওয়ার তৃতীয় কারণ হচ্ছে অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করা। একটি কথা স্মরণ রাখবেন যে, আল্লাহ পবিত্র কুরআনে যত জায়গায় যিকিরের নির্দেশ দিয়েছেন, সাথে-সাথে অধিক পরিমাণে যিকির করার কথা বলেছেন। এক জায়গায় আল্লাহ বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۝

'আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো।'[২৮]

অন্যস্থানে বলেন–

وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا

'আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী পুরুষ ও মহিলা; তাদের জন্য আল্লাহ রেখেছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।'[২৯]

অনত্র বলেছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا

'হে মুমিনগণ! যখন তোমরা শত্রুর মুখোমুখি হও, তখন অটল থাকো এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো।'[৩০]

ভেবে দেখুন, প্রত্যেক স্থানে অধিক পরিমাণে যিকিরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে প্রতিভাত হয়, মানুষের হৃদয় জগতের পরিবর্তনের জন্য অধিক পরিমাণে যিকির করা জরুরি। কোনো-কোনো সময় যখন কতিপয় বস্তুর পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়, তখন সেটা মেনে চলাও জরুরি হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, আপনার জ্বর হলো। ডাক্তারের নিকট গেলেন। ডাক্তার সাহেব আপনাকে পনেরোটি এন্টিবায়েটি ট্যাবলেট দিয়ে বললেন, সকালে ১টা, দুপুরে ১টা, রাতে ১টা। দৈনিক মোট তিনটা ট্যাবলেট খাবেন। এভাবে পাঁচ দিনে পনেরোটা ট্যাবলেট খেলে জ্বর সেরে যাবে। এবার আপনি বাড়িতে এসে দৈনিক একটি করে ট্যাবলেট খেতে শুরু করলেন। এভাবে পনেরো দিনে পনেরোটি খেলেন; কিন্তু আপনার জ্বর কমেনি। তখন ডাক্তার সাহেব বলবেন, আপনি ওষুধ সেবন করেছেন ঠিকই; কিন্তু নিয়ম মেনে সেবন

---

২৮. সূরা আহযাব : আয়াত ৪১
২৯. সূরা আহযাব : আয়াত ৩৫
৩০. সূরা আনফাল : আয়াত ৪৫

করেননি; তাই আপনার জ্বর কমেনি। সুতরাং এতে আমাদের বুঝতে হবে, যিকিরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাথে-সাথে অধিক পরিমাণে যিকির করতে বলা হয়েছে। অতএব, যিকিরের মাধ্যমে ফায়েদা পেতে হলে সেই নিয়ম মেনে অধিক পরিমাণে যিকির করতে হবে।

বর্তমানে আমরা কী করি? যিকির করি; কিন্তু অধিক পরিমাণে করি না। তরিকতপন্থী লোকদের ভক্তদের জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কত সময় মুরাকাবা করেন? পাঁচ মিনিট। যে অন্তর সারা বছর বিভিন্ন প্ররোচনায় পড়ে বিগড়ে গেছে, তাকে পাঁচ মিনিটে সংশোধন করতে চাও? মিনিটের মুরাকাবা করছ। যদি কেউ মজনুকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি লায়লাকে কত সময় স্মরণ কর, তখন যদি আগে বেড়ে জবাব দেয়, পাঁচ মিনিট, তাহলে মনে হয় আপনারা হাসবেন না। সে কেমন মজনু, যে লায়লাকে স্মরণ করার জন্য সারাদিনে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় বের করতে পারে। বর্তমানে আমরা আল্লাহর এমন আশেক যে, সারাদিন মাত্র পাঁচ মিনিট আল্লাহকে স্মরণের জন্য নির্ধারিত করি। তা-ও আবার সর্বদা নয়– ফাঁকে-ফাঁকে। অযীফা আদায় করার টাইম পাওয়া যায় না। অথচ এসে বলে, হুজুর! আমার দ্বারা তো আমল আদায় হচ্ছে না; সুতরাং আপনি আমার প্রতি একটু মানসিক টান ফেলুন। তবে আমার কার্যসিদ্ধি হয়ে যাবে। এর মানে হচ্ছে, আমার থেকে যা হওয়ার কথা ছিল, তা তো হচ্ছে না; সুতরাং আপনিই করে দিন। তাই বলছিলাম, ভাই! এই অধিক যিকির না করার কারণে তার অন্তরে আল্লাহর মহব্বত সৃষ্টি হয়নি। সুতরাং আল্লাহর প্রতি মহব্বত সৃষ্টি হওয়ার তিনটি কারণ বললাম। (১) যথা আল্লাহর অবদানের প্রতি চিন্তাশীল হওয়া (২) সুন্নত আমলের ওপর অটল থাকা (৩) অধিক পরিমাণে আল্লাহ তা'আলার যিকির করা।

চতুর্থ কারণ

চুতর্থ কারণ হচ্ছে, যা উল্লিখিত সবকিছুর নির্যাস। তা হলো আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্য গ্রহণ করা। আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্যে তুমি থাকবে, অটোমেটিক তোমার হৃদয়ে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আপনারা দেখে থাকবেন, মানুষ কম্পিউটারের ব্যবসা করে। অন্য কেউ কিছুদিন তার সঙ্গে চলাফেরা করে, তার দোকানে বসে বলা শুরু করে, আমি কম্পিউটারের বিজনেস করি। তার অন্তরের এই অনুরাগ কীভাবে এল? কয়েকদিন তার সাথে চলাফেরা ও ওঠাবসা করার কারণে। ঠিক তেমনিভাবে

আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্য গ্রহণ করলে মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর মহব্বত সৃষ্টি হয়ে যায়। তাদের একেকটি মাহফিল মানুষের জন্য তার জীবনের গতি পরিবর্তন করে দেয়।

মহব্বতের প্রভাব

কয়েক মুহূর্তের সান্নিধ্য কখনো মানুষের জীবনের বিপ্লব ঘটিয়ে দেয়। একে মাওলানা রুমি (রহ.) বলেন, তোমার এ অন্তরটা আল্লাহ পাকের হাতে সোপর্দ করে দাও। তারপর দেখো, আল্লাহর ভালোবাসার কেমন স্বাদ তোমার ভাগ্যে জোটে। যখন আমাদের হৃদয়ে আল্লাহর ভালোবাসা ঘর বাঁধবে, তখন আমাদের মধ্যে সঠিক মানবতা সৃষ্টি হবে। তারপর আমাদের হৃদয় সবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হবে। পর-আপন সকলের জন্য সমবেদনা প্রকাশ করবে। সুতরাং এই মহব্বত অন্তরে পরিপূর্ণ করা চাই। এরপর দেখবেন, মানুষের কথায় প্রভাব, দৃষ্টিতে প্রভাব, আমলে প্রভাব।

মোদ্দাকথা, প্রত্যেক জিনিসে তার প্রভাব পরিলক্ষিত হবে। কারণ, তার অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা ছেয়ে আছে। মিয়াজি ওমর (রহ.) নামে ইন্ডিয়ায় এক বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, তিনি মাঝে-মাঝে টাঙা গাড়ি দিয়ে সফর করলে ওই গাড়িতে তাঁর সঙ্গে কোনো হিন্দু বসা থাকলে গাড়ি থেকে নামার পূর্বে সে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যেত। এই সামান্য সময়ের সান্নিধ্যে আল্লাহ এমন নূর প্রকাশ করে দিতেন যে, তার অন্তরের অবস্থার বিপ্লব হয়ে যেত।

আমাদের এলাকায় হযরত খাজা গোলাম সাওয়াক (রহ.) নামে এক বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর সম্পর্কেও এমন ঘটনা বর্ণিত আছে যে, হিন্দু সম্প্রদায় তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি আদালতে মামলা দায়ের করল। অভিযোগ হলো, তিনি আমাদের তরুণদের জোরপূর্বপ মুসলমান বানিয়ে নিচ্ছেন। শায়খকে আদালাতে তলব করা হলো। তিনি উপস্থিত হয়ে জজ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে আদালতে তলব করা হয়েছে কেন? জজ সাহেব বললেন, আপনার বিরুদ্ধে এই মর্মে মামলা দায়ের করা হয়েছে যে, আপনি জোরপূর্বক হিন্দু তরুণদের মুসলমান বানিয়ে নিচ্ছেন। একথা শুনে শায়খ উপস্থিত একজন হিন্দু লোকের প্রতি আঙুল দিয়ে ইশারা করে বললেন, বলুন, আপনাকে মুসলামন হওয়ার জন্য কি আমি বলপ্রয়োগ করেছি। তাঁর আঙুলের ইশারায় এমন প্রভাব ছিল যে, যার প্রতি তিনি ইশারা করেছিলেন, সঙ্গে-সঙ্গে সে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। তারপর আরেকজনের প্রতি এভাবে

ইশারা করে বললেন, আপনাকে মুসলমান হওয়ার জন্য কি আমি জোর চালিয়েছি? সঙ্গে-সঙ্গে সেও মুসলমান হয়ে গেল। আদালতে উপস্থিত বিরাট বড় জামাত সাক্ষী যে, ওই সময় তিনি প্রায় তিন চারজন লোকের প্রতি ইশারা করেছেন আর সাথে-সাথে তারা মুসলমান হয়ে গেছে। এই অবস্থা দেখে জজ সাহেব পাশের প্রকোষ্ঠে চলে যান, কি জানি আমার প্রতিও ইশারা পড়ে যায়! পাশের কক্ষ থেকে বললেন, এ-বিষয়টি আমি স্বচক্ষে দেখেছি। মাওলানা সাহেব নির্দোষ। আদালত তাকে বেকসুর খালাছ দিচ্ছে।

অতএব, এভাবে দৃষ্টিতে প্রভাব, কথায় প্রভাব কীসের মাধ্যমে এল? আল্লাহর মহব্বত অন্তরে বিদ্যমান আছে বলে। পক্ষান্তরে যখন আল্লাহর ভালোবাসা থেকে অন্তর শূন্য হবে, তখন মানুষের কথা হবে এক রকম এবং কাজ হবে অন্য রকম।

কথা ও কাজের বৈপরীত্ব

বর্তমানে আমাদের অবস্থা এমন হয়েছে যে, আপনারা একটু চিন্তা করে দেখবেন, আমরা মুখে বলি, এই পৃথিবী নশ্বর; এর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। অথচ কাজে-কর্মে সবাই চব্বিশ ঘণ্টা এই দুনিয়াকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। মুখে বলে, এ পৃথিবীর কোনো মূল্য নেই, অথচ বাস্তবে দেখাবে উল্টোটা। কতিপয় লোক নামায পড়ায় সুযোগ পাচ্ছে না। দোকানে কাষ্টমারের ভিড় ছিল; নামায পড়তে পারিনি। জাগ্রত অবস্থায় সর্বক্ষণ দুনিয়ার ফিকির। রাতে শুতে গেলে শুধু দুনিয়ার ভাবনা। আর মুখে বলে, আরে এ দুনিয়ার তো কোনো গ্রহণযোগ্যতা-ই নেই। বাস্তবে এর বিপরীত করছে। মুখে বলে, এ পৃথিবী নশ্বর। অথচ বাস্তবে এমন দেখায় যে, আমি এমন ভবন নির্মার্ণ করব। এমন Plan করব। যেন তার দুনিয়া থেকে যেতেই হবে না। সে চিরঞ্জীব হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেন–

وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾

'স্থাপনা নির্মাণ করছ যেন তোমরা চির্কাল এখানেই থাকবে।'[৩১]

মুখে বলি, পরকাল উত্তম; কিন্তু বাস্তবে দুনিয়ার পিছে বেশি সময় ব্যয় করি আর পরকালের প্রস্তুতির জন্য অল্প সময় বের করি। কেউ-কেউ তো তা-

---

৩১. সূরা শু'আরা : আয়াত ১২৯

ও পারে না। মুখে বলি, আমরা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, প্রত্যেক মানুষের মুখে আল্লাহর প্রতি অভিযোগ। কোনো-না-কোনোভাবে আল্লাহর প্রতি অভিযোগ প্রকাশ পেয়েই থাকে। কেউ বলে, আমার ছেলে হয় না, কেউ বলে আমার দু'আ কবুল হয় না। কেউ বলে, আমার অমুক কাজটি সিদ্ধি হচ্ছে না। যার সামনে যে-অবস্থা প্রকাশ পায়, সেটাই বলতে থাকে। এরা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তা'আলার প্রতি অভিযোগ ব্যক্ত করছে।

এজন্য কোনো এক বুযুর্গ বলেন, আল্লাহ আমার অন্তরে এলহাম করেছেন, হে আমার প্রিয় বান্দা! মানুষদের বলে দাও, যখন তোমরা অভাব-অনটনে নিপতিত হও, তখন তোমাদের বন্ধুদের নিকট গিয়ে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে থাক। অথচ তোমাদের আমলনামা গুনাহে পরিপূর্ণ করে আমার নিকট আসে। কিন্তু আমি কোনোদিন ফেরেশতাদের নিকট বসে তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিনি। মুখে প্রকাশ করে, আমরা আল্লাহ তা'আলার বান্দা; অথচ বাস্তবে দেখা যায়, নির্বিঘ্ন শত্রুর ন্যায়। যেহেতু অন্তর তৈরি হয়নি, তাই কথা ও কাজের মধ্যে বৈপরীত্ব প্রকাশ পায়। মুখে বলে, আমরা আশেকে রাসূল; অথচ বাস্তবে দেখা যায়, তারা রাসূলের সুন্নত থেকে বঞ্চিত।

কথা ও কাজের এই বৈপরীত্ব কেন? কারণ, তার অন্তর শোধিত হয়নি। সেই অন্তরে মেহনত করো; তাহলে আল্লাহর এমন মহব্বত আমাদের অন্তরে আসবে যে, সত্যিকারের সভ্যতা আমাদের হৃদয়ে জাগ্রত করে দেবেন। সত্যিকার সহমর্মিতা আমাদের হৃদয়ে উদয় হবে। আমাদের মধ্যে নববী চরিত্রের প্রতিকৃতি প্রকাশ পাবে। আমাদের জীবন অন্যের হিতৈষী হয়ে যাবে। আমরা যেখানে যাব, আল্লাহর বান্দাদের জন্য আত্মার প্রশান্তি হয়ে যাব। মানুষের জন্য মহা বিপদ হয়ে আত্মপ্রকাশ করব না। আপনারা ভেবে দেখুন, বর্তমানে কত মানুষ তার পরিবারের জন্য বিপদ, সন্তানদের জন্য বিপদ হয়ে আছে। যে বস্তিতে বাস করছে, সেই বস্তির জন্য বিপদ হয়ে আছে। যে শহরে থাকবে, সেই শহরের অধিবাসীদের জন্য মসিবত হয়ে আছে। এসব কেন হচ্ছে? কারণ, তার অন্তর গঠিত হয়নি। আমাদের জীবনের সমস্ত অস্থিরতা দূরীভূত হওয়ার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে আমার অন্তর শোধিত হওয়া।

কোনো কবি বলেন–

دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دو بارہ
کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ

'জাতির প্রাচীনতম ব্যাধির একটিমাত্র চিকিৎসা। আর তা হলো তোমরা নিজেদের মৃত অন্তরকে জীবিত করো।'

আল্লাহ আমাদের মৃত অন্তরকে জীবিত করুন এবং আমাদের হৃদয়জগতকে পরিবর্তন করে দিন। আমার বন্ধুগণ! যখন অন্তরের পরিবর্তন ঘটে, তখন মানুষ আল্লাহর ভালোবাসায় সবকিছু উৎসর্গ করে দেয় এবং সমস্ত অনুগ্রহ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে বলে মেনে নেয়। আল্লাহু আকবার! তারপর আল্লাহর জন্য আত্মত্যাগ করা সহজ হয়ে যায়।

হযরত আবদুল্লাহ (রাযি.)-এর শাহাদাতের মুহূর্ত

হযরত আবদুল্লাহ (রাযি.) ইয়ারমুকের যুদ্ধে আহত হয়ে পড়ে আছেন। প্রচণ্ড গরম। আসরের সময় হয়ে গেল, দেহ থেকে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার দরুন অনেক দুর্বল হয়ে গেছে। ওষ্ঠ শুকিয়ে গেছে। তাঁর এক বন্ধু ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করলেন, বন্ধুকে একটু পানি পান করাব। পানি নিয়ে উপস্থিত হলেন। এমন সময় হযরত আবদুল্লাহ (রাযি.) ঠোঁট বন্ধ করে নিলেন। বন্ধু বলছেন, দোস্ত! তোমার প্রচুর পিপাসা লেগেছে। রক্ত ঝরার কারণে দুর্বল হয়ে গেছেন। একটু পানি পান করে নিন। হযরত আবদুল্লাহ (রাযি.) বললেন, বন্ধু! আমি রোযাদার। এ মুহূর্তে আমি পানি পান করব না। আমি চাচ্ছি, রোযা অবস্থায় শাহাদত বরণ করি। তারপর আমার প্রাণ প্রিয় মাহবুবের হাতের স্নিগ্ধ মধুময় শরবত পান করে আমার রোযার ইফতার করব। আমি এই পানি দ্বারা আমার রোযার ইফতার করতে চাই না। আমি রোযা অবস্থায় আমার মালিকের দিদার চাই।

সুবহান্নাল্লাহ! এমন অবস্থা তখনই হয়, যখন অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা ভরপুর হয়। তাই অন্তর পরিবর্তন করার চেষ্টা করুন। দেখবেন, আমাদের অবস্থায় পরিবর্তন আসবে। ঘরের অবস্থায় পরিবর্তন আসবে। সমাজের পরিবর্তন হবে। সভ্যতার পরিবর্তন হবে। দেশের অবস্থায় পরিবর্তন হবে। যদি মানুষের অন্তরের অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যায়, তবে সবকিছুর পরিবর্তন হয়ে যাবে। কাজেই স্মরণ রাখবেন, অন্তর পরিবর্তন হলে মানুষের অবস্থার পরিবর্তন হবে। জীবনের পরিবর্তন হবে। জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পরিবর্তন

হবে। শত্রুতা-মিত্রতার মাপকাঠির পরিবর্তন হবে। উপার্জন ও ব্যবসার অবস্থা বদলে যাবে। চরিত্রের রূপরেখা পাল্টে যাবে। আধুনিক কৃষ্টি-কালচার সোনালি সভ্যতার রূপ নেবে। ইতিহাসের পরিবর্তন হবে। দিন-রাতের অবস্থা অন্যরকম হয়ে যাবে। সহপাঠীদের আচরণ মনোমুগ্ধকর হবে। পরিমাপ পাল্টে যাবে। এমনকি আমিত্বের বিলাসবহুল নীড় নির্মূল হয়ে যাবে।

আসুন, আমরা নিজেদের হৃদয়ের পরিবর্তন করি, যাতে অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা আসন গ্রহণ করে এবং সোনালি জীবন গড়ার সৌভাগ্য অর্জন করি। বর্তমানে সারা বিশ্বে অশান্তি বিরাজ করছে। সেই অশান্তি নিরসনের ব্যবস্থা মানবতার অনুকূলে চলে আসবে। আল্লাহ তাঁর নিজ অনুগ্রহে আমাদের সকলের হৃদয়জগৎ পরিবর্তন করে দিন এবং তাঁর ভালোবাসা দ্বারা আমাদের ধন্য করুন এবং তাঁর হাকীকতের মাধ্যমে আমাদের প্রশান্তি দান করুন। আমাদের সকলকে পুণ্যবান ও ধর্মানুরাগী হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

فکر دنیا کرکے دیکھی فکر عقبیٰ کرکے دیکھ
چھوڑ کر اب فکر سارا فکر مولا کرکے دیکھ
کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے بنا
سب کو اپنا کرکے دیکھا رب کو اپنا کرکے دیکھ

ইহকালের ভাবনা ভেবে দেখেছ। পরকালের ভাবনা ভেবে দেখো। সকল চিন্তা পরিহার করে মাওলার চিন্তায় মগ্ন হয়ে নিরীক্ষণ করো, কে কার উপকারে আসছে। কে কার জন্য আপন হয়েছে। সবাইকে আপন করে দেখেছ। এবার মাওলাকে আপন করে দেখে নাও। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন।

মায়ের ভালোবাসা

'যুবক-যুবতিদের জন্য উচিত, নিজের মাতাপিতার মান-মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি রাখবে। যুবতিরা মায়ের সঙ্গে অভিমান করে বসে। সাধারণ কথার জের ধরে কয়েকদিন যাবৎ মায়ের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। কলেজে পড়ুয়া ছাত্রীরা সকালে ঘুম থেকে উঠে ধোওয়া-গোসলের কাজে তাদের সময় শেষ হয়ে যায়। তাদের মায়েরা চাকরানির মতো নাস্তা তৈরি করতে থাকে। নাস্তা তৈরি করতে দু-মিনিট বিলম্ব হলে বেটি মুখ ফুলিয়ে খাবার না খেয়েই কলেজে চলে যায়। এদিকে মা বেচারী সারাদিন আক্ষেপ করতে থাকে, হায়! যদি দুটা মিনিট আগে আমি নাস্তা তৈরি করে দিতে পারতাম! অতএব, বর্তমান যুগের যুবসম্প্রদায়কে একথা বোঝানো প্রয়োজন যে, মাতাপিতার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করে তাদের থেকে দু'আ নেয়ার চেষ্টা করো। তা হলে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের সম্মান দান করবেন।'

মায়ের ভালোবাসা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

গুপ্ত ধনভান্ডার

এসব হাদীস নয় ১/৭৩

হাদীছে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ বলেন–

كُنْتُ كَنْزًا مُخْفِيًّا فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ

'আমি গুপ্ত ধনভান্ডার ছিলাম, ফলে আমি এ-বিষয়টি পছন্দ করলাম যে, আমাকে চেনা হোক। সুতরাং আমি সৃষ্টজীব সৃষ্টি করলাম।'

এতে বোঝা যায়, মানবসৃষ্টির মূল হেতুই হচ্ছে ভালোবাসা। আমার পছন্দ হয়েছে। আমার ভালো লেগেছে। এটা মানবসৃষ্টির কারণ হয়েছে। সৃষ্টিকুলে যা কিছু রয়েছে, সবাই সেই ভালোবাসার ভাগ পেয়েছে। মানব, দানব, পশু, পাখি সবাই নিজ-নিজ অবস্থা অনুযায়ী অংশ পেয়েছে। সুতরাং বর্তমান বিশ্বে যে-পরিমাণ ভালোবাসা দেখতে পাচ্ছেন, সবকিছু ওই ভালোবাসার অংশ, যা মহান রাব্বুল আলামীন সৃষ্টিজীবকে প্রদান করেছিলেন।

শরীয়তের পরিধি

শরীয়ত কিছু ভালোবাসাকে প্রতিদানের উপকরণ বলেছে। যেমন– মাতাপিতার ভালোবাসা, স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা, দুই ভাইয়ের মধ্যে ভালোবাসা, দুজন মুসলমানের পারস্পরিক ভালোবাসা। এগুলো ওই ভালোবাসারই প্রতিদান। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এগুলো বৈধ ভালোবাসা। পক্ষান্তরে যদি মানসিক শয়তানি ও কুপ্রবৃত্তির পরবশ হয়ে ভালোবাসা করা হয়, তাহলে সেটা নাজায়েয। এর দৃষ্টান্ত এমন মনে করুন,

যেমন গাভি ও মহিষের দুধ হালাল আর কুকুরের দুধ নাপাক ও হারাম। অথচ উভয়টিই দুধ। সুতরাং শরীয়তের গণ্ডির ভেতরে থেকে যত প্রকার ভালোবাসা হতে পারে, সেগুলোর মধ্যে মায়ের ভালোবাসা হচ্ছে সবার ঊর্ধ্বে।

প্রকৃতিগত ভালোবাসা

আপনারা দেখে থাকবেন, ছোট্ট একটি চড়ুই পাখি। বাসায় তার বাচ্ছা আছে। তখন সেই বাচ্চাকে পানি পান করানোর জন্য সে অস্থির হয়ে যায়। কোনো কারণে রুমের দরজা বন্ধ থাকলে ভেতরে সে ওড়াউড়ি করতে থাকে। তার এই তুচ্ছ্য একটি প্রাণে শান্তি পাচ্ছে না। ঠোঁটে করে পানি নিয়ে এসে বাচ্চাকে পান করাবে। ফিরে আসার সময় যদি পুনরায় দ্বার বন্ধ থাকে, তাহলে বাইরে ওড়াউড়ি করতে থাকবে। এতে ক্লান্ত হবে। কিচিরমিচির শুরু করবে। গায়ে ঘাম বেরিয়ে আসবে। কিন্তু নিজের মুখে পানি থাকা সত্ত্বেও পান করবে না। অপেক্ষার প্রহর গুনবে। বাসায় এসে নিজের বাচ্চাদের পানি পান করিয়েই তবে শান্ত হবে।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

এক সাহাবি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে যাচ্ছেন। পথে একটি গাছে পাখির নীড় দেখতে পেলেন। সেখানে খুব সুন্দর-সুন্দর পাখির বাচ্চা রয়েছে। এদের মা দানা সংগ্রহ করার জন্য কোথাও চলে গেছে। সাহাবি পাখির বাচ্চাকে ধরে ফেললেন। বাচ্চাগুলো নিয়ে চলে যাচ্ছেন। এতক্ষণে বাচ্চাগুলোর মা বাসায় ফিরে বাচ্চাকে বাসায় না পেয়ে অস্থির হয়ে যায়, চতুর্দিকে সন্ধান করতে থাকে। সামান্য প্রচেষ্টার পরই ওই সাহাবির নিকট এসে যায়। সে বুঝতে পারে, ইনি আমার বাচ্চাকে ধরে নিয়ে এসেছেন। পাখিটি সাহাবির মাথার ওপর উড়ে-উড়ে কিচকিচ করতে থাকে। কিন্তু সাহাবি তার কারণ অনুধাবন করতে পারেননি। কিছুক্ষণ পর পাখিটি সাহাবির কাঁধে বসে যায়। সাহাবি তাকেও ধরে ফেললেন।

সাহাবায়ে কেরামের অভ্যাস ছিল, নতুন কিছু ঘটে গেলে সেটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রকাশ করতেন। সুতরাং এ ঘটনাটিও তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বর্ণনা করলেন। দয়ার আধার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, শোনো, এটা হচ্ছে ওই বাচ্চাগুলোর মা। বাচ্চার প্রতি তার গভীর ভালোবাসা। যখন তুমি তার বাচ্চাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছ, তখন সে তোমার

মাথার ওপর ঘুরে-ঘুরে তোমাকে অনুরোধ জানাচ্ছে, দেখুন, আমার প্রতি দয়া করুন। বাচ্চাদের বিহনে আমার জীবন বিষণ্ন। এদের ছাড়া আমার জীবন দুর্বিষহ। দয়া করে আমার বাচ্চাদের ছেড়ে দিন। আমাদের দু'আ নিন। কিন্তু যখন তুমি তার ভাষা বুঝতে পারনি, বাচ্চাদের নিয়ে চলেই যাচ্ছ, তখন সে ভাবছে, পথিক আমার বাচ্চাদের নিয়েই যাচ্ছে। তাহলে আমার বেঁচে থেকে লাভ কী, একদিন তো মরতেই হবে। এদের ছাড়া তো আমি বেঁচে থেকেও শান্তি পাব না। এর চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো। আর মরতে হলে বাচ্চাদের সঙ্গেই মরি। তাই তোমার কাঁধে বসে স্বেচ্ছায় প্রাণ বির্সজন দেয়ার জন্য তোমার হাতে ধরা দিয়েছে। যাও; পাখিগুলোকে তাদের নীড়ে পৌঁছিয়ে দাও।

মায়ের ভালোবাসা

আপনারা দেখে থাকবেন, মুরগি অনেক বাচ্চা দেয়। সেগুলোকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ একটা বিড়াল এসে উপস্থিত। মুরগি ভালো করেই জানে, আমি বিড়ালের মোকাবেলা করতে পারব না। সে আমাকে জানে মেরে ফেলবে। কিন্তু সে তার বাচ্চাদের অনেক ভালোবাসে। সে চায় না, আমি বেঁচে থাকতে বিড়াল আমার বাচ্চাদের ওপর আক্রমণ করুক। তাই সে পাখা প্রসারিত করে বিড়ালের সম্মুখে দাঁড়িয়ে যায়। বিড়ালের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত। এর উদ্দেশ্য কী? তার মাতৃত্বের ভালোবাসা সহ্য করতে পারে না যে, আমার বাচ্চাদের ওপর আক্রমণ হোক। সে বলে, প্রথমে আমাকে প্রাণে হত্যা করো। তারপর আমার বাচ্চাদের ওপর আক্রমণ করো। বন্ধুগণ! সাধারণ একটি মুরগি; দুর্বল সৃষ্টি। তার মধ্যে যদি মাতৃত্বের এমন ভালোবাসা থাকতে পারে, তাহলে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি মানুষের মধ্যে মাতৃত্বের ভালোবাসা কেমন হতে পারে?

বিগত শতাব্দীর বিস্মরকর ঘটনা

একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে। বিগত শতাব্দীতে চীন দেশে একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিল। এতে লাখো মানুষের প্রাণহানি ঘটে। অনেক বড় একটি ভবন ছিল Multy Story। এর ধ্বংসস্তূপ সরাতে অনেক দিন লেগেছে। বেশ কয়েকদিন পর দেখা গেল, এর নিচে বিরাট একটি প্রস্তরখণ্ড পড়ে আছে। এর আড়ালে একজন মহিলা অজ্ঞান অবস্থায় শুয়ে আছে। তার পাশে একটি শিশুও রয়েছে। তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। চিকিৎসা করা

হলো। মহিলার জ্ঞান ফিরে এলে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করল, তোমার সারা শরীর অক্ষত, কিন্তু শুধু আঙুলগুলোর মাথায় আঘাত কেন? মহিলা বলছে, যখন ভবনটি ধসে যায় আর আমি এই বিরাট দেওয়ালের আড়ালে নিরাপদে থাকি, তখন ভাবলাম, যেহেতু চাপা পড়ে আমার মৃত্যু হয়নি, তাহলে আমার হায়াত থাকলে কোনো একদিন আমাকে কেউ বের করবে। তাই নিজের বাচ্চাকে নিয়ে সেখানে থাকতে লাগলাম। বাচ্চাকে বুকের সাথে আগলে রেখে দুধ পান করাচ্ছি। অনাহারে থাকতে-থাকতে এক সময় আমার বুকের দুধ শেষ হয়ে যায়। এবার বাচ্চা কান্না করছে। তাকে মায়াবী বাণী দিয়ে ঘুম পাড়াই। কিন্তু এভাবে আর কদিন রাখা যায়! সে কাঁদে আর আমি তার মুখে আঙুল দেই। আমার জিহ্বা দেই। কিন্তু তা থেকে তো আর কিছু বের হচ্ছে না। তাই সে কাঁদছে। এক সময় আমার ধারণা হলো, আমার বুকে যদিও দুধ নেই। তবে আমার গায়ে রক্ত তো আছে তো। সুতরাং সেই রক্ত দিয়ে আমার সন্তানকে সান্ত্বনা দেব। তাই দাঁত দ্বারা আমার আঙুলের মাথা কেটে বাচ্চার মুখে দেই। এবার সে এই আঙুল চুষণ করতে থাকে। তারপর আরেক আঙুল কাটি। এভাবে আমার সন্তান আমার দেহের রক্ত খেতে থাকে। ফলে রক্তের পরিমাণ হ্রাস পাওয়াতে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই এবং আমার সন্তানও অজ্ঞান হয়ে যায়। অবশেষে কোনো হৃদয়বান লোক আমাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে আপনাদের নিকট নিয়ে আসে। আপনারা চিকিৎসা করে আমাকে সুস্থ করেছেন। আমি আপনাদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। তার কথা শুনে মানুষ অবাক! একজন মা তার সন্তানকে এতই ভালোবাসে যে, নিজের দেহের রক্ত পান করিয়ে তাকে জীবিত রাখতে চায়! সুবহানাল্লাহ! এ হচ্ছে মায়ের ভালোবাসা।

মায়ের ভালোবাসার দাবি

হযরত সুলাইমান (আ.)-এর নিকট দুজন মহিলার বিবাদ পেশ করা হলো। বিষয়টি হলো, তারা দুজন কোনো অরণ্য দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের উভয়ের কোলে তাদের সন্তান ছিল। এমন সময় একটি বাঘ এসে তাদের একজনের সন্তান ছিনিয়ে নিল। এবার যে মহিলার সন্তান বাঘে নিয়ে গেল সে বলল, সেটা আমার সন্তান নয়, আমার সন্তান এটা। বাঘ তোমার সন্তানকে নিয়ে গেছে। সুলাইমান (আ.)-এর নিকট উভয়ে দাবি উপস্থাপন করার পর তিনি বললেন, ঠিক আছে; আমি তোমাদের ফয়সালা করছি।

তিনি একটা ছুরি আনতে নির্দেশ দিলেন। ছুরি আনা হলো। এবার সুলাইমান (আ.) বললেন, শিশু একটি, দাবিদার তোমরা দুজন। কারও পক্ষে

উপযুক্ত প্রমাণ নেই। সুতরাং উত্তম ফয়সালা হবে, আমি শিশুটিকে দুই টুকরা করে তোমাদের প্রত্যেককে অর্ধেক-অর্ধেক করে দিয়ে দেব। এক মহিলা রাজি হয়ে গেল। অপর মহিলা বলল, হে আল্লাহর নবী! শিশুটি দুই টুকরা করে হত্যা করার দরকার নেই। তাহলে আমি আমার সন্তানকে চিরতরে হারিয়ে ফেলব। এর চেয়ে বরং ভালো হবে, আপনি সন্তানটি তাকে দিয়ে দিন; তাহলে কমপক্ষে আমি আমার সন্তানকে দেখতে পারব। সোলাইমান (আ.) বুঝে গেলেন, ছেলেটি বাস্তবে এই মহিলার। তাই সে তাকে হত্যা করা সহ্য করতে পারছে না। এই মহিলাকে তার সন্তানটি দিয়ে দিলেন।

সুতরাং মায়ের এই ভালোবাসা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দয়ালু নামক গুণের নমুনা। পৃথিবীর যেখানেই মা থাকবে, সেখানেই তার সন্তানের প্রতি গভীর ভালোবাসা থাকবে।

মায়ের দু'আ

আল্লাহ মায়ের হৃদয়ে সন্তানের জন্য অপূর্ব ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এ কারণেই মায়ের দু'আকে বেহেশতের বাতাস বলা হয়। তা অতি দ্রুত কবুল হয়ে থাকে। স্মরণ রাখবেন, মা যখন তার সন্তানের জন্য দু'আ করে, তখন আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয় আর সেই দু'আ আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। সাথে-সাথে আল্লাহ তা'আলা সেই দু'আ কবুল করে নেন। এমনকি কিতাবের মধ্যে বলা হয়েছে, মা যদি গুনাহগারও হয়, তবু সন্তানের প্রতি তার এখলাছ ও ভালোবাসা থাকার কারণে ওই সন্তানের জন্য তার দু'আ কবুল হয়ে যায়।

মায়ের সম্মান

একব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল, হুজুর! গুনাহ করে ফেলেছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাও। বলল, হুজুর! অনেক বড় গুনাহ (কবিরা)! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মা জীবিত আছেন? বলল, জি; আছেন। নবীজি বললেন, যাও; তোমার মায়ের মাধ্যমে দু'আ করাও।

মায়ের দু'আর বদৌলতে আল্লাহ বান্দার কবিরা গুনাহ পর্যন্ত মাফ করে দেন। সুতরাং মায়ের সেবার মানুষ সম্মান পায়। দুনিয়া ও আখেরাতে চিরসুখী হয়। সুবহানাল্লাহ!

একটি দৃষ্টান্ত

একটি জোরালো উদাহরণ শুনুন। হযরত ওয়াইস করনি নামে একজন বুযুর্গ অতিবাহিত হয়েছেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ পেয়েছেন। তবে মায়ের সেবার কারণে বাধ্যবাধকতায় নবীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেননি। তাই তাকে তাবেয়ী বলা হয়। মায়ের সেবার জন্য অন্য কেউ ছিল না। তাই সর্বদা মায়ের সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। একদা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাতের জন্য মায়ের নিকট অনুমতি চান। মা তাকে অনুমতি দিলেন। তবে বললেন, বাবা! আমার সেবা করার মতো আর কেউ নেই। সুতরাং তাড়াতাড়ি চলে এসো। তিনি মদীনায় গেলেন। ঘটনাক্রমে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেসময় কোনো এক সফরে ছিলেন। তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ পাননি। মায়ের সেবার তাগাদায় চলে এলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আসার পর সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সাক্ষাতের জন্য একজন লোক এসেছিলেন। আপনি উপস্থিত নেই। লোকটি তার মায়ের সেবার তাগিদে বিলম্ব না করে চলে গেছে।

শুনে নবীজি অত্যন্ত খুশি হলেন। কিতাবে আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর ও হযরত আলীকে একটি জামা দিয়ে পাঠালেন যে, করন নামক লোকালয়ে ওয়াইস নামে আল্লাহর এক বন্ধু বাস করে। সে তার মায়ের সেবার ব্যস্ততায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেনি। তাকে আমার জামাটি হাদিয়া দিয়ে বলবে, সে যেন উম্মতের নাজাতের জন্য দু'আ করে। এসব হাদীস নয় ২/৫৫

দেখুন, মায়ের সেবার ফযিলত কত! শেষ পর্যন্ত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুব্বা উপহার পেলেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে উম্মতের জন্য দু'আর ফরমায়েশ পেলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মপদ্ধতি

একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবওয়া নামক স্থানে তাঁর মায়ের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে দু'আ করছেন। তাঁর নয়ন মোবারক থেকে অঝোর ধারায় অশ্রু বইতে থাকে। এক সাহাবি জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কঠিন মসিবতের সময়ও আপনাকে এভাবে কাঁদতে দেখিনি। আপনার চক্ষু থেকে এভাবে অশ্রু ঝরতে দেখিনি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বললেন, ভাই এটা মায়ের প্রতি ভালোবাসার কান্না। এখন আমার মায়ের কথা স্মরণ হয়েছে।

মায়ের ভাবনা

মহব্বতের দরুন সন্তানের জন্য মা অনেক কষ্ট সহ্য করেন। সন্তানের প্রতিপালনের জন্য মা তার নিজেকে কষ্ট দেন। কী আশ্চর্য কথা! সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মা নিজেকে ভুলে যান। সন্তান জন্ম নেওয়ার পূর্বে মা তার স্বামীর সঙ্গে কোথাও যেতে হলে নিজের জন্য অনেক কেনাকাটা করেন। আর সন্তান জন্ম নেওয়ার পর নিজেকে ভুলে যান। এবার বলেন, আমার সন্তানের জুতা এরকম চাই, তার ফিডার এমন চাই, তার পোশাক এমন চাই। মোটকথা, নিজের জন্য আর কোনো ফিকির থাকে না। তাঁর সকল ভাবনা সন্তানের জন্য। কেমন ভালোবাসা, প্রথমে সন্তানকে খাওয়ান, পরে নিজে আহার করেন। প্রথমে সন্তানকে পান করান, পরে নিজে পান করেন। প্রথমে সন্তানকে ঘুম পাড়ান, তারপর নিজে ঘুমান। সন্তানের প্রয়োজনে তিনি চব্বিশ ঘণ্টা হাজির। এটা কী? এটা সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা। সামান্য সময়ের জন্য মা থেকে সন্তানকে আলাদা করলে তিনি অধীর হয়ে যান। বলতে থাকেন, আমার সন্তান কোথায়? আমার সন্তান কোথায়? সন্তান তাঁর কোলে এলে তিনি মনে করেন, সারা দুনিয়ার খুশি আমার কোলে তুলে দেয়া হয়েছে। এজন্যই পৃথিবীতে যত বড়-বড় মনীষীগণ অতীত হয়েছেন, তাদের জীবনী পাঠ করলে দেখবেন, তাদের পেছনে তাদের মায়ের প্রতিপালন রয়েছে।

আদর্শ মায়ের অনন্য শিক্ষা

খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকি নামে এক বিখ্যাত বুযুর্গ ছিলেন। কাক হিন্দী শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে রুটি। তিনি এ ধরণীতে আগমন করার পর তার মাতাপিতা পরস্পরে পরামর্শ করলেন, আমাদের সন্তানকে ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত করব। তাহলে আমাদের সন্তান আল্লাহ তা'আলার প্রতি মহব্বতকারী হবে। মা বললেন, আমার অন্তরেও একই ধারণা। আমি এর ওপরই আমল করব। তাদের সন্তান মাদরাসায় যাওয়ার উপযুক্ত হলো। ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের জন্য মাদরাসায় আসা-যাওয়া করছেন। একদা মাদরাসা থেকে এসে বললেন, আম্মাজান! খুব ক্ষুধা লেগেছে। মা বললেন, বাবা! আল্লাহ আমাদেরও আহার দেন এবং তোমাকেও খাবার দেন। আমরা আল্লাহর

দরবারে খাবার চাই। সুতরং তুমিও আল্লাহ তা'আলার দরবারে আহার্য প্রার্থনা করো। বললেন, আম্মাজান! কীভাবে খাবার প্রার্থনা করব? মা বললেন, বাবা! নামাযের মুসল্লা বিছিয়ে তাতে বসে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করো।

সন্তান মুসল্লা বিছিয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করে বলল, আম্মাজান! এবার কী করব? এদিকে মা খাবার তৈরি করে খাবারের কক্ষে কোথাও লুকিয়ে রেখেছিলেন। বললেন, বাবা! এবার খাবারের কক্ষে গিয়ে খুঁজে দেখো, তোমার খাবার আছে কিনা। সন্তান অল্পক্ষণ সন্ধান করেই খাবার পেয়ে গেল। এতে সন্তান অত্যন্ত আনন্দিত হলো। ফলে এটা তার নিত্যদিনের আমল হয়ে গেল। প্রথমে মুসল্লা বিছিয়ে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে তারপর খাবার সন্ধান করেন এবং খাবার পেয়ে আনন্দ চিত্তে আহার করেন।

একদা মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আম্মাজান! আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টজীবকে আহার দান করেন? আম্মাজান বললেন, হ্যাঁ বাবা। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এবং সমস্ত প্রাণীকে আহার দান করেন। বলল, আম্মাজান আল্লাহ তা'আলা কত মহান! কত দয়াবান! এবার সে আল্লাহর প্রশংসা করতে লাগল। মা তাঁর সন্তানের মুখে আল্লাহর স্তুতি শুনে আনন্দে বাগবাগ হয়ে যান এবং ভাবেন, আমার সন্তানের হৃদয়ে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা বৃদ্ধি পাচ্ছে। একদা মা তাঁর কোনো আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গেলেন। এতে সন্তানের ওই সময়ের কথা স্মৃতিপটে নেই। স্মরণ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বোরকা নিয়ে বাড়িতে চলে এলেন। এতক্ষণে সন্তান মাদরাসা থেকে চলে এসেছে। তিনি অত্যন্ত অস্থির, দু'আ করতে লাগলেন, আমি তো সন্তানের মনে এই বিশ্বাস স্থাপন করেছিলাম যে, এভাবে আমল করলে আল্লাহ আহার দান করেন। আজ কী হবে? যদি সে তালাশ করে রুটি না পায়, তাহলে আল্লাহর প্রতি তার বিশ্বাস ভেঙে যাবে না তো? এই বলে তিনি কাঁদছেন আর আল্লাহর দরবারে দু'আ করছেন।

আল্লাহ সবার সম্মান রক্ষা করেন। দু'আ করতে-করতে যখন তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন দেখলেন, তার সন্তান সুখনিদ্রায় রয়েছে। মা খাবার পাকালেন, সন্তানের নিকট এসে তাকে জাগিয়ে গালে চুমু খেয়ে বললেন, বাবা! আজ তোমার প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছে তাই না? সে বলল, না মা, আমার কোনো ক্ষুধা লাগেনি। বললেন, কেন বাবা? বলল, আম্মাজান! আমি মাদরাসা থেকে এসে জায়নামায বিছিয়ে বসে গেলাম এবং আল্লাহর দরবারে

প্রার্থনা করলাম। মা! আমি প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম যে, প্রচণ্ড ক্ষুধা লেগেছে। আম্মাজানও বাড়িতে নেই, কী করব? বললাম, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে খাবার দিন। দু'আ শেষ করে আমি রুমে গেলাম, সেখানে আমি উত্তমরূপে পরিবেশিত একটি রুটি পেলাম এবং আনন্দ চিত্তে আহার করলাম। তবে আম্মাজান! আজকের রুটি অন্যদিনের রুটির চেয়ে অধিক স্বাদ হয়েছে। এমন স্বাদ আমি কোনোদিন পাইনি। এরপর থেকেই তাঁর নাম কুতুবুদ্দীন কাকি হয়ে যায়। তিনি অত্যন্ত বড় বুযুর্গ ছিলেন। সমকালের বাদশাহ তাঁর মুরীদ ছিলেন।

মায়ের তরবিয়তের ধরন

শৈশবে ইমাম বোখারি (রহ.)-এর দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর মায়ের দু'আর বরকতে আল্লাহ পুনরায় তাঁকে দৃষ্টিশক্তি দান করেন। ইমাম গাযযালি (রহ.)কে তাঁর মা শিক্ষা দান করেন। তারা দুই ভাই ছিলেন। আহমদ গাযযালি ও মুহাম্মদ গাযযালি। আহমদ গাযযালি বড় এবং মুহাম্মদ গাযযালি ছোট, যিনি ইমাম গাযযালি নামে পরিচিত। ছোট বেলায় তাঁদের পিতা ইহধাম ত্যাগ করেন। ফলে তাঁদের মা তাদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলেন। সেকালে মায়েরা সন্তানদের এমন শিক্ষা দিতেন যেমন পীর-মাশায়েখগণ শিষ্যদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। ইমাম গাযযালি (রহ.) শহরের কেন্দ্রীয় মসজিদের খতীব ছিলেন। একদা তিনি মাকে বললেন, আম্মাজান শহরের সকল মানুষ আমার পেছনে নামায পড়ে। আমাকে দেশের প্রধান মুফতী বলে আখ্যায়িত করে। কিন্তু আপনার ছেলে, আমার বড় ভাই আমার পেছনে নামায পড়েন না। এতে আমার লজ্জা হয়, লোকেরা আমাকে অনেক কিছু ভাবে।

তাঁর বড় ভাই আহমদ গাযযালি নামায পড়তেন। কিন্তু জামাতে ইমাম গাযযালির পেছনে নয়। একা পড়তেন। মা তাকে ডেকে বললেন, বাবা! তুমি তোমার ভাইয়ের পেছনে নামায পড়ছ না কেন? এতে লোকে মন্দ বলে। তোমার ভাইয়ের পেছনে নামায পড়ো। পরদিন আহমদ গাযযালি তাঁর ছোট ভাই ইমাম গাযযালির পেছনে নামায পড়ছেন। দুরাকাত পড়ে নামায ভেঙে কাতার থেকে চলে গেলেন। নামায শেষে লোকেরা বলাবলি শুরু করল, এ নামায, নাকি তামাশা! ইমাম সাহেবের বড় ভাই এমন করছেন কেন?

ইমাম গাযযালি (রহ.) হতভম্ব হয়ে গেলেন। মায়ের নিকট এসে অভিযোগ করলেন, আম্মাজান আপনার ছেলে আমাকে আজ আরও বেশি

অপমানিত করেছে। জনসমক্ষে তিনি আমাকে জবাই করে এসেছেন। মা তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা! তুমি এমন করছ কেন? হযরত আমহদ গাযযালি বললেন, আম্মাজান! আপনি বলেছেন, আমি তার পেছনে নামায পড়ার জন্য। সুতরাং আমি তার পেছনে নামায পড়ছি। যতক্ষণ সে নামায পড়ছিল, ততক্ষণ আমি তার পেছনে নামাযে ছিলাম। আর যখন যে নামায ছেড়ে চলে গেছে, তখন আমি নামায ভেঙে চলে আসি।

মা হতবাক! ইমাম গাযযালিও অবাক! ব্যাপারটা কী? কী হয়েছে খুলে বলো? তিনি অন্তরদৃষ্টিবান বুযুর্গ ছিলেন। কাশফের মাধ্যমে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, নামাযে ইমাম গাযযালির মনোযোগ নেই। সুতরাং প্রথম দু-রাকাতের পর ইমাম গাযযালির মনোযোগ নামায থেকে দূরীভূত হয়ে যাওয়ার কারণে তিনি নামায ভেঙে চলে আসেন। আম্মাজান ইমাম গাযযালিকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা সত্য কথা বলো তো নামাযে তোমার কী হয়েছিল? ইমাম গাযযালি (রহ.) বললেন, আম্মাজান! ভাইজান সত্যই বলেছেন। নামাযের আগে আমি পবিত্রতা সম্পর্কে একটি মাসয়ালা শিক্ষা দিয়েছিলাম। প্রথম দু-রাকাতের পর আমার মন সেই মাসয়ালার প্রতি অকৃষ্ট হয়ে যায়। আমি সেই মাসয়ালার গবেষণা করতে থাকি। তাদের কথা শুনে মা বললেন, তোমাদের কেউই আমার উপকারে এলে না। কেন মা? কী হয়েছে? বললেন, দেখো, একজন সামনে দাঁড়িয়ে মাসআলায় মগ্ন হয়ে যাচ্ছে আর অপরজন তার পেছনে হাত বেঁধে ভাইয়ের অন্তরে অনুসন্ধান চালাচ্ছে। তার মনোযোগও আল্লাহর প্রতি হয়নি।

এ ছিল আগেকার যুগের মায়ের শিক্ষা। সন্তানদের তারা এভাবেই শিক্ষা দিতেন।

বর্তমান যুগের মা

হযরত আবদুল কাদের জিলানি (রহ.)-এর শিক্ষা-দীক্ষা তাঁর মা দিয়েছিলেন। হযরত খাজা মইনুদ্দীন চিশতী (রহ.)-এর শিক্ষা-দীক্ষা তাঁর মা দিয়েছিলেন। আগেকার যুগে মায়েরাই সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা দিতেন। বর্তমানে এমন যুগ এসেছে যে, মেয়েরা তো মা হয়; কিন্তু মায়ের মর্যাদা তারা উপলব্ধি করতে পারে না। নিজেরা ধর্মীয় শিক্ষা থেকে দূরে থাকার দরুন তারা বুঝতেও পারে না যে, সন্তানদের কীভাবে শিক্ষা দিতে হবে। এজন্য কোথাও-কোথাও দেখা যায়, সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি মা নারাজ থাকেন। সন্তান তাবলীগে তিন চিল্লা দিয়ে মুখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের সুন্নত সাজাতে চেয়েছে। কিন্তু মা বলছে, বাবা! এটা তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করো। এখানে মা তার হক আদায় করেনি। পরে যখন সন্তান তার কথা মান্য করে না, তখন বলে সন্তান অবাধ্য হয়ে গেছে। অথচ বলা হয়েছে-

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

'আল্লাহ তা'আলার নাফরমানিতে কোনো সৃষ্টজীবের আনুগত্য নেই।'

যদি মাতাপিতা তার সন্তানকে শরীয়তের পরিপন্থী কোনো কাজের নির্দেশ দেন, তাহলে শরীয়তের বিধানকে অগ্রাধিকার দিয়ে মাতাপিতার আদেশের বিপরীত কাজ করাকে শরীয়ত অবাধ্যতা বলে না। সুতরাং মাতাপিতাকেও চাই তারা যেন শরীয়তের গণ্ডির ভেতরে থেকে সন্তানদের আদেশ করেন। সন্তানরা মাতাপিতার নির্দেশ মান্য করে তাদের সেবা করে তাদের থেকে দু'আ নেবে এরং তাদের অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকবে।

কবীরাহ গুনাহ

কখনো-কখানো যুবকরা সাধারণ বিষয়ে তাদের মাতাপিতার অবাধ্যতা করে, তাদের সঙ্গে অভিমান করে তাদের কষ্ট দেয়। এটা কবীরা গুনাহ। হাদীছ শরীফে এসেছে, কিছু-কিছু গুনাহের শাস্তি আল্লাহ দুনিয়াতে দিয়ে থাকেন। এর মধ্যে একটি হলো মাতাপিতার অবাধ্যতা। আল্লাহ তাকে মৃত্যুর পূর্বে এই গুনাহের শাস্তি দেবেন।

গ্রাম্য যুবকের শিক্ষণীয় ঘটনা

গ্রাম থেকে এক যুবককে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলো। তার অদ্ভূত এক ব্যাধি হয়েছিল। সে কিছুক্ষণ পরপরই চিৎকার করে বলত, আমার গালাটা টিপ দিও না, আমার গলাটা টিপ দিও না। ডাক্তার বললেন, তার ওপর প্রেতাত্মার প্রভাব পড়েছে। এটা সেই ব্যাধি। তার পিতা বলল, না প্রেতাত্মার প্রভাব নয়। তার নিজের কৃতকর্ম তার সম্মুখীন হচ্ছে। ডাক্তার বললেন, কীভাবে? তার পিতা বলল, সে একজন তরুণ। তার পেশা এমন ছিল যে, তার মা তাকে বলত, তুমি সৎ লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো, অসৎ লোকদের সঙ্গ ছাড়ো। সে তার মায়ের উপদেশ খারাপ মনে করত। বলত, মা! এমন বলছেন কেন? এতে সে তার মাকে ধমক দিয়ে বলত, তোমার গলাটা টিপ দিয়ে শেষ করে দেব। এতে তার মা চুপ হয়ে যেত। যেহেতু সে সারা জীবন শুধু এটাই বলত যে, আমার সামনে কথা বললে তোমার গলাটা টিপ দিয়ে

শেষ করে দেব, তাই আজ তার মা পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার পর সেই কর্ম তার সামনে উপস্থিত হচ্ছে আর সে এমন করছে। আর এখন সে নিজেই তাতে আক্রান্ত হচ্ছে এবং নিজে নিজেই চিৎকার করে বলছে, আমার গলাটা টিপ দিও না, আমার গলাটা টিপ দিও না। তার নিজের কৃতকর্ম তার সামনে প্রকাশ পাচ্ছে।

মায়ের অসন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর পাকড়াও

আলকামা (রাযি.) নামে একজন সাহাবি ছিলেন। তাঁর মা কোনো এক কারণে তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল। অনেক কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তার প্রাণবায়ু বের হচ্ছে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সংবাদ গেল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আম্মার, সুহাইব ও বেলাল (রাযি.)কে সঙ্গে নিয়ে আলকামা (রাযি.)-এর বাড়িতে গেলেন। অবস্থা অবলোকন করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পারলেন, তাঁর মা তার ওপর নারাজ আছেন। তিনি তার মাকে বললেন, আপনি আপনার ছেলেকে ক্ষমা করে দিন। মায়ের হৃদয় অনেক ব্যথিত। তিনি বললেন, সে আমাকে অসহনীয় কষ্ট দিয়েছে। আমি তাকে ক্ষমা করতে পারব না। প্রচলিত ভুল ২/১৯৪

মায়ের কথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলাল (রাযি.)কে নির্দেশ দিলেন, পাহাড় থেকে লাকড়ি সংগ্রহ করো। একথা শুনে তার মা মনে-মনে ঘাবড়ে গেলেন। লাকড়ি দিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী করবেন? অবশেষে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লাকড়ি দিয়ে কী করবেন? নবীজি বললেন, তুমি যদি তোমার ছেলেকে মাফ না কর, তাহলে পরকালে সে জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। সুতরাং আগে থেকেই আমি তোমার ছেলেকে তোমার সামনে আগুনে জ্বালিয়ে দেব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনে তার মা ভাবলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অহেতুক কোনো কথা বলেননি। যদি আমি তাকে মাফ না করি, তাহলে অবশ্যই তিনি আমার সম্মুখে আমার সন্তানকে জ্বালিয়ে দেবেন। মায়ের ভালোবাসা তা সহ্য করতে পারেনি। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ছেলেকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। তাকে এভাবে জ্বালাবেন না। সঙ্গে-সঙ্গে হযরত আলকামা (রাযি.)-এর জবানে কালিমায়ে তাইয়্যেবা জারি হয়ে গেল। তিনি পরপারে পাড়ি দিয়ে চলে গেলেন। সুবহানাল্লাহ!

বর্তমান যুবসম্প্রদায়ের পিতামাতার সঙ্গে আচরণ

যুবক-যুবতিদের জন্য উচিত, নিজের মাতাপিতার মান-মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি রাখবে। যুবতিরা মায়ের সঙ্গে অভিমান করে বসে। সাধারণ কথার জের ধরে কয়েকদিন যাবৎ মায়ের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। কলেজে পড়ুয়া ছাত্রীরা সকালে ঘুম থেকে উঠে ধোওয়া-গোসলের কাজে তাদের সময় শেষ হয়ে যায়। তাদের মায়েরা চাকরানির মতো নাস্তা তৈরি করতে থাকে। নাস্তা তৈরি করতে দু-মিনিট বিলম্ব হলে বেটি মুখ ফুলিয়ে খাবার না খেয়েই কলেজে চলে যায়। এদিকে মা বেচারী সারাদিন আক্ষেপ করতে থাকে, হায়! যদি দুটা মিনিট আগে আমি নাস্তা তৈরি করে দিতে পারতাম! অতএব, বর্তমান যুগের যুবসম্প্রদায়কে একথা বোঝানো প্রয়োজন যে, মাতাপিতার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করে তাদের থেকে দু'আ নেয়ার চেষ্টা করো। তা হলে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের সম্মান দান করবেন।

মায়ের কোল সন্তানের জন্য মহান রহমত

আল্লাহ তা'আলা সন্তানের জন্য পিতার মধ্যে রেখেছেন দয়া আর মাতার মধ্যে রেখেছেন ভালোবাসা। এজন্যই সন্তানের জন্য মায়ের কোলের চেয়ে উত্তম কোনো আশ্রয় নেই। সন্তানের বয়স যা-ই হোক না কেন এ পৃথিবীতে মায়ের কোলের চেয়ে উত্তম স্থান নেই। চল্লিশ বছর কি সত্তর বছরের সন্তানও মায়ের কোলে বসে গেলে মা তাকে সন্তান বলেই ডাক দেয়। এজন্যই বলা হয়, বিপদের সময় মায়ের কোল সন্তানের জন্য ঢাল। এমনকি কিতাবে লিখা হয়েছে, সন্তান যখন মায়ের ভালোবাসার কথা স্মরণ করে কাঁদে, তখন ফেরেশতারা তার চোখের অশ্রু মুছে দেন। কারণ, সে তার মায়ের ভালোবাসায় কাঁদছে। মায়ের প্রতি এই ভালোবাসা আল্লাহ তা'আলার নিকট অতি প্রিয়। এজন্যই মানুষ যতই চিন্তামগ্ন ও ব্যাধিগ্রস্ত থাকুক মায়ের কথা স্মরণে তার অন্তরে প্রশান্তি আসে।

চোখে দেখা ঘটনা

একদা আমি এক হাসপাতালে একজন বৃদ্ধা মহিলাকে দেখলাম, সে বারবার আম্মা-আম্মা বলে চিৎকার করছে। অথচ সে নিজেই দাদি-নানি হয়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি আম্মা আম্মা বলছ কেন? সে জবাব দিল, আম্মা শব্দ উচ্চারণ করলে আমার হৃদয় শান্তি পায়। আল্লাহু আকবার! এ

কেমন শব্দ! শিশুরা মা বললে তার অন্তরে প্রশান্তি পায় আর বড়রা আল্লাহ শব্দ উচ্চারণ করলে তাদের হৃদয় তৃপ্তি পায়।

অমূল্য ধনভান্ডার

মা অমূল্য সম্পদ। এজন্য মা একবার চলে গেলে মানুষ আর জীবনে তা ফিরে পায় না। মায়ের ভালোবাসা দেখতে হলে সন্তানের অসুস্থতার সময় অবলোকন করো। অসুস্থ সন্তানের মা এমন-এমন দু'আ করে, যে বুঝেই আসে না, এই দু'আ তাকে কে শিক্ষা দিয়েছে। সেই মমতা-ই তাকে তা শিক্ষা দিয়েছে। মা অধীর হয়ে সন্তানের জন্য আল্লাহর দরবারে চাইতে থাকে। ফলে আল্লাহ তার সন্তানকে সুস্থতা দান করেন। এজন্যই বলা হয়, ভালোবাসা, আত্মদান, ধৈর্য ও এখলাছ এই চার গুণের সমষ্টি হচ্ছে মা। মায়ের মধ্যে ভালোবাসা হয়। সন্তানের জন্য আত্মদান হয়। ধৈর্য হয়, এখলাছ হয়। এই চারটি বৈশিষ্ট্য একত্রিত করলে তার ফলাফল হয় 'মা'। অর্থাৎ– এগুলোর সমষ্টিকে 'মা' বলে। মায়ের মধ্যে এই সবকটি গুণ বিদ্যমান রয়েছে।

কেয়ামতের আলামত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেয়ামতের সন্নিকটে কেয়ামতের কিছু নিদর্শন প্রকাশ পাবে। এর মধ্যে একটি আলামত হলো, মা তার নিজের শাসক জন্ম দেবে। অর্থাৎ– মেয়ে হলে মা তার মায়ের ওপর শাসন চালাবে। বর্তমানে পৃথিবীতে তাকিয়ে দেখুন, মেয়ে তার মায়ের ওপর ভয় সঞ্চার করছে। মা বৃদ্ধা হয়ে গেছে। সন্তান তার ওপর চোখ রাঙাচ্ছে! আফসোস! যদি আমরা মায়ের সেবা করে তার দু'আ নিয়ে পরকালে সৌভাগ্যবান হতে পারতাম।

মায়ের দু'আ

কিতাবে এসেছে, একজন বিখ্যাত আল্লাহর ওলী ছিলেন। তাঁর মায়ের ইন্তেকালের পর আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে এলহাম করে বললেন, হে আমার বন্ধু! তোমার রক্ষক আজ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। এবার ভেবেচিন্তে পা বাড়িও। যার দু'আর বরকতে তুমি হেফাযতে থাকতে, সে আজ চলে গেছে। এজন্যই ভাই! মা যদিও বৃদ্ধা হয়ে গেছেন, বার্ধক্যে তিনি কঙ্কালসার হয়ে গেছেন, অসুস্থতার কারণে হাত-পা নাড়াচাড়া করতে

পারেন না, কিন্তু রোগবিছানায় শুয়ে-শুয়ে যখন তিনি সন্তানের জন্য দু'আ করেন, সাথে-সাথে তার দু'আ কবুল করা হয় এবং এই দু'আর বরকতে তার সন্তানকে হেফাযত করা হয়।

রহমতপূর্ণ গুণ

স্মরণ রাখবেন, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে তাঁর রহমত গুণের বহিঃপ্রকাশের জন্য মা বানিয়েছেন । অর্থাৎ– হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যদি আমার দয়া, রহমত ও ভালোবাসা দেখতে চাও, তাহলে আপন মায়ের প্রতি তাকাও। তোমাদের ঘরে আমি আমার রহমতের প্রতিকৃতি সৃষ্টি করে রেখেছি। প্রত্যেক ঘরে দেখো, আল্লাহর দয়া ও ভালোবাসার প্রতিচ্ছবি হচ্ছে মা। কোনো কারণে রাগান্বিত হলেও এত দ্রুত খুশি হয়ে যান, যার কোনো সীমা নেই।

মায়ের হাকীকত

একদা কোনো একস্থানে আমি পরীক্ষা নিচ্ছিলাম। পর্দার আড়ালে ছাত্রীরা উপস্থিত। আমি প্রশ্ন করলাম, আচ্ছ! বলো তো পৃথিবীতে ক্রোধান্বিত্ব হওয়ার পর সবচেয়ে সহজে কে সন্তুষ্ট হয়ে যান। তারা জবাব দিল, মা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কীভাবে? তাদের একজন বলতে লাগল, আমি দেখেছি, আমার বড় ভাই যখন কোনো অশালীন কাজ করেন, তখন আম্মাজান তাকে বিভিন্নভাবে ধমক দেন, শাসন করেন, তুমি এমন করলে কেন? এটা করলে কেন? ওটা করলে কেন? এমন করা তোমার উচিত হয়নি, এভাবে করা প্রয়োজন ছিল। এতে আমার বড় ভাই রাগ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। তিনি ঘর থেকে বের হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আম্মাজান তার জন্য দু'আ করতে থাকেন। অজু করেন। জায়নামায বিছিয়ে নফল নামায পড়ে আল্লাহর দরবারে কাঁদতে থাকেন, হে আল্লাহ! আমার সন্তানের যেন কোনো অমঙ্গল না হয়, তার যেন কোনো অনিষ্ট না হয়। হে আল্লাহ! আমার সন্তানকে সহীহ সালামতে ফিরিয়ে দাও। এবার যখন আম্মাজান এভাবে কাঁদতে থাকেন, তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আম্মাজান! এখন ও কাঁদছেন কেন? এভাবে কাঁদতে হলে প্রথমে ভাইয়্যাকে শাসাচ্ছিলেন কেন? আম্মাজান উত্তর দিলেন, সর্বোপরি আমি তার মা। আমিই তাকে শিক্ষা-দীক্ষা দিতে হবে, আমি তাকে না বোঝালে কে বোঝাবে? তবে আমি এটাও চাইনি যে, আমার সন্তান আমার চোখের আড়াল হয়ে যাক। তাই আমি মহান প্রভুর দরবারে প্রার্থনা করছি,

যাতে আমার সন্তান অতি দ্রুত আমার কোলে ফিরে আসে। এতক্ষণে আহারের সময় হয়ে গেল। সবাই খাচ্ছে। মা এদিক-সেদিক ছটফট করছেন। খাবার খাচ্ছেন না। আমি বললাম, আম্মাজান! খাবার খেয়ে নিন। আম্মাজান বললেন, মা! আমি তো জানি না, তোমার ভাই এখনো কিছু খেয়েছে কিনা, আমার খাবার খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। তারপর রাত হয়ে গেল, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। একমাত্র আম্মাজান জেগে আছেন। আব্বাজানও আম্মাজানকে শাসাচ্ছেন, তোমার অপাত্রে ভালোবাসা তোমার ছেলেকে নষ্ট করেছে। আম্মাজান আব্বুর ধমক সহ্য করছেন। তারপরও জেগে আছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আম্মাজান! জেগে আছেন কেন? তিনি বললেন, বেটি এমন যেন না হয় যে, তোমার ভাই এসে দরজায় করাঘাত করে অপেক্ষা করতে হয়। আম্মাজান কাঁদছেন। ঘুমাচ্ছেন না, খাচ্ছেন না। কেন? সন্তানের ভালোবাসা তাঁর অন্তরে গাঁথা। সামান্য পদশব্দ পেলে বা বাতাসের কারণে দরজায় আওয়াজ হলে আম্মাজান উঠে বসে যান। আমার ছেলে আসেনি তো! অর্ধরাতে আমার ভাই এসে তার কামরায় প্রবেশ করলে আম্মাজান এসে আমাকে জাগ্রত করে বলছেন, বেটি! তোমার ভাই এসেছে। খাবার পাকিয়ে তাকে গরম খাবার দাও। আমি বললাম, আম্মাজান! ভাইয়া তার রুমের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। থাক সকালে দেব। সকালে সবার আগে আম্মাজান ঘুম থেকে জেগে আমাকে বলছেন, মা তোমার ভাই সারারাত না খেয়ে আছে। তাড়াতাড়ি খাবার তৈরি করে তাকে খেতে দাও। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আম্মাজান! এতই যদি ছেলের জন্য আপনার হৃদয় কাঁদে, তাহলে আবার সন্তানের প্রতি নারাজ হন কেন? আম্মাজান বললেন, বেটি! আমি তো আমার সন্তানের প্রতি খুশি হওয়ার জন্য প্রস্তুত। আমি চাচ্ছি, আমার ছেলে আমার নিকট এসে বলুক, আম্মাজান! ভুল হয়ে গেছে; আমাকে ক্ষমা করুন। ছেলের মুখে ভুল হয়েছে শব্দটি শোনার জন্য আমি অপেক্ষা করছি। সুতরাং তার ভুল শব্দটি শোনামাত্রই আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।

অতএব, যে মা শুধু সন্তানের ভুল হয়েছে শব্দটি শ্রবণের অপেক্ষায় আছেন এর চেয়ে দ্রুত কেউ খুশি হতে পারে না। আমি বললাম, ঠিক আছে অপরাধ যদি আরও গুরুতর হয় আর শুধু ভুল হয়েছে শব্দ শুনে ক্ষমা না করেন, তাহলে? সে বলল, তাহলে ভাইজান এসে আম্মাজানের পা মোবারক ধরে ক্ষমা চাইলেই আম্মাজান বলবেন, আচ্ছা বাবা! আমার পা ছাড়ো; আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। আমি বললাম, অপরাধ যদি এর চেয়ে ও গুরুত্ব

হয় আর মায়ের পায়ে ধরে ক্ষমা চাওয়ার পরও যদি তিনি খুশি না হন, তাহলে? সে উত্তর দিল, তাহলে ভাইজান এসে আম্মাজানের পা ধরে দুই ফোঁটা অশ্রু ফেলবে। সাথে-সাথে আম্মাজান তার আঁচল দিয়ে ভাইয়ার চোখের পানি মুছে দিয়ে বলবেন, চলো বাবা? আমি তোমাকে মাফ করে দিয়েছি। কারণ, মায়ের ভালোবাসা সন্তানের চোখের পানি সহ্য করতে পারে না। এটা মায়ের ভালোবাসা। সন্তানের প্রতি নারাজ হলেও সেটা হয় বাহ্যিক রূপ। মূলত অন্তরে সন্তানের ভালোবাসায় কোনো ত্রুটি আসে না। আফসোস! যদি আমরা মায়ের হাকীকত উপলব্ধি করতে পারতাম, সন্তানের প্রতি মায়ের কেমন ভালোবাসা থাকে, তা যদি বুঝতে পারতাম! আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

একটি সত্য ঘটনা

গ্রামাঞ্চলে এক দম্পতি থাকত। বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহ তাদেরকে একটি সন্ত ান দান করলেন। ছেলে আস্তে-আস্তে বড় হচ্ছে। তার স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর ছিল। লেখাপড়া করে বড় ইঞ্জিনিয়ার হলো। মা-বাপের একমাত্র সন্তান। ইঞ্জিনিয়ার হয়ে চাকরি পেল। S D O হলো। গাড়ি, বাড়ি, সম্মান ও মূল্যায়নের কোনো অভাব নেই। এখন সে শহরে বসবাস করতে লাগল। কিছুদিন পর সে ভাবল, এবার আমার একটা বিয়ে করা প্রয়োজন। শহরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্ধান পেল। তাদের প্রাচুর্যের সাথে ধর্মনুরাগও রয়েছে। ওই পরিবারের এক পাত্রীর সন্ধান পেয়ে স্থির করল, আমি এখানেই বিয়ে করব। মাকে সংবাদ দিল। মা বললেন, বাবা! জীবন কাটাবে তুমি। সুতরাং তোমার পছন্দ হলে এতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। অতএব, প্রস্তাব পাঠানো হলো। ছেলের প্রসিদ্ধি শুণে পাত্রীপক্ষ আত্মীয়তা করতে রাজি হলো। বিয়ে হয়ে গেল।

কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর মেয়ে বলল, গ্রামাঞ্চলে বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মা-বাপ সন্তুষ্টচিত্তেই ছেলেকে বললেন, ঠিক আছে; তোমার স্ত্রীকে শহরের দালান-কোঠায় নিয়ে যাও। সেখানে সুখে জীবন যাপন করো। আমরা এখানেই আছি, আমাদের খোঁজখবর নিয়ো আর মাঝে-মাঝে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে তোমার চেহারাটা দেখিয়ে যেয়ো। সে বলল, ঠিক আছে; এটা অনেক উত্তম পরামর্শ। তা-ই হবে। সুতরাং সপ্তাখানেক পরপর এসে মা-বাবাকে দেখে যায়। তারপর এমন হলো, এক ঘণ্টার কথা বলে এলে দেড় ঘণ্টা-দুঘণ্টা হয়ে যায়।

এই বিলম্বের কারণে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া বাঁধে, তুমি দেশের বাড়িতে চলে যাও। চলে গেলে এদিকের কোনো খবর থাকে না। এটা কর সেটা কর। যেমনটা মহিলারা বলে থাকে। সে এভাবেই বলতে থাকে। এতে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া লেগেই আছে। যখনই সে মায়ের সাক্ষাতে যাওয়ার ইচ্ছা করে, তখন স্ত্রী তার সঙ্গে বিতণ্ডা করতে থাকে। সে একজন ভদ্র মানুষ ছিল। এগুলো শুনত আর ভাবত, আমি এ মসিবত থেকে রেহাই পাই কীভাবে? আল্লাহর মহিমা! ওই সময় সৌদি আরবের কোনো কোম্পানি কিছু ইঞ্জিনিয়ার চেয়েছিল। সে সেখানে আবেদন করলে তার আবেদন মঞ্জুর হয়ে যায়। সে তার মাতাপিতার নিকট অনুমতি চাইলে মা বললেন, বাবা! যাও। সেই পবিত্র ভূমিতে যাওয়া আমাদের সৌভাগ্য হয়নি। তুমি আমাদের সন্তান হয়ে সেখানে যাবে, সেখানে জীবনযাপন করবে এটা আমাদের গর্ব, তুমি সেখানে সুখে থেকো। আমাদের খোঁজখবর নিও। আমাদের জন্য দু'আ কর। মাতাপিতার অনুমতিক্রমে ভদ্রলোক মক্কায় চলে গেল। সেখানে বসবাস করতে লাগল। সেখানে সে তেরো বছর অবস্থান করল। প্রথম দিকে মাতাপিতার কিছু খোঁজখবর নিত। কিছু খরচপাতিও পাঠাত। পরবর্তী কালে তেমন খোঁজখবরও নেয়নি এবং খরচপাতিও দেয়নি। তখন তো টেলিফোনের যুগ ছিল না। দু একটা থাকলেও শহরে থাকত। গ্রামাঞ্চলে যোগাযোগের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। হজ-ওমরার সময় এলাকার লোকজন পেলে কিছু টাকা পয়সা ও আসবাবপত্র দিয়ে দিত। পরবর্তী কালে কোনো খোঁজখবর নেয়নি। সেখানে থাকাবস্থায় সে তেরোবার হজ করেছে। তেরো নম্বর হজের সময় সে একেবারে বায়তুল্লাহর সামনে মাতাফের মধ্যে দাঁড়িয়ে অঝোর ধারায় কাঁদতে থাকে। আল্লাহর কোনো ওলী তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, হে যুবক! এভাবে কাঁদছ কেন? তোমার কী হয়েছে? সে বলল, হুজুর! এই নিয়ে আমি তেরোবার হজ করেছি।

কিন্তু হজ আদায়ের দুই-তিন দিনের মধ্যেই আমি স্বপ্নযোগে জানতে পারি, কে যেন বলছে, হে যুবক! তোমার হজ কবুল হয়নি, হুজুর আমি বুঝতে পারিনি আমার হজ কবুল হচ্ছে না কেন? তিনি তার নিকট থেকে তার সমস্ত অবস্থা শুনে বললেন, বাবা! তোমার হজ কবুল না হওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে তোমার মাতাপিতা, তুমি তাদের খোঁজখবর নাওনি, তাদের সেবা করার মতো তোমার অন্য কোনো ভাই-বোনও নেই। তারা অত্যন্ত দুর্বিষহ জীবন যাপন করছে। আর তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে এখানে সুখে জীবন কাটাচ্ছ। সত্বর তাদের খবর নাও।

বুযুর্গের কথা শুনে যুবকের ঘুমন্ত হৃদয়ে চেতনা আসে। সে বাসায় এসে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি নেয়। টিকিট করে। বাড়িতে আসার জন্য কাপড়চোপড় গোছায়। দেখে তার স্ত্রী বলছে, এসব কী করছ? কোথায় যাচ্ছ? স্বদেশে কেন যাবে? কী প্রয়োজন সেখানে? স্বদেশে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে এখন কঠোরভাবে শাসাচ্ছে– চুপ কর, কোনো কথা বলবে না। স্বামীর ধমক খেয়ে সে নীরব হয়ে যায়। স্বামীর দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে না। স্বামীর ধমক খেয়ে সাধারণ মহিলারা যেমনটা করে থাকে। সামনের দিকে তাকাতেও সাহস পায় না। সে স্বদেশ ফিরে এল। নিজ দেশের বাড়ির দিকে রওনা হলো। বাড়ির পথে যাত্রা করে সে ভাবতে লাগল, এতদিন যাবৎ আম্মা-আব্বার খবর নেইনি। এবার কীভাবে তাদের মুখ দেখাব। এটাওটা বিভিন্ন বিষয় ভাবতে-ভাবতে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বাড়ির কাছাকাছি এসে প্রায় দশ বছর বয়সি এক কিশোরকে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, বাবু! ওই বাড়ির বুড়াবুড়ি কেমন আছে? সে বলল, বৃদ্ধ লোকটি ছয় মাস পূর্বে মারা গেছে আর বৃদ্ধ মহিলাও প্যারালাইসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে ঘরে পড়ে আছে। কেউ তার খোঁজখবর নিচ্ছে না। তাদের আপনজন বলতে কেউ নেই। আমরা শুনেছি, তার নাকি একটা ছেলে আছে, সে মক্কায় থাকে। সে কেমন হারামি যে, মাতাপিতার একমাত্র ছেলে হয়ে তাদের খবর নিচ্ছে না। মক্কায় সে সুখে জীবন কাটাচ্ছে আর এখানে তার মাতাপিতা দুঃখ-যাতনায় ভুগছে। অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। কিশোর তো আর জানে না, এই ভদ্রলোকই এই বুড়াবুড়ির ছেলে।

ছেলেটা তার কথা বলে চলে গেছে। এবার ভদ্রলোকের হৃদয়ের গিরা খুলে যায়। সে ভাবতে থাকে, বাস্তবেই আমি আমার মাতাপিতার হক পরিপূর্ণ আদায় করিনি। এবার কীভাবে এই মুখ আমার মাকে দেখাব। মা হয়তো আমার মুখ দেখতে চাইবেন না। তিনি হয়তো আমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেবেন। বলবেন, এখন কেন এসেছ? তোমার পিতা চলে গেছেন। অবশেষে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ঘরের দ্বারে উপস্থিত হলো। দরজা খুলে ঘরে প্রবেশ করল। দেখল, বারান্দায় একটা খাটের ওপর তার মা হাড্ডিসার হয়ে খাটের সঙ্গে মিশে আছে। মনে-মনে ভাবছে, মা হয়তো ঘুমিয়ে আছেন। তাই প্রথমে মায়ের নিকট গিয়ে দেখব। যদি তিনি জাগ্রত থাকেন, তাহলে সালাম করব নতুবা অপেক্ষা করব। দেখল, তার মা বিছানায় প্রস্রাব করে আছে। দৃষ্টিশক্তিও চলে গেছে। আস্তে-আস্তে পদধ্বনিবিহীন মায়ের নিকট উপস্থিত হলো। মায়ের নিকট গিয়ে সে কী দেখল? আশ্চর্য ব্যাপার! দীর্ঘদীন যাবৎ সে

মায়ের খোঁজখবর নেয়নি। যে-মায়ের কাছে যেতে সে ভয় পাচ্ছিল, কী জানি মা আমাকে তাড়িয়ে দেন কিনা, মা আমার মুখ দেখতে অস্বীকৃতি জানান, সেই মা আজ রোগবিছানায় শায়িত অবস্থায় অনাহারে কঙ্কাল হয়ে এবং দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে দুহাত মাথার দিকে উত্তোলন করে বলছেন, হে আল্লাহ! আমার একটিমাত্র সন্তান। সে তোমার পাক ভূমিতে বাস করছে। আমার থেকে অনেক দূরে। আমার স্বামীও আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন। এবার আমি মারা গেলে কবরে আমার লাশ নামানোর মতো আমার কোনো আপনজন নেই। হে আল্লাহ! তুমি মহান। তুমি আমার ছেলেকে সুখে রেখে সহীহ ছালামতে আমার নিকট পৌঁছিয়ে দাও, যাতে আমার মরদেহ সে কবরে নামাতে পারে। এ হচ্ছে সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসর শেষ সীমানা। সুবহানাল্লাহ!

মায়ের ভালোবাসার মাপকাঠি

স্মরণ রাখবেন, মায়ের ভালোবাসা এমন একটা গভীর সমুদ্র, যার গভীরতা আজ পর্যন্ত কেউ পরিমাপ করতে পারেনি। মায়ের ভালোবাসা এমন হিমালয় পর্বত, যার উচ্চতা আজ পর্যন্ত কেউ সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারেনি। মায়ের ভালোবাসা এমন স্বপ্নিল বাগান, যার ফুল কখনো ঝরে পড়েনি। মায়ের বুকে ভালোবাসা সর্বদা সতেজ থাকে। আরও স্মরণ রাখবেন, পৃথিবীতে উত্তমকে সবাই ভালোবাসে। পিতাও তার ভদ্র ও ভালো সন্তানকে ভালোবাসেন। কিন্তু মা এমন অমূল্য রত্ন, যিনি তার অভদ্র ও খারাপ সন্তানকেও ভালোবাসেন। সন্তান চরিত্রহীন হয়ে যায়। সবাই তাকে ঘৃণা করে। মা বলেন, কী করব; অবাধ্য-চরিত্রহীন হওয়া তার ভাগ্যে ছিল, সে তা আমার সন্তান। আমি তাকে ভালোবাসতে হবে। খারাপদের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী এ পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার পর মা ব্যতীত আর কেউ হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা মাকে এমন হৃদয় দিয়েছেন। সন্তানের প্রতি মায়ের হৃদয় এরকম অস্থির থাকে। এজন্য আপনারা দেখে থাকবেন, শিশু সন্তান মায়ের চুল ধরে টানতে থাকে। রাগে মায়ের গালে থাপ্পড় মারে। কিন্তু মা তার সন্তানের হাত ধরে চুমু খায়। এটা ভালোবাসার জগৎ। এমন ভালোবাসায় সন্তানকে লালনপালন করেন। উচিত তো এটা ছিল যে, বাচ্চা মাকে থাপ্পড় মারলে মা তাকে উঠিয়ে দেওয়ালে ছুড়ে মারবে। কিন্তু না, বাচ্চা থাপ্পড় দিলে মা তার হাতে চুমু খান। এটা মায়ের ভালোবাসা। সুতরাং কে পারবে মায়ের হক আদায় করতে?

সাহাবায়ে কেরামের আমল ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবাব

এক সাহাবি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার মাকে পায়ে হেঁটে হজ করিয়েছি। বালুকাময় পাথুরে রাস্তা, পায়ে জুতা নেই। হাঁটতে-হাঁটতে আমার পায়ে ছাল পড়ে যায়, পায়ের চামড়া শক্ত হয়ে যায়। এতে কী আমার মায়ে কিছু হক আদায় হয়েছে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার ভূমিষ্টের সময় তোমার মা যে-ব্যথা সহ্য করেছিলেন, তার কিছু বিনিময় হয়েছে কি? অর্থাৎ– তাও পরিপূর্ণ আদায় হয়নি। বাকি দুধপান ও শৈশব তো দূরের কথা। বন্ধুগণ! আল্লাহ মায়ের অন্তরে এমন ভালোবাসা দিয়েছেন, যাকে মায়ের মমতা বলা হয়।

একটি ইংরেজি বাগ্‌ধারা

Mother's Shedow is like honey of bee especially in the desert of life just like a green tree

অর্থাৎ– বালুকাময় জমিতে যেরূপ একটি সবুজ-শ্যামল বৃক্ষ গজায়, তদ্রূপ মানুষের কঠিন মসিবতের সময় মায়ের ভালোবাসা সতেজ হয়ে ভূমিকা রাখে

তাই তো কোনো কবি বলেন–

ماواں ٹھنڈیاں چھاواں

لعل لڑاون سارے

ماواں باج نہ آکھے کوئی

آفرزند پیارے

মা হচ্ছেন সুশীতল আশ্রয়স্থল, সকল মোতির মালা

মায়ের মতো আসবে না কেউ করতে তোমায় উজালা।

পৃথিবীতে এমন কেউ আছে কি, যে বলতে পারবে, এসো হে আমার আদরের দুলাল! আমার কোলে আস। একমাত্র মা-ই তা বলতে পারে। আল্লাহু আকবার!

এখলাছের চিত্র

এমন ভালোবাসা হয়ে থাকে মায়ের। এজন্যই মা বিছানায় শুয়ে থেকেও সন্তানের জন্য দু'আ করে। চলাফেরায় অক্ষম হয়ে ঘরে বসে থেকে সন্তানকে আশীর্বাদ দেয়। ফলে মায়ের দু'আর বরকতে তার সন্তানকে হেফাযত করা হয়। কোনো কবি বলেন–

دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے

میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے

'দূরে বসে কে যেন আশীর্বাদ দিচ্ছে।
আমি নিমজ্জমান; সমুদ্র আমাকে ছুড়ে দেয়।'

মানুষ এমন কাজ করে বসে, যার দরুন আল্লাহ তা'আলা তাকে অপমান করেন। তারপর তার মায়ের দু'আর বরকতে আল্লাহ তাকে সম্মানের পর্দা দিয়ে ঢেকে নেন। মায়ের দু'আর বরকতে আল্লাহ তার সন্তানকে বিপদ থেকে মুক্তি দেন। এটা মায়ের মর্যাদা, যা আল্লাহ তা'আলা স্বতন্ত্রভাবে মাকে দান করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, মানুষ যখন বড় হয়, যখন মায়ের সেবার উপযুক্ত হয়, মায়ের ভালোবাসা অনুভব করতে পারে, তখন সাধারণত মাও পৃথিবী ছেড়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। তাই কোনো কবি বলেন–

تربیت سے تیری میں انجم کے ہم قسمت ہوا

گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا

عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی

میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا

তোমার প্রতিপালনে আমি নক্ষত্রের ন্যায় সৌভাগ্যবান হয়েছি। আমার ঘর আমার পূর্বপুরুষদের দৌলতে সম্মানিত হয়েছে। সারাটা জীবন তোমার ভালোবাসা আমার সেবা করেছে। আমি যখন তোমার সেবার উপযোগী হলাম, তখন তুমি আমার ছেড়ে চলে গেলে।

সন্তান যখন মায়ের সেবায় উপযুক্ত হয়, তখন আল্লাহ এই অমূল্য নেয়ামত ফিরিয়ে নিয়ে যান। আর এই নেয়ামত চলে গেলে আর আসে না। যাদের মাতাপিতা জীবিত আছেন, আল্লাহ সকলকে তাদের সেবা করার তাওফীক দান করুন। যারা অসুস্থ আছেন, তাদের সুস্থতা দান করুন।

আমার সম্মানিতা মাতা এ দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। আজ আমি তাঁর সেই দোয়ার অভাব উপলব্ধি করছি, যে দু'আ তিনি বসে-বসে আমার জন্য করতেন। আজ তার দুটি সন্তান এখানে বসে আছে। তাদের মাথা থেকে মায়ের ভালোবাসা অপসারিত হয়েছে। আমরা দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা যেন তাদের দু'আর কল্যাণ আমাদের ওপর সর্বদা জারি রাখেন। আল্লাহ তা'আলা এই দুটি সন্তানের উত্তম প্রতিপালন করুন, আমার ছোট-বড় উভয় সাহেবজাদাকে আল্লাহ তাঁর মকবুল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, সারা জীবন তাদেরকে দীনের খেদমতের জন্য কবুল করুন। হযরত সিদ্দীকী সাহেব (রহ.) যে দু'আ করতেন, আল্লাহ যেন আমার স্বচক্ষে তাদের এমন দেখান। আমাদের মুরশিদ বলতেন, হযরত সিদ্দীকী সাহেব (রহ.) এই দু'আ করতেন, হে আল্লাহ! আমার সন্তানকে যুগের কুতুব বানিয়ে দিন। এমন দু'আও কোনো পিতা তার সন্তানের জন্য করেন। সুবহানাল্লাহ! হযরত সিদ্দীকী সাহেবের দু'আ বাস্তব রূপ ধারণ করেছে। আল্লাহ তা'আলা এই মারকাযকে আরও সমুন্নত করুন। আল্লাহ তাঁর কেয়ামত পর্যন্ত আগত বংশধরকে দীনের জন্য কবুল করুন। আল্লাহ আমাদের মায়ের পরকালের ঘাঁটিসমূহকে আসান করে দিন। তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিন। ইন্তেকালের দুদিন পূর্বে আমার আম্মাজানের মুখে আল্লাহর জাতি নামের জপ জারি হয়েছিল। প্রতিটি নিঃশ্বাসে আল্লাহ, আল্লাহ উচ্চারণ হতে থাকে, যা দেখে হাসপাতালের সমস্ত ডাক্তার, নার্স অবাক হয়ে যায়। আল্লাহ দেখিয়ে দিয়েছেন, দেখো, আমার ওলীদের সান্নিধ্যে থাকলে তার শেষ পরিণাম কত সুখময় হয়। আমার পবিত্র নাম পাঠ অবস্থায় তারা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। আল্লাহ তাদের দু'আর সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দিয়ে আমাদের ধন্য করুন। আমীন।

পর্দা আবশ্যক কেন?

'হাদীছ শরীফে এসেছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যেলোক না-মাহরাম থেকে নিজের দৃষ্টিকে হেফাযত করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ইবাদাতের মধ্যে স্বাদ দান করবেন। এটাও স্মরণ রাখবেন যে, রূপসী রমণী দেখলে অন্তর আনন্দ পায়। আর সুন্দর চবিত্রবান রমণী দেখলে অন্তর খুশি হয়। সুতরাং রূপসজ্জায় পরিহার করে নিজের চরিত্র গঠন করার চেষ্টা করো। আমি মেয়েদের বলি, উঁচা জুতা ব্যতীতও মহিলাদের লম্বা দেখা যায় যদি তার ব্যক্তিত্ব উঁচা হয়। সুরমা ছাড়াও তাদের চক্ষু সুন্দর দেখায় যদি তাদের লাজুকতা থাকে। পলকবিহীন মুচকি হাসাও তাদের সুন্দর লাগে যদি তারা লজ্জাশীল হয়। ললাটে তিলক ছাড়াও সুন্দর দেখায় যদি কপালে সেজদার আলামত থাকে।'

পর্দা আবশ্যক কেন?

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ﴿۳۲﴾

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

'আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।'[৩২]

ভূমিকা

সন্তান যখন যৌবনে পদার্পণ করে, তখন তারা এক নবগন্তব্যে প্রবেশ করে। তাদের নিজের চিন্তাভাবনা থাকে, নতুন অনুভূতি হয়, আবেগ থাকে। যেমন তাদের খাওয়া দাওয়া শয়ন করা ইত্যাদি। তার নিজের প্রয়োজন উপলব্ধি করে, তার সত্তাগত প্রাকৃতিক প্রয়োজন ও পুরো করার অনুভূতি হয়। অর্থাৎ– বিয়ে-শাদীর ইচ্ছা জাগে। শরীয়ত ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত এ বিষয়ের অতি উত্তম সমাধান বর্ণনা করেছে যে, মেয়ে বালেগ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে যোগ্য পাত্র দেখে তার বিয়ের কাজ সমাধা করে ফেলো। আমাদের মাশায়েখগণ এ ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। তারা যখন বুঝতেন, আমাদের কন্যা এখন উপযুক্ত হয়েছে, তখন প্রথম মাসের পর দ্বিতীয় মাস স্বামীর বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন।

উদ্বেগের সময়

কিতাবে লিখা হয়েছে, কন্যা যুবতি হওয়ার পর যদি তার বিয়ের ব্যবস্থা না করে ঘরে রাখা হয়, তাহলে ওই সময় সে যে গুনাহ করবে, তা তার

---

৩২. সূরা বানী ইসরাইল : আয়াত ৩২

পিতামাতার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হবে। এখন অবস্থা তো এমন হয়েছে যে, যৌতুক ও এটা-ওটা তালাশ করতে-করতে মেয়েকে এতদিন ঘরে রাখা হয় যে, এর ফলে তার ছোট আরও তিন বোন বিয়ের উপযুক্ত হয়ে যায়। এ অবস্থায় সে দশ-পনেরো বছর পিত্রালয়ে থাকতে হয়। ওই সময় যদি সে গুনাহ থেকে বেঁচেও থাকে, তাহলে হয়তো তার মধ্যে উন্মাদনার ভাব চলে আসবে, না হয় একেবারে আল্লাহর ওলী হতে হবে। এই দুই অবস্থা ছাড়া সে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার উপায় নেই। কারণ, শয়তান সবসময় গুনাহের প্রতি আহ্বান জানায় আর মানবপ্রবৃত্তি তাকে গুনাহের দিকে আকর্ষণ করে।

সতীত্ব ও পবিত্রতা সংরক্ষণের প্রতিদান

কতিপয় মানুষ রয়েছে, যারা মানুষরূপে শয়তানের মুখপাত্র বা প্রতিনিধি সাজে। তারা হয়তো তোমার ক্লাসমেট হবে, না হয় কোনো নিকটাত্মীয়। না হয় কোনো গায়রে মাহরাম পুরুষ হবে। সে তোমাকে গুনাহের দিকে দাওয়াত দেবে। তা ছাড়া রেডিও, টেলিভিশন, মিউজিক, সংস্কৃতি, ভিসিডি, ইন্টারন্টে তো চতুর্দিকে সেটিং হয়েই আছে। সেগুলো উত্তপ্ত তেলের কাজ করে। এমতাবস্থায় যখন যুবতি রমণীকে সর্বদিকে থেকে গুনাহের কাজে আহ্বান করে, তখন তার ভাবমূর্তি পাল্টে যায়। লজ্জা একটি সৃষ্টিগত কুদরতি বিষয়, যা আল্লাহ তা'আলা বিশেষ করে নারী জাতিকে দান করেছেন। অতএব, এ সমাজের নারীদের জন্য সতীত্ব ও পবিত্রতা রক্ষা করে জীবন যাপন করা কঠিন। সে তার নিজের সাথে এক প্রকার যুদ্ধ করতে হয়। ফলে সৌভাগ্যবান নারীরা সেই যুদ্ধের হাকীকত উপলব্ধি করতে পারে যে, আমি এক মহাযুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছি। পুরুষরা যুদ্ধের ময়দানে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে আর নারীরা নিজের ঘরে নিজের আত্মার সাথে যুদ্ধ করে। সে এদিক-সেদিক গুনাহের দাওয়াত পায়। কিন্তু সে ভাবে, আমি যদি আমার ইজ্জত-সম্ভ্রম রক্ষা করে চলতে পারি, তাহলে আমি আল্লাহ তা'আলার দরবারে কৃতকার্য হব।

বিজয়ী মহিলা কে?

মুজাহিদগণ যেভাবে যুদ্ধের ময়দানে জয়ী হলে গাজী হয়, ঠিক তেমনি যদি কোনো রমণী নিজের সতীত্ব, ইজ্জত-সম্ভ্রম রক্ষা করে চলতে পারে, তাহলে সে আল্লাহর দরবারে বিজয়ী গাজীয়া বলে গণ্য হয়। পুরুষের জিহাদ হয় ময়দানে আর মহিলার জিহাদ হয় চব্বিশ ঘণ্টা আপন ঘরে। পুরুষের

জিহাদ হয় প্রকাশ্যে আর নারীর জিহাদ হয় গোপনে। সে কাউকে বলতেও পারে না, কারও নিকট নিজের বেদনাও প্রকাশ করতে পারে না। মিস্টার ইবলিস কোন কোন দিক থেকে তাকে আক্রমণ করছে, সে তা প্রকাশও করতে পারে না। নিজের নফস কু-আত্মা কোন কোন পথে তাকে ফাঁদে ফেলছে, তা কারও নিকট প্রকাশ করেও নিজের দুঃখ লাঘব করতে পারছে না। ফলে সে নিজ নিজেই আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানিয়ে নিজের সত্তার সঙ্গে জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছে, যাতে আল্লাহ তাকে সফলতা দান করেন।

নির্জনতায় চরিত্র গঠন হয়

একটি কথা স্মরণ রাখবেন যে, মহিলাদের সমস্ত ভুলত্রুটি ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু তার কৃতকর্মের (অপকর্মের) অপরাধ কেউ ক্ষমার চোখে দেখে না। এজন্যই যদি মহিলাদের সঠিক তত্ত্বাবধানের কারণে তাদের কোনো প্রকার ত্রুটি প্রকাশও পায়– যেমন, তর্কবাজ রাগী, জেদী, কামচোর, অলস, অভিমানী, ইত্যাদি, এ-ধরনের সকল ত্রুটি সহজেই বরণ করে নেয়া যায়। কিন্তু তার আপন কৃতকর্মের দুর্বলতা কেউ সহ্য করতে পারে না। এটা বরদাশত করতে কেউ রাজী নয়। কাজেই যুবতি মেয়েদের উচিত নিজের সতীত্ব ও পবিত্রতা সংরক্ষণ করে চলা। এটা তাদের গুরুদায়িত্ব। আল্লাহ যেখানে চুরির কথা আলোচনা করেছেন, সেখানে বলেছেন–

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا

'পুরুষ চোর ও নারী চোর উভয়ের হাত কর্তন করো।'[৩৩]

এখানে পুরুষের কথা আগে উল্লেখ করেছেন। পরে মহিলার কথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যেখানে ব্যভিচারের কথা আলোচনা করেছেন, সেখানে মহিলাদের কথা আগে উল্লেখ করেছেন। যেমন– আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করো (যদি তারা অবিবাহিত হয়)।[৩৪]

মুফসসিরীনে কেরাম বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মহিলা প্রশ্রয় না দেবে, সে নিজের থেকে সুযোগ না দেবে, নিজে অপকর্মের জন্য প্রস্তুত না হবে, ততক্ষণ

---

৩৩. সূরা মায়েদা : আয়াত ৩৮

৩৪. সূরা নূর : আয়াত ৩

পর্যন্ত একজন পুরুষ তার সতীত্বে হাত দিতে পারবে না। পক্ষান্তরে চুরির বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। কারণ, চুরি কর্মটা পুরুষদের থেকেই সংঘটিত হওয়া স্বাভাবিক। এটা পুরুষত্বের বিপরীত বিষয়। তাই সেখানে পুরুষের কথাই আগে বলা হয়েছে। আর ব্যভিচার লজ্জার বিপরীত বিষয় এবং লজ্জা মহিলার মধ্যেই প্রবল। তাই এখানে মহিলার কথা আগে বলা হয়েছে।

সতীত্বের সংরক্ষণ কীভাবে?

অতএব, পৃথিবীতে নারীদের সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে নিজের সতীত্ব রক্ষা করা। সে এই অনুভূতি রাখা অপরিহার্য যে, পৃথিবীর সমস্ত পরপুরুষ আমার প্রতি লালসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এক্ষেত্রে আমি আমার নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। যেমন– চেরাগ জ্বালানো থাকলে বাতাসের ঝাঁকুনি থেকে তাকে হেফাযত করা হয়। নতুবা কখন বাতাস থাপ্পড় মেরে সেটা নিভিয়ে চলে যায় বলা যায় না। তেমনিভাবে রমণীকে বুঝতে হবে, আমার সতীত্ব ও ইজ্জতের বাতি জ্বলছে। ঘূর্ণিঝড় ও তুফান থেকে আমি তাকে হেফাযতে রাখতে হবে। যদি আমি সেই ক্ষেত্রে উদাসীন থাকি, তাহলে কোনো থাবা এসে আমার সম্ভ্রমের, সতীত্বের বাতি নিভিয়ে চলে যাবে। তাই পৃথিবীতে বসবাসকালে নারীদের সবচেয়ে গুরুদায়িত্ব হচ্ছে নিজেদের সতীত্ব রক্ষা করে চলা।

একটি সোনালি উপদেশ

জনৈক অন্ধ লোকের ব্যাপারে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয় যে, একদা তার রাতের অন্ধকারে দূর থেকে পানি সংগ্রহের প্রয়োজন হলো। সে পানির কলসি কাঁধে নিয়ে হাতে একটি বাতি ধারণ করে চলছে। পথে এক লোক তাকে দেখে অশ্চর্যান্বিত হয়ে বলছে, কী ব্যাপার? তুমি তো অন্ধ! তাহলে হাতে বাতি জ্বালিয়ে রাখছ কেন? তুমি তোমার আন্দাজের ওপরই চলাফেরা করতে পার। তবে এ বাতি জ্বালিয়ে তোমার ফায়েদা কী? অন্ধ লোকটি জবাব দিল, তোমার কথা সঠিক। বাতির আলোতে আমি কোনো কিছু দেখতে পাইনি। তবে বাতি জ্বালানোর মধ্যে আমার ফায়েদা আছে। কীভাবে? কারণ, এখন রাতের অন্ধকার। আমার জন্য আঁধার ও আলো উভয়ই সমান। তবে ভালো মানুষের জন্য আঁধার বিপদ। আলোর ন্যায় সে অন্ধকারে দেখতে পায় না। সুতরাং কী জানি কোনো ভালো মানুষ অন্ধকারে হেঁটে আমার সঙ্গে ধাক্কা খায় আর আমার কলসি পড়ে ভেঙে গিয়ে আমার ক্ষতি হয়ে যায়। তাই বাতি জ্বালিয়ে রেখেছি, যাতে অন্য কেউ ধাক্কা খেয়ে

আমার ক্ষতি না করতে পারে। দেখুন, এই অন্ধ লোকটির বুদ্ধি কত। বাতি জ্বালিয়ে রেখেছে, যাতে অন্যরা সঠিকভাবে পথ দেখে তার সঙ্গে ধাক্কা না খায়। কারণ, ধাক্কা খেলে তো ক্ষতি আমারই হবে। সুতরাং যুবতিরাও এমন ভাবনা রাখা চাই যে, আমি যদি পর্দাবিহীন চলাফেরা করি, তাহলে কী জানি কোনো পরপুরুষ আমার প্রতি তার কুদৃষ্টি ফেলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। যদি আমি কারও সঙ্গে নির্জনে কথা বলি, টেলিফোনে কথা বলি, এতে সে আমার ওপর সামান্য সুযোগ পায়, তাহলে সর্বনাশ তো আমারই হবে। নারীর অমূল্য সম্পদ ইজ্জত যাবে এবং দুর্নামের ছাপ লাগবে। আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টিতে পড়তে হবে। ফলে এই জিহাদে আমি পরাজিত হব। আমার মালিককে আমি কীভাবে মুখ দেখাব। তাই মহিলারা ওই সমস্ত বিষয় চিন্তা করে চলা একান্ত কর্তব্য।

নবীজির সম্মানিতা স্ত্রীগণের চরিত্র

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিতা স্ত্রীগণের সম্পর্কে বলা হয় যে, তাঁরা অনেক সতর্কতা অবলম্বন করতেন। যখন অবসর হয়ে তাঁরা নিজের ঘরের বারান্দায় বসতেন, তখন তাসবীহ-অজীফা ইত্যাদি পাঠ করতেন। তবে খোলা বারান্দার দিকে মুখ করে বসতেন না, ঘরের দেওয়ালের দিকে মুখ করে বসতেন। কী জানি অসতর্কতাবশত ভুলক্রমে আমাদের প্রতি কারও দৃষ্টি পড়ে যায়। এবার ভেবে দেখুন, তাঁরা কেমন সতর্কতা অবলম্বন করতেন। নিজের ঘরে বসে থেকেও খোলা বারান্দার দিকে তাকাতেন না, যাতে কারও দৃষ্টি পড়ার প্রশ্নই আসে না।

মহিলাদের গুরুদায়িত্ব

এটা নারীদের জিম্মাদারি। ফরজ দায়িত্ব। পৃথিবীতে থাকাবস্থায় তাদের সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে নিজেদের ইজ্জত-সম্ভ্রম হেফাযত করা। যদি তার ইজ্জত হরণ হয়ে যায়, তাহলে তার সবকিছুই হরণ হয়ে গেল। তার পাল্লা শূন্য রয়ে গেল। কাজেই মহিলাদের এ ব্যাপারে প্রয়োজনের চেয়েও বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা চাই।

একটি স্বীকৃত মূলনীতি

একটি মূলনীতি স্মরণ রাখবেন। আক্ষেপের সাথে বলতে হয় যে, পুরুষ সর্বদা সুযোগসন্ধানী হয়। এটা স্থিরীকৃত নীতিমালা ও পরীক্ষিত বিষয়। এটা

যাচাই করার প্রয়োজন মনে করি না। মূলনীতি হয়ে গেছে, পুরুষ সুযোগসন্ধানী হয়। নারীদের ব্যাপারে পুরুষ চাই আঠারো বছরের যুবক হোক কিংবা আশি বছরের বৃদ্ধ সবার অবস্থা একই রকম। যখন বেপর্দা হয়ে মহিলারা রাস্তায় বের হয়, তখন একই সময় যুবক ছেলেও তার প্রতি লালসার দৃষ্টিতে তাকায় এবং তার সাদা চুলবিশিষ্ট পিতাও ওই মহিলার প্রতি লিপ্সার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। মহিলা হচ্ছে পুরুষদের জন্য দুর্বলতা। এজন্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের পুরুষদের ওপর আমি সবচেয়ে বেশি যে-জিনিসের ভয় করি, তা হচ্ছে মহিলাদের ফেতনা।

এজন্যই নারীদের দায়িত্ব হলো নিজেকে নিজে বাঁচিয়ে রাখা। শরীয়তে পুরুষদেরও বলা হয়েছে, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি হেফাযত করে। এর প্রতি সর্তক থাকে। মহিলাদেরও বলা হয়েছে, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংরক্ষণ করে। বর্তমান যুগের যুবতিরা মনে করে, দৃষ্টিকে নত রাখা পুরুষদের কাজ। তারা আমাদের প্রতি তাকাচ্ছে কেন? অথচ তারা এটা ভুলে যায়, তাদের মধ্যেও কুআত্মা রয়েছে। মিষ্টার ইবলিস সর্বদা তাদের পেছনে ঘুরছে। তাদের দৃষ্টিও যদি পরপুরুষের প্রতি পড়ে, তাহলে তারাও ফেতনায় গ্রেফতার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ

'হে নবীর পত্নীগণ! তোমরা পর্দায় থাকো। এটা পুরুষদের অন্তরের ক্ষেত্রে ও পবিত্রতার জন্য উত্তম এবং তোমাদের অন্তরের পবিত্রতার জন্যও উত্তম।'[৩৫]

দৃষ্টির দুর্বলতার বিপদ

হৃদয়ের গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে অবগত মহামহিম প্রভু এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, যখনই কোনো মানুষ তার দৃষ্টিকে দুর্বল করে অন্যের প্রতি তাকায়, তখন পুরুষের মধ্যে এর গুনাহের প্রভাব পড়ে এবং মহিলার মধ্যেও গুনাহের কল্পনা সৃষ্টি হতে থাকে। সুতরাং কাউকে রাবেয়া বসরি হওয়ার প্রয়োজন নেই। কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করা চাই। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মহিলাদেরও দৃষ্টি হেফাজতের কথা বলেছেন এবং পুরুষদেরও দৃষ্টি নত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং পুরুষদেরও নিষেধ করা হয়েছে, মহিলাদেরও নিষেধ করা

---

৩৫. সূরা আহযাব : আয়াত ৫৩

হয়েছে। তাই আমি বারবার বলছি, পৃথিবীতে নারীদের সবচেয়ে মহৎ কাজ হচ্ছে, নিজের আবরু ও সতীত্ব রক্ষা করা।

একটি উদাহরণ

মনে করুন, আপনি হজের সফরে গেছেন। আপনার সঙ্গে আট-দশ লাখ টাকা আছে। এখন এই টাকা কি আপনি কোনো সাধারণ ব্যাগে রাখবেন? অবশ্যই রাখবেন না। আপনি টাকাগুলো মজবুত কোনো লাগেজে রেখে তালাবদ্ধ করে রাখবেন, যাতে আপনি রুম থেকে বের হলে কোনো ঝাড়ুদার ও সহজে দেখতে না পায়। অতএব, ভেবে দেখুন, এই টাকা-পয়সা আজ আছে কাল নেই। সেগুলো আপনারা এমনভাবে হেফাযত করেন, যাতে কেউ দেখতেও না পায়। তাহলে নিজের জীবনের অমূল্য সম্পদ, ইজ্জত, সতীত্ব টাকা-পয়সার চেয়ে অনেক মূল্যবান। এটা পরপুরুষের সামনে কোন বিবেকে খুলে রাখেন। আপনার কি একবারও মনে হয় না, যদি আমার এই নগ্ন দেহে কোনো পরপুরুষের দৃষ্টি পড়ে যায় আর তার কল্পনায় কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলা আমাকে নিয়ে সৃষ্টি হয়ে যায়, তারপর সে আমার প্রতি তার লালসার হাত বাড়িয়ে দেয় এবং আমার এ সম্পদ তার হাতে কোনোক্রমে পৌঁছেও যায়, তাহলে আমার জীবনের কী হবে? অতএব, কোন বিবেকে আমরা আমাদের অমূল্য সম্পদ পরপুরুষের সামনে খুলে রাখি। আল্লাহ আমাদের বুঝবার তাওফীক দান করুন। আমীন।

শরীয়তে লজ্জা ও নিষ্কলুষতার শিক্ষা

শরীয়ত আমাদের লজ্জা ও নিষ্কলুষতার এবং পবিত্রতার শিক্ষা দিয়েছে। শরীয়ত এ পরিমাণ নিষ্কলুষতার শিক্ষা দিয়েছে যে, মহিলারা তাদের চুল আঁচড়ানোর পর চিরুনিতে লেগে যে-চুল আসে, তা-ও কোনো নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছে, যাতে কারও এগুলো যেখানে-সেখানে ফেলে দেওয়ার পর কোনো পরপুরুষের নজরে না পড়ে। হতে পারে, কোনো পরপুরুষ আমার মাথার এই চুল দেখেই তার অন্তরে কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলার সঞ্চার হয়ে যাবে। সে আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ হয়ে যাবে। সুতরাং এবার চিন্তা করুন, যে-শরীয়ত মহিলার মাথার পরিত্যাক্ত চুলকে বেপর্দাভাবে যেথায়-সেথায় ফেলে দেওয়া পছন্দ করে না, সেই শরীয়ত একজন তাগড়া যুবতিকে বেপর্দা চলাফেরা করতে পছন্দ করবে কীভাবে? যে-শরীয়ত নির্দেশ দিচ্ছে, মহিলারা মারা যাওয়ার পর তার লাশ

কবরে নামানোর জন্য একমাত্র তার মাহরাম পুরুষ কবরে নামবে, যাতে কোনো পরপুরুষের হাত তার মৃতদেহেও না লাগে, তাহলে ওই শরীয়ত এটা কীভাবে বরদাশত করবে যে, একজন জীবিত নারী তার এ মূল্যবান সম্পদ কোনো ভিন পুরুষের নিকট সোর্পদ করে দেব। কাজেই স্মরণ রাখবেন, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর বর্তমান যেহেতু উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনা মহামারি আকার ধারণ করেছে এবং আমরা এমন সমাজে বাস করছি, যেখানে মুসলিম ও অমুসলিম সকলেই একসঙ্গে থাকছে। সাথে-সাথে অমুসলিমদের নিকট পর্দার কোনো গুরুত্বই নেই। তাই তারা যেন ধোঁকায় না পড়ে, সেদিকে সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য।

দৃষ্টি ও অন্তরের পবিত্রতা

স্মরণ রাখবেন, মুসলমান লজ্জাশীল হয়। এজন্যই হাদীছ শরীফে বলা হয়েছে–

اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ

'লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।'

اِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

'ঈমানের অঙ্গ লজ্জা যখন তোমার নিকট থেকে বিদায় নেবে, তখন তুমি যা ইচ্ছা করতে পারবে।'

লজ্জা একটি অপূর্ব নেয়ামত, যা আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের মধ্যে দুর্গের ন্যায় বসিয়ে দিয়েছেন। এটি সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য যে, মহিলারা লজ্জাশীল হয়। সুতরাং যে-নারী থেকে লজ্জা চলে গেছে, সে যেন মনে করে, আমার নিকট থেকে আল্লাহর নেয়ামত হরণ করে নেওয়া হয়েছে। সে দুনিয়াতেও সম্মান পাবে না এবং আখেরাতেও কোনো মর্যাদা পাবে না। দুনিয়াতে হবে লাঞ্ছিত আর আখেরাতে হবে বঞ্চিত। এজন্যই নিজের দৃষ্টিকে হেফাযতে রাখা চাই। অন্তরকে পবিত্র রাখা চাই। মহিলাদের জন্য নিজেদের সতীত্ব ও সম্ভ্রম সংরক্ষণ করা গুরুদায়িত্ব এবং ফরজ বিধানসমূহের মধ্যে অনন্য বিধান। গাড়িচালক যেমন সতর্ক থাকে, সামনের কোনো গাড়ি যাতে আমার গাড়িকে ধাক্কা না দেয়। অন্যথায় আমার ও সকল যাত্রীসহ আমার গাড়ির সর্বনাশ হয়ে যাবে। তেমনিভাবে তোমরা নারীরা ভাবতে হবে, সম্মুখে আগত সকল পুরুষ আমার ইজ্জত নামক গাড়ির সঙ্গে টক্কর লাগাতে চায়। সুতরাং আমার গাড়ি

আমাকে সাবধানে চালাতে হবে। আমার গাড়ি বাঁচানোর দায়িত্ব আমার, চালক কখনো গাড়ি চালাতে উদাসীন হয় না। সে একথা মনে করে না যে, আমার গাড়ি আমি চালাচ্ছি। অন্যদের গাড়ি আমার গাড়ির সঙ্গে এক্সিডেন্ট থেকে বাঁচানো তাদের দায়িত্ব। আমার করার কিছু নেই। চালক নিজেকে নিজে এ্যাকসিডেন্ট থেকে বাঁচিয়ে গাড়ি চালায়। তেমনিভাবে নারীরা নিজেকে নিজে হেফাযত করে চলতে হবে, যাতে এ্যাকসিডেন্ট না হয়। শরীয়ত তাকে শুরু থেকেই এভাবে চলার নির্দেশ দিয়েছে।

বলা হচ্ছে, নারী-পুরুষের সম্মিলিত অনুষ্ঠান থেকে বেঁচে থাকো। সুতরাং মহিলারা শুধু ওই সমস্ত পুরুষের সামনে আসতে পারবে, যারা তার জন্য মাহরাম, যেখানে লাজুকতার সম্পর্ক রয়েছে, যেখানে তাকে নিয়ে মানবিক কল্পনায় পরিসমাপ্তি হয়েছে। মহব্বত-ভালোবাসা সত্য। তবে এটা পরপুরুষের সঙ্গে নয়, নিজের পিতা, ভাই তথা মাহরাম ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে। যেখানে এর চেয়ে এক কদম বেড়ে যাবে, সেখানেই চোখে লালসার ছাপ দেখা যাবে, মানবিক চাহিদার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে, শরীয়ত যেখানে পর্দার নির্দেশ দিয়েছে। এজন্যই কোনো গায়রে মাহরাম নিজের পরিবারে অবস্থান করলে তার থেকে পর্দা করে থাকা একান্ত কর্তব্য। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَلْكَوْرُ مَوْتٌ

'দেবর হলো মৃত্যু।'

সুতরাং সে গায়রে মাহরাম; তবে থাকে কিন্তু নিকটে। তাই তার থেকে সর্তক থাকা মহিলাদের জন্য অতি জরুরি। এর সহজ পন্থা হলো যথাসম্ভব গায়রে মাহরামের সঙ্গে কথা না বলা। রমণীগণ এই নিয়ম বানিয়ে নেবে যে, গায়রে মাহরাম পুরুষের সঙ্গে যেন কথা বলার প্রয়োজনই দেখা না দেয়। এমন সুযোগই যেন না হয় যে, গায়রে মাহরামের সঙ্গে কথা বলতে হবে। এমনভাবে সে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে, যাতে গায়রে মাহরামকে দেখতে না হয় এবং সেও যেন তার দেহ দেখতে না পারে এবং তার সঙ্গে যেন কোনো প্রকার কথা-ই না হয়। কারণ, যদি তার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন হয়, তাহলে মধ্য থেকে শয়তান ফোন করার সুযোগ খুঁজবে।

জাহান্নামের ফোন

হাদীছ শরীফে এসেছে, যখন কোনো বেগানা নারী-পুরুষ পরস্পর কথা বলে, তখন শয়তান তাদের উভয়ের হৃদয়ে একে অপরের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে দেয়। একজন অপরজনের প্রতি দুর্বল হয়ে যায়। মধ্যখানে শয়তান পথপ্রদর্শক হয়ে কাজ করার সুযোগ পায়। সুতরাং এমন সুযোগই যেন না হয় যে, কখনো কোনো গায়রে মাহরামকে চিঠি দিতে হয়। টেলিফোনে তার সঙ্গে কথা বলতে হয় অথবা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হয়। এমন সুযোগ দেয়া থেকে যে-রমণী বেঁচে গেল, সে যেন নিজের ইজ্জত-সম্ভ্রম সংরক্ষণ করল।

বর্তমানে আরেকটা মহামারি দেখা দিচ্ছে যে, যুবতি মেয়েরা মাতাপিতার অনুমতিক্রমে নিজের নিকট মোবাইল ফোন রাখে। আমি অধম একটা দেশে সফর করে এসেছি, যেখানে শুনলাম, প্রায় ৯০% যুবতির হাতে মোবাইল ফোন রয়েছে। স্কুলে গিয়েও নিজের ব্যাগের মধ্যে মোবাইল ফোন রাখে। দেখা যায়, ক্লাসের মধ্যেও তার মোবাইল ফোন বেজে ওঠে। তার কাজিন, ক্লাসমেট কল করছে। একে সেলফোন বলে। মূলত এটা সেলফোন নয় বরং এটা হীলফোন (জাহান্নামের ফোন) এর নাম Hill Phone রাখা উচিত। তার হাতে জাহান্নামের ফোন। আর সেই জাহান্নাম তাকে কল করছে, তুমি তাড়াতাড়ি আস, আমি তোমার জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছি। স্মরণ রাখবেন, নারীদের সবচেয়ে বড় ভুল হচ্ছে, তারা পরপুরুষকে কথা বলার সুযোগ দেয়। কুরআন মাজীদ এই রাস্তাটা চিরতরে বন্ধের ঘোষণা দিচ্ছে। বলা হয়েছে–

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ

'তোমরা তোমাদের কথায় নম্রতা প্রকাশ করো না।'[৩৬]

অর্থাৎ– যদি কোনো কারণে গায়রে মাহরামের সঙ্গে কথা বলতেই হয়, তাহলে, তোমাদের আওয়াজে যেন নম্রতা প্রকাশ না পায়। কর্কশ আওয়াজে তাদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথা সেরে নিতে পার। এর অর্থ অশালীন আচরণ নয়। বরং এমন স্বরে কথা বলো, যাতে তোমার আওয়াজে মাধুর্য প্রকাশ না পায়। প্রয়োজনীয় কথা সেরে অতিরিক্ত কথা বলা থেকে বিরত থাকো, যাতে সে তোমার সঙ্গে অধিক সময় কথা বলার সুযোগ না পায়।

---

৩৬. সূরা আহযাব : আয়াত ৩২

পবিত্র কুরআনের উপদেশ

পবিত্র কুরআন বলছে, পরপুরুষের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথা কর্কশ আওয়াজে বলো। যদি কর্কশ স্বরে কথা বল, তাহলে কোনো পুরুষের আর দুঃসাহস হবে না, আগে বেড়ে তোমার সঙ্গে আরও কথা বলবে। আর যদি তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথা বলার সময়ও দুনিয়ার সকল মিষ্টান্নদ্রব্য এনে তোমার কথার সঙ্গে মিশ্রিত করে তার সামনে ঢেলে দাও এবং আদুরে ও সোহাগিনীর মতো কথা বল, তাহলে,

فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ

'যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, সে তোমার কথার ওপর লালসা করবে।'[৩৭]

অথচ পুরুষের হৃদয়ে কুপ্রবৃত্তির ব্যাধি তো থাকেই। সামান্য যদি কারও কোনো নম্র কথা বা আওয়াজ কিংবা ভাষার মাধুর্য পছন্দ হয়ে যায়, তবে সেই পুরুষ ভাবতে থাকবে, এই রমণী অপূর্ব কথা বলে। সে অবশ্যই কথা বলার সুযোগ দেবে। তখন সে এই রমণীর সঙ্গে কথা বলার জন্য সামনে অগ্রসর হতে থাকে। কারণ, সে তো কথা বলার সুযোগের সন্ধানেই আছে। আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম, সকল পুরুষই সুযোগসন্ধানী। তবে যাকে আল্লাহ হেফাযত করেন, যার অন্তরে আউলিয়ায়ে কেরামের নূর রয়েছে, একমাত্র সে-ই এই ফেতনা থেকে বাঁচতে পারে। নতুবা এই জগতে সকল পুরুষই এক রকম। এজন্য শরীয়ত বলেছে, একান্ত প্রয়োজনে পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলতে হলে কর্কশ ভাষায় কথা বলো। কতিপয় যুবতি কোনো-কোনো সময় কথা বলে আর ভাবে, আমি তো টেলিফোনে সামান্য কথা বলছি। সে তো আমাকে কোনোদিন দেখেনি। আমিও তাকে দেখিনি। এটা শয়তানের অনেক বড় জাল। যখন তুমি কারও সঙ্গে কথা বলার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলে তখন পরবর্তী সকল কাজ তার জন্য সহজ হয়ে গেল। দেখুন, সমস্ত নবীর মধ্যে কেউ একথা বলেননি–

رَبِّ اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ

'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে দেখা দিন আমি আপনাকে দেখতে চাই।'[৩৮]

একমাত্র মূসা (আ.)-এর ব্যাপারে একথা এসেছে। এর কারণ কী? মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন, হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে আল্লাহ

---

৩৭. সূরা আহযাব : আয়াত ৩২

৩৮. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৪৩

তা'আলার কথোপকথন হতো। যখন পরস্পর কথাবার্তা শুরু হয়ে গেল, তখন ভালোবাসা ক্রমশ সামনে অগ্রসর হতে লাগল। মন চাচ্ছে, তাকে এক নজর দেখি। মূসা (আ.) আবেদন করলেন, হে আল্লাহ! আমি আপনাকে দেখতে চাই। সুতরাং একথা কুরআন দ্বারাই প্রমানিত হলো যে, কথা বলার সুযোগ হলে সাক্ষাতের অভিপ্রায় হয়। তাই তুমি যখন কাউকে টেলিফোনে কথা বলার সুযোগ দিলে, তখন মনে কর, সামনের কদম হবে সাক্ষাতের। আর যখন সাক্ষাৎ হলো, তখন পরবর্তী সকল পর্দা উঠে গেল। আর কোনো কিছু বাকি থাকবে না। কোনো কবি বলেন–

نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا

دونو انسان ہیں تو کیو اتنے حجابوں میں ملیں

তুমি তো খোদা নও। আর আমার ভালোবাসা তো ফেরেশতার অনুরূপ নয়। উভয়েই মানুষ। তাহলে এমন পর্দার আড়ালে সাক্ষাৎ কেন?

তারপর সমস্ত পর্দা খুলে যায়। মানুষ কিছুই বুঝতে পারে না। অনুভূতি তখন হয় যখন গুনাহ সংঘটিত হয়ে যায়। সুতরাং এই গাড়ি ছাড়ার আগেই সতর্ক হওয়া জরুরি। মনে-মনে একথা ভাবনা করা যে, অমুকের গঠনাকৃতি এমন, তার ব্যক্তিত্বে অত্যন্ত সহানুভূতি রয়েছে, এটা এক নম্বরের বোকামি। কেননা, যদি আল্লাহ তার ভাগ্যে লিখে থাকেন, সে যৌবনে পদার্পণ করবে, তারপর বিয়ে করবে, তবে মানুষ তার সেই নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা অপরিহার্য। প্রত্যেক বস্তু তার উপযুক্ত সময়ে সুন্দর রূপ ধারণ করে। যেব্যক্তি তার উপযুক্ত সময়ের পূর্বে গুনাহের মাধ্যমে তার প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করে, সে সারা জীবন অস্থিরতা ভোগ করে। আপনি কোনো মানুষ এমন পাবেন না, যে পৃথিবীতে যিনার মতো অপরাধ করেছে আর সুখে জীবন যাপন করছে। বরং সে কারও সঙ্গে কথা বললেই হাজারো ভয় তার হৃদয়ে উদয় হচ্ছে। মা-বাপ, ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন সকল থেকে বিষয়টি লুকানোর প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। একটা গুনাহ করে সারা জীবনের বিপদ খরিদ করে নিচ্ছে। এখন সেই গুনাহ ঢেকে রাখার জন্য পদে-পদে মিথ্যা কথা বলতে হচ্ছে। বিভিন্ন বাহানা তৈরি করতে হচ্ছে। কথাবার্তা বলার সুযোগ করার জন্য ভুল বর্ণনা দিতে হচ্ছে। মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে কথা বলার সুযোগ বের করছে। করছে মাত্র একটা গুনাহই; কিন্তু হাজারো গুনাহের রাস্তা উন্মুক্ত করছে। কোনো-কোনো সময় তো নিজের অপরাধ চাপা দেয়ার জন্য মিথ্যা শপথ পর্যন্ত করে ফেলছে।

গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকো

একদা কোনো এক দেশ থেকে এক তরুণী চিঠি লিখে ফতোয়া জানতে চাইল। সে লিখেছে, আমি একজনের সঙ্গে নিয়মিত সাক্ষাৎ করছি। বলতে পারছি না এমন গুনাহ করছি। আমার আম্মাজান বিষয়টি আঁচ করতে পেরে আমাকে শাসাচ্ছেন। আমাকে বলছেন, তুই এমন আচরণ কীভাবে করতে পারলি? আমার মায়ের বিশ্বাসের জন্য আমি শপথ করে বলছি, আমি তার সঙ্গে কোনো প্রকার যোগাযোগ রাখিনি। মা আমার শপথও বিশ্বাস করতে পারছেন না। বলছেন, তোর শপথের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। অবশেষে আমি মাকে বিশ্বাস করানোর জন্য বলছি, যদি ওই ছেলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক থাকে, তাহলে মৃত্যুর সময় যেন আমার কালেমা নসিব না হয়।

দেখুন, এখন তো সে তার মায়ের সামনে লজ্জিত হওয়া থেকে বাঁচার জন্য সাময়িকভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে নিল। পরবর্তী কালে তার উপলব্ধি হলো, এটা আমি কী করলাম। আমার হাশর কেমন হবে? তাই সেই তরুণী চিঠির মধ্যে বলছে, হুজুর! আমাকে সঠিক সমাধান বলে দেবেন। আমি এখন দীনেরও নই, দুনিয়ারও নই। আমার পরিণাম কী হবে? এসব কেন হলো? সে একটা ভুল পথে পা বাড়াল। পরিণামে ঈমানের ধ্বংস নেমে এল। যখন একটি রাস্তা ভয়ানকই রয়েছে, তাহলে মানুষ কেন সেই পথে অগ্রসর হচ্ছে। যদি অপনার সামনে একশটি পানপাত্র রেখে বলা হয়, জনাব! এখানে একটি পাত্রে বিষ মিশ্রিত আছে আর অবশিষ্ট নিরান্নব্বইটি পাত্রে খাঁটি মধু আছে, তাহলে আপনি একটি পেয়ালাও গ্রহণ করবে না। কেন? আপনি বলবেন, এতে আমার প্রাণের আশঙ্কা রয়েছে। হে যুবতি! তোমার প্রাণের ভয় হলে এক মুহূর্তের জন্যও ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত নও। একশটি পাত্রের মধ্যেও একটি পাত্র গ্রহণ করতে রাজি হচ্ছ না। অথচ যেখানে তোমার সতীত্বের ভয়, যেখানে তোমার ইজ্জতের ভয়, সেখানে তুমি এমন ঝুঁকি নিচ্ছ কেন? আরও সামনে অগ্রসর হচ্ছ কেন? সেখানে তো আরও একশতগুণ বেশি সতর্ক থাকা চাই। কারণ, এখানে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ ইজ্জত হনন হবে। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করে তা হেফাযত করতে চাই। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।

ইজ্জত ও সতীত্বের হেফাযত এবং আল্লাহর পুরস্কার

কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবেন, তোমার সতীত্বের হেফাযত কেন করনি? এজন্যই যুবতি রমণীদের এ

অনুভূতি থাকা চাই যে, আমার জীবনে একটি জিহাদের সময় আসে। আর সেটি হচ্ছে নিজের ইজ্জত ও সম্ভ্রম হেফাযত করা। এজন্যই বলা হয়েছে, যে-মহিলা তার ইজ্জত ও সতীত্ব রক্ষা করে চলতে পারবে এবং সতী-সাধ্বী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, কেয়ামতের দিন সে শহীদগণের সারিতে উপস্থিত হবে। আল্লাহু আকবার।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মূল্যায়ন

আল্লাহ তা'আলাও তাদের যথোচিত মূল্যায়ন করেন। এক হাদীছে এসেছে, যদি কেউ কাউকে গুনাহের প্রতি আহ্বান করে, দাওয়াত দেয় আর সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি, তারপর সে গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকে, তাহলে আল্লাহ তাকে কেয়ামতের দিন আরশের নিচে স্থান দেবেন। সুবহানাল্লাহ। এ নেয়ামত কীভাবে অর্জিত হলো? কারণ, সে নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

অতি মনোযোগের বিষয়

একটি কথা স্মরণ রাখবেন এবং ভালো করে বুঝবার চেষ্টা করবেন। তা হলো, মানবজীবনের প্রত্যেকটি কাজের আলাদা কোটা রয়েছে। শ্বাস-নিঃশ্বাসের আলাদা কোটা রয়েছে। সারা জীবনে কতটি শ্বাস গ্রহণ করেছে, তার হিসাব সংরক্ষিত রয়েছে। কত লুকমা খাবার খেয়েছে, তার আলাদা কোটা রয়েছে। আলাদা হিসাব আছে। কত ঢোক পানি পান করেছে, তার হিসাব আছে। কত সময় পৃথিবীতে বেঁচে ছিল, তার হিসাব আছে। এক কথায় প্রত্যেক কাজের জন্য স্বতন্ত্র কোটা আছে। এমনিভাবে জীবনে সে কতবার জৈবিক চাহিদা পূরণ করবে, তা-ও নির্ধারিত রয়েছে। অতএব, যেব্যক্তি হারাম পন্থায় নিজের চাহিদা পূরণ করবে, এর প্রতিদানে আল্লাহ তা'আলা তাকে হালাল পন্থায় এই চাহিদা উপভোগ করা থেকে বঞ্চিত করবেন। তারপর ফলাফল কী হবে? কান্নাকাটি শুরু হবে যে, আমার স্বামী আমার প্রতি তাকাচ্ছে না, আমার স্বামী অন্যমনস্ক হয়ে আছে। বলতে থাকে, এখন কী করব? আমার জীবনে কোনো সুখ নেই, স্বামী আমার সঙ্গে খুশি মনে কোনো কথা বলছে না। তা এজন্যই যে, তুমি যখন শরীয়তের সীমা অতিক্রম করে অন্যের প্রতি ভালোবাসা স্থাপন করার চেষ্টা করেছ, তখন আল্লাহ তোমাকে জায়েয ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করেছেন। সুতরাং এটা অত্যন্ত ভয়ের বিষয়। এর সম্পর্ক হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার ভয়ের সঙ্গে, যার

অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয় থাকবে, সে তার ইজ্জত ও সম্ভ্রম হেফাযত করবে এবং সাময়িক আমোদ-প্রমোদের বিপরীতে স্থায়ী আনন্দ ও পরকালের সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখবে এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে মাথানত করবে। যেব্যক্তি মানুষকে গুনাহের প্রতি ডাকে, সে কেয়ামতের দিন ওই সমস্ত মানুষের জন্যও আক্ষেপ করবে, যাদের সে ডেকেছিল এবং যারা তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে গুনাহে লিপ্ত হয়েছিল, তারাও তার জন্য আক্ষেপ করবে। এইমর্মে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বলেন–

يٰلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ﴿٢٧﴾ يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِيْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ﴿٢٨﴾ لَقَدْ اَضَلَّنِيْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِيْ ۗ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا ﴿٢٩﴾

'হায় আফসোস! যদি রাসূলের সঙ্গে পথ অবলম্বন করতাম। হায় আমার দুর্ভাগ্য! যদি আমি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। আমার নিকট উপদেশ আসার পর সে আমাকে বিভ্রান্ত করেছিল। শয়তান মানুষকে বিপদকালে ধোঁকা দেয়।'[৩৯]

সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা

একটি নীতিমালা বলছি। মহিলারা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। যখন কোনো পুরুষকে কোনো নারী, কোনো রমণী তার কাছে আসতে দেবে, তার সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করবে, যদিও ওই পুরুষ বলে, আমি তোমাকে বিয়ে করব, আমি তোমাকে আমার আপনজন হিসেবে পেতে চাই, এসমস্ত বাহানা অহেতুক শৈলী বই কিছুই নয়। এসব হচ্ছে গুনাহ করার সুযোগ সন্ধান করার অজুহাত। প্রত্যেক পুরুষই এমনটা করে থাকে, যারা গুনাহ করার সুযোগ খোঁজে। কারণ, সে জানে, আমি যদি কোনো রমণীকে সরাসরি বলি, আমি তোমার ইজ্জত হনন করতে চাই, আমার চাহিদা পূরণ হলে আমি আর তোমার নিকট আসব না, তাহলে কোনো মহিলা তার প্রতি ফিরেও তাকাবে না। সুতরাং এটা তার কৌশল। প্রত্যেক পুরুষ যারা কোনো রমণী সম্পর্কে শপথ করবে, ওই রমণীর প্রশংসা করবে, সে মূলত ওই নারীর প্রশংসা করে না। বরং তাকে তার প্রতি আকৃষ্ট করতে চায়। তার অন্তরে মূলত ওই মহিলার গুণগান নয়, বরং সে তার উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায়। সে সর্বদাই তার প্রশংসা করবে। এমনকি তার ভুলত্রুটি পর্যন্ত সে সত্য প্রমাণ করবে।

---

৩৯. সূরা ফুরকান : আয়াত ২৭-২৯

তারপর দ্বিতীয় কথা হলো, সে তাকে বলবে, আমি তোমাকে আমার আপনজন হিসেবে দেখতে চাই। তোমাকে আমার জীবনসাথি বানাতে চাই। আমার মনে হয়, এর চেয়ে বড় কোনো মিথ্যা কথা হতে পারে না। অতঃপর যখন ওই রমণী তার নিকট আসবে, তার ওপর বিশ্বাস করতে থাকবে। তার নিকট গা ঢাকা দেওয়া ছেড়ে তার জীবন-যৌবন ওই পুরুষের কাছে এলিয়ে দেবে। তার হাতে সবকিছু সঁপে দেবে আর তার উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে, তখন সে বিভিন্ন অজুহাত দেখাবে। ওই নারী বলবে, সব কিছু তো শেষ হয়ে গেল। এবার তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা করো। নতুবা কিছুদিন পর নতুন ইতিহাস গড়বে। লোকসমাজে মুখ দেখাতে পারব না। তখন সে বাহানা করবে, আমার আম্মু মেনে নিচ্ছেন না, আমার আব্বু মেনে নিচ্ছেন না। ভাই মানছে না, অমুক মানছে না, তমুক মানছে না। আমি তো চাই তোমাকে আমার আপন করে নিই; কিন্তু আমার ফ্যামিলি বিষয়টি মেনে নিতে পারছে না, এখন আমি কী করব। আমি তো আমার ফ্যামিলি নিয়ে থাকতে হবে। শুধু তোমার দিকে তাকিয়ে তো আমার সকল গোষ্ঠির দুশমন হতে পারব না। মোটকথা, কোনো পুরুষ কোনো রমণীকে বিয়ের আগে ভোগ করলে সে আর ওই নারীকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবে না।

গুনাহের বিপদ পৃথিবীতেই

স্মরণ রাখবেন, যে যুবক কোনো কুমারীর সঙ্গে বিয়ের পূর্বে যৌনানন্দ উপভোগ করবে এবং ওই রমণী তাকে এ কাজের সুযোগ দেবে, সে ওই রমণীকে কস্মিনকালেও বিয়ে করবে না। আমার নিকট এমন এক যুবক গুনাহ করার পর তাওবা করতে এসেছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি তাকে বিয়ে করছ না কেন? সারা জীবন তাকে আশা দিয়েছ, শপথ করে তার বিশ্বস্ত হয়ে তার সবকিছু কেড়ে নিয়ে এখন কেটে পড়তে চাচ্ছ কেন? সে পরিষ্কার ভাষায় আমাকে বলে দিল, হুজুর! আমার অন্তরে এখন সর্বদা একথাটি বিরাজ করছে যে, যে-মেয়ে কুমারী অবস্থায় অবৈধভাবে তার সবকিছু আমার নিকট সমর্পণ করতে পারল, পরবর্তী কালে তাকে বিশ্বাস করা যায় কীভাবে? আমি তাকে বিয়ে করব, তাকে নিয়ে সংসার সাজাব। সে পরে আমার চেয়ে উত্তম কোনো পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়ে এমন করবে না এর নিশ্চয়তা কী? সুতরাং তাকে জীবনসাথি করে ঘর সাজানো বোকামি ছাড়া কিছু হতে পারে না।

সুতরাং বুঝলেন কী? পুরুষের অন্তরে একথা ছেয়ে বসে যে, যে-নারী অবৈধভাবে আমার সঙ্গে এরূপ করতে পারে, সে আমার ঘরে এসে অন্যের সঙ্গে এমন করা অসম্ভব নয়। সুতরাং কোনো পুরুষ চায় না, আমার হালাল স্ত্রী অন্যের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করুক। তাই সে নিজের অভিলাষ পূর্ণ করার পর আর তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হবে না। সুতরাং সাবধান! এ পথে পা বাড়িয়ো না। তোমাকে নিয়ে পুরুষের প্রশংসা ও শপথের ওপর ভরসা করো না। এসব হলো তার ছলনা। তার কথা নিয়ে ধ্যানে পড়ো না। তার সব কিছু মিথ্যা। এটা অন্যকে জ্বলন্ত সিসায় নিক্ষেপ করার পথ। আশেপাশে চেয়ে দেখো, যারা এমন করেছে, তারা পরিশেষে চুপে-চুপে কাঁদা ছাড়া উপায় নেই। এখন এই কান্নার ফায়েদা কী? এমন কান্নার রাস্তায় পা না বাড়ালেই তো হতো। যখন জানতে পারলে, এই রাস্তায় ঈমানের শঙ্ক আছে, ইজ্জতের ভয় আছে, তবে সেই রাস্তায় পা বাড়াচ্ছিলে কেন?

এজন্যই শরীয়ত নির্দেশ দিচ্ছে, নারীরা তাদের সতীত্ব ও পবিত্রতা রক্ষা করবে। কারও সাজানো মিষ্টি কথার ফাঁদে পড়বে না। এটা তাদের গুরুদায়িত্ব।

বোরকার সরলতা

এজন্যই মহিলাদের বলা হয়েছে, ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পর্দা করে বের হও এবং পর্দাও এমনভাবে করবে না যে, রাস্তায় বের হলে সেই পর্দার দিকে মানুষ অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকে। যুবতীরা বোরকা পরিধান করে। তবে এমন পুঁতিগাঁথা মনোরম সুন্দর বোরকা, যা দেখে মানুষ ভাবতে থাকে, না জানি এই বোরকার ভেতর কোন হুর-পরী লুকিয়ে আছে। এটা ভিন্ন কথা যে, এর মধ্যে কোনো কালো ভূতের বোনও থাকতে পারে। যখন পর্দা করবে, তখন স্মরণ রাখতে হবে, পর্দা করার অর্থ এটা নয় যে, আমার পর্দার প্রতি মানুষের মন আকৃষ্ট হোক। তারা বোরকাতে মোতি স্থাপন করে, উত্তম চিত্তাকর্ষক এম্ব্রয়ডারি করে, তারপর কুমারী মেয়ের মতো চলে। যাচ্ছে বুড়ি; কিন্তু সেজেছে কুমারী। কুমারী মেয়ে যদিও এমন বোরকা পরিধান করে, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। তবে তার জন্যও কিন্তু এমন বোরকা জায়েয নয়।

যুবতি রমণীরা এমন সাজসজ্জা করে রাস্তায় চলা, যার দ্বারা পরপুরুষের নজর অনিচ্ছায়ও তাদের ওপর পড়ে যায় এটা গুনাহের দাওয়াত দেওয়ার নামান্তর। সুতরাং এমন না করা চাই। যুবতিরা সাদাসিধে বোরকা পড়ে ঘর থেকে বের হবে, যাতে কারও নজর তোমার প্রতি না পড়ে। কিতাবে লেখা

আছে, আগের যুগের যুবতিরা রাস্তায় বৃদ্ধা মহিলার বেশ ধরে চলত, যাতে কোনো পুরুষ তাদের প্রতি আকর্ষিক দৃষ্টিতে না তাকায়। তারা এটা করত আল্লাহর ভয়ে।

মহিলা ও সুগন্ধি ব্যবহার

এজন্যই শরীয়ত বলেছে, মহিলারা পর্দা করে ঘর থেকে বের হবে এবং এমন সুগন্ধি ব্যবহার করবে না, যার দরুন রাস্তায় চলার সময় পুরুষ তার সুগন্ধি অনুভব করতে পারে। এক হাদীছে এসেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে-নারী সুগন্ধি ব্যবহার করে পরপুরুষের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, সে এমন-এমন। মুফাসসিরীনে কেরাম 'এমন-এমন'-এর তরজমা করেন, সে ব্যভিচারিণী। তার নিয়তে বিশৃঙ্খলা আছে। তাই সে সুগন্ধি ব্যবহার করে রাস্তায় বের হয়েছে। শরীয়ত পুরুষদের এ অনুমতি দিয়েছেন যে, তার সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ে এমন সুগন্ধি তারা ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু মহিলাদের এমন সুগন্ধি ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। তারা এমন সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে, যার সুঘ্রাণ শুধু তাদের নিকটের, ঘরের লোক অনুভব করতে পারে। বর্তমানে ব্যাপারটা উল্টো হয়েছে। তারা বলে, আমরা এমন সুগন্ধি ব্যবহার করব যে, আমরা যে-গলি দিয়ে হাঁটব, সেই গলি দিয়ে আমাদের পরে আগমনকারীরা যেন সেই সুগন্ধি অনুভব করতে পারে এবং বলে, আহ! এদিক দিয়ে কে গমন করেছে!

একটি সূক্ষ্ম ব্যাপার

এটি এমন একটি সূক্ষ্ম ব্যাপার যে, মহিলারা যে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছে, যদি সেই রাস্তায় তার পায়ের চিহ্ন পড়ে যায় এবং পরবর্তী কালে ওই রাস্তা দিয়ে কোনো পুরুষ যায় আর ওই মহিলার পদাঙ্কে তার কদম পড়ে, তাহলে এর কারণেও ওই পুরুষের অন্তরে সেই মহিলার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে যায়। মিস্টার ইবলিস তার অন্তরে ওই মহিলার প্রতি আবেগ সৃষ্টি করে দেয়। কাজেই এটা খুবই সূক্ষ্ম বিষয়, এজন্যই শরীয়ত মহিলাদের পর্দার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। পর্দার ব্যাপারে হাদীছে অনেক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অতএব, যুবতিদের জন্য উচিত তারা পর্দাকে সর্বদা নিজের ওপর একটি জিহাদ মনে করবে এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করবে, হে আল্লাহ! আমাকে এ জিহাদে বিজয় দান করুন। এর প্রতিদানে কী পাবে? আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি পাবে। ঘটনাক্রমে যদি কারও প্রতি অন্তরের টান

কোনো কবি বলেন–

در جوانی توبہ کردن شیوہ پیمبری * وقت پیری گرگ ظالم شود پرہیزگار

'যৌবনে তাওবা করা (গুনাহের কাজ পরিহার করা) নবীগণের চরিত্র। কেননা, বার্ধক্যে অত্যাচারী হিংস্র বাঘও সাধু হয়ে যায়।'

যুবকদের দু'আ আল্লাহর দরবারে গৃহীত

কোনো এক বুযুর্গ ছিলেন। যখনই তাঁর কোনো প্রয়োজন হতো, দু'আ করার প্রয়োজন মনে করতেন, তখন তিনি কোনো দীনদার পুণ্যবান যুবকের মাধ্যমে দু'আ করাতেন। কেউ জিজ্ঞাসা করল, হুজুর! আপনি এত বড় একজন বুযুর্গ, আপনার মুখে সাদা দাড়ি, আপনি ওই সমস্ত যুবক দিয়ে দু'আ করাচ্ছেন কেন? তিনি বললেন, যে-যুবক নিজের যৌবনের হেফাযত করে, সে যখন দু'আর জন্য হাত উঠায়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।

সুতরাং ভাই! আপনার-আমার এই যৌবনকে ইবাদাতের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা চাই। নিজেকে সকল প্রকার গুনাহের সুযোগ থেকে হেফাযত করবেন।

শয়তানের বাধাদানকারী বাহিনী

বর্তমানে যারা হজমশক্তি বিষয়ে লেখাপড়া করে, তাদের সর্বপ্রথম বিষয়বস্তু হচ্ছে তিনজন তরুণী ও তিনটি বাহিনী নিয়ে কম্পিউটারে বসে গেল। সেটিং শুরু হয়ে গেল। আর যদি ঘরে টিভি থাকে, তাহলে মনে করুন, আপনার ঘরে শয়তানের বাধাদানকারী বাহিনী বিদ্যমান রয়েছে। এটা মূলত T V নয়– এটা হচ্ছে ঈমানের T B যা ঈমানকে ধ্বংস করা ছাড়া শান্ত হয় না। এটা থাকলে সতীত্ব হেফাযত হবে কোত্থেকে? সন্তানরা মাতাপিতার নাকের ডগায় বাতি জ্বালিয়ে দেয়। তারা কী করছে সে সম্পর্কে তাদের মাতাপিতাকে বুঝতেও দেয় না। তারা এমন-এমন কাজ করে, এমন এমন প্লান করে যে, কানকেও শুনতে দেয় না। শরীয়ত নির্দেশ দিয়েছিল, এক হাতে আল্লাহর রাস্তায় দান কর, যাতে অপর হাতে জানতে না পারে। আর আজকাল মানুষেরা এমন করছে যে, এক হাতে পাপ করছে, তার অপর হাত জানতে পারছে না। কিন্তু জেনে রেখো, এমন লুকোচুরি কতদিন চলবে? মানুষ থেকে লুকিয়ে রাখতে পার। তবে যিনি অন্তরের গোপন রহস্য জানেন, তাঁর থেকে লুকাবে কী করে। তাঁকে কী জবাব দেবে?

সতীত্ব ও পবিত্রতা রক্ষার সহজ উপায়

এর উপায় হলো সন্তান উপযুক্ত বয়সে উপনীত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে উপযুক্ত পাত্র দেখে তাদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া। বর্তমানে কতক পরিবার এই অপেক্ষায় থাকে যে, নতুন ঘর বানিয়ে সন্তানের বিয়ে দেব। যারা ঘর নির্মাণ করার অজুহাতে উপযুক্ত সন্তানের বিয়ে বিলম্ব করে, ফলে যদি ওই সন্তান গুনাহে লিপ্ত হয়, তাহলে এই অপরাধের কারণে তাদের মাতাপিতাকে পরকালে জাহান্নামে যেতে হবে। নিজে বুড়া হয়ে গেছে। এখন ভাবছে, বার্ধক্যের দরুন আমাদের মন যেমন অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় না, তেমনি মনে হয় যুব সম্প্রদায়ের ভাবনা-কল্পনাও শিথিল হয়ে গেছে।

শাহ আতাউল্লাহ বোখারি (রহ.)-এর বেদনাপূর্ণ উপদেশ

সৈয়দ আতাউল্লাহ বোখারি (রহ.) কোথাও মেহমান হয়েছিলেন। জানতে পারলেন, ওই ঘরে বিবাহযোগ্যা যুবতি মেয়ে আছে। তিনি তাদের বললেন, যুবতি মেয়ের বিবাহ তাড়াতাড়ি সম্পাদন করো। মেয়ের মা বলল, হুজুর! আমার মেয়ের মুখ থেকে এখনো শৈশবের দুধের ঘ্রাণ দূর হয়নি আর আপনি বলছেন, মেয়ের বিবাহ দিয়ে দেব। হুজুর বললেন, আম্মাজান! সেই দুধ বিনষ্ট হয়ে গেলে অবশেষে কুকুর ছাড়া কেউ পান করবে না। কোনো মানুষ তার ধারেকাছেও যাবে না। বুঝতে পারি না, মানুষ কেন যুবতি মেয়ের বিয়েতে বিলম্ব করে। পরিশেষে ইজ্জত হনন হওয়ার পর বিয়ের ব্যবস্থা করবে। অথচ শরীয়ত বলেছে, আমরা প্রথমে এই ফরজ দায়িত্ব পালন করব। তারপর নিজেদের ইজ্জত ও সতীত্ব রক্ষা করে পবিত্র জীবন গড়ব।

মহিলাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব

যে-রমণীকে আল্লাহ তা'আলা সতী-সাধবী রেখে উপযুক্ত স্বামী দান করেছেন, তারপর সন্তানাদিও দান করেছেন, তাদের জন্য উচিত কস্মিনকালেও যেন কোনো পরপুরুষের প্রতি চোখ তুলে না থাকায়। এমন যেন না হয় যে, তার অপরাধের দরুন আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রদত্ত নেয়ামত ফিরিয়ে নিয়ে যান। এজন্য সকল মহিলাদের নিজের ইজ্জত ও সতীত্ব রক্ষা করে চলা সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।

চোখের পলক কত ছোট! কেমন দ্রুতগামী!

আল্লাহ তা'আলা সবার চোখে পলক দিয়েছেন। তবে তুমি জান যে, তা কত ছোট এবং কি পরিমাণ দ্রুতগামী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সারা পৃথিবীর

প্রতি পলক মারা একটি সাধারণ উদাহরণ হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলা চোখকে এমন বানিয়ে দিয়েছেন যে, মুহূর্তের মধ্যে পলক মেরে চোখ বন্ধ করে দেয়া যায়। আল্লাহ যদি এখানে কোনো ধীরগতির কোনো পর্দা দিতেন, তাহলে মানুষ এই বাহানা করত যে, হে আল্লাহ! আমি সেটা বন্ধ করতে চেয়েছিলাম; কিন্তু বন্ধ করতে-করতে সেদিকে দৃষ্টি পড়ে গেছে। তাই আল্লাহ সারা দেহের মধ্যে দ্রুত কার্যকরী বানিয়েছেন মানুষের চোখের পলক, যাতে কেয়ামতের দিন মানুষ চোখের ব্যাপারে কোনো প্রকার অজুহাত পেশ না করতে পারে।

আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর বয়ান

সায়্যেদা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রহ.) বলেন, আমি আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখে এমন লাজুকতা দেখেছি, যা মদীনার কুমারী রমণীদের চোখেও দেখা যেত না।

লাজুকতা হচ্ছে ঈমান

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীছে বলেন–

لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَّا غَيْرَةَ لَهٗ

যার লাজুকতা নেই, তার ঈমান নেই।

অন্য হাদীছ বলেছেন–

اَنَا اَغْيَرُ وُلْدِ اٰدَمَ

সমস্ত আদম সন্তানের মধ্যে আমি সবচেয়ে বেশি লজ্জাশীল।

وَاللّٰهُ اَغْيَرُ مِنِّيْ

আর আল্লাহ তা'আলা আমার চেয়েও অধিক লজ্জাশীল।

না-মাহরামের সঙ্গে নির্জনতা বিপদের সংবাদ

হাদীছ শরীফে এসেছে, কোনো বেগানা নারী ও পুরুষের জন্য এটা শোভা পায় না, শরীয়তও অনুমতি দেয় না যে, তারা পরস্পরে কোথাও নির্জনে বসবে। এজন্যই আমাদের মাশায়েখগণ বলেছেন, হাসান বসরির মতো ধার্মিক ওস্তাদ এবং রাবেয়া বসরির মতো ধর্মানুরাগী ছাত্রীও যদি নির্জনে বসে আর একে অপরকে পবিত্র কুরআন শিক্ষা দেয়, তবু শয়তান তাদের মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য হাসিল করে নেবে। অর্থাৎ– গুনাহে লিপ্ত করে দেবে।

সংস্কৃতির ভয়াবহ ক্ষতি

হাদীছ শরীফে এসেছে, গান-বাজনা, সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শ্রবণ করা কানের যিনা। এক হাদীছে এসেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি বাদ্যযন্ত্র চুরমার করার জন্য আগমন করেছি। অন্য এক হাদীছে এসেছে, গান-বাজনা শুনলে অন্তরে যিনার আগ্রহ এমনভাবে উদ্রেক হয়, যেভাবে বিরান ভূমিতে বৃষ্টির ফলে উদ্ভিদ জন্মায়। এজন্যই যে-যুবতিরা গান-বাজনার প্রতি আকৃষ্ট হয়, প্রকৃত পক্ষে তারা গুনাহের কাজের জন্য আকৃষ্ট হচ্ছে। সেই আর্কষণ তাকে গুনাহের কাজে লিপ্ত করবে।

কাজেই নিজেকে গান-বাজনা থেকে বাঁচিয়ে রাখো। শরীয়ত এতটুকু পর্যন্ত বলেছে যে, বেপর্দা মহিলারা পাপিষ্ঠা। সতী-সাধ্বী রমণীরা যেন ওই সমস্ত পাপিষ্ঠা মহিলাদের থেকেও পর্দা করে চলে। কারণ, বেপর্দা পাপিষ্ঠা মহিলারা বেগানা পুরুষের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। শরীয়ত বলে, বিবাহিতা নারীরা যেন তাদের স্বামীর সঙ্গে বিশেষ আমোদ-প্রমোদের কথা কোনো যুবতিদের নিকট আলাপ না করে। যদি কোনো মহিলা এমন করে, তাহলে শরীয়ত তাকে নিকৃষ্ট মহিলা বলে আখ্যায়িত করে।

সবচেয়ে উত্তম রমণী

একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাহফিলে আলোচনা চলছিল, সবচেয়ে উত্তম মহিলা কে? অনেকেই যার-যার উত্তর দিয়েছেন। এমন সময় সায়্যেদুনা আলী (রাযি.) কোনো প্রয়োজনে ঘরে চলে যান। ঘরে যাওয়ার পর তাঁর একথা স্মরণ হয়। তিনি বেহেশতী রমণীদের নেত্রী হযরত ফাতেমা (রাযি.)-এর নিকট বললেন, আজ নবীজির দরবারে এই আলোচনা হচ্ছে যে, সবচেয়ে উত্তম মহিলা কে? একথা শুনে হযরত ফাতেমা বললেন, আমি বলব কি সবচেয়ে উত্তম রমণী কে? আলী (রাযি.) বললেন, ঠিক আছে বলো। হযরত ফাতেমা (রাযি.) বললেন, যে-রমণী নিজেকে অন্য পুরুষকে দেখার সুযোগ দেয় না এবং নিজেও অন্য কোনো পুরুষকে দেখে না, সে হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম নারী। হযরত আলী (রাযি.) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে হযরত ফাতেমা (রাযি.)-এর জবাব ব্যক্ত করলেন। শুনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন এবং বললেন, ফাতেমা আমারই গোশতের টুকরা। ফাতেমা তো আমার কলিজার টুকরা। খাতুনে জান্নাত (রাযি.) বলেন, সবচেয়ে উত্তম মহিলা হচ্ছে সে, যে

নিজেকে অন্যের দৃষ্টি থেকে হেফাযত করে এবং নিজের দৃষ্টিকেও অন্যের ওপর পতিত হওয়া থেকে সংরক্ষণ করে।

শাহ আবদুল আযীয (রহ.) মুহাদ্দিছে দেহলবী-এর শিষ্যের ঈমানদীপ্ত ঘটনা

শাহ আবদুল আযীয (রহ.)-এর এক ছাত্র ছিল। একদা কোনো এক রমণী তাকে ডেকে এই বাহানায় অন্দর মহলে নিয়ে গেল যে, ভেতরে একজন রোগী আছে; তাকে একটু ঝাড়ফুঁক দিয়ে যান। ভদ্র লোকটি সরল-সহজ মানুষ ছিল। ভেতরে যাওয়ার পর মহিলা দরজা বন্ধ করে দিল। এবার তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন, মহিলার তো নিয়ত খারাপ। এখন তিনি কীভাবে গুনাহ থেকে বাঁচতে পারেন। তিনি সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, আমাকে বাথরুমে যেতে হবে। মহিলা তাকে বাথরুমটা দেখিয়ে দিলে তিনি সাথে-সাথে বাথরুমে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি টয়লেটের সমস্ত ময়লা নিজের গায়ে মেখে নিলেন। বের হওয়ার পর দুর্গন্ধ প্রকাশ হচ্ছে। তারপর যখন ওই মহিলার সামনে এলেন আর মহিলা তাকে এই অবস্থায় দেখল, সাথে দুর্গন্ধও সহ্য করতে পারছে না, তখন বলল, আমি কি জানতাম তুমি এত হীন প্রকৃতির লোক! ইতর কোথাকার! বের হও এখান থেকে!

মহিলা দরজা খুলে দিল। তিনি নিজের ঈমান রক্ষা করে সেখান থেকে বের হয়ে গেলেন। এবার সোজা মাদরাসায় চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে গোসল করলেন। ময়লা কাপড় ধুলেন। ভেজা কাপড় পরিধান করে ক্লাসে সবার পেছনে চুপ করে বসে রইলেন। তিনি কোনোদিন ক্লাসে দেরিতে আসতেন না। আজ দেরি হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর শায়খ পাঠদান বন্ধ করে বললেন, আরে! তোমাদের মধ্যে আজ এত কড়া সুগন্ধি ব্যবহার করে কে এসেছে? ছাত্ররা এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে। এমন সময় তার নিকটের এক ছাত্র বলল, হুজুর! আজ সবার শেষে যে ক্লাসে উপস্থিত হয়েছে, সে এই সুগন্ধি ব্যবহার করে এসেছে। হযরত তাকে কাছে ডাকলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এত কড়া, সুমধুর সুগন্ধি ব্যবহার করলে কেন? শায়খ যখন তাকে বারবার জিজ্ঞাসা করছেন, তখন তাকে ঘটনাটা বলতেই হলো।

তার দু-নয়ন বয়ে অশ্রু ঝরছে। পূর্ণ ঘটনা খুলে বলল। হুজুর! আমার ঈমান বাঁচানোর জন্য আমি এমন করেছি। পরিশেষে আমি গোসল করেছি। এতে আমার ক্লাসে উপস্থিত হতে দেরি হয়েছে। কিন্তু হুজুর! আমার গায়ের

যে-যে অংশে আমি পায়খানা লাগিয়েছিলাম, সেসব অংশ থেকে এই সুগন্ধি প্রকাশ হচ্ছে। কিতাবে আছে, ওই যুবক যতদিন পৃথিবীতে বেঁচে ছিল, ততদিন পর্যন্ত তার দেহ থেকে মেশক আম্বরের সুঘ্রাণ বের হচ্ছিল। কিতাবে লিখেছেন, এই ঘটনার কারণে সুগন্ধি প্রকাশ হওয়ার দরুণ তার নাম পড়ে গিয়েছিল খাজা মেশকি। মানুষেরা তাকে খাজা মেশকি বলে ডাকত। কারণ, গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি তার দেহের যে সমস্ত অঙ্গে মল লাগিয়েছিলেন, সেসব অঙ্গ থেকে সারা জীবন মেশক আম্বরের সুঘ্রাণ প্রকাশ হতো। সুবহানাল্লাহ!

প্রকৃত সৌন্দর্য

হাদীছ শরীফে এসেছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যেলোক না-মাহরাম থেকে নিজের দৃষ্টিকে হেফাযত করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ইবাদাতের মধ্যে স্বাদ দান করবেন। এটাও স্মরণ রাখবেন যে, রূপসী রমণী দেখলে অন্তর আনন্দ পায়। আর সুন্দর চবিত্রবান রমণী দেখলে অন্তর খুশি হয়। সুতরাং রূপসজ্জায় পরিহার করে নিজের চরিত্র গঠন করার চেষ্টা করো। আমি মেয়েদের বলি, উঁচা জুতা ব্যতীতও মহিলাদের লম্বা দেখা যায় যদি তার ব্যক্তিত্ব উঁচা হয়। সুরমা ছাড়াও তাদের চক্ষু সুন্দর দেখায় যদি তাদের লাজুকতা থাকে। পলকবিহীন মুচকি হাসাও তাদের সুন্দর লাগে যদি তারা লজ্জাশীল হয়। ললাটে তিলক ছাড়াও সুন্দর দেখায় যদি কপালে সেজদার আলামত থাকে। ইংরেজি একটি প্রবাদ আছে–

Wealth lost not hing lost

সম্পদ হারালে কিছুই হারাল না।

Health lost somthing lost

স্বাস্থ্য হারালে কিছুটা হারাল।

Character lost every thing lost

নৈতিকতা (চরিত্র) হারালে সব কিছুই হারিয়ে গেল।

So people Fell that charater is not a precious thisng, but can buy the most precious Thing of the world with the help of your charactce

তাই চরিত্রের মাধ্যমে মানুষ পৃথিবীর অনেক মূল্যবান বস্তু ক্রয় করতে পারে।

চরিত্র গঠনের কতিপয় দীপ্যমান নীতিমালা

একটি কথা স্মরণ রাখবেন। সারা পৃথিবীতে তাকিয়ে দেখুন, অস্ত্রের মোকাবেলা চলছে, কৃতিত্বের প্রতিযোগিতার অভাব দেখা দিচ্ছে। মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) বলতেন, চক্ষু বিগড়ে গেলে অন্তরের হেফাযত করা মুশকিল। অন্তর বিগড়ে গেলে লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ কঠিন। বুদ্ধিমান তাকেই বলে, যে অন্যের ভুল দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে। আর নির্বোধ তাকে বলে, যে নিজে অপরাধ করে, তারপর ধাক্কা খেলে বুঝে আসে। একটি স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম স্মরণ রাখবেন। সৌন্দর্যই হচ্ছে নারীদের ধ্বংসের কারণ। মহিলাদের ওপর যত প্রকার বিপদ নেমে আসে, তা তাদের সৌন্দর্যের কারণেই হয়ে থাকে।

এজন্যই শরীয়ত পুরুষদের বলেছে, তোমরা দুশ্চরিত্রা নারীদের থেকে দূরে থাকো। যদি সহজ-সরল নারীও হয় তবু তার থেকে সাবধান। যদি মা হাওয়া নিষিদ্ধ গাছটি না দেখতেন, তাহলে তাদের জান্নাত থেকে বের হওয়া অবধারিত হতো না। যদি কাবিল হাবিলের স্ত্রী আকলিমার প্রতি না তাকাত, তাহলে ভাই হত্যার অপরাধের কলঙ্ক তার মাথায় লাগত না। যদি জুলায়খা ইউসুফের প্রতি চোখ তুলে না তাকাত, তাহলে পবিত্র কুরআনে জুলায়খার অপরাধ এভাবে বিবৃত হতো না। যে বলে অমুকের ফিটনেস (গঠনাকৃতি) খুবই মনোমুগ্ধকর, তার কোনো ব্যক্তিত্ব নেই। এসবই অহেতুক প্রলাপ বই নয়। প্রকৃত ভালোবাসা তো সেটা, যা মানুষের পুণ্যময় চরিত্রের কারণে হয়ে থাকে। চেহারার সৌন্দর্য হলো কৃত্রিম। আজ যে-রমণীর চেহারা যৌবনের টলমল অবস্থায় ঝলমল করছে, এক-দুটি সন্তান হওয়ার পরপরই তার চেহারার সেই লাবণ্য দূর হয়ে যায়। ফলে তার প্রতি সকল আকর্ষণ ধূলিসাৎ হয়ে যায়। যখন বয়স একটু বেড়ে যায়, তখন তো আরও অদ্ভূত মানবের রূপ ধারণ করে।

স্বামী যদি তার স্ত্রীকে একমাত্র সৌন্দর্যের জন্যই ভালোবাসত, তাহলে কিছুদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরই সে অন্য পত্নীর সন্ধান করত। এজন্য সুখময় জীবনের ভিত্তি মানুষের বাহ্যিক সৌন্দর্যের ওপর নয়। এটা অদৃশ্য সৌন্দর্য। এটা হচ্ছে উত্তম চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ। বাহ্যিক সৌন্দর্য নশ্বর এবং উত্তম চরিত্র অবিনশ্বর। এমনিতেই কাছে থেকে দেখার তুলনায় কাউকে দূরে থেকে দেখলে সুন্দর লাগে। যদি কাছের তুলনায় কারও আওয়াজ দূরে থেকে সুন্দর লাগে, তাহলে বুঝতে হবে, সৌন্দর্যের রহস্য হলো দূরত্ব। এটাই মানবপ্রকৃতির সাধারণ নিয়ম যে, দূরে থাকলে সুন্দর দেখায় আর কাছে এলে এর বিপরীতটা প্রকাশ পায়।

জৈবিক চাহিদার শুরু ও শেষ

মানুষ গুনাহ করার আগে খুব বীরপুরুষ থাকে আর গুনাহ করার পর কাপুরুষ হয়ে যায়। তাই তো সে গুনাহ করার পর সেটা ঢাকা দেওয়ার জন্য অসংখ্য মিথ্যা বলতে থাকে। তাই বলা হয়, যৌনচাহিদা এমন একটি মিষ্টদ্রব্য, যে তার পানকারীকে ধ্বংস করে দেয়। আর সর্বজনস্বীকৃত নীতি হলো, ভালোবাসা ও শত্রুতা গোপন রাখা যায় না। যে মনে করে, আমি অমুককে ভালোবাসব অথবা অমুকের প্রতি শত্রুতা পোষণ করব এবং তা সম্পূর্ণ গোপন রাখব, সে এক নম্বরের নির্বোধ। ভালোবাসা ও শত্রুতা এমন বিষয়, যা কখনো গোপন থাকে না। যৌনচাহিদার সূচনা হয় ছোট কীটের মতো। তখন তাকে অনায়াসে নিঃশেষ করা যায়। সে সময় দমন না করলে সেটা বিরাট ভয়ানক অজগর সাপের রূপ ধারণ করে। ফলে তাকে প্রতিরোধ করা বিষম দায় হয়ে যায়। অবশেষে তা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। এজন্যই বাহ্যিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার কাজে ব্যস্ত না হয়ে অদৃশ্য ও চরিত্রের সৌন্দর্যের বৃক্ষের গোড়ায় পানি ঢালা চাই। যেভাবে কাঁটার ওপর ফুল হলে ডালের সৌন্দর্য বাড়ে, তেমনি ঘরের মধ্যে পুণ্যবান রমণী থাকলে সেই ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। ওই ঘর সম্মানের আধার হয়।

হৃদয়ে আসন দাও

একটি কথা স্মরণ রাখবেন। মানুষ অসংখ্য বস্তু থেকে আনন্দ ভোগ করে। কিন্তু মানুষ নিজেকে জয় করে যে আনন্দ পায়, সারা দুনিয়া জয় করেও সেই আনন্দ হাসিল করতে পারে না। তাই রমণীদের চাই, তারা নিজেকে নিজে জয় করে আনন্দময় জীবন গড়বে এবং মহান মালিকের দরবারে সম্মানের পাত্রী হবে।

আল্লাহর রহমতের নজর থেকে বঞ্চিত মহিলা

বিভিন্ন সূত্রে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যে, হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে-মহিলা এ উদ্দেশ্যে নিজের চুল ধৌত করে, ভাঁজ করে, মেকাপ করে, সুগন্ধি ব্যবহার করে যে, ভিন পুরুষরা আমাকে দেখে আনন্দ ভোগ করবে, তার গুনাহের শাস্তি এমন পাবে যে, আল্লাহ তা'আলা তার আমলনামায় একথা লিপিবদ্ধ করে রাখেন যে, আমি কেয়ামতের ময়দানে ওই মহিলার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাব না। এবার চিন্তা করুন কেমন শাস্তি হবে! আরও স্মরণ রাখবেন, যে-রমণী এ উদ্দেশ্যে

সাজবে, নিজের চুল আঁচড়াবে যে, পরপুরুষেরা আমাকে দেখে খুশি হবে, তাহলে আল্লাহ তার আমলনামায় লিখে দেন, আমি ওই রমণীর প্রতি কেয়ামতের দিন মহব্বতের নজরে তাকাব না। এজন্যই মহিলাদের উচিত নিজেকে পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে হেফাযত করবে। নিজের ইজ্জত ও সম্ভ্রম সংরক্ষণ করবে। তখন আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলের সাহায্যকারী হয়ে যাবেন এবং পুণ্যময় জীবন গড়ার তাওফীক দান করবেন। আর যে-গুনাহ হয়ে গেছে, তার ওপর সত্যিকারের তাওবা করো। কেননা, তাওবার জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবার সর্বদা খোলা রয়েছে। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কেউ কোনো গুনাহ করে থাকলে আল্লাহ তা'আলা সব কিছু ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ তা'আলা তো এমন মহা মহিম যে, বনী ইসরাইলের এক নর্তকী ছিল, যে হাজারো পুরুষের সঙ্গে ব্যভিচার করেছে। সে একদিন একটা তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর বদৌলতে আল্লাহ তার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুতরাং যে-মালিক এত দয়াবান, তাঁর দয়া থেকে ফায়েদা গ্রহণ করো। অতীতের গুনাহের জন্য বিনয়ের সাথে ক্ষমা প্রার্থনা কর। দয়া ও মাগফিরাতের মাস পবিত্র রমজানের কিছু ঘণ্টা এখনো বাকি আছে। এ সময়ের মধ্যে সত্যিকারের তাওবা করে করুণাময় প্রভুর দরবারে ক্ষমা চাও। আমার বন্ধুদের অনুরোধে আমি আগামী কালের আলোচনা মৃত্যু ও তাওবা সম্পর্কে ঠিক করেছি, যে-বিষয়ে আগামীকাল বয়ান হবে। যারা তাওবা করতে চান, আগামীকাল বয়ানের পর তাদের সুন্নত তরিকায় তাওবার শব্দ পাঠ করিয়ে দেব, যাতে আল্লাহ আমাদের পুণ্যময় জীবন দান করেন। আমীন।

সৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইবে আল্লাহ তোমার অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন করে দেবেন। বলা হয়েছে, যে কারও প্রতি আসক্ত হলো, তারপর তার এই ভালোবাসা গোপন করল, সে শহীদের সমতুল্য।

মহা প্রতিদান

যার অন্তরে কারও প্রতি আসক্তি এসে গেল, তারপর সে তা গোপন রাখল, এমতাবস্থায় যদি তার মৃত্যু হয়, তাহলে সে কেয়ামতের দিন শহীদের সম্মান পাবে। এজন্যই নিজের ইজ্জত ও সতীত্ব রক্ষা করা মহিলাদের অনেক বড় দায়িত্ব। এর জন্য সে যেরকম সর্তকতা অবলম্বন করছে, এটা স্বল্প আরও বেশি করা চাই। কারণ, নিজের ইজ্জত ও সতীত্ব রক্ষার্থে সে যতটা বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করবে, যত রকম অন্যায় কাজ থেকে সে বেঁচে থাকবে, প্রত্যেকটি কাজে সে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রতিদান পাবে।

শরয়ী সতকর্তাসমূহ

শরীয়ত তো এতটুকু পর্যন্ত বলেছে যে, মহিলারা নিজের জামাকাপড় পর্যন্ত এমন জায়গায় রাখবে না, এমন স্থানে শুকাতে দেবে না, যেখানে পরপুরুষের দৃষ্টি পড়তে পারে। নিজের নামটিও কোনো পরপুরুষকে শোনাবে না। নিজের নামকেও পর্দায় রাখতে বলা হয়েছে। প্রয়োজন হলে অমুকের মেয়ে, অমুকের স্ত্রী অমুকের মা বলা যেতে পারে। আর এ সমস্ত সতর্কতার কারণ হচ্ছে, যাতে শয়তান এর মধ্যেও কোনো সুযোগ খুঁজে না পায়।

যৌবনকালে তাওবা করা নবীগণের চরিত্র

প্ররোচনা দিয়ে গুনাহে লিপ্তকারী মহা চতুর মিস্টার ইবলিস বলে, নারীরা আমার এমন বর্শা, যার লক্ষ্য কখনো ভুল হয় না। হাদীছ শরীফে এসেছে–

اَلنِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ

'মহিলারা শয়তানের রশি।'

এজন্যই শয়তান সেই সূরতে নারী-পুরুষ সকলের হৃদয়ে প্ররোচনা দিয়ে গুনাহে লিপ্ত করে এবং এ থেকে বেঁচে থাকা নারী-পুরুষ সকলের একান্ত কর্তব্য। সুতরাং যে নিজের যৌবনে সতী-সাধ্বী হয়েছে, পবিত্র জীবন গড়েছে, সে কৃতকার্য হয়েছে। কারণ, আল্লাহ তা'আলার নিকট পবিত্র জীবনের অনেক মূল্য রয়েছে।

মহিলাদের উদ্দেশে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা

'যে বান্দা গুনাহ করতে-করতে চুল সাদা করেছে, নামাযের জন্য কখনো মসজিদে আসেনি, তার জীবনসাথি সহধর্মিণীও এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। সন্তানরাও দূরে চলে গেছে। ভাই-বোনরা এমনকি কোনো আত্মীয় তার খোঁজখবর নিচ্ছে না। কারও ঘরে দু-চার দিন থাকলে তারাও এই বলে তাড়িয়ে দিচ্ছে যে, তোমার কাশির জ্বালায় আমার বাচ্চারা ঘুমাতে পারছে না। বুড়া বাবু! তুমি এখন আমাদের বাড়ি থেকে চলে যাও। এবার ওই বৃদ্ধের মাথা রাখার মতো ঠাঁই নেই। সে এখন কোথায় যাবে? কে তাকে এক মুঠ ভাত খাওয়াবে? কে তার অসুস্থতায় সেবা করবে? কে তার ভালো-মন্দের খবর নেবে? হাতে লাঠি নিয়ে ঘর থেকে এ অবস্থায় বের হলো যে, মুখে দাঁত নেই, পেটে আঁত নেই। চোখে নেই দর্শন, কানে নেই শ্রবণ। গায়ে নেই শক্তি। হাতে ধরছে লাঠি। এবার সেই লাঠিতে ভর করে চলছে আর ভাবছে, এখন আমি কোথায় যাব। অবশেষে স্থির করল, এ পৃথিবীতে কারও দরবারে যেহেতু যাওয়ার ব্যবস্থা নেই, সুতরাং পরম করুণাময় মালিকের দরবারেই হাজিরা দেই। এছাড়া অন্য কোনো দরজা নেই, যেখানে আমি কড়া নাড়তে পারব। সবাই আমাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে। সুতরাং এখানেই হাঁক দেই। হাঁপাতে-হাঁপাতে কাঁপতে-কাঁপতে যদি সে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়, তাহলে আল্লাহ তাকে তিরষ্কার করে তাড়িয়ে দেবেন না। একথা বলবেন না যে, তোমার যৌবনকাল কোথায় ব্যয় করেছ? তোমার ধনসম্পদ কী হয়েছে? তোমার সৌন্দর্য কোথায় গেছে? যৌবনে তুমি অন্যের পেছনে দৌড়িয়েছ, তুমি বড় সৌন্দর্যপূজারি ছিলে। সবকিছু হারিয়ে এখন আমার দরবারের কথা তোমার স্মরণ হয়েছে। এটা বলবেন না যে, হে বুড়া! সারাটা জীবন কাটিয়ে এখন আমার দরবারে কী নিয়ে এসেছ? বরং বলবেন, হে বৃদ্ধ! তুমি কী আবদার নিয়ে আমার দরবারে হাজির হয়েছ? আমার কাছে তুমি কী চাও?'

মহিলাদের উদ্দেশে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ط

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর দরবারে তাওবা করো তাওবায়ে নাসূহ (সত্যিকারের তাওবা)।'[৪০]

দুটি মৌলিক কথা

আল্লাহ মানবজাতিকে সৃষ্টিলগ্নেই তার হৃদয়ে সৎকর্ম ও দুস্কৃতি দুটি বিষয় গচ্ছিত রেখেছেন। আল্লাহ বলেন–

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝

'শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন। তারপর তাকে তার সৎকর্ম ও অসৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন।'[৪১]

সর্বপ্রথম তো এ আদেশের ভাগীদার হয়েছে সেই ব্যক্তি, যে তার সৎকর্মকে প্রাধান্য দেবে, সে উত্তম মানব হবে। আর যে তার অসৎকর্মকে প্রাধান্য দেবে, সে নিকৃষ্ট মানব হবে। সুতরাং যার আপাদমস্তক সৎকর্ম, তার নাম ফেরেশতা এবং যার আপাদমস্তক অসৎকর্ম, তার নাম মিস্টার শয়তান। যার মধ্যে সৎকর্ম ও অসৎকর্মের সমষ্টি রয়েছে, তার নাম মানুষ।

সমাজের প্রভাব

পৃথিবীর সকল মানুষের মধেই সৎকর্ম ও অসৎকর্ম থাকে। পার্থক্য এতটুকু যে, পুণ্যময় সুশীল সমাজে সৎকর্মের প্রাধান্য পাবেন এবং সত্য সম্পর্কে

---

৪০. সূরা তাহরীম : আয়াত ৮
৪১. সূরা আশশাম্‌স : আয়াত ৭, ৮

উদাসীন সমাজে অসৎকর্মের প্রাধান্য পাবেন। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পরহেযগার ও ধর্মানুরাগী ব্যক্তিকে অন্যায় ও উদাসীন সমাজে ছেড়ে দিন; দেখবেন, তার মধ্যে অধঃপতনের মন-মাসিকতা সৃষ্টি হয়ে যাবে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসীকে পুণ্যময় সুশীল সমাজে ছেড়ে দিন, আস্তে-আস্তে তার মধ্যে পরিশুদ্ধির মনোভাব সৃষ্টি হয়ে যাবে। এজন্য উত্তম মানুষ ওই ব্যক্তি, যে নিজে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে এবং গুনাহের পরিবেশ থেকেও দূরে থেকে সুশীল সমাজে বাস করে।

আল্লাহর অপূর্ব দয়াসমূহ

মানুষ ভুলের আধার। কোনো কিছু অতিদ্রুত ভুলে যায়। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে প্রায় ৭০০বারের অধিক বলেছেন, اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ নামায কায়েম করো। অথচ আল্লাহ তা'আলার শানের সমীচীন ছিল যে, সারা কুরআন শরীফে একবার ঘোষণা দেবেন, اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ নামায কায়েম করো। এতেই বান্দার জন্য নামায কায়েম করা ফরজ হয়ে যেত এবং শাহী ফরমানের শিষ্টাচারের দাবিও মাত্র একবার আদেশ জারি করা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জানেন, আমার বান্দা ভুলপ্রবণ, তারা ভুলকারী। তাই অনুগ্রহ করে বারবার বলেছেন।

পবিত্র কুরআন বলে–

اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

'নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অতিশয় দয়াবান।'[৪২]

সেই দয়ার ভিত্তিতে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ৭০০বারেরও বেশি নামাযের কথা বলেছেন।

তাওবার প্রভাব

সুতরাং মানুষ পুণ্যময় সুশীল সমাজে থাকলে নেকির ওপর অটল থাকা সহজ হয় এবং যদি কোনো প্রকার ত্রুটি হয়ে যায়, তাহলে তাওবা করতে দেরি করে না। তাওবা ওই আমলের নাম, যার দ্বারা আল্লাহ গুনাহ মোচন করে দেন। এমনকি একান্ত নিষ্ঠার সাথে সত্যিকারের তাওবা করলে আল্লাহ তার গুনাহকে নেকির দ্বারা পরিবর্তন করে দেন।

---

৪২. সূরা বাকারা : আয়াত ১৪৩

হাদীছ শরীফে এসেছে–

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهُ

'গুনাহ থেকে তাওবাকারী এমন হয় যেন তার কোনো গুনাহই নেই।'

এবং যদি অতিশয় বিনয়ের সাথে লজ্জিত হয়, অন্তরে লাঞ্ছনার আগুন প্রজ্বালিত করে যে, আমি তো গুনাহ করে ফেলছি। আমি একাজটা কেন করলাম? আমার জন্য এটা না করা উচিত ছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা তার অনুতপ্ত হওয়াকে এমন পছন্দ করেন যে, আল্লাহ বলেন–

فَأُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ

'আল্লাহ তা'আলা তাদের অপরাধ পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেন।'[৪৩]

এটা কত বড় খুশির কথা। সুতরাং লোমনাশক পাউডার ব্যবহার করলে যেমন সমস্ত চুল পরিষ্কার হয়ে যায়, তেমনি যেব্যক্তি তাওবা করে, তার সমস্ত গুনাহ পরিষ্কার হয়ে যায়। অতএব, তাড়াতাড়ি তাওবা করা চাই। প্রথমত গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে। আর যদিও কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়ে যায়, তাহলে সাথে-সাথে তাওবা করবে।

অস্থিরতার কারণ কী?

গুনাহের মধ্যে মানুষের জন্য দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং আখেরাতে বঞ্চনা। এজন্যই গুনাহ থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে থাকা চাই। প্রত্যেক বস্তুরই একটি প্রভাব আছে। যেমন– আগুন গরম, বরফ ঠান্ডা। এটা সেগুলোর নিজ-নিজ প্রভাব। এমনিভাবে গুনাহের প্রভাব হলো, সে মানুষের অন্তরে অশান্তি ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে। এজন্যই কোনো মানুষ যতই গোপনে গুনাহ করুক, যতই বেপরোয়া গুনাহ করুক, এ ব্যাপারে তাকে বোঝানোর মতো কেউ নেই। তাকে বোঝাতে কেউ সাহস ও করে না। তার প্রতিষেধকও কেউ নেই। তার ভ্রষ্টতার অহরহ সুযোগ রয়েছে। মন যা চায় তা-ই করে। নিজের মনমতো নিজের জীবনটাকে ব্যবহার করে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে অস্থিরতা সঞ্চার করে দেন। সুতরাং একথা মনে করুন যে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে কিছু অশান্তি বরাদ্দ হয়ে আছে। আমরা অপরাধ করলে তা আমাদের ভাগে চলে আসবে। ফলে আমাদের জীবনে প্রশান্তি আসবে না।

---

৪৩. সূরা ফুরকান : আয়াত ৭০

প্রশান্তি অর্জিত হচ্ছে না কেন?

কতিপয় মানুষ আছে, যারা অঢেল সম্পদের অধিকারী, লাখপতি, কোটিপতি হয়ে যায়। ধনসম্পদের পাহাড় হয়ে যায়। কিন্তু তাদের অন্তরে প্রশান্তি নেই। রাতে ঘুম আসে না। ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমাতে হয়। এয়ারকন্ডিশন রুমে, রানের ওপর কম্বল ফেলে পাশ ফেরাতে হয়। ঘুমের জন্য মিনতি করে, তবু ঘুম আসে না। তাদের যদি জিজ্ঞাসা কর, জনাব! আপনার মূল ব্যাপারটা কী? তখন সে বলবে, ভাই! বাস্তবে তো কোনো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আল্লাহ তা'আলা সবকিছুই দিয়েছেন। যা মন চায় আহার করি, যা ইচ্ছা পরিধান করি, যার সঙ্গে মন চায়, রাত কাটাই। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হলো, অন্তরে শান্তি নেই। এই অশান্তি অন্তরে লেগেই আছে। যা করে, পরিণামে তা-ই পায়। যারা আত্মহত্যা করে, মূল কারণ হচ্ছে গুনাহের অকল্যাণ। গরিব লোক জীবনে একবার মরে। আর ওই সমস্ত উদাসীন লোকেরা প্রতিদিন অনেকবার মরে এবং অনেকবার জীবিত হয়। এমন অশান্তি হয় যে, কাউকে বলতেও পারে না। যদি আত্মহত্যা জাযেয় হতো, তাহলে পৃথিবীতে ধনী লোকেরা সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যা করত। কারও রয়েছে ক্লান্তি, কারও রয়েছে মরণজ্বালা আর কেউ বিভিন্ন টেনশনে ভুগছে।

একটি বিস্ময়কর সূক্ষ্মতা

তিনটা শব্দ আছে। ڈپریشن মাতলামি ٹینشن টেনশন (চিন্তা) Inexcite ক্লান্তি। সবকটি ইংরেজি শব্দ। আমাদের ভাষায়ও অনুরূপই ব্যবহার হয়। এতে বোঝা যায়, আমাদের ভাষায় এ শব্দগুলোর সমার্থবোধক শব্দ ব্যবহারই হতো না। ইংরেজি শব্দকে আমরা তাঁদের ভাষায় ব্যবহার করতে শুরু করছি। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো, আমাদের বুযুর্গদের জীবনে এই তিনটি শব্দের প্রয়োজনই হয়নি। যদি আমাদের জীবনে এমন অবস্থায় দেখা দিত, তাহলে এর জন্য অবশ্যই কোনো শব্দ চয়ন করা হতো। যখন এর কোনো শব্দই আমাদের ভাষায় নেই, তাহলে বোঝা গেল, এমন কোনো মসিবত আমাদের বুযুর্গদের জীবনে আসেনি। অতএব, এর মমার্থ হলো, আমরা এই শব্দগুলো ওই সময় থেকে ব্যবহার করতে শুরু করেছি, যখন আমরা আল্লাহ তা'আলার বিধানকে অবজ্ঞা করতে আরম্ভ করেছি। যখন আমরা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সভ্যতাকে গ্রহণ করতে শুরু করেছি, তখন তাদের জীবনের অবস্থা আমাদের জীবনে আসতে শুরু করেছে।

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার উপকারিতা

কতিপয় মানুষ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। আল্লাহ তাদের হৃদয়ে প্রশান্তি দান করেন। আহারের রুটি পায় না, পান করার পানি পায় না। অধিকাংশ সময় অনাহারে কাটাতে হয়। কিন্তু তাদের অন্তর শান্ত। তাদের মধ্যে অস্থিরতার গন্ধও নেই। এজন্য কোনো কবি বলেন–

نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے
تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے

দুনিয়া, সম্পদ ও ঘর নির্মাণে নয়, অন্তরে প্রশান্তি আসে আল্লাহর স্মরণে।

প্রকৃত পর্যবেক্ষণ

একবার আমরা মসজিদে ছাদ ঢালাই দিচ্ছিলাম। জুলাই অথবা আগষ্ট মাস ছিল। প্রচুর গরম পড়ছিল। আল্লাহ মাফ করুন গরম ধৈর্যের বাইরে চলে গিয়েছিল। দুপুরের সময়। দু-চার মিনিটও দাঁড়ানো যাচ্ছে না। আমরা একটার সময় মাদরাসা ছুটি দিয়ে দিলাম। কর্মরত শ্রমিকরা দু-তিন ঘণ্টা রেষ্ট নিল। নামায পড়ল। খাবার খেল। তারপর আবার কাজ শুরু করল। তখন বাইরে কংক্রিটের স্তূপ ছিল। এবার বলুন, যেখানে তাপমাত্রা প্রায় ৪৯-৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াম হয়ে গেছে, সেখানে কংক্রিটের ওপর কেমন গরম হবে! আমি দেখলাম, এক শ্রমিক ওই কংক্রিটের ওপর খুব আরামের সাথে ঘুমাচ্ছে। ঘুমে তার নাক ডাকছে। তাকে দেখে আমার জবানে অনিচ্ছায় এই কবিতাটি বের হয়ে এল–

کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے
نیند کانٹوں پہ بھی آجاتی ہے آرام کے ساتھ

'কতই-না সান্ত্বনা সম্পৃক্ত রয়েছে তোমার নামের সাথে যে, কাঁটার মধ্যেও নির্বিঘ্নে নিদ্রা আসে।'

সুতরাং যারা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, উত্তপ্ত গরমের মধ্যেও তাদের ঘুম আসে। কংক্রিটের ওপরও তারা আরামে সুখনিদ্রা যায়। আর যারা নিজের অভিলাষ অনুযায়ী জীবন গড়ে, এয়ারকুলারের মধ্যেও তাদের ঘুম আসে না। আসল ব্যাপারটা হলো, আল্লাহ তাদের অন্তরে অশান্তি বিরাজমান করে দিয়েছেন।

একটি শিক্ষণীয় উদাহরণ

আমার বন্ধুদের আমি অনেক সময় একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকি যে, ছোট বেলায় আমি বড়দের সাথে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। দেখলাম, একটি বিরাট হোটেলে খাবারের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে বিশাল-বিশাল থালায় তরকারি ও খাবার রাখা হয়েছে। এর নিচে বাতি জ্বালিয়ে দিচ্ছে। আমি সর্বপ্রথম এ অবস্থা দেখে ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলাম, এরকমভাবে বাতি জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে কেন? ম্যানেজার বলল, বরযাত্রীরা দলে-দলে আসবে। এক দল খাবার খেয়ে চলে যাবে, আরেক দল বসবে। এতে খাবার খেতে-খেতে অনেক সময় লাগবে। ফলে খাবার ঠান্ডা হয়ে যাবে। তাই আমরা এই সিস্টেম করে রেখেছি, যাতে খাবার সর্বদা গরম থাকে।

সেই শৈশবের ঘটনাটা আমার এখনো মনে আছে। আমি এখন ভেবে থাকি, যারা গুনাহের কাজ করে, আল্লাহ তাদের জীবনের মধ্যে অশান্তির বাতি ওইরূপে জ্বালিয়ে রাখেন, যার দরুন তারা সর্বদা অস্থিরতায় থাকে। কোনো-কোনো সময় আল্লাহ তাদের সন্তানদের ওই রকম বাতি বানিয়ে দেন। সন্তান লেখাপড়া করছে। কিন্তু লেখাপড়ার প্রতি মন বসছে না। সাধারণ কথায় রাগান্বিত হয়ে যাচ্ছে। সর্বদা জেদি হয়। কাজ চুরি করে। এবার বলে, হুজুর! আমার সন্তান আমার জন্য মসিবত হয়েছে। ছেলের অবস্থা দেখে মেয়েও এরকম হয়ে যায়। বলে, আমার মেয়ে কোনো কাজই ঠিকমতো করছে না। কোনো কাজে মন বসছে না। সে অবৈধ বন্ধুত্ব স্থাপনে ব্যাকুল হয়ে আছে। এবার মা তার এ অবস্থা কাউকে বলতেও পারছে না। চুপে-চুপে কাঁদছে। আঁচল দিয়ে চোখের পানি মুছছে। নির্জনে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে। মেয়ে তো নয় যেন কোনো মহা বিপদ ঘরে লালন করা হয়েছে। সে তো মায়ের বেঁচে থাকা হারাম করে দিচ্ছে। সব সময় তাকে পাহারা দাও। বলা যায় না, কখন কী করে বসে।

মা-বাপ এত অস্থির থাকার কারণ কী? কখনো কী তারা ভাবছে, এগুলো আমাদের আপরাধের ফল। আল্লাহ তা'আলা তাকে গরম সুইচ বানিয়ে দিয়েছেন। আর এখন তার জন্য আমাদের অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের ঘুম হারাম হয়েছে। কখনো দেখা যায়, কতক লোকের সন্তান হচ্ছে না। এটা তাদের জন্য অশান্তির বাতি হয়েছে। কারও স্বামী তার জন্য অশান্তির অগ্নিশিখা হয়। যদি কারও স্বামী বিগড়ে যায় বা স্বামী তার স্ত্রীকে অশান্তিতে

রাখে, তাহলে ওই মহিলার দুনিয়া অন্ধকার হয়ে যায়। যার কাছ থেকে সে ভালোবাসা পাওয়ার আশা করছিল, যখন সে-ই কষ্ট দেওয়া শুরু করল, তখন তার সুখের দরজা কোথায়? সে তার কষ্টের কথা কাউকে বলতেও পারছে না, সইতে ও পারছে না। সে মাঝে-মাঝে কারও নিকট তার অশান্তির কথা বলতে গেলে স্বামী আরও আগুন হয়ে যায়। খাবার ঠান্ডা হলো কেন? মরিচ বেশি আর লবণ কম হচ্ছে কেন? আল্লাহ তা'আলা যেন তার ওপর তার স্বামীকে মহা মসিবত বানিয়ে দিয়েছেন। এটা কেন? এটা আমাদের গুনাহের পরিণাম। আল্লাহ আমাদের সকলকে বোঝার তাওফীক দান করুন। আমীন।

এক স্বামীর বিরল দৃষ্টান্ত

আমি এক স্বামীকে এমনও পেয়েছি যে, সে তার স্ত্রীর সঙ্গে কয়েক মাস যাবৎ কথা বলছে না। সে যেন তার স্ত্রীকে একটা অন্ধকার কারাগারে ঢুকিয়ে রেখেছে। যখন আমি জানতে পারলাম, তখন তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই ব্যাপার কী? এমন করছেন কেন? সে বলল, হুজুর! আমার স্ত্রীর মধ্যে বিবেক বলতে কিছুই নেই। নিজের জ্ঞান-বুদ্ধিতে কিছুই করতে পারে না, আমি যা বলি তা-ই শুধু করে। আমি বললাম, ভাই এটা তো আপনার স্ত্রীর অপরাধ নয়। বরং এটা মহিলাদের গুণ যে, স্বামী যা বলবে, তা-ই করবে। মহিলাদের ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড় গুণ আর কী হতে পারে।

এবার ভেবে দেখুন, সেই স্বামী কী চায়। সে চায়, স্ত্রী তার ইচ্ছেমতো চলাফেরা করুক, মন যা চায় তা-ই করুক। নাউযুবিল্লাহ! সে যা বলছে, তার স্ত্রী তা-ই করছে। এর ওপরও সে রাগ করছে। এটা কেমন কথা!

গুনাহের অকল্যাণ

অনেক সময় দেখা যায়, স্বামী বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে হরেক রকম আনন্দ-ফুর্তি করে। কিন্তু ঘরে এলে স্ত্রীর সঙ্গে এমন চেহারায় সাক্ষাৎ করে যে, আল্লাহ মালুম তার স্ত্রী যেন অপরাধ করেছে। তার হাসি-খুশি তার স্ত্রী যেন ধ্বংস করে দিয়েছে। অতএব, অশান্তির জীবন কাটাচ্ছে। অথচ, এমন কতক লোকের স্ত্রী উত্তমও হয়ে থাকে। কাজও করে, ইবাদত ও করে; কিন্তু অদৃশ্য অপরাধের কারণে আল্লাহ তাদের উভয়ের ভালোবাসায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তাদের মধ্যে অশান্তির বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছেন। কখনো দেখা যায়, স্বামী তো ঠিকই আছে; কিন্তু কামচোর, দায়িত্বের অনুভূতি তার মধ্যে নেই। কখনো আল্লাহ তা'আলা অন্য কোনো হিংসুক তার ওপর নিয়োগ করে

দেন। সে তার ওপর হিংসা করা শুরু করে। কারও প্রতিবেশি এমন খারাপ হয় যে, তার জন্য বেঁচে থাকা দায় হয়ে যায়। কোথাও দেখা যায়, বউ-শাশুড়ির মধ্যে এমন অবস্থা হয় যে, একের জন্য অপরের বেঁচে থাকা হারাম হয়ে যায়। তারা এমন অশান্তিতে ভুগছে কেন? তাদের জীবন এমন বিপদ হয়ে সম্মুখীন হচ্ছে কেন? ভাবছে না, এটা আমারই কর্মের ফল।

ফুযায়েল ইবনে আয়াযের বাণী

ফুযায়েল ইবনে আয়ায (রহ.) বলেন, যখনই আমার পক্ষ হতে আল্লাহ তা'আলার কোনো বিধান পালনে ত্রুটি হচ্ছে, তখনই দেখতে পাচ্ছি, আমার অধীনরা আমার অবাধ্যতায় মেতে উঠছে। এদিকে আমি কবিরা গুনাহ করছি, সেদিকে আমার স্ত্রী আমার নাফরমানি করছে। অথবা আমার সন্তান কিংবা চাকর-চাকরানিরা আমার অবাধ্যতা করছে। মানুষের মধ্যে না হলেও কম পক্ষে এমন হচ্ছে যে, আমার বাহন ঘোড়া অথবা গাধা আমার অবাধ্য হয়ে যাচ্ছে। যেমন বলা হয়, প্রত্যেক আমলের প্রতিষেধক কোনো আমলই হয়ে থাকে। সুতরাং গুনাহ করাও একটা আমল। তার প্রতিবন্ধকও ওই রকম কোনো আমলই হবে। গুনাহ করার ক্ষমতা বান্দার হাতে; কিন্তু এই গুনাহের প্রতিফল বারণ করার ক্ষমতা বান্দার নেই। তবে, এর জন্য একটিমাত্র পথ রয়েছে। তা হলো গুনাহ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা। এ ছাড়া কোনা উপায় নেই। আমরা অন্যের ওপর দোষ চাঁপিয়ে দেই; অথচ অপরাধ আমাদের।

আমাদের আক্ষেপপূর্ণ অবস্থা

বর্তমানে তো অবস্থা এমন হয়েছে যে, ভাই জাদুটোনা করে ফেলছে। কেউ কারবার মেরে ফেলছে। আমার মেয়ে অমুকের সঙ্গে সর্ম্পক করে ফেলছে। তাকে সে ভুলতেই পারছে না। আমাদের অবস্থা ভালো নয়। কেউ কোনো কিছু করে ফেলছে। হে আল্লাহর বান্দারা! অন্যের ওপর মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছ কেন? কারও রিযিক কি কেউ হ্রাস করতে পারে? কেউ কাউকে বেঁধে রাখতে পারে? কেউ কাউকে সম্মান দিতে পারে না। কেউ কাউকে লাঞ্ছিত করতে পারে না। সব কিছুই আল্লাহর হাতে। আমাদের ওপর যদি কোনো বিপদ এসে থাকে, এটা আমাদের কৃতকর্মের ফল। আমরা আমাদের নিজেকে দেখতে পারি না।

তাই কোনো কবি বলেন–

جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ
حکم آیا میرے بندے نامہ اعمال دیکھ

আমরা যখন বলি, হে আল্লাহ! আমার দুরবস্থার প্রতি তাকাও, তখন নির্দেশ আসে, হে আমার বান্দা! নিজের আমলনামা দেখো। সুতরাং এতে প্রতিভাত হয় যে, আমরা আমাদের আমলনামা দেখি না। আমরা নামাযে অলসতা করি।

অস্থিরতা কেন আসে?

পর্দার ব্যাপারে আমরা শৈথিল্য করি। আমাদের এই অনুভূতিই নেই যে, মহা পরাক্রশীল প্রভু আমাদের পর্দার নির্দেশ দিয়েছেন। আরে না, সে তো আমার কাজিন, আমার সহপাঠী, আমার আপনজন, সে আমার আত্মীয়। আমার অমুক ভাই। যদি কোনো মহিলা আল্লাহর হুকুম এভাবে অবজ্ঞা করে এবং গায়রে মাহরামের সামনে আসে, তাহলে পরবর্তী কালে কীভাবে বলছে, আমার জীবনে সুখ নেই? এটা তো তোমার কৃতকর্মের শেষ ফল। এখন ভাবছ কেন? কী পরিমাণ ঘর রয়েছে, যেখানে টিভির পর্দায় প্রতিদিন ছায়াছবি দেখানো হচ্ছে! কত ঘরে আজ নিত্যদিনের রুটিন হচ্ছে গান বাজনার অনুষ্ঠান! ইন্টানেটে সকল প্রোগ্রাম সেটিং রয়েছে। নামাযের প্রতি উদাসীনতা। ঘরে দশজন সদস্য থাকলে দুয়েকজন পাওয়া কঠিন হবে যে, তারা নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করছে। বাকিরা তো তেলাওয়াতের সুযোগই পাচ্ছে না।

শরীয়ত থেকে দূরত্ব

নিজের তাগড়া যুবতিকে সাজিয়ে-গুছিয়ে সঙ্গে নিয়ে মার্কেটে যাচ্ছে। আর কী অহমিকা! হ্যাঁ; নিজের দেশে শপিং করি না। নিজের দেশে কেনাকাটা ভালো লাগে না। আমরা দুবাই গিয়ে মার্কেট করি। বোঝা যায়, সেখানে আল্লাহর বিধান নেই। এর উদ্দেশ্য হলো, এদেশের সকলেই আমার নগ্ন মাথা ও আমার সুন্দরী কন্যার নগ্ন দেহ অবলোকন করেছে। এখন এ ক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল হওয়া দরকার। মা-মেয়ে এক সঙ্গে উলঙ্গপনার বেশে মার্কেটে যাচ্ছে। অথচ একে কোনো গুনাহের কাজই মনে করছে না।

যদি আপনারা চিন্তা করেন, তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের অপরাধের দরুন কী পরিমাণ বিপদ আমাদের সম্মুখীন হচ্ছে। কুরআনে আল্লাহ বলেন–

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

'জলে ও স্থলে যে-বিপর্যয় প্রকাশ পাচ্ছে, তা মানুষের নিজহাতের কর্মফল।'[৪৪]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۝

'বিপদাপদ যা কিছুই তোমাদের নিকট পৌঁছে, তা তোমাদের নিজ হাতে অর্জিত এবং তিনি তোমাদের কতক অপরাধ ক্ষমা করে দেন।'[৪৫]

যদি তোমাদের ক্ষমা না করতেন, তাহলে তো তোমাদের বেঁচে থাকারই অধিকার থাকত না। তোমরা এর যোগ্যপাত্র হয়েছে যে, পৃথিবীতে বেঁচে আছ, নিজের মালিকের প্রদত্ত খাবার খাচ্ছ। তাঁর প্রদত্ত জীবন ভোগ করছ আর তাঁরই নাফরমাননি করছ।

আল্লাহপ্রদত্ত রহমত

এটা তো একমাত্র আল্লাহর অশেষ দয়া যে, তিনি আমাদের জীবন দান করেছেন। নতুবা আমাদের আকৃতি বিকৃত হয়ে যেত। জমিন এ আদেশ পেত যে, তাকে তুমি গ্রাস করে ফেলো। আমাদের অজান্তে মাথার ওপর পাথরের বৃষ্টি হয়ে আমাদের নাশ করে দিত। তখন আমাদের অবস্থা কেমন হতো? এ আমাদের রহমতের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপূর্ব কৃতিত্ব যে, আমাদের আকৃতি বিকৃত হচ্ছে না। আমরা সুখে জীবন কাটাচ্ছি। নতুবা পৃথিবীতে আরও অনেক সম্প্রদায় অতিবাহিত হয়েছে, যাদের গুনাহের কারণে আল্লাহ তাদের আকৃতি শূকর ও বানরে পরিণত করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন–

فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ۝

'তারপর আমি তাদের বললাম, তোমরা নিকৃষ্ট বানর হয়ে যাও।'[৪৬]

---

৪৪. সূরা রূম : আয়াত ৪১

৪৫. সূরা শূরা : আয়াত ৩০

৪৬. সূরা বাকারা : আয়াত ৬৫

তাদের মতোই এবং তাদের চেয়ে বেশি গুনাহ আমরা করছি। এ আমাদের নবীর বৈশিষ্ট্য যে, তার উম্মতকে জনসমক্ষে লাঞ্ছিত করা হবে না।

আদি যুগের মানুষের আমল ও তার পরিণাম

হযরত শুয়াইব (আ.)-এর উম্মতের মধ্যে মাপে কম দেওয়ার প্রচলন ছিল। আল্লাহ ভূমিকম্পের দ্বারা তাদের নিঃশেষ করে দিয়েছেন। আদ জাতির মধ্যে অহংকার ছিল। আল্লাহ তা'আলা প্রবল ঝঞ্ঝবায়ু দ্বারা তাদের বিলুপ্তি ঘটিয়েছেন। ছামুদ জাতির মধ্যেও এমন আচরণ ছিল। আল্লাহ একটি বিকট আওয়াজের মাধ্যমে তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। সবাই মৃত্যুশয্যায় শায়িত হয়ে গেল। আমরা আমাদের অবস্থার প্রতি তাকালে দেখব যে, আদি যুগের সমস্ত অপরাধ আমাদের মধ্যে একত্র হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি শাস্তি আসছে না। এটা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আ ও কৃতিত্ব।

একটি মূল্যবান উপদেশ

অনেক মানুষ বলে, আমাদের ওপর জাদু করা হয়েছে। তাবিজ করা হয়েছে। আমাদের হিসাব ৯৯% ভুল। তাবিজকারীদের ধারেকাছেও যাবেন না। তারা বিশেষ শ্রেণির লোক হয়ে থাকে। সে তো তোমাকে প্রথমেই ভয় দেখাবে। তা না হলে তোমার পকেট থেকে টাকা সে কীভাবে বের করবে। সুতরাং প্রথমেই তোমাকে বলবে, জনাব আপনাকে তো অনেক বড় জাদু করা হয়েছে। এবার যখন আপনি অনেক বড় জাদুর কথা শুনলেন, তখন পকেট থেকেও অনেক বড় টাকার বান্ডিল বের করে তার হাতে দিলেন। সুতরাং তার উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেল। সে তো মানুষকে দ্বিধায় ফেলে দেয়। মূলকথা হলো, আমাদের অবস্থার বিপর্যয়ের ভিত্তি হচ্ছে আমাদের আমলের ওপর। আমরা যদি সংশোধন হয়ে যাই, তা হলে আল্লাহ আমাদের অবস্থা শুধরে দেবেন।

অস্থিরতার সমাধান ইস্তেগফার

আমরা বলি, আগে আমাদের অবস্থা ঠিক হয়ে যাক, পরে আমরা পরিশুদ্ধ হব। অস্থিরতায় ভুগছে এমন কাউকে জিজ্ঞাসা করলেন, জনাব মসজিদে আসছেন না কেন? বলবে, জি হুজুর! কী করব; কাজ ছিল তাই আসতে পারিনি। কিছু ব্যস্ততা আছে, টেনশন আছে। সমাধান হয়ে যাক, পরে

আসব। এর অর্থ কী? আল্লাহ তা'আলা আগে আমার ঘর সংশোধন করে দিন। তারপর আমি আল্লাহর ঘরের দিকে আসব। এটাই হচ্ছে আমাদের অবস্থা। সুতরাং মানুষ যত অস্থিরতায় ভুগছে, এর অধিকাংশই হচ্ছে তার হাতের কামাই। এর সমাধান হলো, ইস্তেগফার করো। আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাও। এরপর নিজের জীবনে বরকতের অবতরণ স্বচক্ষে দর্শন করো। এটি কোনো শিশুর সান্ত্বনার বাণী নয় যে, এর দ্বারা অবুঝ শিশুকে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে। বরং এটি প্রকৃত সত্য উপদেশ।

দীনের মধ্যেই সফলতা

আজ যদি কোনো মহিলা অঙ্গীকার করে যে, আজ থেকে আমি আমার মালিকের অবাধ্য হব না। সুন্নতের পরিপন্থী কোনো কাজ করব না, তাহলে সে নিজ চোখে দেখতে পারবে, আল্লাহ তা'আলা তার সকল সমস্যার সমাধান কীভাবে করছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে সুখ-শান্তির জীবন দান করবেন। আপনারা অনেক জিনিস যাচাই করেন। এটাও একবার নিরীক্ষণ করে দেখুন। আমি তো আমার আবেগেও এ সমস্ত কথা বলতে পারি। না, না, আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

'যদি লোকালয়বাসী ঈমান গ্রহণ করে ধর্মানুরাগী হয়, তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান ও জমিনের বরকতের দরজাসমূহ খুলে দেব।'[৪৭]

গুনাহের ক্ষতিসমূহ

গোনাহের মধ্যে কিছু প্রভাব থাকে। গুনাহ বান্দার অন্তরে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। বান্দার জীবনের সমস্ত কাজের বরকত দূরীভূত হয়ে যায়। কোনো কাজে সে আল্লাহ তা'আলার রহতের ভাগীদার হতে পারে না।

বরকতশূন্য জীবন

দেখতে অনেক ঐশ্বর্যশালী দেখা যায়; কিন্তু তার কোনো কাজে বরকত নেই। যৌবনকাল; কিন্তু সুস্থতার বরকত নেই। বিশ-বাইশ বছরের তরুণীকে আমি দেখেছি, তার হাড়ের জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা। ফুসফুস ফুলে গেছে। আমার অবাক লাগে, আল্লাহর এই বান্দী এমন বয়সে এত কঠিন রোগে

---

৪৭. সূরা আরাফ : আয়াত ৯৬

আক্রান্ত! তার স্বাস্থ্য চলে গেছে। সময়ের মধ্যে বরকত নেই। স্মরণশক্তি লোপ পেয়েছে। সবকিছু ভুলে যায়। একটি কাজ করার কথা ছিল। স্বামী এসে জিজ্ঞাসা করলে স্মরণ হয়। বলে, করিনি। এখন তো শাস্তি পেতে হবে, লাঞ্ছিত হতে হবে। সুতরাং এগুলো সে অস্থিরতার কারণে ভুলে যায়। মূলত তার বরকত চলে গেছে। সময়, সুস্থতা, রিযিক সবকিছু থেকে বরকত চলে গেছে। তখন সেই বান্দী কী করে? দৌড়ে-দৌড়ে সকল কাজ গোছাতে শুরু করে। কিন্তু কাজ সমাধা করতে পারে না। এমনও হয় যে, ঘরে যত সদস্য আছে, সবাই অসুস্থ হয়ে যায়। আজ একজনকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাওয়া হয়েছে। সে এখনো সুস্থ হয়নি; আরেকজন অসুস্থ হয়ে গেছে। সে এখনো রোগবিছানায় কাঁতরাচ্ছে, আরেকজন অসুস্থ হয়ে গেছে। এমন হয় যে, এক পরিবারেই অসুস্থের লাইন পড়ে গেছে। এর মূল কারণ হচ্ছে, বরকত চলে গেছে। সুতরাং গুনাহের একটা প্রভাব হচ্ছে, সর্বদা অস্থিরতা ছেয়ে থাকে। দ্বিতীয় প্রভাব হচ্ছে, সবকিছু থেকে বরকত চলে যায়। কাজে বরকত হচ্ছে না। পরিশ্রম করে, চেষ্টা করে, দৌড়ায়; কিন্তু ফলাফল হয় শূন্য। স্বামীর ধমক, শাশুড়ির বকুনি, প্রতিবেশির দোষারোপ লেগেই আছে। কোনো কিছুতেই কল্যাণ পাচ্ছে না। তখন নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলে, এর চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো।

সুতরাং বাস্তব সত্য কথা হলো, আমরা যদি গুনাহের প্রাণ পরিত্যাগ না করি, তাহলে বিপদ আমাদের প্রাণ ছাড়বে না। এ বিষয়ে আমাদের স্বাধীনতা রয়েছে– যেটা ইচ্ছা গ্রহণ করতে পার।

আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে পুরস্কার

আজকের মাহফিলে আমরা আমাদের মালিকের সঙ্গে অঙ্গীকার করব, আজ থেকে আমরা তাঁর নাফরমানি করব না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সময়ের মধ্যে বরকত দেবেন, সুস্থতায় বরকত দেবেন, ইজ্জত-সম্মানে বরকত দেবেন। প্রত্যেক মানুষ আপনাকে সম্মান দেবে। সম্মান আপনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন যে, আমাকে তো আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা মূল্যায়ন করছে না। আল্লাহর বিধান মেনে চলো; দেখবে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সেই সম্মান দান করবেন। পৃথিবীর সবাই আপনাকে সম্মান করতে থাকবে। সুতরাং গুনাহের যে-মৌলিক দুটি ক্ষতির কথা বললাম, তা শুনে সকলেরই প্রতিজ্ঞা করা আবশ্যক যে, আজ থেকে আমরা আল্লাহর হুকুম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আদায় করার চেষ্টা করব। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।

দু'আ কবুল হয় না কেন?

আমাদের দু'আ কবুল হচ্ছে না। প্রত্যেক দিন দু'আ করছি। দিন রাত সকাল সন্ধা দু'আ করছি। কিন্তু সেই দু'আ কবুল হওয়ার কোনো নির্দশন প্রকাশ পাচ্ছে না। সবকিছুর পর বলা যায়, তাতে মরিচা লেগে আছে, যার দরুন দু'আ উর্ধ্বগমন করছে না। এটা হচ্ছে গুনাহের মরিচা। যেমন– কোনো পাখিকে যদি রশি বেঁধে দেওয়া হয়, তাহলে সেটা আর উড়তে পারে না। তেমনিভাবে আমাদের দু'আর মধ্যে আমাদের গুনাহের রশি বাঁধা রয়েছে, যার দরুন সেই দু'আ ওপরে উঠতে পারছে না। যত চেষ্টার পরও তা কোনো প্রকার ফলপ্রসূ হচ্ছে না।

দু'আ কবুল হওয়ার রহস্য

এজন্যই মাশায়েখগণ বলেছেন, বান্দা যদি তার ইল্‌ম ও সংকল্পের মাধ্যমে গুনাহের কাজ ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ প্রত্যাখ্যান করা ছেড়ে দেন। সুতরাং আজকের মাহফিলের পর আমরা প্রতিজ্ঞা করব, আজকের পর থেকে আমরা আমাদের মালিকের নাফরমানি করব না।

একটি বিরল উদাহরণ

এটা কীভাবে হয়? দেখুন, একটি ঘরে একজন স্বামীর সামান্যমাত্র অধিকার। সে ঘর নির্মাণ করেছে, খরচপাতি দিচ্ছে। কোনো ঘরের স্বামী কোনো ঘরের পিতা। ওই স্বামী বা পিতা যদি দেখে, তার ঘরে তার কথা মানা হচ্ছে না, তখন সে বলে, আমি দেখব, তুমি এই ঘরে কীভাবে শান্তিতে বাস কর। সুতরাং একটি ছোট ঘরের কর্তা যদি বলে, আমি দেখে নেব; আমার ঘরে কীভাবে তুমি শান্তিতে থাক, তাহলে কি ওই ঘরে শান্তি আসতে পারে? ফ্যাক্টরির ম্যানেজার শ্রমিকদের বলল, আমি দেখে নেব, তোমরা কীভাবে এখানে সুখে থাক, তাহলে কীভাবে ফ্যাক্টরিতে শান্তি আসতে পারে? অতএব, আপনারা ভেবে দেখেছেন কি, যে মহান প্রভু আমাদের সৃষ্টি করেছেন, অসংখ্য নেয়ামত দিয়ে আমাদের ধন্য করেছেন, যদি আমরা তাঁর কথা অমান্য করি, তাঁর বিধান লঙ্ঘন করি, তাহলে আমরা কীভাবে শান্তিতে থাকতে পারি? তারপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেও এই ঘোষণা আসে যে, হে বান্দা! তুমি আমার আদেশ লঙ্ঘন করেছ। সুতরাং আমিও দেখে নেব, তুমি আমার এ পৃথিবীতে শান্তির জীবন গড় কীভাবে। কে করে আর বদনাম কার হয়? অবশেষে কাঁদতে থাকে, হ্যাঁ; আমি তো কিছু করিনি।

ভাই! তুমি যে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি করেছ, এটাই তোমার বিপদের জন্য যথেষ্ট। এর ফলেই আল্লাহ তা'আলা তোমার মাথার ওপর লাঞ্ছনা চাঁপিয়ে দিয়েছেন। তোমার চতুর্পার্শ্বে অস্থিরতা ছেয়ে আছে। এখন তুমি অহেতুক প্রলাপ করছ, আমার ওপর বিপদ এসেছে।

এজন্য যে-বান্দা ধর্মানুরাগ ও পবিত্রতার জীবন গড়বে, নেক কাজ করবে, আল্লাহ তা'আলার সাহায্য তার জীবনের অন্তভুর্ক্ত হবে। হাদীছে কুদসীতে এসেছে, হে আমার বান্দা! একটা হচ্ছে তোমার ইচ্ছা, আরেকটি হচ্ছে আমার ইচ্ছা। যদি তুমি চাও, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, তাহলে আমি তোমার সেই কাজ অসম্পূর্ণ রাখব এবং তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হতে দেব না। আর যদি তুমি চাও, আমার ইচ্ছা পুর্ণ হোক, তাহলে তোমার সেই কাজ পরিপাটি হবে। সাথে-সাথে তোমার ইচ্ছাও পূর্ণ হয়ে যাবে।

আল্লাহর সাহস কত বড়!

আমাদের উচিত, আজই আমরা মহা মহিম প্রভুর সঙ্গে আপস করে নেব। গুনাহ করা আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ করার সমতুল্য। এজন্য পবিত্র কুরআনে সুদখোরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে–

فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও।'[৪৮]

সুতরাং এখন পর্যন্ত আমরা গুনাহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি করে যাচ্ছি। অতএব, আজ তাওবার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সন্ধি করি এবং ভবিষ্যতে পুণ্যময় জীবন গড়ার সংকল্প করি। আপনি নিয়ত করুন। তারপর দেখুন, আল্লাহর সাহায্য কীভাবে আসে। সেই করুণাময় খোদা পবিত্র কুরআনে বলেন–

يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۝

'ও হে মানবসম্প্রদায়! কিসে তোমাদের ধোঁকা দিয়ে বিমুখ করেছে মহা মহিমা প্রভুর দরবার থেকে?'[৪৯]

অথচ উচিত তো ছিল, কোনো বান্দা আল্লাহর দরবার থেকে বিমুখ হলে, পেছন থেকে কেউ কোমরে লাথি মেরে বের করে দিয়ে বলবে, হে দুর্ভাগা!

৪৮, সূরা বাকারা : আয়াত ২৭৯

৪৯. সূরা ইনফিতার : আয়াত ৬

চলে যা এখান থেকে। আজকের পর থেকে তোর জন্য এই দরজা চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হলো। কিন্তু না; মহা মহিমা খোদা বলেন–

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

'নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অতি দয়ালু।'[৫০]

তিনি পিঠ ফিরিয়ে চলে যাওয়া ব্যক্তিকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করেননি। বরং তিনি বলেন–

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

'হে মানুষ! মহামহিমা প্রভুর দরবার থেকে তোমাদের কোন জিনিস ধোঁকা দিচ্ছে?'[৫১]

যেমন– কোনো অবুঝ শিশু তার মাতাপিতার প্রতি অভিমান করে কেঁদে-কেঁদে চলে গেল। মাতাপিতা তাকে আদর করে কোলে তুলে বলে, বাবা! সন্তান তার মাতাপিতা সঙ্গে এভাবে রাগ করে না। ঠিক তেমনি আল্লাহ তা'আলা মানুষদের ডাক দেন, হে আমার বান্দা! দয়াময় প্রভুর দরবার থেকে কোন জিনিস তোমাকে ধোঁকা দিচ্ছে? এই প্রতারণায় গ্রেফতার হচ্ছ কেন? দুর্নামের বোঝা মাথায় নিচ্ছ কেন? অস্থিরতার বিপদকে নিজের সাথি বানাচ্ছ কেন? তোমার জীবনে শান্তি নেই কেন? এসো আমার সত্তায় শান্তি রয়েছে। তোমার জীবনে সম্মান আমার থেকে পাবে। সম্মান তো আমার হাতে। আমার দরজায় এস; আমি তোমাকে সুখময় জীবন দান করব। সুতরাং আমাদের উচিত, আমরা আমাদের মালিকের দরবারে আগমন করি। আল্লাহ বলেন–

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ

'আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?'[৫২]

অতএব, যেহেতু আল্লাহ তা'আলাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তাহলে চাকরিজীবীদের পেছনে দৌড়ানোর কারণ কী? অন্যান্য লোকদের পেছনে দৌড়ে লাভ কি? নিজের মালিককে সন্তুষ্ট করো। অন্তরে একথা বদ্ধমূল করে নাও যে, আমার মালিক আমার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলা আমাদের পুণ্যময় জীবন দান করবেন।

---

৫০. সূরা বাকারা : আয়াত ১৪৩
৫১. সূরা ইনফিতার : আয়াত ৬
৫২. সূরা যুমার : আয়াত ৩৬

বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা

পরম করুণাময় প্রভু তো এখনো চাচ্ছেন, আমরা তাওবা করি। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর দরবারে তাওবা করো সত্যিকারের তাওবা।'[৫৩]

তাই ওলামায়ে কেরাম বলেন, অভিমান করে চলে যাওয়া অবাধ্য সন্তানের জন্য তার মা এপরিমাণ অপেক্ষা করে না, যে-পরিমাণ অপেক্ষা মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর গুনাহগার বান্দার জন্য করেন। সুবহানাল্লাহ! যদি কোনো মায়ের সন্তান রাগ করে বাড়ি থেকে চলে যায়, তাহলে আপনারা জানেন, ওই মা তার সন্তানের জন্য কেমন অস্থির হয়। খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দেয়, তার চোখে ঘুম আসে না, কী জানি আমার সন্তান কী অবস্থায় আছে। কোথাও খাবার খেয়েছে কি? ঘুমানোর একটু জায়গা পেয়েছে কি? এমন অস্থিরতায় যদি তার একটু তন্দ্রা আসে, এমন সময় বাতাসেও যদি দরজায় আওয়াজ হয়, তাহলে মা উঠে বসে যায়। মনে হয়, আমার আদরে দুলাল এসে গেছে। সুতরাং ভেবে দেখুন, অবাধ্য সন্তানের জন্য যদি মা এমন অধীর হতে পারে, তাহলে অবাধ্য বান্দার জন্য আল্লাহ তা'আলা কেমন অপেক্ষা করেন!

নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্থল কে?

এজন্য স্মরণ রাখবেন, যে বান্দা গুনাহ করতে-করতে চুল সাদা করেছে, নামাযের জন্য কখনো মসজিদে আসেনি, তার জীবনসাথি সহধর্মিণীও এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। ছেলে-সন্তানরাও দূরে চলে গেছে। ভাই-বোনরা এমনকি কোনো আত্মীয় তার খোঁজখবর নিচ্ছে না। কারও ঘরে দু-চার দিন থাকলে তারাও এই বলে তাড়িয়ে দিচ্ছে যে, তোমার কাশির জ্বালায় আমার বাচ্চারা ঘুমাতে পারছে না। বুড়া বাবু! তুমি এখন আমাদের বাড়ি থেকে চলে যাও। এবার ওই বৃদ্ধের মাথা রাখার মতো ঠাঁই নেই। সে এখন কোথায় যাবে? কে তাকে এক মুঠ ভাত খাওয়াবে? কে তার অসুস্থতায় সেবা করবে? কে তার ভালো-মন্দের খবর নেবে? হাতে লাঠি নিয়ে ঘর থেকে এ অবস্থায় বের হলো যে, মুখে দাঁত নেই, পেটে আঁত নেই। চোখে নেই দর্শন, কানে নেই শ্রবণ। গায়ে নেই শক্তি। হাতে ধরছে লাঠি। এবার সেই লাঠিতে ভর

---

৫৩. সূরা তাহরীম : আয়াত ৮

করে চলছে আর ভাবছে, এখন আমি কোথায় যাব। অবশেষে স্থির করল, এ পৃথিবীতে কারও দরবারে যেহেতু যাওয়ার ব্যবস্থা নেই, সুতরাং পরম করুণাময় মালিকের দরবারেই হাজিরা দেই। এছাড়া অন্য কোনো দরজা নেই, যেখানে আমি কড়া নাড়তে পারব। সবাই আমাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে। সুতরাং এখানেই হাঁক দেই।

অতএব, হাঁপাতে-হাঁপাতে কাঁপতে-কাঁপতে সেই বিদ্রোহী বুড়া যদি আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হয়, তাহলে আল্লাহ তাকে তিরষ্কার করে তাড়িয়ে দেবেন না। একথা বলবেন না যে, তোমার যৌবনকাল কোথায় ব্যয় করেছ? তোমার ধনসম্পদ কী হয়েছে? তোমার সৌন্দর্য কোথায় গেছে? যৌবনে তুমি অন্যের পেছনে দৌড়িয়েছ, তুমি বড় সৌন্দর্যপূজারি ছিলে। সবকিছু হারিয়ে এখন আমার দরবারের কথা তোমার স্মরণ হয়েছে। এটা বলবেন না যে, হে বুড়া! সারাটা জীবন কাটিয়ে এখন আমার দরবারে কী নিয়ে এসেছ? বরং বলবেন, হে বৃদ্ধ! তুমি কী আবদার নিয়ে আমার দরবারে হাজির হয়েছ? আমার কাছে তুমি কী চাও?

সেই মহা মহিম প্রভু ওই বৃদ্ধের ব্যাপারে বলেন, সে যদি আমার দরবারে হেঁটে-হেঁটে আসে, তাহলে আমি তার প্রতি দৌড়িয়ে অগ্রসর হই। অর্থাৎ– আমার রহমত দৌড়ে গিয়ে থাকে স্বাগতম জানায়। হে আল্লাহ! তোমার রহমতের প্রতি আমার জান কোরবান হোক। তুমি বাস্তবেই মা থেকে বহুগুণ বেশি দয়াবান। আমরা কতইনা অযোগ্য! কত দুর্ভাগা আমরা! গুনাহের পিছে মত্ত হয়ে আছি। অযথা সময় নষ্ট করছি। হে আল্লাহ! আজ আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি। আমরা আপনার সঙ্গে আপস করতে চাই। আপনাকে খুশি করতে চাই। হে আল্লাহ! আমরা আমাদের অতীত গুনাহের ওপর লজ্জিত, অনুতপ্ত। আমাদের ক্ষমা করে দাও। ভবিষ্যতে আমাদের পুণ্যময় জীবন দান করো। একেই বলে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর দরবারে তাওবা করো সত্যিকারের তাওবা।'[৫৪]

আল্লাহ আমাদের তাওবা কবুল করুন এবং আমাদেরকে পুণ্যময় ও সম্মানজনক জীবন দান করুন। আমীন।

---

৫৪. সূরা তাহরীম : আয়াত ৮

জীবন-যাপনের দিকনির্দেশনামূলক নীতিমালা

'শরীয়ত আমাদের একটি অপূর্ব শিক্ষা দিয়েছে। কুরআন বলে–

لَاتُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ

'অহংকারের বশবর্তী হয়ে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না।'

অর্থাৎ– যখনই তুমি কারও সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন প্রফুল্ল মনে, আনন্দিত চিত্তে ও হাসি মুখে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করো। কারও সাক্ষাতে গাল ফুলিও না। যেব্যক্তি রাগবশত গাল ফুলিয়ে কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তখন সেই আগন্তুক ব্যক্তি দেখেই হতভম্ব হয়ে যায়, না জানি তার ভেতরে কেমন ঘৃণা রয়েছে। এক্ষেত্রে শরীয়ত মুসলমান হওয়ার শর্তারোপ করেনি। শরীয়ত বলেছে– 'মানুষের জন্য।'

কেবল মুসলমানের সাথে নয়। কেননা, সকল মানুষই আল্লাহর বান্দা। বলা হয়েছে– 'মাখলুক আল্লাহর পরিবার।'

যারা-ই মানুষ চাই মুসলমান হোক, চাই কাফের হোক যখন তুমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, তখন তোমার চেহারা প্রফুল্লতার ছাপ রাখবে। তোমার চেহারায় যেন উজ্জ্বলতা থাকে, ভালোবাসা থাকে। সুতরাং তুমি যখন ভালোবাসার সাথে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, তখন কাফেরও মুসলমান হওয়ার জন্য ভাবতে থাকবে। এজন্যই শরীয়ত لِلنَّاسِ (মানুষের জন্য) বলেছে, যার মধ্যে কাফেরও শামিল রয়েছে।'

জীবন-যাপনের দিকনির্দেশনামূলক নীতিমালা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

'নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই-ভাই।'[৫৫]

ঈমানদারদের পারস্পরিক সম্পর্ক

ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম, প্রকৃতির ধর্ম, শান্তির ধর্ম। এটি সর্বযুগে মানুষকে পবিত্র জীবনের শিক্ষা দেয়। ইসলামি শরীয়ত আমাদেরকে একটি শিক্ষা দিয়েছে যে,

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ

'মুমিনরা পরস্পর ভাই-ভাই।'

এক প্রকার ভাই হয় রক্তসম্পর্কীয়, যাদের মাতাপিতা এক হয়। এজন্যই এদের একজনকে অপরজনের ভাই বলা হয়। আরেক প্রকার ভাই হয় আল্লাহপ্রদত্ত ঈমান সম্পর্কীয়। তারা কালেমা পাঠ করেছে; সুতরাং পরস্পর মুসলমান ভাই হয়েছে। যখন সমস্ত মুমিন পরস্পরকে ভাই মনে করবে, তখন অবশ্যই পরস্পরে সহমর্মিতার সাথে জীবন যাপন করা সহজ হবে। শরীয়ত আমাদের এ শিক্ষা দিয়েছে যে, আমরা যখন কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করব, তখন সর্বপ্রথম যে-নিদর্শন তার মধ্যে পরিলক্ষিত হবে, তা হবে তার চেহারার

---

৫৫. সূরা হুজুরাত : আয়াত ১০

মাধ্যমে। সে খুশী আছে, নাকি বিরক্ত, তার হৃদয়ে ভালোবাসা আছে, নাকি ঘৃণা, লোকটি শিক্ষিত, নাকি অশিক্ষিত। সবকিছু তার চেহারায় প্রস্ফুটিত হয়। তার চেহারা-ই বলে দেয়, লোকটির ব্যক্তিত্ব কেমন?

শরীয়তের অপূর্ব শিক্ষা

শরীয়ত আমাদের একটি অপূর্ব শিক্ষা দিয়েছে। পবিত্র কুরআন বলে–

لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ

'অহংকারের বশবর্তী হয়ে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না।'[৫৬]

অর্থাৎ– যখনই তুমি কারও সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন প্রফুল্ল মনে, আনন্দিত চিত্তে ও হাসি মুখে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করো। কারও সাক্ষাতে গাল ফুলিও না। যেব্যক্তি রাগবশত গাল ফুলিয়ে কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তখন সেই আগন্তুক ব্যক্তি দেখেই হতভম্ব হয়ে যায়, না জানি তার ভেতরে কেমন ঘৃণা রয়েছে। এক্ষেত্রে শরীয়ত মুসলমান হওয়ার শর্তারোপ করেনি। শরীয়ত বলেছে–

لِلنَّاسِ

'মানুষের জন্য।'

কেবল মুসলমানের সাথে নয়। কেননা, সকল মানুষই আল্লাহর বান্দা। বলা হয়েছে,

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ

'মাখলুক আল্লাহর পরিবার।'

যারা-ই মানুষ চাই মুসলমান হোক, চাই কাফের হোক যখন তুমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, তখন তোমার চেহারা প্রফুল্লতার ছাপ রাখবে। তোমার চেহারায় যেন উজ্জ্বলতা থাকে, ভালোবাসা থাকে। সুতরাং তুমি যখন ভালোবাসার সাথে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, তখন কাফেরও মুসলমান হওয়ার জন্য ভাবতে থাকবে। এজন্যই শরীয়ত لِلنَّاسِ (মানুষের জন্য) বলেছে, যার মধ্যে কাফেরও শামিল রয়েছে।

---

৫৬. সূরা লুকমান : আয়াত ১৮

শরীয়তের তিনটি অলংকারপূর্ণ কথা

এক. যখন তুমি কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, তখন প্রফুল্লিত চেহারায়, হাসিমুখে, মায়াময় মুখচ্ছবির মাধ্যমে সাক্ষাৎ করো।

দুই. কেউ কারও সঙ্গে কথা বললে তার কথায় অনুমান করা যায়, লোকটি কেমন হবে। চরিত্রবান, নেককার হবে, নাকি খারাপ প্রকৃতির হবে। তার হৃদয় সজ্জিত, নাকি হিংস্র। তার মেজাজ কেমন হবে। তাই শরীয়ত বলেছে,

وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا

'তোমরা মানুষের সঙ্গে উত্তম কথা বলো।'

কথা বলতে তোমরা সুন্দর শব্দ চয়ন করো। সুন্দরভাবে কাউকে সম্বোধন করো। মাধুর্যময় ভাষায় কথা বলো। তোমার কথা যেন তার হৃদয়ে আসন পায়। এখানেও মুসলমানের শর্ত নেই। বলা হয়েছে,

وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا

'তোমরা মানুষের সঙ্গে উত্তমরূপে কথা বলো।'

তিন. তোমরা নিজের অনিষ্ট থেকে অন্যকে বাঁচাও। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সৎ ও অসৎ বিষয় বিদ্যমান রয়েছে। আমরা সুকৃতি ও দুষ্কৃতি উভয়ের সমষ্টি। যার আপদমস্তক সুকৃতি, সে ফেরেশতা। যার আপাদমস্তক দুষ্কৃতি, সে শয়তান। আর যার মধ্যে উভয়ের সমষ্টি রয়েছে, সে মানুষ। সুতরাং শরীয়ত বলেছে, তোমরা নিজের দুষ্কৃতি থেকে অন্যকে হেফাযত করো। মন চাচ্ছে, উদাহরণস্বরূপ কাউকে এমন কথা বলি, যার দরুন লোকেরা তাকে নিয়ে বিদ্রূপ করবে। শরীয়ত বলে, না তোমার এমন ভাবনা থেকে তুমি ফিরে যাও। তুমি এমন কথা বলো না, যার দরুন তোমার আরেক ভাই লোকসমাজে লজ্জিত হবে। লোকসমাজে তার মানহানি হবে। লোকেরা তাকে নিয়ে ঠাট্টা করবে। অতএব, তুমি নিজের দুষ্কৃতি থেকে অন্যকে রক্ষা করো। এই তিনটি কথা সমস্ত মানুষের জন্য। একে বলে পরস্পর সহানুভূতির জীবন। এটা সবার সঙ্গে উত্তম হওয়া চাই। চাই সে মুমিন হোক, চাই কাফের হোক। শরীয়ত সবাইকে এক সারিতে আবদ্ধ করেছে।

ভালোবাসার সম্পর্কের উপযুক্ত কে

দেখুন, একটি বিষয় হচ্ছে মিলেমিশে থাকা। সাধারণ আচরণ তো তোমরা সবার সঙ্গে করে থাক। পক্ষান্তরে একটি বিষয় হচ্ছে ভালোবাসার

সম্পর্ক। এটা শুধু মুমিনের সঙ্গে হওয়া উচিত। কাফেরদের সঙ্গে ভালোবাসা রাখা এটা তোমাদের জন্য শোভা পায় না। এবার আপনি নিজেই ভেবে দেখুন। আপনি দৈনিক প্রায় পাঁচশজন মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু এর মধ্যে মাত্র দুই-চারজন মানুষ থাকবে, যার সঙ্গে আপনি মহব্বতের সর্ম্পক রেখেছেন, যার সাথে মহব্বত হবে। সুখ-দুঃখ সবকিছুতে তাকে শরীক করবেন। অন্তরের গোপন কথা জানাবেন। তার থেকে পরামর্শ নেবেন, তার পরামর্শ অনুযায়ী সামনে পদক্ষেপ নেবে। শরীয়ত বলে, এমন সম্পর্ক তোমরা একমাত্র মুমিনদের সঙ্গে রাখবে। কাফেরদের সঙ্গে তোমাদের এমন ভালোবাসার সর্ম্পক হতে পারে না। কারণ, সে আল্লাহর দুশমন। মানুষ্যত্বের সর্ম্পক একটি সীমায় থাকা চাই। একে ইংরেজিতে বলে Respect of humanity মানুষ্যত্বের সর্ম্পক। সুতরাং মানুষ্যত্বের সম্মান আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন। কোনো কবি বলেন–

نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے
وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے
جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر
سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছেন সবশেষে নবীদের ইমাম হয়ে। পৃথিবীতে তিনি আল্লাহর শেষ পয়গাম নিয়ে এসেছেন।

বান্দার ললাট আল্লাহর দরবারে নত করার সংবাদ নিয়ে এসেছেন।

মানুষের প্রতি মানুষের সম্মান শিক্ষা দেওয়ার জন্য এসেছেন।

মনুষ্যত্বের সম্মান

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনুষ্যত্বের সম্মান শিক্ষা দিয়েছেন। এর মধ্যে তিনটি কথা শিক্ষা দিয়েছেন যে, মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময় উত্তমরূপে কথা বলো। নিজের দুস্কৃতি থেকে অন্যকে হেফাযত কর এবং একমাত্র ঈমানদারদের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ো। এমনকি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানের ইতিহাস বর্ণনা করে দিয়েছেন। একে সংজ্ঞা বলে।

অর্থাৎ– মুসলমান কাকে বলে এই মর্মে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ

'মুসলমান বলে, যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।'

অর্থাৎ– কোনো মুসলমান তার মুখের গালমন্দ ও হাতের প্রহার দ্বারা অন্য কোনো মুসলমানকে কষ্ট দেয় না। সার কথা হচ্ছে, মুসলমানের এমন অনিষ্ট থেকে মুসলমান নিরাপদ থাকে।

নবীজির হাদীছের কারিশমা

মানুষ অন্যকে কষ্ট দেয় হয়তো কথার দ্বারা নতুবা তার কাজের দ্বারা। এজন্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ও হাতের কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ– তোমরা কথা ও কর্মে কাউকে কষ্ট দেবে না। তারপর দেখা যায়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখের আলোচনা আগে এনেছেন। তারপর হাতের কথা বলেছেন। হাদীছবিশারদগণ বলেছেন, এতে কয়েকটি হেকমত রয়েছে।

এক. হাতের দ্বারা কাউকে আঘাত করতে হলে নিজের মধ্যেও শক্তির প্রয়োজন। অন্যথায় তুমি একজনকে একটা থাপ্পড় দিলে উল্টো তোমাকে সে চারটা থাপ্পড় খেতে হবে। কিন্তু মুখের দ্বারা দুর্বল মানুষও সবলদের প্রচণ্ড কষ্ট দিতে পারে। তদুপরি মুখের দ্বারা কাউকে কষ্ট দিতে তার নিকটে যাওয়ারও প্রয়োজন হয় না। এক শহরে বসে আরেক শহরের মানুষের অন্তরে কষ্ট দেয়া যায়। আর মুখের দ্বারা কষ্ট দিতে হলে সময়ও এক হওয়ার দরকার পড়ে না। হাত দ্বারা কষ্ট দিতে হলে সামনাসামনি হতে হয়। কিন্তু মুখের দ্বারা পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া মানুষকেও কষ্ট দেওয়া যায়। যেহেতু মুখের দ্বারা কষ্ট দেওয়া সহজ এজন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখের আলোচনা আগে এনেছেন। এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছের করিশমা।

তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলমান ওই ব্যক্তি, যার মুখ ও হাতের কষ্ট থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। তার জান-মাল, ইজ্জত-আবরু সবকিছু নিরাপদ থাকে। মুসলমানের এমন ভয় থাকতে পারে না যে, অন্য কোনো মুসলিম ভাই আমার জান-মাল ও ইজ্জতের ক্ষতি করবে। আমার ইজ্জতের ওপর কেউ হাত উঠাবে।

মুসলমানের মৌলিক পরিচয়

এবার ভেবে দেখুন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানের যে-গুণের কথা বলেছেন, তা আমাদের মধ্যে আছে কি? না কোনো মুসলমানের সম্পদ আমাদের হাত থেকে নিরাপদ আছে, না কোনো মুসলমানের ইজ্জত আবরু আমাদের হাত থেকে নিরাপদ রয়েছে, না কারও প্রাণ আমাদের অত্যাচার থেকে মুক্ত আছে। তাহলে মুসলমান কাকে বলে? একটু ঠান্ডা মাথায় বিষয়টি চিন্তা করে দেখুন। এটা হচ্ছে মুসলমানের মৌলিক পরিচয়।

অন্যের প্রতি সুদৃষ্টি রাখার ক্ষেত্রে নবীজির বরকতময় অভ্যাস

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যের প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখতেন। হাদীছে এসেছে, আম্মাজান হযরত আয়েশা (রহ.) বলেন, আমি শুয়ে আছি। সহসা আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমি দেখাছলাম, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আস্তে-আস্তে বিছানা থেকে নিচে নেমে গেলেন। নিচে নেমে পদধ্বনি বিহীন নরম কদমে হাঁটছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এমন করছেন কেন? তিনি বললেন, হুমায়রা! তুমি আমার পাশে শুয়ে আছ। আমি তাহাজ্জুদ নামায পড়ার জন্য জাগ্রত হয়েছি। এখন ভাবলাম, যদি আমার উঠার মধ্যে শব্দ হয়, তাহলে তোমার ঘুমের ক্ষতি হবে। তাই এমন করছি।

ভেবে দেখুন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের সর্দার। ফেরেশতাকুল ও নবীকুল সকলের শ্রেষ্ঠ। রাহমাতুললিল আলামীন। তিনি ঘুম থেকে জাগ্রত হতে নিজের স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন, কী জানি তার ঘুম ভেঙে না যায়। সুবহানাল্লাহ!

সায়্যেদুনা আবুবকর (রাযি.)-এর প্রজাদের ঘুমের প্রতি খেয়াল

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর খেলাফতকালে একদা হযরত ওমর (রাযি.) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। তিনি দেখলেন, তাঁর দরবারে একটি কাগজে বিভিন্ন লোকের নামের তালিকা রয়েছে। অমুক অসহায়, অমুক বৃদ্ধ, অমুক মাজুর। এদের সেবা করার মতো কেউ নেই। সুতরাং তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজের জন্য সেবক দরকার। অতএব, যারা স্বেচ্ছায় এদের সেবার দায়িত্ব নিলেন, তাদের নামও প্রত্যেকের নামের ডান পার্শ্বে লিপিবদ্ধ রয়েছে। একস্থানে একজন বৃদ্ধা মহিলার নাম রয়েছে। তার

সেবকের কোটায় কারও নাম নেই। হযরত ওমর (রাযি.) মনে-মনে স্থির করলেন, আমি এই মহিলার সেবার দায়িত্ব নেব।

বন্ধুগণ! বতর্মানে যুবকরা তো নিজের মায়ের খেদমত করতেই রাজী নয়। আবার অন্য মহিলার সেবা করার দায়িত্ব নেয় কীভাবে। যখন সমাজ একে অপরের, অসহায়দের, মাজুরদের সেবা করার দায়িত্ব নিচ্ছে এবার ভেবে দেখুন, তাঁদের সমাজে একে অপরের সাথে কেমন মহব্বত ছিল। হযরত ওমর (রাযি.) পরদিন ফজরের নামাযের পর ওই বৃদ্ধার বাড়িতে গেলেন। দরজায় করাঘাত করে বললেন, মা খাদেম এসেছে; কোনো কিছুর প্রয়োজন থাকলে বলুন। সেবা কী ছিল? দূর থেকে পানির ব্যবস্থা করা, ঘর ঝাড় দেওয়া, ঘরের আসবাবপত্র ধুয়ে দেওয়া। বৃদ্ধা পর্দার আড়াল থেকে জবাব দিল, একজন লোক এসে প্রতিদিনের ন্যায় আজও আমার প্রয়োজনীয় কাজগুলো সেরে দিয়েছেন। হযরত ওমর জিজ্ঞাসা করলেন, মা ওই লোকের নাম কী? বলল, ভাই! আমি কোনোদিন তার নাম জিজ্ঞাসা করিনি। সে-ও বলেনি। বললেন, আম্মাজান! লোকটি দেখতে কেমন? বলল, ভাই! লোকটি এসে দরজায় কড়া নাড়া দিয়ে বলে, খাদেম এসেছে, পর্দা করুন। সুতরাং আমি আমার খাছ কামরায় চলে যাই আর সে আমার কাজ সেরে আবার বলে, কাজ শেষ হয়েছে, খাদেম চলে যাচ্ছে, পর্দা থেকে বের হতে পারেন। সে চলে যায়; আমি বের হই। আমি কোনোদিন তার চেহারা দেখিনি।

বুড়ির কথা শুনে হযরত ওমর (রাযি.) অস্থির হয়ে গেলেন। সে আল্লাহর কোন মকবুল বান্দা, যে অসহায় মহিলার সেবা করতে নিজের নামও প্রকাশ করছে না! এমনকি তার মুখও দেখাচ্ছে না। আচ্ছা! আগামীকাল আমি ফজরের আগে এখানে আসব।

পরদিন হযরত ওমর (রাযি.) ফজরের নামাযের পূর্বেই বৃদ্ধার বাড়ি এসে দরজায় করাঘাত করে বলছেন খাদেম এসেছে, কী প্রয়োজন আছে বলুন। মহিলা বলছে খাদেম এসে আমার কাজ সমাধা করে চলে গেছে। হযরত ওমর (রাযি.) আরও অবাক হলেন।

হযরত ওমর (রাযি.) বলেন, পরদিন আমি ঈশার নামায পড়ে ওই মহিলার বাড়ির পার্শ্বে কোথাও লুকিয়ে থাকলাম। দেখব সে আল্লাহর কোন বান্দা, এত চুপিসারে এই অসহায় মহিলার সেবা করছে। রাত যখন গভীর হলো, সবাই সুখনিদ্রায় মগ্ন হলো। দেখলাম, এক ব্যক্তি খুব চুপিসারে পদধ্বনিবিহীন আস্তে-আস্তে পা ফেলে ওই মহিলার বাড়িতে উপস্থিত

হয়েছেন। তার চলার ধরনে বোঝা যায়, তার চলাতে যেন জমিনও কষ্ট না পায়। কাছে আসার পর হযরত ওমর (রাযি.) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? উত্তরে সেকালের খলীফা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর আওয়াজ ভেসে এল, আমি আবুবকর।

হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! রাতের অন্ধকারে এই বৃদ্ধার সেবার জন্য আপনি; অথচ সেবার তালিকায় আপনার নামও উল্লেখ করেননি? হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) বললেন, হ্যাঁ আমি। আমার নাম সেই তালিকায় লিপিবদ্ধ করিনি। কারণ, এই কাজটি আমি একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে করতে চাই। হযরত ওমর (রাযি.) বলেন, আমি দেখলাম, খলীফাতুল মুসলিমীনের পায়ে জুতা নেই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মানলাম, আপনি চুপিসারে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে একাজটি করে যাচ্ছেন। তবে আপনার পায়ে জুতা নেই কেন? হযরত আবুবকর (রহ.) জবাব দিলেন, জুতা খুলে বাড়িতে রেখে এসেছি। কারণ, জুতাপায়ে হাঁটলে আওয়াজ হবে। এতে এই গভীর রাতে জনগণের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটবে। এবার ভেবে দেখুন, সমকালের বাদশাহ প্রজাদের ঘুমের প্রতি কেমন সচেতন ছিলেন। তাঁরা অন্যের আরামের প্রতি কেমন দৃষ্টি রাখতেন।

হযরত ওমর (রাযি.) ও বিধবা মহিলার সেবা

একদা হযরত ওমর (রাযি.) তাঁর গোলাম আসলাম (রাযি.)কে বললেন, আসলাম! কোথা থেকে এক পথিকদল মদীনার সন্নিকটে এসে তাঁবু স্থাপন করছে। এসো একটু পর্যবেক্ষণ করে আসি, তারা কীভাবে রাত কাটাচ্ছে। হযরত আসলাম (রাযি.) বলেন, আমরা সেখানে গিয়ে দেখলাম, সবাই তাঁবুর ভেতরে ঘুমিয়ে আছে। একটা তাঁবুর সামনে জনৈক মহিলা চুলা জ্বালিয়ে কী যেন পাকাচ্ছে। তার পাশে তার দুটি সন্তান বসে আসে। হযরত ওমর (রাযি.) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এত রাত পর্যন্ত সজাগ কেন? মহিলা বলল, জনাব! আমি একজন বিধবা মহিলা। আমার স্বামী বেঁচে নেই। এই আমার দুটি এতিম সন্তান। খুব অভাবে দিন কাটছে। এরা ছটফট করছে। খাবারের কিছুই নেই। ক্ষুধার জ্বালায় বাচ্ছাদুটির চোখে ঘুম আসছে না। তাই আমি চুলা জ্বালিয়ে হান্ডিতে পানি দিয়ে এমনিতেই নাড়াছাড়া দিচ্ছি। বাচ্চাদের সান্ত্বনা দিচ্ছি, বাছারা! আমি খাবার পাকাচ্ছি; তোমরা অপেক্ষা করো। ফলে যখন অধিক সময় হয়ে যাবে, তখন ওরা ঘুমিয়ে যাবে আর আমি অসহায় ও এই এতিম বাচ্চাদের রাত কেটে যাবে।

হযরত ওমর (রাযি.) আসলামকে ইশারা দিলেন, মদীনায় চলো। সেখানে গিয়ে বায়তুলমাল (খাদ্যগুদাম) খুলে একটি আটার বস্তা বের করলেন। কিছু মধু নিলেন, কয়েকটা ঘিয়ের কৌটা নিলেন। তারপর গুদামের দরজা বন্ধ করে হযরত ওমর (রাযি.) আটার বস্তা নিজের পিঠে তুলে নিলেন। আমি বললাম, হুজুর! এ কী করছেন? আমি গোলাম তো আপনার সঙ্গেই আছি। এটা তো আমার কাজ। হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, না; এটা তোমার কাজ নয়– এটা আমার কাজ। আমার প্রজাদের খাবার পৌঁছিয়ে দেওয়া আমার দায়িত্ব। কেয়ামতের ময়দানে আমার বোঝা আমাকেই বহন করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى

'কারও বোঝা কেউ বহন করবে না।'[৫৭]

সুতরাং আমার বোঝা আমাকেই নিতে হবে। গোলাম আসলাম আটার বস্তা হযরত ওমর (রাযি.)-এর পিঠে তুলে দিলেন। তিনি এই বস্তা নিয়ে মহিলার নিকটে গেলেন। গিয়ে দেখলেন, তারা এখনো আগের মতোই আছে। ওমর (রাযি.) তাকে আটার বস্তা দিলেন, মধু দিলেন, ঘি দিলেন এবং বললেন, এগুলো দিয়ে বাচ্চাদের খাবার তৈরি করে দাও। মহিলা বলল, আমি তাদের হালুয়া বানিয়ে দেব। হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, ঠিক আছে। তুমি হালুয়া প্রস্তুত করো; আমি চুলায় আগুন দিচ্ছি। তিনি লাকড়ির ব্যবস্থা করে চুলায় আগুন দিচ্ছেন। কাঁচা চুলা, ভেজা লাকড়ি; ঠিকমতো আগুন জ্বলছে না। ওমর (রাযি.) চুলায় ফুঁ দিচ্ছেন। ধোঁয়ায় চুতুর্দিক ছেয়ে যাচ্ছে। ওমর (রাযি.)-এর চোখ মোবারক দিয়ে পানি বের হচ্ছে। তবু তিনি তাঁর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। অবশেষে আগুন জ্বলল। মহিলা সবকিছু প্রস্তুত করে পাতিলে ঢেলে দিল। অতি সুস্বাদু হালুয়া তৈরি হলো। শিশুরা খাবার দেখে অত্যন্ত খুশি হলো। কিন্তু এখনো খেতে পারেনি। কারণ অনেক গরম। হাত দেওয়া যাচ্ছে না। অন্য পাত্রে রেখে ঠান্ডা করা হয়েছে।

আসলাম বললেন, হুজুর! খাবার পাকানো হয়ে গেছে; এবার আমরা চলে যাই। ওমর (রাযি.) বললেন, না-না অপেক্ষা করো। খাবার খেয়ে শিশুরা মনের সুখে আনন্দে মেতে উঠেছে। পরস্পরে খেলাধুলায় মত্ত হয়েছে। ওমর (রাযি.) তাদের খেলাধুলা অবলোকন করছেন। অল্প সময় বসে থেকে

---

৫৭. সূরা ফাতির : আয়াত ১৮

মদীনার পথে রওনা হলেন। রাস্তায় আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হুজুর! খাবার তৈরি হওয়ার পরও সেখানে বসে থাকলেন কেন? এতে আমাদের তো অনেক দেরি হয়ে গেল। হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, আসলাম! আমি স্বচক্ষে বাচ্চাদের ক্ষুধার তাড়নায় কান্না দেখেছি। তাই ভাবলাম, এবার স্বচক্ষে তাদের মুখে হাসি দেখে যাই।

সুবহানাল্লাহ! এ হচ্ছে মানবতা। এর নাম নেকি। বর্তমান যুগের যুবকরা অবাধ্য হয়ে যায়। মা কাঁদে। সেই মায়ের অশ্রুর তাদের নিকট কোনো মূল্য নেই। পিতা কাঁদে। তার চোখের পানি সন্তান চোখ ভরে দেখে। তাদের সেই অনুভূতিও হচ্ছে না যে, আমার পিতা কাঁদছে। এদিকে তারা কোনো ভ্রূক্ষেপও করছে না। আমরা একবারও ভাবছি না, আমাদের পূর্বপুরুষগণ অন্যের মনে কষ্ট দেওয়া সহ্য করতে পারতেন না। আমরা তো তাঁদের উত্তরসূরী। তাঁদের সহমর্মিতা আমাদের মধ্যে আসছেনা কেন?

সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যাধি

মনে রাখবেন, সবচেয়ে বড় রোগ অন্তরের রোগ। আর অন্তরব্যাধির মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্যাধি হচ্ছে অন্তরের কষ্ট। অন্তরের কষ্টের মর্ম কী? তা হলো কাউকে দুঃখ দেওয়া। মানুষের অন্তরে ব্যথা দেওয়া আজ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। আমরা একে আজ গুনাহের কাজ মনে করছি না। আমাদের আকাবিরগণ এ-বিষয়ে খুব গুরুত্ব দিতেন। তাঁরা কারও অন্তরে দুঃখ দেওয়া সহ্য করতে পারতেন না। আপনারা বলবেন, এটা তো মহান ব্যক্তিবর্গের কাজ। আমরা সেটা পালন করব কীভাবে? তা হলে আপনার নিকটবর্তী যুগের কিছু কথা শ্রবণ করুন।

আকাবিরের জীবনী নবীজির জীবনীর প্রতিচ্ছায়া ছিল

পাকিস্তানের প্রধান মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব (রহ.) বলেন, আমি দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীছ সমাপণ করে উচ্চ ডিগ্রী হাসিল করলাম। তখন আমার হাতে আরও কিছু সময় অবশিষ্ট রইল। ভাবলাম, এই সময়টা হযরত আসগর হোসাইন দেওবন্দি (রহ.)-এর খেদমতে কাটিয়ে দেব। সুতরাং আমি তাঁর নিকট চলে গেলাম। দুপুরের সময় খাবার খেলাম।

খাওয়ার পর দস্তরখানা গোছানোর সময় হলো। হুজুর নিজেই দস্তরখানা গোছাতে লাগলেন। আমি অগ্রসর হলাম। হুজুর দস্তরখানাটা আমি গুছিয়ে

নিই। হুজুর বললেন, তুমি দস্তরখানা গোছাবে? দস্তরখানা গোছানো কবে থেকে শিক্ষা করেছ? চিন্তা করছেন? একজন মুফতী সাহেবকে বলছেন, দস্তর গোছানো কোথায় শিখেছ? তিনি বললেন, হুজুর আপনি শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন, দেখো, অবশিষ্ট যে খাবার রয়েছে, তা আমি প্রথমে আলাদা করছি। এটা অন্য কেউ খেতে পারবে। তারপর যে ছোট-ছোট খাবার আছে, সেগুলো অমুক জায়গায় ফেলব। সেখানে এগুলো পিঁপড়ারা খেতে পারবে। এগুলো পিঁপড়া ও অন্যান্য পোকামাকড়ের আহার হয়ে গেল। আর যে হাড্ডি বা মাছের কাটা আছে, এগুলো অমুক জায়গায় ফেলব। সেগুলো কুকুর-বিড়াল এসে খাবে। সুতরাং এগুলোর দ্বারা তাদেরও জীবিকা হয়ে যাবে। আর এই যে তোমরা আম খেয়েছ, সেই আমের আঁটিগুলো একত্র করে অমুক মাঠে ফেলব। সেখানে এগুলো শোকাবে। তারপর গ্রামের ছোট-ছোট ছেলেরা এখানে খেলতে এসে এই আমের বিচিগুলো পেয়ে খুশি হবে যে, আমরা আমের শুকনো বিচি পেয়েছি; এগুলো দিয়ে খেলা করা যাবে। আবার কোনো-কোনো ছেলে আমের বিচির ভেতরের শুকনো অংশ খাবে। আর এই যে আমের ছালগুলো একত্র করছি, এগুলো খোলা জায়গায় ফেলো না। কারণ, এটা গরিব এলাকা। এখানের গরিব ছেলেমেয়েরা এগুলো দেখলে তাদের মনে জাগবে, আহ! যদি আমাদের আব্বার পকেটে টাকা থাকত, তাহলে তিনি আমাদের আম খাওয়াতেন। এটা তাদের অন্তরের আক্ষেপের কারণ হবে। সুতরাং আমি রাস্তায় চলার সময় এখানে একটা ছাল ফেলব। আরও দশ কদম দূরে গিয়ে আরেকটা ফেলব। তাহলে কারও মনে এই ভাবনাও হবে না যে, এই এলাকায় কেউ আম খেয়েছে।

এ ছিল আল্লাহওয়ালাদের চরিত্র। তাঁরা অন্যের মনে এতটুকু কষ্টও সহ্য করতে পারতেন না। হযরত মুফতী শফী সাহেব বলেন, ঈশার নামাযের পর আসতে লাগলাম। আমি দেখলাম, কিছুক্ষণ যাওয়ার পর হুজুর নিজের পায়ের জুতা খুলে নিলেন। দু-চার মিনিট পর পুনরায় জুতা পায়ে দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হুজুর! আপনি এমন করছেন কেন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। হুজুর বললেন, শোনো; এখানে আমরা হিন্দু-মুসলমান সবাই মিলেমিশে বাস করি। এটা ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার আগের কথা। যেখানে আমি জুতা খুলেছিলাম, যেখানে জনৈক কাফের মহিলা বাস করে। সে একজন পতিতা মহিলা। দেহব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করত। নিজের ইজ্জত বিক্রি করত। দেখতে খুব অপরূপা সুন্দরী ছিল। অনেক লোক তার নিকট আসত। এতে তার প্রচুর ব্যবসা হতো। বর্তমানে সে বয়স্কা হয়ে

গেছে। এখন তার নিকট আর আগের মতো লোক আসে না। তার সেই ব্যবসাও ঠিকমতো হচ্ছে না। কিন্তু সে অভ্যাসের কারণে এখনো অপেক্ষা করছে, কোনো গ্রাহক পাওয়া যায় কি-না; তাহলে আমার পথ খুলে যাবে। আমি তার বাড়ির নিকট এজন্য জুতা খুলে ফেলছি যে, পুরুষের পায়ের জুতার শব্দ হয়। কি জানি ওই মহিলা ঘরে সেই অপেক্ষায় থাকে আর আমার জুতার শব্দ পেয়ে ভাবে, মনে হয় আমার কোনো গ্রাহক আসছে। তারপর যখন আমি দূরে চলে যাব, তখন সে নিরাশ হয়ে মনে কষ্ট পাবে। আহ! আমার ঘরে কেউ এল না। মনে-মনে আক্ষেপ করবে। সুতরাং আমি ওই বদকার কাফের মহিলার অন্তরেও কষ্ট দিতে চাই না। তাই আমার জুতা খুলে ফেলি।

আল্লাহু আকবার! চিন্তা করুন। আমাদের আকাবির কেমন সর্তকতা অবলম্বন করে চলতেন। সমাজে একে অপরের প্রতি কেমন সহমর্মিতা দেখাতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.)-এর প্রতিবেশিত্বের মূল্য

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)-এর বাড়ির আশেপাশে এক ইহুদি বাস করত। তার বাড়ি বিক্রি করার প্রয়োজন হলো। একজন গ্রাহক এল। দাম জিজ্ঞাসা করল। ইহুদি বলল, আমার বাড়ির মূল্য দু-হাজার দিনার। ক্রেতা বলল, এমন বাড়ির মূল্য তো দু-হাজার নয়– এক হাজার। ক্রেতা বলল, বাড়ির মূল্য এক হাজারই। তবে আরেক হাজার হচ্ছে আমার বাড়ি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারকের মতো আল্লাহর অলীর প্রতিবেশিত্বের কারণে। অর্থাৎ– তাঁর মতো লোকের প্রতিবেশিত্বের মূল্য এক হাজার।

ইমাম আজম (রহ.) ও উত্তম আচরণ

আমাদের পূর্বপুরুষগণ তাঁদের মাতাপিতার কেমন সম্মান করতেন? শুনুন– দিলের কানে শুনুন। আমাদের মাযহাবের ইমাম হযরত আবুহানীফা (রহ.)-এর মাতা বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। তখন ওই যুগ ছিল, যখন ইমাম আজম (রহ.) তাঁর ওস্তাদ হাম্মাদ (রহ.)-এর আসনে বসেছিলেন। সারা দেশে তাঁর ফতোয়া চলত। এটি ১২০ হিজরির ঘটনা। মায়ের দৃষ্টিতে সন্তান সন্তানই থাকে। সে যত বড়ই হোক মা তাকে নাম ধরেই ডাকে।

তাঁর মাতা কোনো একসময় একটি মাসআলা জানতে চাইলেন। বললেন, নোমান! তুমি আমাকে অমুক আলেমের নিকট নিয়ে যাও। তিনি বয়স্ক

মানুষ। এ বিষয়ে তার বিশদ জ্ঞান থাকবে। এ ব্যাপারে তার ইল্‌ম মজবুত হবে। আমি এ মাসআলা তাকে জিজ্ঞাসা করব। ইমাম সাহেব মাকে সোওয়ারিতে বসিয়ে নিজে সোওয়ারির লাগাম ধরে নিয়ে যাচ্ছেন। কোনো বাজারের নিকট গেলে তার শিষ্যরা তাঁকে দেখে অবাক। ইমাম সাহেব কার সোওয়ারির লাগাম টেনে নিয়ে যাচ্ছেন, ইমাম সাহেব তাঁর মাকে নিয়ে বুযুর্গের বাড়িতে গেলেন। দরজায় নক করলেন, আমার আম্মাজান আপনার নিকট কী একটা মাসআলা জানতে এসেছেন। মা মাসআলা জিজ্ঞাসা করলেন। ঘটনাক্রমে তার প্রশ্নের সমাধান ওই বুযুর্গের জানা ছিল না। তিনি ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, এর সমাধান কী? তিনি আস্তে করে ওই বুযুর্গকে বলে দিলেন, এর সমাধান এই। আপনি উচ্চৈঃস্বরে বলে দিন; আমার আম্মাজান শুনে নেবেন। বুযুর্গ তা-ই করলেন। তাঁর মা শুনে মাসআলা বুঝো নিলেন। মা আজীবন তার ওপর আমল করেছেন। কিন্তু ইমাম সাহেব কোনোদিন তাঁর মাকে বুঝতে দেননি, আপনি যে-মাসআলা জানার জন্য উক্ত বুযুর্গের নিকট গিয়েছিলেন, তার সমাধান আমিই দিয়েছিলাম। তাঁর প্রতি আম্মাজানের বিশ্বাস জন্মেছে। সুতরাং তাঁর কথা শুনেই আমার আম্মাজানের শান্ত থাকা চাই।

শত্রু কীভাবে মিত্র হয়

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, আমরা এমন হব, যাতে আমাদের আচরণ ও চরিত্র দেখে পর আপন হয়ে যায়, শত্রু মিত্র হয়ে যায়। কাফের পর্যন্ত আমাদের আচরণ দেখে মুসলমান হয়ে যাবে। কিন্তু আপনারা ভেবে দেখুন, বর্তমানে আমাদের সমাজে যে শত্রুতা রয়েছে, যত বিরোধিতা রয়েছে, আগে কি এরকম ছিল? আপনারা হয়তো দেখে থাকবেন, বাস্তবেও প্রত্যেক মানুষ একদিকে না আরেক দিকে উশৃঙ্খল হয়ে আছে। ঘরের মধ্যেও আমরা না ভালো পিতা হতে পারি, না ভালো স্বামী হতে পারি। কোনো-না-কোনোভাবে তাদের চাপের মুখে রাখি। এমনকি আমরা ভালো সন্তানও হতে পারি না। মাতাপিতা আমাদের প্রতি কষ্টে আছেন। তাহলে আমরা কী? নবীজি বলেছেন–

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ

'মুসলমান তাকে বলে, যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।'

যখন জানাযা উপস্থিত করা হয়, তখন আমরা ঘোষণা দিয়ে থাকি, ভাই! যদি তিনি কাউকে কোনো প্রকার কষ্ট দিয়ে থাকেন কিংবা কারও প্রতি সীমালঙ্ঘন করে থাকেন, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেবেন। আমাকে আপনারা একথার জবাব দিন তো, যদি সে কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকে, তাহলে ওই ব্যক্তি কি তার জানাযায় উপস্থিত হয়েছে? তাহলে এই ঘোষণা দেয়ার ফায়েদা কী? উচিত তো এটা ছিল যে, যাকে সে কষ্ট দিয়েছে, জীবিত থাকতে তাঁর নিকট ক্ষমা চেয়ে নেবে।

এক বুযুর্গের অপূর্ব অভ্যাস

আমাদের আত্মীয়ের মধ্যে এক বুযুর্গ ছিলেন। তিনি কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে বিদায় নেওয়ার সময় সালাম করে তাকে বলতেন, ভাই! আমার ওপর আপনার অনেক হক রয়েছে। আমি অনেক দুর্বল মানুষ। আপনার হক আদায় করতে পারিনি। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। শরীয়ত বলে, এমন কথা কেউ বললে যখন সেই ব্যক্তি একটি মুচকি হাসি দেবে, তখন তার সেই মুচকি হাসি সেই ব্যক্তির জন্য ক্ষমার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে। এটি কত সহজ ব্যবস্থা। বড়রা ছোটদের নিকট ক্ষমা চাইতে পারে। ছোটরা বড়দের নিকট ক্ষমা চাইতে পারে। ভাই ভাইয়ের নিকট ক্ষমা চাইবে। সন্তান মাতাপিতার নিকট ক্ষমা চাইবে। এত দীর্ঘ কথা বলার দরকার কী? কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে শুধু এতটুকু বলে দেবে যে, আমার ওপর আপনার অনেক হক ছিল। আমি অপারগ। তাই আদায় করতে পারিনি। মেহেরবানিপূর্বক ক্ষমা করে দেবেন। আপনি দেখবেন, যখন আপনি আপারগ হয়ে কাউকে এমন কথা বলবেন, তখন সে আপনার কথা শুনে হাসি দেবে। আর তার চেহারায় এতটুকু হাসি তোমাকে ক্ষমা করে দেওয়ার কারণ হয়ে যাবে। কত সহজ উপায়। তাই সবার জন্য উচিত নিজের জীবদ্দশায় অন্যের নিকট ক্ষমা চেয়ে নেবে।

আজ ক্ষমা চেয়ে নাও

বন্ধুগণ! আজ ক্ষমা চেয়ে নাও। কাল কেয়ামতের ময়দানে ক্ষমা পাওয়ার অবকাশ থাকবে না। সেদিন নবীগণ পর্যন্ত ভয়ে কাঁপতে থাকবেন। সেদিন যখন আল্লাহ হযরত ঈসা (আ.)কে জিজ্ঞাসা করবেন, 'তুমি কি এমন বলেছিলে।' ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, তখন হযরত ঈসা (আ.) ভয়ে কাঁপতে শুরু করবেন, যিনি সত্যবাদী, যার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

لِيَسْئَلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ

কেয়ামতের দিন যখন সত্যবাদীদের তাদের সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।'[৫৮]

সেদিন আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কী অবস্থা হবে, যেদিন সত্যবাদীদেরই আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন। আজ কাউকে কমবখত বলা সহজ, কাউকে বেঈমান বলা সহজ, কাউকে ইতর বলা সহজ। কিন্তু কাল কেয়ামতের ময়দানে এর জবাব দেয়া খুবই কঠিন হবে।

ইরানের এক বাদশাহ ছিলেন মালেক শাহ। একদা তাঁর শিকার করার ইচ্ছা হলো। তিনি সৈনিকদের সঙ্গে নিয়ে শিকারে গেলেন। তিনি শিকারে লিপ্ত হয়ে গেলেন। সেখানে তিন দিন থাকতে হবে। এর মধ্যে সৈনিকরা ওই এলাকার এক বৃদ্ধ মহিলার একটা গাভি ধরে জবাই করে ভুনা করে খেয়ে ফেলল। বুড়ি বলল, ঠিক আছে; আপনারা আমাকে কিছু টাকা দিয়ে দিন; আমি আরেকটা গাভি খরিদ করে নেব। তারা টাকা দিতে অস্বীকার করল। বুড়ি বলল, তাহলে আমাকে বাদশাহর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে দাও। তারা সেই সুযোগও দিল না। ফলে বুড়ি অত্যন্ত অস্থির হয়ে গেল, এখন আমি কী করব। এই গাভিটাই যে ছিল আমার একমাত্র অবলম্বন!

এতক্ষণে কোনো তালিবে ইল্‌মের সঙ্গে তার কথা হলো। তালিবে ইল্‌ম বুড়িকে পরামর্শ দিল, শোনো; বাদশাহ তিন দিনের জন্য শিকারে এসেছেন। তিন দিন পর চলে যাবেন। বাদশাহ বাড়িতে যাওয়ার পথে একটি নদী আছে। সেই নদীতে একটিমাত্র সেতু। সেই সেতু ছাড়া বাদশাহ নদী পার হতে পারবেন না। তুমি ওই সেতুর ওপর বসে অপেক্ষা করো। বাদশাহ খুব সম্ভ্রান্ত লোক। যখন বাদশাহর সোওয়ারি সেই সেতুতে উঠবে, তখন তুমি সরাসরি বাদশাহর নিকট তোমার গাভি দাবি করবে। বাদশাহ তোমার গাভির মূল্য দিয়ে দেবেন।

তালিবে ইল্‌মের কথায় বুড়ি সেখানে বসে রইল। বাদশাহর বাহন সেতুতে ওঠার পর বুড়ি বাদশাহর ঘোড়ার লাগাম ধরে তাদের গতি রোধ করল। বুড়ির কাণ্ড দেখে বাদশাহ হতবাক। কী হয়েছে মা, বিষয়টা কী আমাকে খুলে বলুন। আমার বাহন আটকালে কেন? বুড়ি বলল, মালেক শাহ আমার ও আপনার মধ্যে একটি জটিল বিষয় আছে। এর সমাধান আপনি এ

---

৫৮. সূরা আহযাব : আয়াত ৮

পুলে করতে চান, নাকি পুলসিরাতে করতে চান? বুড়ির কথা শুনে বাদশাহ ঘোড়া থেকে নেমে গেলেন। তাঁর দুচোখ বয়ে অশ্রু ঝরছে। আম্মাজান! বিষয়টা খুলে বলুন; আমি এখাইে সমাধান করতে চাই। পুরসিরাতে সমাধান করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনার দাবি উত্থাপন করুন। প্রাপ্য বুঝে পেয়ে আমাকে মুক্তি দিন। যাহোক, ঘটনা শুনে বাদশাহ তার গাভির মূল্য দিয়ে বুড়ির নিকট ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

ভেবে দেখুন, সেদিন আমাদের অবস্থা কী হবে?

আমাদের ভেবে দেখা দরকার, এজীবনে কতজনকে দুঃখ দিয়েছি, কতজনের ওপর অত্যাচার করেছি, কতজনের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেছি। কাল কেয়ামতের ময়দানে যখন আল্লাহর সম্মুখ দিয়ে পুলসিরাত অতিক্রম করব, তখন যদি এই ঘোষণা দেওয়া হয় যে,

وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْئُوْلُوْنَ ۝

'তাদের আটকাও; তাদেরকে আমার কিছু জিজ্ঞাসা করতে হবে।'[৫৯]

তারা এখানে জিজ্ঞাসিত হবে। তাদের পেছনের অবস্থা জিজ্ঞাসা করা হবে। তারা মানুষের অন্তরে কষ্ট দিয়েছিল। তারা আমার বান্দাদের নির্যাতন করেছিল। সুতরাং চিন্তা করুন, সেদিন আমাদের কী অবস্থা হবে। আজই হচ্ছে ক্ষমা চাওয়ার সময়। আমাদের অতীতের দোষত্রুটি খুঁজে-খুঁজে আল্লাহর বান্দাদের নিকট ক্ষমা চাই এবং চেষ্টা করি যে, আমরা কারও অন্তরে কষ্ট দেব না। কেউ আমাদের কষ্ট দিলে আমরা আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের ক্ষমা করে দেব। হাদীছ শরীফে এসেছে, বান্দা অন্য কারও অপরাধ যত দ্রুত ক্ষমা করে দেবে, কাল কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাকে তত দ্রুত ক্ষমা করে দেবেন। সুতরাং কেউ আমাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করলে আল্লাহর ওয়াস্তে আমরা তাকে ক্ষমা করে দেব। আমরা কারও সঙ্গে খারাপ আচরণ করব না। এভাবে আমরা নিজে পরিশোধিত হওয়ার চেষ্টা করব। দেখবেন, এক সময় আমাদের গোটা সমাজ শুধরে যাবে।

ইসলামের বিশ্বজনীন ব্যবস্থা

ইসলাম শুধু মানুষদের কষ্ট দিতে নিষেধ করেনি, অন্যান্য প্রাণীদের কষ্ট দিতেও ইসলাম নিষেধ করেছে। হাকীমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ আলী

---

৫৯. সূরা সাফফাত : আয়াত ২৪

থানভী (রহ.) আমাদের ওপর প্রাণীদের হক সম্পর্কে একটি কিতাব রচনা করেছেন। কিতাবটির নাম হচ্ছে, حُقُوْقُ الْبَهَائِمِ 'প্রাণীদের অধিকার।' সেটা পড়বেন। দেখবেন, আমরা গরু, ছাগল, ঘোড়া, গাধা, মহিষ ইত্যাদি লালন করি, আমাদের ওপর সেগুলোর কেমন হক রয়েছে। সুবহানাল্লাহ! কেমন নিপুণ দীন! কেমন অপূর্ব শরীয়ত যে, প্রাণীদের অধিকারের প্রতি এমন গুরুত্ব দিয়েছে। আর মানুষ তো মানুষই, তাদের অধিকার কেমন হতে পারে!

হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর বিস্ময়কর ঘটনা

খুবই আজব ঘটনা। তিনি বলেন, আমি বয়ানুল কুরআন লেখার সময় আমার স্ত্রী কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য চলে যান। যাওয়ার সময় বলে গেলেন, ঘরে কিছু মোরগ আছে; সকাল ১০টায় সেগুলোকে খাবার দিতে হবে। আমি বললাম, ঠিক আছে। তিনি চলে গেলেন। পরদিন আমার সেগুলোর কথা স্মরণ নেই। যে-কাজ নিত্যদিনের রুটিনে থাকে না, তা স্মরণ না থাকাই স্বাভাবিক। তিনি বলেন, আমি তাফসীর লিখতে বসলাম। কিন্তু তাফসীরের বিষয়বস্তুর আগমন বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক ভাবছি। গবেষণা করছি, কিন্তু কিছুই স্মরণে আসছে না। ভাবলাম, অবশ্যই আমার থেকে কোনো গুনাহ সংঘটিত হয়েছে। কোনো অপরাধ হয়েছে, যার বেবরকতির কারণে আজ আমার স্মৃতিতে কিছুই আসছে না। আমি তাফসীর লিখতে পারছি না। আমি লেখা বন্ধ করে বসে চিন্তা করতে লাগলাম, কী হয়েছে। আমি কোন অপরাধটা করলাম। আমার এমন হচ্ছে কেন? হঠাৎ আমার স্মরণ হলো, হায়! আমি তো মোরগগুলোকে খাবার দেইনি। এখন তো বেলা এগারোটা হয়ে গেছে।

তিনি বলেন, সঙ্গে-সঙ্গে আমি সবকিছু ছেড়ে মোরগের ঘরে চলে গেলাম। দেখলাম, মোরগগুলো ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করছে। আমি সেগুলোকে দানা-পানি দিলাম। তারা অতি তড়িঘড়ি করে খেয়ে শান্ত হলো। আমি আমার কাজে চলে এলাম। লিখতে বসলাম। এবার লেখার বিষয়বস্তু পূর্বের ন্যায় স্মৃতিপটে উদ্ভাসিত হতে লাগল। দেখুন, সাধারণ মোরগকে খাবার-পানি দিতে বিলম্ব হওয়ার দরুন হাকীমুল উম্মতের স্মৃতি থেকে আল্লাহর পবিত্র কালামের ইল্‌ম কীভাবে লোপ পেয়ে গেল। আল্লাহ আমাদের সকলকে বোঝার তাওফীক দান করুন।

অন্যের হক সম্পর্কে বেপরোয়া হওয়ার মসিবত

আমরা যদি মাতাপিতার অন্তরে কষ্ট দেই, প্রতিবেশির মনে আঘাত দেই, ঈমানদারদের হৃদয় ব্যথিত করি, তাহলে আমাদের কী অবস্থা হবে? কেয়ামতের দিন আল্লাহ এক বান্দাকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন, হে বান্দা! আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম; তুমি আমাকে আহার দান করনি। আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম। তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। বান্দা আল্লাহর জিজ্ঞাসা শুনে অবাক হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি অসুস্থ ছিলাম; তুমি আমার শুশ্রূষা করনি। বান্দা বলবে, হে আল্লাহ! আপনি ক্ষুধা থেকে মুক্ত। আপনি মহান, পবিত্র। এগুলোর তো আপনার কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, ঠিক আছে; আমি এগুলো থেকে মুক্ত। তবে, অমুক সময় তোমার অমুক প্রতিবেশী অনাহারে দিন কাটাচ্ছিল। পিপাসায় কাতরাচ্ছিল। তখন যদি তুমি তাকে আহার করাতে, পানি পান করাতে, তাহলে আমাকেই আহার করানো হতো, আমাকে পান করানো হতো।

সেদিন উপলব্ধি করতে পারবেন, কোনো অনাহারীকে এক মুঠ ভাত দান করার, কোনো তৃষ্ণার্তকে এক গ্লাস পানি পান করানোর প্রতিদান কত। সুতরাং একে অপরের প্রতি সচেতন হওয়া চাই। আমরা মানুষ। আল্লাহ তা'আলার বান্দা। আল্লাহ চান, আমরা পরস্পরে ভালোবাসা রাখি। কাউকে কষ্ট না দেই। কারও মনে দুঃখ দেওয়া থেকে বিরত থাকি। বরং অন্যের মন খুশি রাখা চাই। মুমিনের অন্তর খুশি রাখা আল্লাহ তা'আলার নিকট অনেক বড় সাওয়াবের কাজ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.)-এর ঈমানদীপ্ত ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.) ইমামুল মুহাদ্দিছীন ছিলেন। হাদীছ শাস্ত্রে আমীরুল মুমিনীন বা মুমিনগণের নেতা বলা হতো। একদা তার কাছে এক লোক এসে বলল, হুজুর! আমার ওপর সাতশত দেরহাম ঋণ রয়েছে। দয়া করে আমাকে সাতশত দেরহাম দিয়ে দিলে আমি ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যাই। তিনি বললেন, ঠিক আছে; অনেক ভালো। কাগজ নিলেন। সেখানে সাত হাজার দেরহাম লিখে দিয়ে আগন্তুককে বললেন, যাও; আমার সেক্রেটারিকে গিয়ে টাকা দিতে বলো। সে কাগজ নিয়ে সেক্রেটারির কাছে গিয়ে তার হাতে কাগজটি দিয়ে বলল, হুজুর আমাকে সাতশত টাকা দিতে বলেছেন। সেক্রেটারি দেখল, কাগজে সাত হাজার দেওয়ার কথা লেখা রয়েছে। সেক্রেটারি দ্বিধায় পড়ে গেল। ভুল হয়নি তো? আগন্তুককে বলল,

ভাই! আপনি বলছেন, সাতশত আর এখানে লেখা আছে সাত হাজার। এখন আমি কী করি? চলো হুজুরকে পুনরায় জিজ্ঞেস করে আসি।

সেক্রেটারি কাগজ নিয়ে হুজুরের সামনে উপস্থিত হলো। বলল, হুজুর! লোকটি বলছে, সাতশত আর এখানে আছে সাত হাজার। একটি শূন্য অতিরিক্ত হয়নি তো? হুজুর বললেন, আমি সাত হাজারই লিখেছি। দাও কাগজটি দাও। কাগজ নিয়ে সাত হাজার কেটে চৌদ্দ হাজার লিখে দিলেন। যাও; ওকে এপরিমাণ টাকা দিয়ে দাও।

সেক্রেটারি সমস্ত টাকা গুনে দিল। লোকটি আনন্দে আত্মহারা হয়ে চলে গেল। এবার সেক্রেটারি জিজ্ঞাসা করল, হুজুর ব্যাপার কী? আপনার কাজ আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। লোকটি সাতশত চাইল, আপনি সাত হাজার লিখে দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হুজুর! ভুল হয়েছে নাকি? আপনি সাত হাজার কেটে চৌদ্দ হাজার লিখে দিলেন। হুজুর! আমাকে একটু খুলে বলবেন কি?

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.) জবাব দিলেন, শোনো; আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীছ পড়েছি। সেখানে তিনি বলেছেন, যখন কোনো বান্দা কোনো ঈমানদারের হৃদয়কে অকস্মাৎ খুশি করে দেয়, তখন আল্লাহ ওই বান্দার অতীতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন। যখন বান্দা আমার নিকট তার সাতশত টাকা ঋণের আবদার করল, তখন আমি তাকে সাতশতই দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পরে ভাবলাম, সাতশত দিলে সে সম্পূর্ণ টাকা তার ঋণ বাবৎ দিয়ে দেবে। তার অভাব পূরণের জন্য কিছুই থাকবে না। এতে সে অকস্মাৎ আনন্দিত হবে না। তাই সাত হাজার লিখে দিলাম, যাতে তার প্রত্যাশাও পূরণ হয়ে যায় এবং অপ্রত্যাশিতভাবে যদি অধিক আনন্দিত হয়, তাহলে আমার গুনাহ ক্ষমা করা হবে। আর তুমি আমার কাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দিলে। সাত হাজার জিজ্ঞাসা করতে এলে। এখন আমি সাত হাজার কেটে চৌদ্দ হাজার বানিয়ে দিলাম। কারণ, সে যখন শুনল, এখানে সাত হাজার লেখা হয়েছে। তখন তার মনে এই প্রত্যাশা হয়ে গেছে যে, আমি সাত হাজার পাব। ফলে সাত হাজার পাওয়ার পর সে অকস্মাৎ আনন্দিত হবে না। তাই সাত হাজার কেটে চৌদ্দ হাজার বানিয়ে দিলাম, যাতে তার অন্তর অকস্মাৎ খুশি হয়ে যায়। আর এই আমলের বিনিময়ে আল্লাহ আমার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন। সুবহানাল্লাহ! তারা হলেন ঈমানদার মানুষ। তারা অন্যের হৃদয়ের প্রতি এমন দৃষ্টি রাখতেন যে, কাউকে সামান্য পরিমাণও কষ্ট দিতেন না।

ঈমানদারদের সঙ্গে উত্তেজিত হওয়া অপছন্দনীয় কাজ

আল্লাহ আমাদের এমন জীবন দান করুন, আমরা যেন অন্যের জন্য রহমত হতে পারি। অন্যের কষ্টের কারণ যেন না হই। অন্যের প্রাণের বিপদ হিসেবে যেন আমরা পরিগণিত না হই। বর্তমানে তো মানুষ যেন শিংবিহীন ছাগল। তার নিকট দিয়ে গমন করলেই সে গুঁতা মারে। আমরাও ওই রকম শিংবিহীন প্রাণীর মতো। মাথায় আমাদের শিং দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু এদিক থেকে কেউ এলে তাকেও গুঁতা দিচ্ছি, ওদিক থেকে কেউ এলে তাকেও ঢুঁ মারছি। সামান্য কথা নিয়ে ঝাগড়া বাঁধিয়ে দিচ্ছি। অন্যের সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছি। আমরা এ-বিষয়টাকে বুঝতে চেষ্টা করছি না। স্মরণ রাখবেন, কোনো ঈমানদারের সঙ্গে ঝগড়া করা, উত্তেজিত হওয়া আল্লাহ তা'আলা কখনো পছন্দ করেন না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানত

নিজের দায়িত্ব হিসেবে আরজ করছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি ওই ব্যক্তির জন্য জান্নাতে ঘর দেওয়ার জামিন হচ্ছি, যে ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করে যদিও সে হকের ওপর থাকে। অর্থাৎ নিজে সত্যের ওপর থেকেও যেব্যক্তি কারও সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ বর্জন করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ওই বান্দাকে বেহেশতে ঘর পাইয়ে দেওয়ার জন্য আমি জামিন হয়ে গেলাম। সুবহানাল্লাহ! তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ

'মুসলমান সে, যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।'

আজকের মাহফিলে আমরা আমাদের অতীতের গুনাহের ওপর ক্ষমা চাই এবং ভবিষ্যতের জন্য সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা করি যে, হে আল্লাহ! আমরা আর তোমার কোনো বান্দাকে কষ্ট দেব না এবং পুণ্যময় জীবন গড়ে তোমার দরবারে হাজিরা দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হব। অন্য কেউ আমাদের ওপর কোনো ভুল করলে আমরা আপনার জন্য তাকে ক্ষমা করে দেব। আমরা কারও ব্যাপারে কোনো ভুল করব না। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন।

বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) একটি ঘটনা লিখেছেন। তিনি বলেন, একদা কোনো বান্দার স্ত্রীর পক্ষ থেকে একটি মারাত্মক অপরাধ

সংঘটিত হয়ে যায়। এমন অপরাধ হয়েছে, যার দরুন সে তার স্ত্রীকে চাইলে শাস্তি দিতে পারে। চাইলে একেবারে বিদায় দিয়ে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারে। সত্য তার পক্ষে ছিল। কিন্তু সে ভাবল, আমার স্ত্রী বিষয়টি নিয়ে নিজেও অনুতপ্ত হয়েছে। স্ত্রী বুঝতে পেরেছ, আমার মারাত্মক অপরাধ হয়েছে। ফলে সে বলল, ঠিক আছে; যাও সে তো আল্লাহর বান্দী। মানুষ হিসেবে ভুল হতেই পারে। সে লজ্জিতও হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম।

কিছুদিন পর লোকটি মারা যায়। তখন আল্লাহর কোনো নেক বান্দা তাকে স্বপ্নে দেখেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আগে বলুন আপনার সঙ্গে কেমন আচরণ করা হয়েছে। সে বলল, ভাই! আল্লাহর দরবারে আমার আমলনামা পেশ করা হলে আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে আমার বান্দা! অমুক সময় তুমি একটি মহা অপরাধে পেয়ে আমার বান্দী বলে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলে। আজ আমি তোমাকে আমার বান্দা বলে ক্ষমা করে দিলাম। আল্লাহু আকবার! আল্লাহ্ আমাদের এমন উত্তম চরিত্রবিশিষ্ট জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ

পরিশেষে একটি কথা বলছি। তখন আমি নবম শ্রেণীতে পড়ি। আমার এক ক্লাসমেট ছিল। আমরা এক সঙ্গে টেবিলে বসে আছি। সে গ্রাম থেকে আসত। তার স্মরণশক্তি খুব ভালো ছিল। নামায পড়ত। তার সঙ্গে আমার গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। আমরা একে অপরকে ভালোবাসতাম। সেই গ্রামাঞ্চলে গাজর, মুলা, টমেটো, শালগম ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। তার কথা শুনে আমার খুব ভালো লাগত। কারণ, জীবনে কোনোদিন গ্রাম দেখিনি। তখন আমি একথা জানতাম না, গম কোনো উদ্ভিদ থেকে উৎপন্ন হয়, নাকি গাছে ধরে। তার গল্প আমি খুব আগ্রহের সাথে শুনতাম।

একদিন সে আমাকে বলল, ভাই, সামনে গ্রীস্মকাল। আমার সঙ্গে চলো; আমাদের গ্রামাঞ্চল ভ্রমণ করে আসবে। গ্রামাঞ্চলে উৎপন্ন ফসল আমি তোমাকে দেখাব। বাড়িতে গিয়ে আম্মাজানকে বললাম, আম্মাজান! আমি গ্রামাঞ্চলে বেড়াতে যাব। গ্রামাঞ্চলের মনোরম দৃশ্য দেখতে আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে। আম্মাজান বললেন, ঠিক আছে; তোমার বড় ভাইয়ের সঙ্গে যাও। তার সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে গ্রামাঞ্চল দেখে আস। সুতরাং আমার বড় ভাইয়ের সঙ্গে

গ্রামাঞ্চলে বেড়াতে গেলাম। সকালে উঠে নামায পড়ে গ্রাম দেখতে বের হলাম। হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ এক জায়গায় দেখলাম, গরু-মহিষের গোবর জমা করে রাখা হয়েছে। গোবরের স্তূপ দেখে আমি অবাক। আমার সাথিকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই! এগুলো গোবর, নাপাক বস্তু, এতে অনেক দুর্গন্ধ রয়েছে। এগুলোকে জমা করে রাখা হয়েছে কেন? এগুলো ফেলে দেওয়া উচিত। সে বলল, ওই যে হালচাষ করছে; তাকে জিজ্ঞাসা করো, এই গোবর জমা করে রাখা হয়েছে কেন?

আমি চাষীকে জিজ্ঞাসা করলাম। এই নাপাক দুর্গন্ধময় গোবর জমা করে রাখছেন কেন। এগুলোর দুর্গন্ধে ক্ষতি হবে। আমি তখন ছোট ছিলাম। লোকটি বলল, মিয়! তুমি ছোট মানুষ। তোমার বোধশক্তি কম। তুমি এটা বুঝবা না। তুমি দেখছ, এগুলো নাপাক, দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু। আমাদের দৃষ্টিতে এগুলো সার, আমরা এগুলোকে জমিনে মাটির সঙ্গে মিশ্রিত করি। ফলে এই জমিনে উন্নত ফসল উৎপন্ন হয়। সাইজও ভলো হয়। সংখ্যায়ও অধিক হয়। এগুলো দ্বারা আমাদের অনেক উপকার হয়। সে আমাকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু আমার অল্প বয়স, তার কোনো কথা আমার বুঝে আসছে না। আমার মস্তিষ্কে একটি কথাই আছে যে, এগুলো নাপাক ও দুর্গন্ধযুক্ত। এগুলো জমা করে রাখবে কেন? এগুলো দূরে ফেলে দেওয়া উচিত। এগুলো দিয়ে নাকি খাবারের বস্তু উৎপন্ন করা হয়। যাহোক, গোবরের আসল হাকীকত আমার বুঝে এল না। না বুঝেই বাড়িতে চলে এলাম।

হে মানবজাতি!

এখন যখন আমার সেই অতীতের ঘটনা স্মরণ হয়, তখন বিষয়টি বুঝে আসে যে, সেই নাপাক গোবর দ্বারা মানুষের খাবার উৎপন্ন করা হয়। তখন ভাবতে অবাক লাগে, হে মানুষ! যাকে আমরা গোবর বলি, নাপাক দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু বলি, তাকে ঘৃণার চোখে দর্শন করি। সেই গোবরকে যদি জমিনে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সেটা তার সাথি মাটির সঙ্গে মিশে উন্নত সবজি উৎপন্ন হওয়ার কাজে আসে। সে-ও শস্যকে উপকার পৌঁছায়। আর আমরা মানুষ হয়ে সাথি-সঙ্গীদের উপকার পৌঁছাতে পারছি না। তাহলে তো আমরা আল্লাহর দৃষ্টিতে সেই গোবর থেকেও নিকৃষ্ট হয়ে যাব। আল্লাহ আমাদেরকে সহানুভূতিশীল পুণ্যময় জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

যুবকদের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

'এ উম্মতের মধ্যে যত বিখ্যাত মনীষী অতিবাহিত হয়েছেন, তারা সকলেই আপন পিতামাতা থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং অতি অল্প বয়সেই খ্যাতি অর্জন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, হযরত বায়েযিদ বোস্তামি (রহ.) সর্ম্পকে হযরত জুনায়েদ বাগদাদি (রহ.) বলেন, ফেরেশতাদের মধ্যে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মর্যাদা যেমন, আমার দৃষ্টিতে আউলিয়ায়ে কেরামের মধ্যে হযরত বায়েজিদ বোস্তামির মর্যাদা তেমন। ছোটবেলায় এতিম হয়ে গেলেন। মা তাকে শিক্ষা দিয়ে প্রতিপালন করলেন। এখানে আরও একটি কথা স্মরণ রাখবেন। এতিমরাই কিন্তু মোতি হয়। যখন বাহ্যিক ভরসাস্থল বিদূরিত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তাদের ভরসা হয়ে যান। হযরত বায়েজিদ বোস্তামি ছোটবেলা থেকে মায়ের শিক্ষা পেয়ে এমন সৌভাগ্যবান ব্যক্তিত্ব হয়েছেন। যখন তার বয়স পূর্ণ যৌবনকাল, সেই সময়ই তিনি বিখ্যাত আলেম, খ্যাতিমান ওলী এবং যুগশ্রেষ্ট শায়খের খেতাব পেয়েছিলেন।'

যুবকদের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

মানবজীবনের বিভিন্ন স্তর

মানবজীবনের বিভিন্ন স্তর থাকে। শিশু জন্ম নেওয়ার পরের সময়টিকে শিশুকাল বলে। ওই সময় শিশুর কাজ হলো দুধ পান করা আর সময় কাটানো। এর চেয়ে একটু বড় হলে শিশু চলতে পারে, হাঁটতে পারে, দৌড়াতে পারে, এখান থেকে ওখানে পালিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত হয়। তখন তার খেলাধুলার আগ্রহ বাড়ে। সুতরাং খাওয়াদাওয়া ও ঘুম ব্যতীত বাকি সময়টা খেলাধুলায় কাটায়। এরপর কৈশোর শুরু হয়। তখন তার ওপর কিছু-কিছু দায়িত্বও অর্পিত করা হয়। যেমন– তাকে লেখাপড়া করতে হয়। সাধারণত শিশুদের ছয় বছর বয়সে কুরআন মাজীদ বা তার প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা দেওয়া হয়। আরও একটু বড় হলে লেখাপড়ার দায়িত্বও বাড়ে। তারপর যখন সে যৌবনে পদার্পণ করে, তখন শিক্ষার চাপও বৃদ্ধি পায়। সাথে-সাথে জীবনোপকরণও পরিবর্তন হতে থাকে। তারপর সে তার পিতামাতার পারামর্শদাতাও হয়ে যায়।

প্রথমে শুধু সে শুনত। এখন সে তিন কথা শুনলে এক কথায় পরামর্শও দেয়। যেহেতু শিক্ষা গ্রহণ করছে, তাই সময়ের সাথে-সাথে তার দায়িত্ববোধও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেননা, শিক্ষা সমাপণ করে সে জীবিকার সন্ধান করবে। কখনো ব্যবসা করবে, কখনো কোনো কোম্পানিতে চাকরি নেবে। এক কথায় রোজগারের যেকোনো ব্যবস্থা করা হবে। ফলে সে তাতে ব্যস্ত

হয়ে পড়বে। তারপর যদি আয়ের পথ ভালো হয়, তাহলে তার পিতামাতা নিজেই চিন্তা করবেন, এখন আমাদের সন্তানের জন্য একজন জীবনসাথি সন্ধান করা দরকার, যাতে তাকে নিয়ে সে সুখে জীবন যাপন করতে পারে। অতএব, যৌবনকালে তাকে একটি বিয়ে করিয়ে দেওয়া হয়। এটি জীবনের একটি স্তর, যার মধ্যে মানুষ তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলে নিজের ঘরের ভিত্তি স্থাপন করে। এখানে একটি নতুন দম্পতির ভিত্তি হচ্ছে। তার দায়িত্বে নবজাগরণ হচ্ছে। এবার আল্লাহর হক ও বান্দার হক উভয়টি পালন করতে হয়। তবে এই যৌবনকাল এমন হয়, যার মধ্যে মানুষের কাছে সময় বেশি থাকে; কিন্তু পরিশ্রম কম হয়।

কাজের জিম্মাদারি কার ওপর সমর্পণ করবেন

যারা কাজ করে, তাদের কথা বলছি। আর যারা শ্রমজীবী নয়, তাদের তো সর্বদাই সময়ের অভিযোগ থাকে। এজন্যই বলা হয়, কোনো কাজ করতে চাইলে অবসর ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেবে না। যে কাজ করছে তাকেই তোমার কাজের দায়িত্ব দাও। কারণ, যে এখনো কাজ করছে, সে তোমার কাজও করে দেবে। আর যে অবসর আছে, সে অবসরের ব্যস্ততায় সেই কাজ করার সুযোগ পাবে না। অতএব, স্মরণ রাখবেন, অলস মানুষের আলামত হলো, তাকে কোনো কাজের কথা বললে সে বলবে, ভাই আমার সময় নেই। পক্ষান্তরে যারা পরিশ্রমী হবে, তারা বলবে, আমার হাতের কাজ পর্যাপ্ত নয়। সময় অনেক বেশি। সুতরাং আরও কাজ হলে ভালো হতো। এটাই জীবনের আসল সময়। যখন মানুষের বিবেক-বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি প্রখর থাকে, শারীরিক শক্তিও তার উন্নতির শীর্ষে থাকে এবং প্রতিভা তার চরম সীমানায় থাকে। যদি ওই সময় মানুষের সামনে কোনো উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে সেটা পূর্ণ করার জন্য সেই যুবক আপ্রাণ চেষ্টা করে।

ঐতিহাসিক প্রমাণাদির প্রতি কিঞ্চিৎ আলোকপাত

যদি আমরা ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে আমরা দেখতে পাব, পৃথিবীর যত মহান কীর্তি রয়েছে, তার অধিকাংশই যুবকরা করেছে। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, হযরত ইবরাহীম (আ.), যাঁকে নবীগণের পূর্বপুরুষ বলা হয়। যাঁর বংশধারা থেকে প্রায় দশ হাজার নবী-রাসূল আগমন করেছেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) যৌবনকালে তাওহীদের দাওয়াতের জন্য প্রস্তুত হন এবং শির্ক ও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। সেগুলোর

নিন্দা প্রকাশ করতে থাকেন। সেকালে নমরূদ নামে এক বাদশাহ ছিল। সে খোদায়ী দাবি করল। হযরত ইবরাহীম (আ.) তার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি মিথ্যাবাদী, প্রতারক। ইবরাহীম (আ.)-এর সঙ্গে তার কথা বলার সুযোগ হলো। সে জিজ্ঞাসা করল, বলো, তোমার খোদা কী করেন। ইবরাহীম (আ.) বললেন, আমার খোদা মানুষকে জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। সে বলল, তা তো আমিও করতে পারি। সুতরাং নমরূদ কারাগার থেকে একজন ফাঁসির আসামিকে এনে তাকে মুক্তি দিল এবং আরেকজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে তার স্থলে ফাঁসি দিল এবং বলল, দেখছ তো, আমি যা ইচ্ছা করতে পারি। একজনকে মৃত্যু দিয়েছি, আরেকজনকে ফাঁসি দিয়েছি। ইবরাহীম (আ.) বুঝতে পেরেছেন, হয়তো তার কোনো জ্ঞানবুদ্ধি কিছুই নেই, না হয় কিছু বুদ্ধি আছে; তবে সেটা সঠিকভাবে কাজ করছে না। সুতরাং তাকে অন্যভাবে বোঝাতে হবে। সুতরাং হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন–

فَإِنَّ اللهَ يَأْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ

'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সূর্যকে পূর্ব দিক হতে উদিত করেন। সুতরাং (তুমি খোদা হলে) তুমি সূর্যকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করো। তখন সে হতভম্ব হয়ে গেল।'[৬০]

কোনো জবাব দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হলো না।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দাওয়াতের অনুমান

সায়্যেদুনা হযরত ইবরাহীম (আ.) তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে হাজির হলেন। গোটা সম্প্রদায় মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। একদা তারা সকলে কোনো এক অনুষ্ঠানে যাচ্ছিল। ইবরাহীম (আ.)কে যাওয়ার আহ্বান করা হলো। তিনি বললেন, আমি অসুস্থ। সবাই চলে গেল। এ সুযোগে ইবরাহীম (আ.) সবগুলো মূর্তি ভেঙে চুরমার করে বড় মূর্তিটির কাঁধে কুড়ালটা রেখে দিলেন। তারা ফিরে এসে মূর্তিগুলোর অবস্থা দেখে অস্থির হয়ে গেল, একাজটা কে করেছে? পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, ওই সময় তারা অনেকেই বলল, আমাদের মধ্যে এক যুবক আছে, তার নাম ইবরাহীম। সে আমাদের মূর্তিগুলোর সমালোচনা করে। সুতরাং ইবরাহীম (আ.)কে জনসমক্ষে তলব করা হলো। ইবরাহীম (আ.) বললেন, যে-বড় মূর্তিটার কাঁধে কুড়াল রয়েছে, তাকে জিজ্ঞাসা করো, তাদের এ অবস্থা কেমন করে হলো। তারা বলল,

---

৬০. সূরা বাকারা : আয়াত ২৫৮

এগুলো তো কথা বলতে পারে না; তারা কী জবাব দেবে? তখন ইবরাহীম (আ.) বললেন, যারা নিজেকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারে না, তারা আপনাদের রক্ষা করবে কীভাবে? ইবরাহীম (আ.)-এর কথা শুনে তারা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। তারা বলল, 'তোমারা তোমাদের খোদাগুলোকে সাহায্য করো।'

বন্ধুগণ! বিবেক যখন অন্ধ হয়ে যায়, তবেই ব্যাপার এতটুকু পর্যন্ত গড়ায়। তারা বলছে, তোমাদের খোদাকে সাহায্য করো। সমস্ত সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত নিল, তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হোক। ফয়সালা দিল, 'তাকে আগুনে নিক্ষেপ করে খোদাকে সাহায্য করো।'

বিরাট একটা অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বালিত করা হলো। অনেক লম্বা ঘটনা। ইবরাহীম (আ.)কে আগুনে নিক্ষেপ করা হলো। তখন তার বয়স কেমন ছিল? তিনি যুবক ছিলেন। পুরা যৌবন তার মধ্যে টলমল করছিল। সুতরাং এর দ্বারা প্রতিভাত হয়, পৃথিবীতে সত্যের আওয়াজ ধ্বনিত করার জন্য যারা মাথা নাড়া দিয়েছিলেন, ইবরাহীম (আ.) যখন নমরূদকে নিরুত্তর করে দিলেন, তারপর অগ্নিপরীক্ষায় পড়েছিলেন, তাঁরা কারা ছিলেন? তারা ছিলেন যুবক। যৌবনকালে তাঁরা এ মহান কীর্তি আঞ্জাম দিয়েছেন।

আম্বিয়ায়ে কেরামের পরস্পর সাদৃশ্য

হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি লক্ষ করুন। আল্লাহ তা'আলা তাকে ফেরাউনের কাছে প্রেরণ করলেন। আল্লাহ বলেন–

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿۱۷﴾

'আপনি ফেরাউনের কাছে যান; সে অত্যন্ত বিদ্রোহী হয়েছে।'

সুতরাং হযরত মূসা (আ.) যখন এসেছিলেন, তখন তার বয়স কেমন ছিল। পুরা যৌবনকাল। এজন্য বলা হয়েছে, তিনি এলেন। দুজন লোককে ঝগড়া করতে দেখলেন। একজন মূসা (আ.)-এর গোত্রের ছিল। আরেকজন অন্য সম্প্রদায়ের (কিবতী) ছিল। মূসা (আ.) চাইলেন, তাদের ঝগড়া মিমাংসা করে দেই। সেই ইচ্ছায় তাদের একজনকে একটি থাপ্পড় মারেন। থাপ্পড় খেয়ে লোকটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। অবশেষে মারা যায়। সুতরাং সেটা যদি বার্ধক্য বয়সের থাপ্পড় হতো, তাহলে এক থাপ্পড়ে সে মারা যেত না। বোঝা যায়, সেটা যৌবন কালের থাপ্পড় ছিল। তারপর যখন তিনি ফেরাউনের সামনে উপস্থিত হন, তখনো তিনি যুবক ছিলেন।

আসহাবে কাহফের ঘটনা

পবিত্র কুরআনে আসহাবে কাহফের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আজ শুক্রবার। শুক্রবারে সূরা কাহ্ফ তেলাওয়াত করা সুন্নত। (নামাযের পূর্বে) আসহাবে কাহফ কারা ছিল? তৎকালীন বাদশাহ অত্যন্ত অত্যাচারী ছিল। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কতিপয় যুবক ভাবল, এখনো আমাদের ঈমান নিরাপদ নয়। তারা স্থির করল, আমরা এ দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাব। এতে আমাদের ঈমান রক্ষা হবে। পবিত্র কুরআন সাক্ষী–

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى

'নিশ্চয় তারা কতিপয় যুবক, যারা তাদের প্রভুর প্রতি ঈমান এনেছিল। আমি তাদের হেদায়াত বৃদ্ধি করে দিলাম।'[৬১]

তারা কারা ছিল? তারা ছিল যুবসম্প্রদায়। কুরআনে যুবক শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং আসহাবে কাহ্ফ যারা আল্লাহর ওলী হয়েছিলেন, তারা যুবসম্প্রদায় ছিলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত মূসা (আ.)ও আসহাবে কাহ্ফের সবাই যুবক ছিলেন। হযরত ঈসা (আ.)ও যুবক ছিলেন, তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নেওয়ার সময় তার পূর্ণ যৌবনকাল ছিল।

যৌবনকালের কৃতিত্ব

যখন আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এধরায় আগমন করে নবুওত দাবি করে একত্ববাদের ঘোষণা দিয়েছিলেন, তখন তাঁর বয়স কত ছিল? চল্লিশ বছর পুরা যৌবনকাল। হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর বয়স ছিল আটত্রিশ বছর। ওমর (রাযি.)-এর বয়স ছিল সাতাশ বছর। হযরত আলী (রাযি.)-এর বয়স ছিল দশ বছর। হযরত হামযা (রাযি.)ও যুবক, হযরত ওছমান (রাযি.)ও যুবক।

এই যুবকদের একটি দলকে আল্লাহ তাওহীদের বাণী দিয়ে দাঁড় করালেন। তাঁরা গোটা বিশ্বে বিপ্লব ঘটালেন। সুতরাং এ সমস্ত উদাহরণ দ্বারা প্রমাণিত হলো, পৃথিবীতে যারাই মহান কাজ করেছেন, তাঁরা কারা ছিলেন? তাঁরা ছিলেন যুবসম্প্রদায়। সুতরাং এই বয়সে আল্লাহ বরকত রেখেছেন। আল্লাহপ্রদত্ত সেই নেয়ামত মানুষকে সফলতায় পৌঁছিয়ে দেয়। তাই মানুষ ওই সময় যে-কাজের ইচ্ছা করে, তা পূর্ণ করে ছাড়ে। এটা খুবই উত্তম

---

৬১. সূরা কাহ্ফ : আয়াত ১৩

বয়স। সুতরাং আখেরাতের জমি চাষ করার জন্য ওই বয়সে দীনের কাজ করা চাই।

একটি গুরুত্বপূর্ণ নসীহত

আমাদের মুরুব্বীগণ বলেছেন, যারা বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, তাদের মধ্যে জীবনের অনেক পর্যবেক্ষণকৃত বিষয় থাকে। তারা জীবনের ধাক্কা খেয়ে-খেয়ে উপলব্ধি করতে পারেন, কোন কাজ করতে হবে এবং কোন কাজ ছাড়তে হবে। মানুষের জীবনে দুধরনের কাজ হয়ে থাকে। এক What to do? তুমি কি কর? দুই What not To do? তুমি কী বর্জন কর? What to do যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি What not to do এটিও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, মানুষ তার জীবনে ধাক্কা না খেয়ে কিছু শিক্ষা করতে পারে না। সুতরাং যারা জীবনে ধাক্কা খায়, তারা উঁচা-নিচা, ঠান্ডা-গরম সকল অবস্থা অবলোকন করতে পারে। যদি তারা পূর্ব থেকেই জানত, তাহলে প্রকৃতপক্ষে সেই বৃদ্ধ লোকেরা ইসলামের দৃষ্টিতে বড় গবেষক হয়ে যেত। প্রত্যেক ঘরে পিতামাতার অবস্থা হলো, তারা ফ্যামিলি সম্পর্কে Think Tank হন। আর যুবকদের অবস্থা হলো, তারা মুরুব্বীদের থেকে দিকনির্দেশনা ও কৌশল গ্রহণ করে জীবন যাপন করে। যুবকরা কাজ করে এবং মুরুব্বীরা তাদের দিকনির্দেশনা দেন।

মুরুব্বীদের বরকত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اَلْبَرَكَةُ مَعَ اَكَابِرِكُمْ

'তোমাদের জন্য বরকত হচ্ছে তোমাদের মুরুব্বীদের সাথে থাকার মধ্যে।'

লক্ষ করুন, একটি হলো পানি, আরেকটি আগুন। উভয়টি মিলিত হলে বাষ্প হয়ে যায়। আর এই Steem বড়-বড় রেলগাড়ির বোঝা বহন করে নেয়। অনুরূপভাবে যুবকদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে আগুন আর মুরুব্বীদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে পানি। যুবসম্প্রদায়ের আবেগ ও মুরুব্বীদের গবেষণা একত্রিত হলে তা বাষ্পে পরিণত হয়, যা তোমার জীবনের গাড়িকে তার গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দেয়। এজন্যই যেখানে যুবকরা একে অপরের পরামর্শদাতা হবে, সেখানে জীবন সংকটে পড়া অনিবার্য। এই মর্মে ইংরেজিতে একটা বাগ্‌ধারা আছে–

A Young leading be young is like a blind, leading be blind they will be both fall into the ditch.

তরুণদের নেতৃত্ব তরুণই হয়। অন্ধের মতো। কারণ, অন্ধের নেতৃত্ব অন্ধই হয়। ফলে তারা উভয়ে নর্দমায় পতিত হয়। তারা যেহেতু জীবনের সুগম পথ পায় না, তাই বলা হয়,

A real Guide is he who has gone all the roads which you want to go.

প্রকৃত দিকনির্দেশক সে, যে তোমার চলার সকল পথে যাতায়াত করেছে। যে রাস্তা সম্পর্কে অবগত নয়, সে তার গতিতেই চলছে। সে কি জানে, কোথায় Speed breaker গতিরোধক রয়েছে। সুতরাং সফল তারা-ই হয়, যারা যৌবনে মুরুব্বীদের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী জীবন গড়ে।

উম্মতের খ্যাতিমান যুবসম্প্রদায়

এ উম্মতের মধ্যে যত বিখ্যাত মনীষী অতিবাহিত হয়েছেন, তারা সকলেই আপন পিতামাতা থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং অতি অল্প বয়সেই খ্যাতি অর্জন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, হযরত বায়েযিদ বোস্তামি (রহ.) সর্ম্পকে হযরত জুনায়েদ বাগদাদি (রহ.) বলেন, ফেরেশতাদের মধ্যে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মর্যাদা যেমন, আমার দৃষ্টিতে আউলিয়ায়ে কেরামের মধ্যে হযরত বায়েজিদ বোস্তামির মর্যাদা তেমন। ছোটবেলায় এতিম হয়ে গেলেন। মা তাকে শিক্ষা দিয়ে প্রতিপালন করলেন। এখানে আরও একটি কথা স্মরণ রাখবেন। এতিমরাই কিন্তু মোতি হয়। যখন বাহ্যিক ভরসাস্থল বিদূরিত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তাদের ভরসা হয়ে যান। হযরত বায়েজিদ বোস্তামি ছোটবেলা থেকে মায়ের শিক্ষা পেয়ে এমন সৌভাগ্যবান ব্যক্তিত্ব হয়েছেন। যখন তার বয়স পূর্ণ যৌবনকাল, সেই সময়ই তিনি বিখ্যাত আলেম, খ্যাতিমান ওলী এবং যুগশ্রেষ্ঠ শায়খের খেতাব পেয়েছিলেন।

ইমাম গাযযালি (রহ.)-এর মায়ের শিক্ষা

আবু হামেদ মুহাম্মদ গাযযালি (রহ.) তাঁর মায়ের শিক্ষায় ধন্য হন। তারা দুই ভাই ছিলেন। আহমদ গাযযালি ও মুহাম্মদ গাযযালি, যাঁকে ইমাম গাযযালি বলা হয়। ইমাম গাযযালি (রহ.) যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। সমকালে কেন্দ্রীয় মসজিদের খতীব ছিলেন। দেশের প্রধান মুফতী ছিলেন। তাঁর বড়

ভাই আহমদ গাযযালিও আধ্যাত্মিক জগতের সাধক ছিলেন। তবে তিনি ইমাম গাযযালির পেছনে নামায পড়তেন না। এতে লোকেরা সমালোচনা করত। একদা ইমাম গাযযালি তাঁর মায়ের কাছে ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন, আম্মাজান আমার ভাই আমার পেছনে নামায পড়ছেন না। এতে লোকে বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করে। আম্মাজান বড় ভাইকে ডেকে বললেন, বাবা! একাকি নামায পড়ার চেয়ে মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে পড়া উত্তম। তুমি মসজিদে তোমার ভাইয়ের পেছনে নামায পড়ো।

পরদিন আহমদ গাযযালি ইমাম গাযযালির পেছনে নামায পড়ছেন। এক রাকাত পড়ে দ্বিতীয় রাকাতের সময় নামায ভেঙে চলে আসেন। এবার লোকেরা আরও বেশি মন্তব্য শুরু করল। ইমাম গাযযালি (রহ.) হতভম্ব হয়ে গেলেন। বাড়িতে এসে আম্মাজানকে বললেন, আজ আপনার ছেলে আরও বেশি দুঃখজনক কাজ করেছেন। জনসমক্ষে আমাকে জবাই করে এসেছেন। আগে পড়তেন না, যেতেন না এটাই ভালো ছিল। আজ গিয়ে নামাযে শরীক হয়ে এক রাকাত পড়ে দ্বিতীয় রাকাতে নামায ভেঙে চলে এসেছেন। এতে লোকেরা আরও বেশি মন্তব্য করছে।

আম্মাজান বড় ভাইকে জিজ্ঞাসা করলেনম বাবা! তুমি এমন করছ কেন? বড় ভাই বললেন, আম্মাজান! আপনি বলেছেন আমি তার পেছনে নামায পড়ার জন্য। যতক্ষণ সে নামাযে ছিল, ততক্ষণ আমি তার পেছনে ছিলাম। আর যখন সে নামায ছেড়ে চলে গেল, তখন আমি নামায ভেঙে চলে এলাম। এবার তারা আরও বেশি অবাক হলেন। মা ইমাম গাযযালিকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা! ব্যাপার কী? নামাযে তোমার কী হয়েছিল। সত্য কথা বলো। ইমাম গাযযালি মাথাটা নত করে নিলেন। চোখ দিয়ে অশ্রু বেরিয়ে আসছে। বললেন, আম্মাজান! বড় ভাই সত্যই বলেছেন। আমি নামাযের পূর্বে মহিলাদের পবিত্রতার মাসআলা শিক্ষা দিয়েছিলাম। এক রাকাত পড়ার পর আমার খেয়াল ওই মাসআলার প্রতি চলে যায়। নামাযে আমার পূর্ণ মগ্নতা থাকেনি।

তাঁর কথা শুনে আম্মাজান বললেন, আমার দুটি ছেলের একটিও আমার উপকারে এল না। মায়ের কথা শুনে তারা দুভাই অবাক। কী হয়েছে আম্মাজান? আমরা কী করেছি? বললেন, তোমাদের একজনও সঠিকভাবে নামায আদায় করতে পারলে না। ছোট ভাই সামনে থেকে নামায পড়াচ্ছে। নামাযের মধ্যে মহিলাদের পাক-পবিত্রতার মাসআলার প্রতি তার মন চলে গেল। সে আল্লাহর জন্য নামায পড়ল না। আর বড় ভাই পেছনে ইকতেদা

করে ছোট ভাইয়ের হৃদয়জগতে দৌড়াচ্ছে। সেও নামাযে থাকতে পারল না। সুতরাং তোমরা কেউই আমার উপকারে এলে না। কারণ, তোমরা এখনো নামায ঠিক করতে পারনি। বন্ধুগণ! এ হলো তাসাওউফের শিক্ষা। আগেকার মায়েরা এমন শিক্ষা দিতেন, যা যুগশ্রেষ্ট ওলীদের ক্ষেত্রেও কঠিন হতো। যাহোক, বলছিলাম, ইমাম গাযযালি (রহ.) এমন যোগ্যতা যৌবনকালেই অর্জন করেছিলেন।

তাসাওউফ জগতের বুযুর্গদের যৌবনকাল

শায়খ আবদুল কাদের জিলানি (রহ.) যৌবনের ঠিক মধ্য বয়সে যুগশ্রেষ্ট ওলী হয়েছিলেন। হযরত খাজা মীর আলম সাহেব যৌবনেই বেলায়াত পেয়ে ছিলেন। যুগশ্রেষ্ট বুযুর্গ হয়েছিলেন। হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকি (রহ.) যৌবনেই শায়খের সিংহাসনে সমাসীন হয়েছিলেন। যুগের বাদশাহ তাঁর কাছে মুরীদ ছিলেন। তারা ওই সমস্ত লোক ছিলেন, যারা তাদের মায়ের নিকট থেকে শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করে যৌবনকালেই যুগশ্রেষ্ট মনীষী হয়েছিলেন এবং হেদায়াতের নির্মেঘ আকাশে উজ্জ্বল তারকার ন্যায় ঝলমল করছেন। আজও তাঁদের নাম উচ্চারণ করলে আমাদের হৃদয়ে তাদের মহত্ত্ব, উদ্ভাসিত হয়। শুধু তারা-ই নন, আরও অনেক বুযুর্গ রয়েছেন, যারা যৌবনকালেই সফলতা অর্জন করেছেন।

মুসলিম সেনাপতি ছিলেন যুবক

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ-পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার আগ মুহূর্তে সর্বশেষে যে-সেনাদলটি প্রেরণ করেছিলেন, তার সেনাপতি ছিলেন হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাযি.)। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র আঠারো বছর। আঠারো বছর বয়সে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মুসলিম বাহিনীর প্রধান বানিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে কাসিম যিনি বিশাল এলাকা জয় করে ইসলামের পতাকা উড্ডিন করেছিলেন, সেনাপতির দায়িত্ব পালনকালে তাঁর বয়স কত ছিল? মাত্র সতেরো বছর। বর্তমানে সতেরো বছরের যুবক নিজের ঘরের নেতৃত্বও দিতে পারে না। আর তিনি সতেরো বছর বয়সে সেনাদলের নেতৃত্ব দেন। শত-শত মাইল বিজয় করে ইসলামের দাওয়াত প্রচার করেন। তাদের মধ্যে এ নেয়ামত কীভাবে এসেছিল? তাঁদের Derection সঠিক ছিল। তাঁরা তাদের পৃষ্ঠপোষকদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করতেন। তাদের দিকনির্দেশনা

মোতাবেক জীবন গড়তেন। তাই স্বল্প সময়ে অধিক কাজ করতে সক্ষম হয়েছেন।

একটি মৌলিক পার্থক্য

বর্তমান যুগের যুবকদের মধ্যে Distuction প্রত্যাশা ও Furstration আবেগ অনেক বেশি হয়। তাই তাদের জীবনে Net out put অর্জিত বস্তু যা হয়, তা কার্যকর হয় খুব কম।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর জীবন

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) তেরো বছর বয়সে 'ইমাম শাফেয়ী' খেতাব পেয়ে ছিলেন। পবিত্র কুরআনের তাফসীর শিক্ষা দিচ্ছেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র তেরো বছর। এমন ছোট ছিলেন যে, একদা তিনি পবিত্র কুরআনের তাফসীর শিক্ষা দিচ্ছেন। এমন সময় দুটি চড়ুই পাখি ঝগড়া বাঁধিয়ে হুজুরের সামনে পড়ে যায়। তিনি পাগড়ি খুলে পাখিদুটির ওপরে ফেলেছিলেন। তখন সাদা দাড়িওয়ালা এক মুরুব্বী বললেন, জনাব! এটা বুদ্ধিমত্তার পরিপন্থী। কারণ, তার কাছে এটা খারাপ লাগছে। ইমাম শাফেয়ী দরস শুরু করে দিলেন। ফলে একটি হাদীছ শোনালেন–

اَلصَّبِيُّ صَبِيٌّ وَلَوْ كَانَ نَبِيًّا

'শিশুরা শিশুই থাকে যদিও তারা নবী হয়।'

অর্থাৎ– নবুওত পেলেও তাদের শৈশবপূর্ণ আচরণ দূরীভূত হয় না। সুতরাং ভেবে দেখুন, তিনি কেমন বয়সে শিক্ষাদানের কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন।

হযরত খাজা মাসুম (রহ.)-এর পরিশ্রম

হযরত খাজা মাসুম (রহ.) ছিলেন হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.)-এর সুযোগ্য সন্তান। তিনি মাত্র বারো বছর বয়সে তাঁর সম্মানিত পিতার নিকট থেকে নকশবন্দি তরিকার খেলাফত পেয়েছিলেন। মাত্র বারো বছর বয়স! সুতরাং দেখুন, যারা করতে পারে, তারা বারো বছর, তেরো বছর, সতেরো বছর, আঠারো বছর বয়সেই এত মহৎ কাজ করতে পারে। অতএব, স্মরণ রাখতে হবে, এই বয়সটা মহান কীর্তি স্থাপনের বয়স। আমরা মনে করি, সে ছোট বাচ্চা। না, না, না। আল্লাহ তা'আলা তাকে মহৎ গুণ দিয়ে থাকেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

প্রতিপালনের প্রভাব

যদি কোনো শিশু প্রথম থেকেই সঠিক তত্ত্বাবধান পায়, তাহলে পনেরো থেকে আঠারো বছর বয়সের মধ্যে সে সমাজের একজন পরিপূর্ণ সদস্য হয়ে যায়। আর যদি এমন হয় যে, মাতাপিতার কথা শোনে না, মাতাপিতা কিছু বোঝাতে চাইলে তার খারাপ লাগে, তাহলে সে এমন বয়সে স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষই হতে পারে না। পরে সেই লাইনে চলতে থাকে, যে লাইনে ধাক্কা খেতে হয়। তারপর মাতাপিতার উপদেশ অনুভব হয়। নিজেই পর্যবেক্ষণ করে, কোথায় ধাক্কা খাবে, কোথায় থাপ্পড় খাবে, কোথায় অপমানিত হবে। তারপর উপলব্ধি করতে পারে, মুরুব্বীগণ বলেছিলেন, বাবা! তোমার এটা করা ঠিক হয়নি। সুতরাং বন্ধুগণ! এই বয়সটা সর্বদা উন্নত বয়স হয়। একে মূল্যায়ন করা চাই।

যৌবনকালের পেশা

স্মরণ রাখবেন, যৌবনকালে আরও একটি বিষয় তার মধ্যে আসন পায়। Teen ager স্বল্প বয়সি বলে। বিশেষ করে ষোলো, সতেরো, আঠারো বছর বয়সে যুবকদের মধ্যে যৌবনের প্রবণতা সজাগ থাকে। যৌবন তার মধ্যে সচেতন হয়। এটা তার জন্য একটি নতুন বিষয়। তখন সে মুরুব্বীদের পরিবর্তে তার সহপাঠীদের নিজের পরামর্শদাতা বানিয়ে নেয়। আর বন্ধু তো তার বয়স অনুপাতে আরেক বন্ধুকে উল্টাপাল্টা পরামর্শ দিয়ে থাকে। তার নিকট যা সহজ হয়, তা-ই বলে। অতএব, ওই সময় অনেক যুবক স্থানচ্যুত হয়ে যায়। সে এমন বস্তুর গবেষণা করতে থাকে, যার গবেষণার সময় এখনো আসেনি। যেমন– মাতাপিতা বলছে, বাবা! লেখাপড়া শেষ করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো। তারপর আমরা তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করব। কিন্তু সে বিষয়টি সামলে রাখতে পারছে না। সে বলে, কলেজে পড়ার সময় এখনই সেই কাজটা সেরে নেওয়া দরকার। অথচ এখনো তার ফল পরিপূর্ণ কাঁচাই হয়নি। সে সেটাকে পাকানোর চেষ্টা করছে। এটা হলো অসময়ে কোনো কিছুর পূর্ণতার চিন্তা করা। কারণ, তার দেহ নামক ফল এখনো পূর্ণ কাঁচাও হয়নি। অথচ, সে তা পাকাতে চাচ্ছে। ফলে এখানে সে একটি বিরাট ধরনের ধাক্কা খায়।

অনেক তরুণকে দেখা যায়, স্কুল যমানায়ই তারা বন্ধুত্বের জালে আটকা পড়ে যায়। বন্ধুরা তাকে Miss guide ভুল দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে।

কাউকে তার সাথি, কাজিন, ক্লাসমেট অনেকে সেই পথের নির্দেশনা দিয়ে থাকে। ফলে সেই স্বল্প বিবেকসম্পন্ন ছাত্র তার বন্ধুদের দিকনির্দেশনায় Miss guide ভুল পথে পরিচালিত হয়। এদিকে তার মাতাপিতা অপেক্ষা করছে, আমার সন্তান A + পাবে, তাকে নিয়ে তাদের অনেক স্বপ্ন। আর তার ওপর লেখাপড়া ছাড়া অন্যান্য চিন্তা ছেয়ে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলে বলে, বই খুলে পড়তে বসলে আমার কান্না আসে। কারণ, বইয়ের প্রত্যেক পাতায় তোমার মায়াবী চেহারা ভেসে ওঠে। এদিকে মা-বাপের প্রত্যাশা, আমাদের সন্তান লেখাপড়ায় A + পেয়ে আমাদের মাথা সমুন্নত করবে। আর ছেলে বসে-বসে বইয়ের পাতায় অন্যের ছবি আঁকছে। ওই ছেলে A + পাবে কী করে? সে তার কৃতিত্ব ফোটাবে কীভাবে? আগেকার যুগে তো সাদাসিধে জিন্দেগি ছিল। তখন ছাত্ররা ভ্রষ্টও হতো কম। বর্তমান আধুনিকতা যুগে একে অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছে। তাই ভ্রষ্ট হওয়াও সহজ হয়ে গেছে।

নীরব ঘাতক

উদাহরণস্বরূপ দেখুন, মোবাইল ফোন ছোট একটি বস্তু। এটা কারও জন্য সেল ফোন হয়। আর আমি এর নাম দিয়েছি Hill Phone জাহান্নামের ফোন। এটা তরুণদের জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে। জাহান্নামে যাওয়ার জন্য এটা দ্রুতগামী তাজি ঘোড়ার কাজ করে। SMS বিনা মূল্যে দেওয়া হয়? এবার এটা দিয়ে সংবাদ পাঠানো হয়। সময় যাচ্ছে, ঘণ্টা যাচ্ছে। এটি দিয়ে আলাপন চলছে। যেখানে লোকাল ফোন বিনামূল্যে দেয়া হয়েছে, যেখানে তরুণরা দিনরাত কথা বলবে না তো কী করবে? এভাবে অপরের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলছে।

মোটকথা, বিনামূল্যে কথা চললে কোথাও সম্পর্ক হবেই। পরে সেখানে গুনাহের তালাবদ্ধ থলি খুলে যাবেই। ফলে এদের আর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত কোনো কিছুর খবর থাকে না। আগে কিছু-কিছু বোঝা যেত। কারণ রিংটোন বেজে উঠত। এখন তো মাশাআল্লাহ এর মধ্যে Vibration লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন অনুষ্ঠানে, মাহফিলে, বিয়ের আয়োজনেও কল আসছে। কাছে থেকে কেউ টেরও পাচ্ছে না। সে কথা বলছে, তার মনে দোলা দিচ্ছে, বাথরুম, ওয়াশরুমের বাহানা করে দূরে চলে যাচ্ছে আর কথা বলছে। মাতাপিতা মনে করছে, সে তার রুমে শুয়ে আছে। এদিকে সন্তান তার কথাবার্তায় ডুবে আছে। এর দ্বারা তার জীবন বিনষ্ট হচ্ছে। তাই বন্ধুগণ!

যথাসম্ভব সন্তানদের হাতে এই Hill Phone, দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। তবে যদি একান্ত প্রয়োজন হয়, তাহলে দেওয়া যেতে পারে।

আমরা ভালোবেসে নিজের হাতে নতুন সেট ব্যবহার করি। ছেলে বিদেশ থেকে খুব দামি সেট পাঠিয়েছে। যখন আমরা মনের আনন্দে নতুন সেট নিজে ব্যবহার করি, তখন পুরাতন সেটটা কী করব? তখন ছেলেমেয়ে সুযোগ পাচ্ছে। আব্বু! স্কুল ছুটি হলে আপনার সেখানে পৌঁছতে অনেক সময় লাগে; আমাকে অপেক্ষা করতে হয়। তাই এই সেটটা আমাকে দিয়ে দিন। ছুটি হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আপনাকে জানিয়ে দেব। এতে আমার বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না। বাহানা হচ্ছে প্রয়োজনের। মূলত উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করা।

তাই সাবধান! এই জাহান্নামের ফোন সন্তানের হাতে তুলে দেবেন না।

বিস্ময়কর ঘটনা

জনৈক ভদ্রলোক বলছেন, আমার ছেলে জানে না, মোবাইলে বিল আসে। সে মনে করছে, লোকাল ফোন; এতে আর কয় টাকা বিল আসবে। ফলে সে একটি বিদেশি নম্বরে কল লাগিয়ে কথা বলছে। এর মধ্যে সে ওই নম্বরে তার কোনো মনের মানুষ পেয়ে যায়। সুতরাং প্রতিনিয়ত কথা বলেই যাচ্ছে। ভদ্রলোক বলছে, কথাটা বলতে আমার লোম শিহরে উঠে। একমাস পর দেখলাম, শুধু তার কথার বিল এক হাজার ডলার এসে গেছে। এ পরিমাণ কথা সে মোবাইল ফোনে বলেছে। ফলাফল কী হলো? তার টার্গেট বদলে গেল। মাতাপিতা টার্গেট দিচ্ছে লেখাপড়া করতে আর সে টার্গেট করছে কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

সুতরাং যখন গন্তব্য পাল্টে যায়, তখন মানুষ আর সেই রাস্তায় চলতে পারে না। তারপর এই মোবাইল ফোনে আরও একটা মসিবত। এল মানুষ তাকে ইন্টারনেট বলে। আমি তাকে নেটই (জাল) বলি। কারণ, কোনো ভদ্র মানুষও যদি কম্পিউটারে বসে ইন্টারনেট চালু করে, তাহলে তাতে বিভিন্ন ধরনের এ্যাডভ্রাস আসতে থাকে। বিভিন্ন উলঙ্গপনা, বেহায়াপনা ছবি আসতে থাকে। কেননা, যারা অশ্লীলতায় মত্ত আছে, তারা সর্বক্ষণ এই ভাবনায় আছে যে, কীভাবে আমাদের সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। সুতরাং বাইপাসে তাদের এডভ্রাইস চলে আসে। অনিচ্ছা সত্তেও আপনাকে সেটা দেখতে হচ্ছে। দশ-পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে আপনি সেটা মুছেও দিয়েছেন।

কিন্তু এরই মধ্যে আপনার সন্তান তার ঝলক দেখল। এতেই তার অন্তরে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। সে শুধু আকৃতি দেখেছে, মডেল দেখেছে। পরবর্তীকালে সে সেটা সন্ধান করতে লাগল। এভাবে কোনো একসময় সে তা পেয়েও যাবে। না হয় কোনো বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নিয়ে সেটা বের করে ছাড়বে। আর তার জীবনে নষ্ট হওয়ার উপকরণ খুলে যাবে। তাই সকলেই সর্তক থাকা চাই।

চিন্তার বিষয়

তারপর এই ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরস্পরে সালাম-কালাম হয়ে থাকে। সংবাদ আদান-প্রদান হয়। মানুষ একে সেটিং বলে। আমি এটাকে চিটিং বলি। একেবারে সত্য কথা হলো, এই ইন্টারনেটের মাধ্যমে মুসলিম তরুণীরা কাফের ছেলেদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলছে। এরকম বহু ঘটনা আমাদের নিকট আসে। একদা এক ভদ্র লোক এসে বলছে, হুজুর! আমার ওপর এক মহা মসিবত চেপে বসেছে। কী হয়েছে? দুবাইর বাসিন্দা এক বিধর্মী ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের সর্ম্পক হয়ে গেছে। এখন সে বলছে, ওই ছেলেকে ছাড়া বিয়ে করবে না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, অন্য দেশের ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের সর্ম্পক হলো কী ভাবে? সে বলল, ইন্টারনেটের মাধ্যমে। সুতরাং সাবধান বন্ধুগণ! এগুলো আমাদের জন্য মহাবিপদ। এর চেয়ে আরও মারাত্মক হচ্ছে বর্তমানে মিউজিক।

মিউজিক একটা মারাত্মক বিষ

মিউজিককে আমরা যতটুকু ক্ষতিকারক মনে করি, এ তার চেয়ে আরও শতগুণ মারাত্মক। একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আমি অধম এই মিউজিকের ওপর অনেক রিসার্চ করেছি। এজন্যই আমার রচিত حیاو پاکدامنی (লজ্জা ও আত্মসম্ভ্রম) নামক পুস্তকে মিউজিক সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি। আগের যুগের মিউজিক এবং বর্তমান যুগের মিউজিকের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। এর কিছু বিশ্লেষণ আজ আপনাদের সম্মুখে দিতে চাই।

মানুষের যে-মস্তিষ্ক বা বিবেক রয়েছে, তা আল্লাহ তা'আলার কুদরতি কারিশমা। এটা এমন Complex যা নিয়ে প্রতিদিন লক্ষ-লক্ষ ডাক্তার গবেষণা করছেন। এই ক্ষুদ্র একটি বস্তুকে রিসার্চ করছে এবং তার

কলাকৌশল উপলব্ধি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই মস্তিষ্কের মাত্র ১৫% মানুষ ব্যবহার করতে পারছে। সুতরাং আমাদের যে Memory (স্মৃতিপট) বা Hard Disk এটা মাত্র ১৫% রিচার্জ হয়েছে। অবশিষ্ট ৮৫% এখনো খালি রয়েছে, সেখানে রিচার্জ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু সেই ৮৫% ও কার্যকরি হয়। সেটা কী কাজ করে? সে সর্ম্পকে মানুষ অদ্যাবধি অজ্ঞাত। মানুষের মস্তিষ্কে কিছু AutoMatic কার্যকারিতা রয়েছে। কিছু রয়েছে সেমি অটোমেটিক আর কিছু রয়েছে ফুল অটোমেটিক। মানুষের মস্তিষ্ক তার দেহে প্রতি সেকেন্ডে এক লাখ সংবাদ প্রেরণ করতে পারে এবং এক লাখ সংবাদ ডেলিভারি দিলে পারে। আর সেই মস্তিষ্ক তার সম্পূর্ণ দেহকে, পুরা ফ্যাক্টরিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। সে সর্ম্পকে আমাদের কোনো খবরই নেই। আমরা মনে করি, আমাদের হাত, মুখ, চোখ, ও ইশারার মাধ্যমে আমরা যা করছি, তা-ই আমাদের কর্মদক্ষতা। অথচ বাকি আরও অনেক নিয়ম-পদ্ধতি রয়েছে। সেগুলো সম্পর্কে আমরা একেবারে অনবগত।

মোটকথা, আমাদের মস্তিষ্ক সর্ম্পকে আমরা যতটুকু জ্ঞান রাখি, এর চেয়ে আরও অনেকগুণ বেশি সেই মস্তিষ্ক আমাদের ইনফরমেশন দিয়ে থাকে। এখন আপনাদেরকে একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করব। একলোক পাসপোর্ট করার জন্য ছবি তুলছে। ক্যামেরাম্যান তাকে দাঁড় করিয়ে শুধু তার ছবি তুলছে। তারপর সেটা তার ক্যামেরায় সংরক্ষণ করছে। সাথে-সাথে তার পেছনে যেগুলো ছিল, সেগুলোও রের্কড করেছে। এবার আপনি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকালে দেখবেন, আপনার পেছনে, সবুজ ঘাস, মনোরম বাগান, গাছ। গাছে পাখি বসা রয়েছে, ফল আছে, ফুল আছে। দেয়াল ইত্যাদি সবকিছু রয়েছে। ছবি অংকনকারী শুধু তোমার ছবি তুলেছিল। এখন তোমার পেছনে এতসব বস্তুর সিনারি কীভাবে এল? এটা ক্যামেরা সংরক্ষণ করেছে। ঠিক তেমনিভাবে মনে করুন, আমরা যখন কোনো বস্তু দেখি, তখন শুধু সেই বস্তুটি দর্শন করি। কিন্তু এর সাথে-সাথে আমাদের মস্তিষ্ক আমাদের বিবেক আরও কিছুর ইনফরমেশন দিয়ে থাকে। যেমন– মনে করুন, আপনি গাড়ি চালাচ্ছেন। রাস্তায় একটি সাইনবোর্ড দেখলেন, 'গতিসীমা ৩০ মাইল'। কিছু দূর যাওয়ার পর আপনার সেই সাইনবোর্ডের কথা স্মরণ হলো। এবার সেই সাইনবোর্ড সর্ম্পকে আপনার কী-কী জিনিস স্মরণ হবে? আপনার বিবেকে ভেসে আসবে, সাইনবোর্ডটি নীল রঙের মধ্যে সাদা অক্ষরে লিখা ছিল। উচ্চতা প্রায় ১৫-১৮ ফুট ছিল। দৈর্ঘ প্রস্থ ৪/৮ ফুট ইত্যাদি ছিল। এবার

ভেবে দেখুন, আপনি তো শুধু 'গতিসীমা ৩০ মাইল' পড়েছিলেন। এটাই আপনার উদ্দেশ্য ছিল। তাহলে বাকি বিষয়গুলো কীভাবে এল? এটা আপনার মস্তিষ্ক অটোমেটিক আপনাকে ইনফরমেশন দিয়েছে। সুতরাং বুঝে নিন, আমরা যতটুকু চাই, আমাদের মস্তিষ্ক আমাদেরকে এর চেয়ে অধিক দিয়ে থাকে।

বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব

সুতরাং এর ওপর বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালাচ্ছে যে, আমরা কীভাবে মানুষের মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে পারি। তারা গবেষণা করল, কম্পিউটারে যেরূপ InPuts (প্রবেশ) হয়ে থাকে, তদ্রূপ আমরাও মানবমস্তিষ্কে প্রবেশ করব। তরুণরা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। কম্পিউটারে In puts হয়। আপনি কম্পিউটারে Key bord, Mouse, Scaner ইত্যাদির মাধ্যমে In Puts (কোনো কিছু প্রবেশ) করানো যায়। আপনি যদি Digitizer সংযুক্ত করেন, তাহলে এর মাধ্যমে আপনি কম্পিউটারে ইনফরমেশন দিতে পারবেন। যদি আপনি একটি কম্পিউটারের সঙ্গে অন্য কোনো কম্পিউটারের Contact net Working সংযোগ স্থাপন করেন, তাহলে একটির মাধ্যমে অন্যটির মধ্যে ইনফরমেশন দিতে পারবেন। সুতরাং একই কম্পিউটারে Hard Disk এর মধ্যে আপনি বিভিন্নভাবে প্রোগ্রাম দিতে পারেন। তেমনিভাবে মানবমস্তিষ্কেও বিভিন্ন প্রকারে In Put হয়। চোখ, মুখ, নাক, কান, হাত, পা, ইত্যাদির মাধ্যমে মস্তিষ্কে In put হয়ে থাকে। যেমন– মনে করুন, কোনো লোক নেশা জাতীয় কিছু তার মুখে রাখল। কিন্তু এর In fact (কার্যকারিতা) কোথায় পৌঁছবে? তার মস্তিষ্কে। তারপর সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। সুতরং বিজ্ঞানীরা এটাই রিসার্চ করেছে যে, মুখের মধ্যে ওষুধ দিলে সেটা মানুষের মস্তিষ্ক পর্যন্ত কার্যকর হয়। তাহলে আমরাও এমন কিছু আবিষ্কার করব, যার ফলে মানুষের বিবেক আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী চলতে থাকে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ঐতিহাসিক দৃশ্য

বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছে। তাদের গবেষণার History ও Back ground আপনাদের বলছি। সর্বপ্রথম তারা ভাবল, আমরা এমন সুগন্ধি আবিষ্কার করব, যা কোনো পুরুষ ব্যবহার করার পর যদি কোনো নারী তার

ঘ্রাণ নেয়, তাহলে ওই নারীর মধ্যে তার যৌনাবেগ প্রবল হয়ে যাবে। এর ওপর গবেষণা করে তারা সেটা আবিষ্কার করেই নিল। উদাহরণস্বরূপ ক্রীম, যা কলেজ-ভার্সিটির ছাত্ররা ব্যবহার করে। তাদের রিসার্চকৃত সুগন্ধিতে বিশেষ করে এই আকর্ষণ থাকে যে, যে কেউ সেই সুঘ্রাণ গ্রহণ করবে, তার মধ্যে যৌন উত্তেজনা প্রবল হয়ে উঠবে। সুতরাং যে চাইবে আমি কারও সঙ্গে প্রেমালাপ করি, কারও সঙ্গে যৌন উত্তেজনামূলক কথা বলি, তারা যখন সেটা কোনো পুরুষকে ব্যবহার করাল, তখন দেখা গেল, তাদের সমাজে, কুফরি সংস্কৃতিতে এর মধ্যে মহিলাকে আকর্ষণ করার প্রভাব পাওয়া যাচ্ছে। এটা ব্যবহারের সঙ্গে-সঙ্গে মহিলারা তার সঙ্গে প্রেমালাপের জন্য উদ্বুদ্ধ হয়ে যায়। তারপর তারা মহিলাদের জন্যও অনুরূপ একটি ক্রীম তৈরি করল এবং উভয় ক্ষেত্রে যাচাই করে তারা সফল হলো। অতএব, যখন তারা সফল হলো যে, এমন সুগন্ধি আবিষ্কার করল, যা কোনো মহিলা ব্যবহার করলে পুরুষ তার প্রতি হামলা করে এবং কোনো পুরুষ ব্যবহার করলে মহিলা তার ওপর আক্রমণ করে, তখন তারা সিদ্ধান্ত নিল, আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের মস্তিষ্কে প্রবেশ করা, সুতরাং আমাদেরকে সেদিকে অগ্রসর হতে হবে। অতএব, বিজ্ঞানীরা আরেকটি সুগন্ধি আবিষ্কার করল, যে সুগন্ধি কোনো লোক ব্যবহার করলে তার অনুভূতি এমন হয় যে, আমি সারা দুনিয়া খরিদ করে নেব। ফলে তারা এ সুগন্ধিকে এয়ারকন্ডিশনের বাতাসের সঙ্গে কোনো এক স্টোরে ছাড়ল। তখন দেখা গেল, সেখানকার এক লোক পাঁচ টাকায় নাস্তা করার জন্য প্রবেশ করে আরও পঞ্চাশ টাকার পার্সেল নিয়ে প্রত্যাবর্তন করছে। সুতরাং যখন দেখা গেল, তাদের এই পরীক্ষায়ও তারা সফল হয়েছে, মানুষ তার নিকট যা আছে তা দিয়েই ক্রয় করতে চাচ্ছে। সাথে টাকা না থাকলে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে সবকিছু ক্রয় করে নেয়। তখন বড়-বড় ইন্ডাষ্ট্রির মালিকরা তাদের সমর্থন করতে থাকল, বাহবা দিতে থাকল।

মানবমস্তিষ্কে পৌঁছা কীভাবে সম্ভব হবে

মানবমস্তিষ্কে পৌঁছার জন্য তারা আরও অনেকগুলো পদ্ধতি অবলম্বন করতে শুরু করে। সুতরাং তারা ভাবল, মানবমস্তিষ্ক Electrical Waves বৈদ্যুতিক প্রচারমাধ্যমের ন্যায় প্রোগ্রাম দিতে থাকে। সুতরাং আমাদের যে মস্তিষ্ক, তা কীভাবে প্রোগ্রাম প্রচার করে? মস্তিষ্ক বিদ্যুৎ ও বজ্রের ঝলকের ন্যায় সিগন্যাল দিতে পারে। এটা চার্জ হয়। এজন্যই আপনারা দেখে

থাকবেন, রেডিও বাজানোর সময় তার এরিয়ালে হাত দিলে তার আওয়াজ কমে যায়। তখন মানুষ নিজেই এক প্রকার এন্টিনা হয়ে যায়। সুতরাং তারা ভাবল, এমন কোনো পদ্ধতি আবিষ্কার করা দরকার, যার দ্বারা আমরা Electricoy ভাবে মানুষের মস্তিষ্কে পৌঁছতে পারি।

মিউজিক একটি বাদ্যযন্ত্র

তারা গবেষণা করতে শুরু করল, মানুষ যে দিনরাত মত্ত হয়ে মিউজিক শুনছে, তাতে কোনো মন্ত্র ঢুকিয়ে দেয়া প্রয়োজন। কেননা, এ মিউজিক প্রথমত একটি আওয়াজ। কিন্তু সেটা অবশেষে মানবদেহে Electrical Weve বৈদ্যুতিক প্রচার মাধ্যমে পরিণত হয়ে যায়। সুতরাং তারা গবেষণা করল, একে Wavelet Amalysis বলে। কোন Wave Let মানবমস্তিষ্কে অধিক কার্যকরি হয়। অতএব, তারা এমন Wave let আবিষ্কার করল, যার ফলে মানুষ মিউজিক শুনলে সে নিজে উঠে নাচতে শুরু করে। তারা এই আবিষ্কারে সফল হলো। তখন তারা ভাবল, আমরা যদি এই Wave let বিশিষ্ট মিউজিক প্রচার করি আর সেটা কোনো অনুষ্ঠানে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে অনুষ্ঠানের সবাই তার তালে নাচার জন্য উত্তেজিত হয়ে যাবে। আর এর অর্থ হবে, আমরা মানবমস্তিষ্কে প্রবেশ করতে পেরেছি। সুতরাং এর ওপর তারা আরও গবেষণা করতে লাগল। অবশেষে তারা একটি System বের করল, যাকে Back Track পদ্ধতি বলে।

Back Track System

এই Back track system কী? মিউজিক তো শুধু Wave bar এর মধ্যে থাকে। এর মধ্যে তাদের নিজস্ব একটি Massage স্থাপন করে দেয়। এটা এমন মনে করুন যে, ঘোড়া যাচ্ছে আর তার ওপর আরোহী বসা আছে। আরও সহজে বুঝে নিন, আপনি আপনার ভাইয়ের জন্য দরজা খুলছেন। ভাই ভেতরে প্রবেশ করেছে আর তার কাঁধে বসা ছিল একটা মাছি। সেটাও এমনিতেই ঢুকে গেল। ঠিক তদ্রূপ মানুষ তো মিউজিক শুনছে যে, আমি শুধু মনকে দোলা দেওয়ার জন্য গান শুনছি। কিন্তু এর মধ্যে যে তাদের বিষাক্ত প্রোগ্রাম জুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সেটাও মানবমস্তিষ্কে প্রবেশ করছে। মানুষ সেটা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেনি। তবে সেটা নিজে নিজেই তার মস্তিষ্কে গিয়ে আসন বাঁধছে। সাথে-সাথে তার নিজস্ব প্রভাবও ফেলছে।

তারা এতে প্রচেষ্টা চালাল। ফলে একটি গান আবিষ্কার করল এবং এর মধ্যে তাদের আবিস্কৃত প্রোগ্রাম সংযুক্ত করে দিয়েছে। ফলে সেটা এমন গায়ক দিয়ে আবৃত্তি করছে, যার আওয়াজ অত্যন্ত সুমধুর, যার গান শুনলে মানুষ পাগলপারা হয়ে যায়। আর যারা গানের আশেক, তারা গান একবার শুনে তৃপ্তি পায় না। বারবার শুনতে থাকে। অফিসে যেতে শোনে, আসতে শোনে। রাতদিন সবসময় সেই গান শুনতে থাকে।

Effects of Back Track System - বেক ট্রেক সিস্টেমের অপকার

সুতরাং তারা গানের মধ্যে তাদের আবিস্কৃত একটি প্রোগ্রাম সংযুক্ত করল। সেটা কী? Kill Your mom তোমার মাকে হত্যা করো। ফলে তারা সেটা নিয়ে Analysis (যাচাই) করল। দেখা গেল, যেসমস্ত যুবক এই গানটা শুনছে তাদের অন্তরে এমন ভাব সৃষ্টি হয়, যার দরুন সে তার মাকে হত্যা করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়ে যায়। এবার যখন তারা এই পরীক্ষায় সফল হলো যে, যারাই এই গান শুনছে, তারা তাদের মায়ের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে যায়, মানুষের নিকট থেকে ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তিও নিচ্ছে। সবাই একথা স্বীকার করেছে।

তারা একজন স্বনামধন্য গায়ক দিয়ে আরেকটি গান গাওয়াল এবং তার মধ্যে তাদের প্রোগ্রাম ঢোকাল Hate your ded তোমার পিতাকে ঘৃণা করো। তারপর তারা সেটাও যাচাই করল যে, যারা এই গান শুনছে, তারা তাদের পিতার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এবার তারা নিশ্চিত হয়েছে, আমাদের প্রোগ্রাম মানবমস্তিষ্কে প্রবেশ করে আমাদের ইচ্ছেমতো তাদের পরিচালিত করছে এবং তাদের বিবেকের কোষাগারে আমাদের ভাবনা আসন বাঁধছে।

বর্তমান বিজ্ঞানের যুগ অনেক কিছুতেই কৃতকার্য হয়েছে। তারপর তারা আরেকটি গবেষণা করল যে, আমাদের এখানে পুরুষের সঙ্গে পুরুষের বিয়ে এবং নারীর সঙ্গে নারীর বিয়ে বৈধ। সুতরাং এ ধারণা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হবে। কিন্তু এর বিপক্ষে তো কোটি-কোটি মানুষ রয়েছে। তাদের ব্যাপারে কী করা যায়। সুতরাং তারা আরেকটি প্রোগ্রাম আবিষ্কার করল Life Stiytl (লাইফ স্টাইল) এবং সেটা মিউজিকের মধ্যে ঢুকিয়ে টিভির মাধ্যমে সারা বিশ্বে প্রচার করে দিল। এখন দেখা গেল, যারা কয়েক দিন পূর্বেও লাইফ স্টাইল আইনের বিরুদ্ধে কথা বলতেন, তারা কিছুদিন সেই মিউজিক দেখে আইনের প্রতি নমনীয় হয়ে গেছেন।

তারপর যখন তারা এই প্রোগ্রামেও সফল হলো, তখন তারা বুঝে নিল, এখন তো আমাদের হাতে একটি Tool (যন্ত্র) রয়েছে, যার মাধ্যমে আমরা মানুষকে আমাদের মর্জিমতো পরিচালিত করতে পারি। সুতরাং এবার তারা আরেকটি প্রোগ্রাম দিল Worship the Devel ইচ্ছেমতো জীবন গড়তে চাই। আল্লাহ-খোদা বলতে কিছু নেই। ফলে যারা ধর্ম মেনে চলত আবার সাথে গান-বাজনাও শুনত, তারাও এই প্রোগ্রামের শিকার হয়ে গেল যে, আমরা আমাদের ইচ্ছেমতে জীবন গড়ব। কীসের ধর্ম আর কীসের গড। অর্থাৎ– নাস্তিক হতে লাগল। সুতরাং এদের মূল ইচ্ছাই হচ্ছে তাদের এই গোপন প্রোগ্রামের মাধ্যমে মানুষকে তাদের মর্জিমতো পরিচালনা করা। তাই বন্ধুগণ! মিউজিক থেকে সাবধান। এর আরও কয়েকটা দৃষ্টান্ত শুনুন।

অন্তর্নিহিত প্রভাব

ইসলামবিধ্বংসী চক্রের কৌশলসমূহের মধ্যে একটি কৌশল হলো, তারা কোনো সংবাদ প্রচার করতে হলে এর পূর্বে তাদের আবিস্কৃত মন্ত্রবিশিষ্ট একটি মিউজিক প্রচার করে। যেমন– কোথাও অনেক মুসলমানদের প্রাণহানি হয়েছে অথবা কোনো স্থানে কাফেররা অনেক মুসলমানকে হত্যা করেছে। এমন সংবাদ প্রচার করার পূর্বে তারা একটি মিউজিক প্রচার করে। এর মধ্যে তাদের বার্তা প্রেরণ করে। ভয়ানক সংবাদের ক্ষেত্রে তারা এমন করে থাকে। এক্ষেত্রে তাদের মন্ত্র কী? সেটা হলো, এমন হওয়াটা স্বাভাবিক। সাধারণত এটা হতেই পারে। সুতরাং যারা সেই মিউজিকসহ এই সংবাদ শুনবে, তাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া কী হয়? তারা বলতে থাকে, এমন হওয়াটা স্বাভাবিক। এমন হতেই পারে। অতএব, তাদের উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেল। এ সংবাদ শুনে কেউ এই নিহত মুসলমানদের জন্য আক্ষেপও করবে না।

আর যখন তাদের কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রচার করতে হয়, তখন পূর্বে তাদের আবিস্কৃত একটি বার্তা প্রচার করে, যার দরুণ মানুষের মস্তিষ্কে একথার আছর হয় যে, এটা তো অনেক ভয়াবহ সংবাদ। মুসলমান এমন হয়? তারা তো কসাই থেকেও খারাপ। এরা এমন নির্মম হয়েছে! এখানে আমি তাদের ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করছি না। সুতরাং মিউজিকের মাধ্যমে তারা এমন Message প্রেরণ করে যে, অল্প সময় তাদের সংবাদ দেখায় আর বাকি সময় তাদের সেই মন্ত্রই প্রচার হতে থাকে। ফলে যারা এটা শোনে, তারা ইসলামের বিরুদ্ধে মেতে ওঠে যে, ইসলাম এত খারাপ! এটা তাদের আবিস্কৃত বার্তার প্রভাব, যার ফলে মানুষ সে বিষয় সম্পর্কে বিস্মিত হয়ে

যায়। এক্ষেত্রে তাদের আরেকটি নবদিগন্ত আবিস্কৃত হয়েছে। তাহলো মিডিয়ার মাধ্যমে নিজের কৃষ্টি-কালচারকে মানবমস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দেওয়া। এটা মানবজীবনে এক নব আবিষ্কার।

ঈমান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা

আগের যুগেও মিউজিক হারাম ছিল। বর্তমানেও তা হারাম। তবে উভয়কালে তা হারাম হওয়ার কারণ ভিন্ন। কেননা, আগের যুগে মিউজিকের মাধ্যমে শুধু ধ্বনি বা সুর হতো। আর বর্তমান যুগের মিউজিকে ঈমান বরবাদ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

মিউজিকের ভয়ানক প্রভাব

আপনারা অবশ্যই দেখে থাকবেন, যারা গান-বাজনার প্রতি আসক্ত, তাদের শত বোঝানোর চেষ্টা করলেও তারা আপনার কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না। সেই কুফরির বিপরীত কোনো কথা সে শুনবে না। নিজের প্রতি যতই আহ্বান কর, মসজিদে আসার দাওয়াত দাও, সে আসবে না। মৌলভীদের পাশে বসবে না। কারও কথা শুনবে না। এর কারণ কী? কারণ হলো, গান-বাজনার কুফল তার হৃদয়ে ছেয়ে আছে। এখন তার বিপক্ষের কোনো কথা সে শুনবে না। গান-বাজনার কৃষ্টি-কালচার তার মধ্যে আসন পেতে বসে আসে। অন্য কিছুকে তার নিকট যেতে বারণ করছে।

সুতরাং বর্তমান যুগের গান-বাজনা মানুষের অন্তরে কুফরি সংবাদ প্রেরণের মাধ্যম হয়েছে। আর আমরা সেই ধ্বংসাত্মক মিউজিক আমাদের সন্তানদের শ্রবণের অনুমতি দিচ্ছি। সে বলে, আব্বু, আম্মু, আমি শুধু মিউজিক শুনছি। আমি শুধু Walk man চাই। অথচ তারা উপলব্ধি করতে পারছে না যে, সেই Walk man এর ধারা শুধু গান শোনানো হচ্ছে না। বরং এর মধ্যে কাফেরা কিছু Message ঢুকিয়ে দিয়েছে, যা আমাদের মস্তিষ্কে বসে আমাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করছে, যা আমাদেরকে দীন থেকে অপসারণ করছে।

একটি চাক্ষুষ ঘটনা

একদা আমাদের এক আত্মীয় এসে বললেন, হুজুর! আমার এই ছেলে মিউজিক কোর্স করেছে। আমি প্রথমে তাকে মানুষের কথা, গান শোনাতাম। সে বলছে, একদিন আমাদের প্রফেসর সাহেব যিনি P.H.D প্রফেসর

ছিলেন, তিনি ক্লাসে তিনশজন ছাত্রকে একত্রিত করে একটি গান শোনালেন। তারপর তিনি বললেন, আচ্ছা! বলো তো তোমরা এই গান শুনে কী সংবাদ সংগ্রহ করলে? সবাই বলল, আমরা এটা শুনে এতটুকু অর্জন করেছি যে, এই গানের অনুরূপ আমরা আবৃত্তি করতে পারব। প্রফেসর বললেন, না; এটা নয়। এটা ছাড়া অন্য আরেকটি Messge আমরা দিয়েছি। সেটা বলো। সবাই বলল, না; আমরা অন্য কোনো Messge পাইনি। তারপর প্রফেসর সাহেব সেই মিউজিক তার Back Track-এর ওপর চালু করলেন। অর্থাৎ– সেটাকে Frequence Slow ধীর গতিতে চালালেন। তখন আমরা দেখলাম, তাতে আল্লাহর বিরুদ্ধে একটি অশ্লীল Message বার্তা রয়েছে, যার সম্পর্কে আমরা মুসলমান এমন ধারণাই করতে পারি না। তখন প্রফেসর বললেন, দেখেছ, আমরা মিউজিকের মাধ্যমে তোমাদের মস্তিষ্কে এ সমস্ত Message পৌঁছিয়ে থাকি। সেই প্রফেসর আমাদেরকে Brain সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন। সুতরাং আমার সেই আত্মীয় বললেন, হুজুর! আমি বাস্তবে দেখেছি, বর্তমানে বিজ্ঞান আমাদের নিষ্পাপ শিশুদের মস্তিষ্কে মিউজিকের মাধ্যমে কুফরি বার্তা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে শতভাগ সফল হয়েছে।

দুশমনের মিষ্ট বিষ

আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, গান-বাজনার দ্বারা মানুষের অন্তরে অপকর্মের আবেগ সৃষ্টি হয়। যেমন বিরান ভূমিতে বৃষ্টির ফলে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়।

আর সেটা তো ছিল শুধু সুরধ্বনির ক্ষেত্রে। বর্তমানে তো তারা সেই সুরধ্বনির সঙ্গে শয়তানি Worship পূজার কথাও ঢেলে দিচ্ছে। সুতরাং যদি তারা সেই মিউজিকের মধ্যে এই প্রোগ্রাম ঢুকিয়ে দেয় যে, Hate your Religion তোমাদের ধর্মকে ঘৃণা করো আর তোমার সন্তান মনের সুখে দৈনিক পনেরো-বিশবার এই গান শোনে, তাহলে পরিণাম কী হবে? তুমি তো বুঝবে, আমার ছেলে শুধু গান শুনছে। অথচ এর মাধ্যমে তোমার সন্তান ধর্মবিদ্বেষী হতে যাচ্ছে। যে নিজের ইচ্ছায় এমন হতে চাচ্ছে না, সেও একদিন এই মিউজিকের মাধ্যমে তাদের কৃষ্টি-কালচার গ্রহণ করে নেবে। একে Mind set বলে। অর্থাৎ– মস্তিষ্কে কোনো বিষয় স্থাপন করে দেওয়া।

মানুষ কখনো বলে, আমার ধারণায় একটি বিষয় রয়েছে; আমি তার অপসারণ করতে চাচ্ছি; কিন্তু পারছি না। এর অর্থ কী? অর্থ হলো, কোনো

বিষয় তোমার মস্তিষ্কে আটকা পড়েছে। তুমি তা দূর করতে চেষ্টা করছ; তবু সক্ষম হতে পারছ না। সুতরাং এমন কিছু বিষয় আছে, যা মানুষের মস্তিষ্কে আসন পেতে বসে আছে। শত চেষ্টার পরও সেটা দূর করা যাচ্ছে না। অতএব, স্মরণ রাখবেন, বর্তমান যুগে মিউজিক একটা মারাত্মক ব্যাধি। স্বল্পবয়স্ক সন্তানের মস্তিষ্ক বিগড়ে দিতে সেটা খুবই কার্যকরি অবদান রাখে। অথচ আমরা তাকে সাধারণ মনে করি। এজন্যই ওই সমস্ত সন্তানেরা মিউজিক শ্রবণে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাদের নিকট ধর্ম ভালো নয়। তাদের পৃষ্ঠপোষকরাও তাদের নিকট মান্যবর নয়। আনুগত্যও তাদের নিকট প্রিয় নয়। তারা বলে, আমরা তো Freedom স্বাধীনতা চাই। মাত্র পনেরো-ষোলো বছর বয়সেই তারা এমন স্বাধীনতা চায়। এ সংবাদ তাদের মস্তিষ্কে মিউজিকই পৌঁছিয়ে থাকে। ফলে মাতাপিতা হাহুতাশ করে, আমার সন্তানের কী হলো। তাই মিউজিক থেকে নিজে বাঁচুন, নিজের সন্তানদের বাঁচান।

মিডিয়া হচ্ছে নষ্টের উৎস

স্মরণ রাখবেন, বর্তমান যুগে আমাদের নষ্ট করার মূল উৎস হচ্ছে মিডিয়া। আমি আমার কতিপয় বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করেছি। তারা আমাকে বলেছে, দোস্ত! আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। পরহেযগারির জীবন গড়তে চেষ্টা করছি। তাহাজ্জুদ পড়ছি। সুন্নতের ওপর আমল করছি। কিন্তু একটা Problem আছে। সেটা আমাদের বুঝিয়ে বলুন। কী Problem? ভাই সারা দুনিয়ার গোনাহ পরিত্যাগ করা আমাদের জন্য সহজ। তবে মিউজিক ছাড়তে পারছি না। এমন তরুণও আছে, যারা তাহাজ্জুদ পড়ছে, নির্দেশিত অজীফা আদায় করছে। আরও বলছে, হুজুর! কোনো গায়রে মাহরাম রমণীর দিকে চোখ তুলেও তাকাচ্ছি না। যুবক বয়সেও কোনো বেগানা মহিলার দিকে তাকাচ্ছে না। দেখুন, যে যুবক বয়সেও কোনো বেগানা মহিলার দিকে তাকাচ্ছে না, সে কেমন উত্তম চরিত্র গ্রহণ করেছে। সে বলছে, কিন্তু হুজুর! রাস্তায় চলতে যদি কোনো পুরাতন গানের সুর কানে বাজে, তাহলে হৃদয়ে যেন বিদ্যু চমকাতে থাকে। এটা আমার আয়ত্তে আসছে না।

সুতরাং এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়, মিউজিক মানুষের মনে এমন শক্ত ঘাঁটি স্থাপন করে, যা জয় করা মানুষের পক্ষে কঠিন হয়ে যায়। এজন্যই আমি বলি, বর্তমান যুগে মিউজিক অত্যন্ত Detrinmental ক্ষতির কারণ হয়েছে এবং সেটা আমাদের জন্য Dengerous বিপজ্জনক হয়েছে। এটা আমাদের ঈমান ধ্বংসের কারণ হয়েছে। এজন্যই ছাত্ররা নিজের গন্তব্যের দিকে

যাওয়ার পরিবর্তে অবিশ্বাস্য পথে চলতে শুরু করে। তাদের মন চায় Enjoy your self নিজের জীবনটাকে উপভোগ করি। সুতরাং Beck Track-এর মাধ্যমে যখন সর্বদা তার মস্তিষ্কে এটাই আসতে থাকে, তখন তার আর কোনো কিছু ভালো লাগে না। পড়তেও মন চায় না। সার্বক্ষণিক এই চিন্তায়ই মগ্ন থাকে। তাই মিউজিক নামক বিপদ থেকে বাচ্চাদের রক্ষা করুন।

ঈমানের টিবি

আল্লাহ তা'আলার খেলা দেখুন। তাবলীগ জামাতের লোকেরা যখন গাশত করতে বের হয়, তখন তারা দরজায় করাঘাত করে আপনাকে বাইরে আসতে আহ্বান জানায়। আপনার ইচ্ছা হলে বাইরে আসবেন। না হয় আসবে না। কিন্তু কুফরি মিডিয়া (মাধ্যম) যার দ্বারা আমাদের সন্তানদের ঈমান হরন হচ্ছে, তাকে আপনি যত্ন করে শয়ন কক্ষে টি.ভি-এর সুরতে সাজিয়ে রেখেছেন। সুতরাং ঈমানবিধ্বংসী মিডিয়া আপনার বেডরুম পর্যন্ত পৌঁছার যোগ্যতা অর্জন করেছে। আর আমাদের ভাইয়েরা যারা আপনার ঈমান রক্ষা করতে চাচ্ছেন, কল্যাণের দিকে ডাকছেন, আল্লাহর পথে আহ্বান করছেন, তারা কেবল দরজা পর্যন্ত যাওয়ার অধিকার পাচ্ছেন। এরপরও আবার অনেক সময় দরজা থেকেই ধমকি দিয়ে বের করে দেওয়া হয়।

সুরতাং বোঝা যায়, ঈমান রক্ষার দাওয়াত দরজা পর্যন্ত যাওয়ারও অনুমতি নেই। আর যাতে কুফরি ও শয়তানি ভরে দিয়েছে, সেটাকে আপনি নিজহাতে ক্রয় করে বেডরুমে সাজিয়ে রেখেছেন। এতে কী হচ্ছে? কুফরি তাবলীগ আপনি টাকা দিয়ে কিনে নিলেন। সেটা আপনার ঘরে বসে তার দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আপনি অফিসে চলে গেলেন। আপনার স্ত্রী, আপনার সন্তান বেডরুমে বসে-বসে টিভি চালু করল। গান-বাজনা শুনল, কুফরির মন্ত্র নিজের মস্তিষ্কে আশ্রয় দিল আর আস্তে-আস্তে আপনার মেয়ের, আপনার স্ত্রীর মনে শয়তান কুমন্ত্রণা ঢেলে দিচ্ছে। আপনি তাকে Perment অনুমোদন দিয়ে দিলেন। এজন্যই এটা মরণ্যব্যাধি। টিবি রোগ হলে তার চিকিৎসা আছে। কিন্তু আপনি যখন বিবিকে টিভি দেখার অনুমোদন দিলেন, ফলে যখন সে অপরের কাজিন হয়ে যাবে, তখন তার চিকিৎসা কী দিয়ে করবেন?

আমরা যদি চাই, আমাদের তরুণরা পবিত্র জীবন যাপন করুক, Construltive রক্ষণশীল ও প্রশংসনীয় জীবন গঠন করুক, তাহলে মিডিয়া

নামক হিংস্র জানোয়ারের আক্রমণ থেকে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তবেই তাদের থেকে প্রত্যাশিত ফলাফল পেতে পারেন।

তরুণরা কেমন জীবন যাপন করবে

মাতাপিতা চাচ্ছে, আমাদের সন্তান লেখাপড়া শেষ করে অমুক অফিসার হবে। এদিকে সন্তানের মস্তিষ্কে অনেক কিছু সওয়ার হয়ে বসে আছে। অথচ যুবকরা যখন সময় হওয়ার পূর্বে কোনো কাজ সম্পন্ন করতে চায়, তখন তার জীবনের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে যায়। প্রত্যেক বস্তু তার উপযুক্ত সময়ে সজ্জিত হয়। যেমন মনে করুন, আপনি লেখাপড়া করছেন। তখন যদি আপনি ভাবেন, বিয়ের কাজটা সেরে নেওয়া দরকার, তাহলে এটা হবে সময়ের আগে কাজ সম্পন্ন করা। সুতরাং এটা আপনাকে আর শিক্ষা করতে দেবে না। সুতরাং স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রত্যেক বস্তু তার উপযুক্ত সময়ে শোভা পায়। আপনার মাতাপিতা বলছেন, লেখাপড়া করতে হবে। সুতরাং একমনা হয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকো, তাহলে তোমার সকল কাজ পরিপাটি হবে। তারপর যখন তোমার উপযুক্ত বয়স হবে, পরিবার চালানোর মতো তোমার দক্ষতা হবে, তখন তোমার মাতাপিতা নিজে থেকেই তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করবেন। অতএব, ঠিক সময়ে তোমার বিয়ের কাজ সম্পন্ন হলে তোমার জীবন সুবিন্যস্ত হবে। সকল কাজে তুমি সফলতা অর্জন করবে। আর সেই বিন্যস্ত অবস্থা তোমার নিজের হাতে পরিবর্তন করলে তোমার জীবন তুমি নিজহাতে ধ্বংস করবে।

যে-ছেলেরা স্কুল-কলেজের যমানায় বন্ধু-বান্ধবের খপ্পরে পড়ে সময় হওয়ার আগে কোনো কাজ করতে চায়, তারা কোনো কাজে সফল হয় না। ব্যবসা, চাকরি কোনো কিছুই ঠিকমতো করতে পারে না। কারণ, সময়ের পূর্বে তাদের মহাব্যাধি আক্রমণ করেছে।

এদিকও থাকতে পারছি না সেদিকও থাকতে পারছে না

পার্শ্ববর্তী কোনো দেশের এক তরুণ এসে একদা আমাকে বলল, হুজুর! দু'আ করবেন, এক সপ্তাহ পর আমার বিয়ে হতে যাচ্ছে। এক সপ্তাহের মধ্যে এনগেজ হচ্ছে এবং এক সপ্তাহ পর বিয়ে হতে যাচ্ছে। সপ্তাহখানেকের মধ্যে আমাদের ভবিষৎ প্রজন্মের ক্ষেত্রেও আমরা নিশ্চিত হতে যাচ্ছি। হুজুর! এখন আমি বিয়ে না করে আর কী করব। ফলে তো আমার ও আমার বংশের দুর্নাম হবে। তাই এখনই বিয়ের কাজটা সমাধান করতে যাচ্ছি।

দেখুন, একটি ছেলের ভুলের কারণে দুটি গোষ্ঠীর শান্তি চলে গেছে। কারণ, সময়ের আগে কাজ করতে চেয়েছে। তাই বলছিলাম, প্রত্যেক জিনিস তার উপযুক্ত সময়ে শোভা পায়। পড়ার সময় পড়া, লেখার সময় লেখা। খেলার সময় খেলা। খাওয়ার সময় খাওয়া। ঘুমের সময় ঘুম। এভাবে একটি রুটিন তৈরি করো এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করো। সুখের জীবন গড়তে পারবে। পক্ষান্তরে যদি সর্বদাই শয়তানি কুমন্ত্রণা মস্তিষ্কে রাখে এবং সর্বক্ষণ নিজের যৌবনের ভাবনায় লেগে থাকে, তাহলে জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে এবং যে যুবক সর্বদা নারীর চিন্তায় মগ্ন থাকে, নিজের জৈবিক ভাবনায় ব্যস্ত থাকে, এই অল্প বয়সে সর্বক্ষণ বালিকাদের ধ্যানে থাকে, তাহলে কিছুদিন পর ফেরেশতারাও তোমাকে গ্রিলে আবদ্ধ করবে। গুনাহের পেছনে পড়ে মানুষ তার দীন-দুনিয়া সবকিছু বিনষ্ট করে দেয়। তাই কোনো কবি বলেন–

نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم

نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے

আল্লাহও পেল না, দেবতাও পেল না।

না এদিক পেয়েছে, না সেদিকে সফল হয়েছে।

ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনাকে উত্তম ঘটনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। বর্তমান সমাজে যুবকরা হরেক রকম গুনাহে লিপ্ত হয়। এর মধ্যে কুদৃষ্টি ও অশ্লীলতার গুনাহ বর্তমানে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। আচ্ছা! সেটা ভিন্ন কথা। একটু শুনে নাও। সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করো।

যেমন কর্ম তেমন ফল

হাদীছ শরীফে এসেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি তোমরা অন্যের মহিলাদের সঙ্গে পবিত্র ও সংযমী আচরণ কর, তাহলে তোমাদের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে পবিত্র ও সংযমী আচরণ করা হবে। এটি হাদীছের কথা। পক্ষান্তরে যদি আমরা অন্যের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে কুদৃষ্টি ফেলি, তাহলে আমাদের স্ত্রীলোকদের প্রতিও ভুল দৃষ্টিপাত করা হবে। একে

ওলামায়ে কেরাম অপকর্মের প্রতিশোধ বলেন। ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর ন্যায় ফকীহ ব্যক্তিও এ ব্যাপারে কবিতা লিখেছেন যে, যিনার কেসাস বা প্রতিশোধ হয়ে থাকে।

প্রতিশোধের মর্ম কী? প্রতিশোধের মর্ম হচ্ছে, সে যা করছে তার সঙ্গে সেটা করা হয়। যেমন– কেউ কাউকে হত্যা করল। এর বিনিময় তাকে হত্যা করা হবে। একে কেসাস বা প্রতিশোধ বলে। সুতরাং ওলামায়ে কেরাম যিনার ব্যাপারে ওই قِصَاصٌ শব্দই ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ– যে যা করবে, তার সঙ্গেও তা-ই করা হবে।

দুটি শিক্ষণীয় ঘটনা

বুখারা শহরে এক স্বর্ণকার ছিল। তার স্ত্রী অত্যন্ত ধার্মিক ছিল। দেখতে অপরূপা সুন্দরী ও সম্ভ্রান্ত রমণী ছিল। তাদের ঘরে দশ-পনেরো বছর যাবৎ এক লোকে পানি বহন করে দিত। একদা সেই রমণীর প্রতি ওই লোকের কুদৃষ্টি পড়ে যায়। সে জোরপূর্বক ওই মহিলার হাত ধরে মনের আবেগে তার হাতে চাপ দিয়ে চলে যায়। লোকটার আচরণে মহিলার খুব পরিতাপ করছে। দশ-পনেরো বছর যাবৎ সে আমার ঘরে আসা-যাওয়া করছে। তাহলে আজ সে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করল কেন? তাই ভেবে মহিলা কাঁদতে শুরু করে।

এতক্ষণে তার স্বামী বাড়িতে এসে যায়। স্ত্রীকে কান্নারত দেখে জিজ্ঞাসা করল, হে আমার জান, তোমার কী হয়েছে? এভাবে কাঁদছ কেন? মহিলা সম্পূর্ণ ঘটনা তার স্বামীকে বলল। স্ত্রীর কথা শুনে সে-ও কাঁদতে লাগল। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল, হে আমার মাথার মণি! এবার আপনি কাঁদছেন কেন? সে তো আমার অন্য কোনো ক্ষতি করেনি, করার ইচ্ছাও করেনি। শুধু আমার হাত ধরছে। স্বামী বলল, শোনো আমার নিজের ভুলের জন্য আমি কাঁদছি। কারণ, আজ ওই লোকটি আমার স্ত্রীর সঙ্গে যে-আচরণ করেছে, সেটা তার ভুল নয়। এটা আমার ভুল।

স্বামীর কথা শুনে স্ত্রী অবাক যে, এটা কীভাবে? সে বলল, শোনো; আজ আমার দোকানে এক অপরূপ তরুণী এসেছিল। সে একটি চুড়ি ক্রয় করে আমাকে বলল, এটা আমার হাতে পরিয়ে দাও। আমি তার হাতে চুড়ি পরানোর সময় আমার অন্তরে শয়তানের প্ররোচণা প্রভাব ফেলে। তার কোমল হাত স্পর্শ করলে আমার মনের আবেগ বেড়ে যায়। তাই আমি একটু জোরে তার হাতে চাপ দিয়েছিলাম। আমার কৃতকর্মের বিনিময়ে আজ সে

আমার স্ত্রীর হাত ধরে চাপ দিয়েছে। সুতরাং আমি তাওবা করছি, জীবনে আর কোনোদিন এমন করব না। আল্লাহ তা'আলা আমাকে মাফ করুন। আর শোনো, আমার অপরাধের কারণে আমি তার আজকের আচরণ ক্ষমা করে দিলাম। পরবর্তী কালে কোনোদিন এমন হলে আমাকে বলবে।

দোকানি তার ব্যবসায় চলে গেল। লোকটি পরদিনও তাদের পানি সংগ্রহ করার জন্য এল। সে এসেই প্রথমে ওই মহিলার নিকট ক্ষমা চাচ্ছে, গতকাল আমার ভুল হয়ে গেছে। শয়তান আমার ওপর বিজয়ী হয়ে গিয়েছিল। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন। আমি তাওবা করেছি, জীবনে কোনোদিন আর এমন করব না। দেখুন, এদিকে অপরাধ অপর দিকে সঙ্গে-সঙ্গে তার বদলা। এদিকে তাওবা, সঙ্গে-সঙ্গে সেদিকেও তাওবা, ক্ষমা চাওয়া, অনুতপ্ত হওয়া।

তারপর কোনো এক আলেম এ ঘটনাটি এক বাদশাহর নিকট বর্ণনা করলেন। বাদশাহ বললেন, আমি তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারছি না। বিষয়টি যাচাই করে দেখতে হবে। বাদশাহ বললেন, আমি কোনোদিন কোনো রমণীর প্রতি চোখ খুলে তাকাইনি। সুতরাং আমার মেয়ে দিয়ে বিষয়টি যাচাই করব। বাদশাহ তার মেয়েকে বললেন, শাহাজাদীর পোশাক পরিবর্তন করে সাধারণ মানুষের পোশাক পরিধান করো এবং একজন দাসি সঙ্গে নিয়ে সাধারণ মানুষের মতো একটু শহরটা প্রদক্ষিণ করে কোনোভাবে চলে আসার চেষ্টা করবে। কোনো প্রকার এ্যাকশনে যাবে না। লোকজন যাতে তোমাকে শাহজাদী বলে চিনতে না পারে।

বাদশাহর কথামতো শাহজাদী সাধারণ লোকের পোশাক পরিধান করে দাসিকে সঙ্গে নিয়ে সারা শহর ঘুরে এল। কোনো প্রতিকার দৃষ্টিগোচর হলো না। অবশেষে নিজের বাড়িতে প্রবেশ করছে। এমন সময় তার বাড়ির এক কর্মচারীর দৃষ্টি তার প্রতি পড়ে যায়। সে তো বুঝতে পারেনি যে, এ শাহজাদী। সে ভাবছে, মনে হয় নতুন কোনো চাকরানি হবে। আহ! তার কী রূপ? সামনে অগ্রসর হলো। শাহজাদীর নিকটে গিয়ে তার রূপ দেখে সে আর থেমে থাকতে পারেনি। তাকে জড়িয়ে ধরে তার কাঁধের সঙ্গে কাঁধ মিলাল এবং শুধু একটি চুমু দিয়ে চলে এল।

শাহজাদী তার প্রদক্ষিণের সমস্ত অবস্থা বাদশাহকে বলল। এবার বদশাহ বললেন, ওই লোকটির কথা পরিপূর্ণ সত্য। কারণ, আমার যৌবনকালে আমিও একটি মেয়েকে এভাবে জড়িয়ে ধরে তাকে শুধু একটি চুমু দিয়েছিলাম। পরে যখন আমার দৃষ্টি আমি অন্য মহিলা থেকে নত করে

নিলাম, তখন আমার পরিবারের কোনো স্ত্রীলোকের প্রতিও কেউ চোখ তুলে তাকায়নি। আর আজ আমার মেয়ের সাথে সে আচরণই হলো, যা আমি করেছিলাম। এর চেয়ে বেশি কিছু হয়নি।

বন্ধুগণ! একে বলে কেসাস বা প্রতিশোধ। অন্যের মহিলার সঙ্গে আমরা যে আচরণ করব, আমাদের মহিলার সঙ্গেও তেমন আচরণ করা হবে।

যিনা কি ঋণ?

কখনো দেখা যায়, ভাই যিনা করছে। এদিকে বোন তার ঋণ আদায় করছে। বাপ অপকর্ম করছে, মেয়ে সেই ঋণ পরিশোধ করছে। স্বামী ব্যভিচার করছে, এদিকে স্ত্রী সেটা মীমাংসা করছে। আমরা কিতাবে পড়েছি, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি তোমরা অন্যের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে যিনা কর, তা হলে অন্যরা তোমাদের স্ত্রীর সঙ্গে যিনা করবে। আল্লাহ একটি নিয়ম বানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং যে-যুবকেরা সর্বদা এই নেশায় থাকে, তারা যেন চিন্তা করে, আমাদেরও মা, মেয়ে, স্ত্রী, বোন আছে। আমরা যদি কারও ইজ্জত নিয়ে খেলা করি, তাহলে আমাদের ইজ্জত নিয়ে অন্যরা খেলা করবে। আমাদের মা-বোনদের প্রতি অন্যের লালসার দৃষ্টি পড়বে। তাই এ থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

ব্যভিচার একটি ঋণ

ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেন, যিনা একটি ঋণ। যে কেউ এই কাজ করবে, তার আত্মীয় থেকে কেউ না কেউ তা পরিশোধ করবেই। তাই আমরা আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাই। আল্লাহ আমাদের ইজ্জত রক্ষা করুন। সত্যিকারের তাওবা করার তাওফীক দান করুন।

ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, اَحْسَنُ الْقَصَصِ 'উত্তম ঘটনা।'

এটা উত্তম ঘটনা কেন? কারণ, এই ঘটনায় আল্লাহ দুটি সম্প্রদায়ের কথা আলোচনা করেছেন।

এক. ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতাগণ! তারা বলল, نَحْنُ عُصْبَةٌ 'আমরা শক্তিশালী বড় দল।' সুতরাং একদল ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা। আরেকদল স্বয়ং ইউসুফ (আ.)।

দল কাকে বলে?

কোনো-কোনো সময় একক ব্যক্তিই একটি দলে পরিণত হয়ে যায়। যেমন– বলা হয়, অমুক একাই একশ। অর্থাৎ– সে একাই একটা দল বা কামিটির সমতুল্য। যেমন– আল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে বলেন,

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً

'নিশ্চয় ইবরাহীম একটি জাতি।'[৬২]

একক ইবরাহীম (আ.)কে একটি জাতি বলা হয়েছে। তেমনিভাবে হযরত ইউসুফ (আ.) একাই একটি দল।

এবার এই দু-দলের মধ্যে পরীক্ষা নেমে এল। উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। ফলে তাদের পরিণামও ভিন্ন হয়েছে। কীভাবে ভিন্ন হলো?

ইউসুফ (আ.)-এর ভাইদের অন্তরে এ ধারণা এসে গেল যে, আমাদের পিতা আমাদের তুলনায় ইউসুফকে অধিক ভালোবাসেন। অথচ সংখ্যায় আমরা অনেক বেশি।

আমরা বড় দল।

إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

'নিশ্চয় আমাদের পিতা সুস্পষ্ট ভুলে রয়েছেন।'[৬৩]

সুতরাং ভাইগণ! এর কোনো একটি ব্যবস্থা করো। কী করবে?

اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ

'ইউসুফকে হত্যা করে ফেলো অথবা তাকে কোনো নির্জন ভূমিতে ফেলে আস। তাহলে তোমাদের পিতার ভালোবাসা একমাত্র তোমাদের জন্য হবে।'[৬৪]

وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ

এর পরে তোমরা ভালো মানুষ হয়ে যাবে।[৬৫]

---

৬২. সূরা নাহল : আয়াত ১২০
৬৩. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৮
৬৪. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৯
৬৫. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৯

শয়তানি জাল

খুবই সূক্ষ্ম বিষয়। একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন। শয়তান তাদের হৃদয়ে কুমন্ত্রণা দিচ্ছে, ভাইকে হত্যা করো অথবা কোনো নির্জন প্রান্তে ফেলে আসো। তারপর এ গুনাহ হয়ে যাওয়ার পর তোমরা আবার নেককার হয়ে যাবে। অর্থাৎ– এখন গুনাহ করে ফেলো। তারপর তাওবা করে ভালো মানুষ হয়ে যাবে।

وَتَكُونُوا مِنۢ بَعْدِهِۦ قَوْمًا صَٰلِحِينَ

'পরে নেককার হয়ে যেয়ো।'

সুতরাং ভাইদের মস্তিষ্কে যে-ভাবনার সঞ্চার হয়েছিল, তারা সেটা নিক্ষেপ করল। এদিকে এক যাত্রীদল এসে ইউসুফ (আ.)কে উঠিয়ে নিল। অবশেষে ইউসুফ (আ.) মিশরের গভর্নরের শাহী মহলে পৌঁছলেন।

বাহ্যিক সৌন্দর্য একটি ধোঁকা

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۭ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ

'তারা তাঁকে স্বল্প মূল্যে বিক্রি করে দিল– গুনাগুনতি কয়েকটা দেরহামে।[৬৬]'

সেই বিক্রয়কারীরা তাকে বিক্রয় করল। প্রথমত কয়েকটা দেরহামে। তদুপরি অচল টাকা। এখানে মুফাসসিরীনে কেরাম একটি সূক্ষ্মতা বর্ণনা করেছেন যে, মানবজাতির মধ্যে হযরত ইউসুফ (আ.) সবচেয়ে বেশি সুন্দর ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইউসুফকে সৌন্দর্যের একটি বিশেষ অংশ দিয়েছিলেন। সৌন্দর্যের এমন অংশ আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দিয়েছিলেন। সাথে-সাথে তার বয়সও ছিল স্বল্প, যে বয়সে বালকরা স্বভাবত সুন্দর থাকে এবং তার সৌন্দর্য ঝলমল করতে থাকে। এমন অবস্থায় তাকে বিক্রি করল। কত টাকা দিয়ে? মাত্র কয়েকটা টাকায়। তাও আবার অচল। সুতরাং মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন, যে বাহ্যিক সৌন্দর্যের পেছনে তোমরা দৌড়াচ্ছ, এটা তুচ্ছ্য কয়েকটা টাকার পেছনে নিজের জীবন নষ্ট করছ। এর ফলাফল কয়েকটা অচল টাকা বই কিছুই নয়।

---

৬৬. সূরা ইউসুফ : আয়াত ২০

তাক্ওয়া ও ধৈর্যের ওপর আল্লাহ্ তা'আলার পুরস্কার

যাহোক অবশেষে ইউসুফ (আ.) যে-ঘরে লালিত হচ্ছেন, সেই ঘরের মহিলার অন্তরে দুষ্কৃতি এসে গেল। সুতরাং এক সুযোগে ওই মহিলা দরজা বন্ধ করে ইউসুফ (আ.)-এর নিকট নিজের নোংরা উদ্দেশ্য প্রকাশ করল। তখন কিন্তু ইউসুফ (আ.) বলেননি, 'এখন গুনাহ্ করে নিই; পরে পুণ্যবান হয়ে যাব।' না তা হয়নি। ইউসুফ (আ.) বলেন, معاذ الله আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাই।' সুতরাং তিনি ভীত হয়ে গেলেন। তারপর সেই মহিলার আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য দৌড় দিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সাহায্যে সমস্ত দরজা খুলে দিয়ে ইউসুফ (আ.)কে মুক্তি করে দিলেন।

এখানে আরও দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। শেষ পর্যন্ত ইউসুফ (আ.)কে জেলখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। ফলে আবার তাকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে তার মাথায় গভর্নরের মুকুট পরিয়ে দেওয়া হলো। দেখুন, এখানে ইউসুফ (আ.)-এর কোনো আত্মীয় ছিল না। কোনো সাথি ছিল না। কোনো সহযোগী ছিল না। একা-একা জেলখানায় ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করেছেন। আল্লাহ্ তাঁকে বিছানা থেকে উঠিয়ে সিংহাসনে সমাসীন করেন। ক্ষমতায় বসালেন। এদিকে যে ভ্রাতাগণ নিজের মনচাহি কর্ম করেছিল যে, এখন করে নাও; পরে তাওবা করে নেব, তাদের অবস্থা কী হলো? তাদের জীবনে দুর্ভিক্ষ নেমে এল। আহার্য না পেয়ে অনাহারে জীবন কাটছে।

অবশেষে ত্রাণ গ্রহণের জন্য ভ্রাতাগণ ইউসুফ (আ.)-এর দরবারে এলেন। ইউসুফ (আ.) কৌশলে আপন ভাই বিনইয়ামিনকে নিজের নিকট রেখে দিলেন। কর্মচারীরা ত্রাণ পরিমাপের একটি পাত্র বিনইয়ামিনের ত্রাণবাহী হাওদায় রেখে দিয়ে পরবর্তী কালে এ অজুহাতে বিনইয়ামিনকে আটক করা হলো। ভ্রাতাগণ অনেক কাকুতি-মিনতি করে বিনইয়ামিনকে নিয়ে আসতে পারেনি। অবশেষে নিরাশ হয়ে তারা চলে এল। ইউসুফ (আ.) তার ভাইকে কাছে রাখলেন? তারা কেন এসেছিল? কারণ, অনাহারে তাদের জীবন খুবই কষ্টে কাটছে। এদিকে ইউসুফ (আ.) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন। ভ্রাতাগণ তার নিকট এসে কী বলেছিলেন?

তারা বললেন,

يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ

'হে মিশরের বাদশাহ! আমাদের ও আমাদের পরিবারকে দুর্ভিক্ষ গ্রাস করেছে। আমাদের অবস্থা শোচনীয়। আমরা আপনার পণ্যের পূর্ণ মূল্যও নিয়ে আসতে পারিনি। তবে আমাদেরকে পরিপূর্ণ দিয়ে দেবেন।'[৬৭]

অর্থাৎ– সদকা-খায়রাত দেবেন। আল্লাহ দানকারীদের প্রতিদান দেবেন। অতএব, ফকির-মিসকিনরা যেরূপ প্রার্থনা করে, তেমনি তারা আবাদার করতে লাগল। সুতরাং ইউসুফ যখন দেখলেন, আমিও একজন নবীর সন্তান আর এরাও নবীর সন্তান। অথচ তারা আজ দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা করছে। তখন ইউসুফ (আ.) ভাইদের বললেন,

مَا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ

'তোমরা ইউসুফের সঙ্গে কী আচরণ করেছিলে?'

যখন তিনি এ প্রশ্ন করলেন, তখন তারা অবাক হয়ে বললেন,

ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ

'তুমিই কি তাহলে ইউসুফ?

قَالَ اَنَا يُوْسُفُ

'আমি ইউসুফ।'

وَهٰذَا اَخِيْ

'আর এ হচ্ছে আমার ভাই।'[৬৮]

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাদের ওপর দয়া করেছেন। সুতরাং যেব্যক্তি নিজের মধ্যে তাক্ওয়া ও ধৈর্য সৃষ্টি করবে, আল্লাহ তা'আলা সেই পুণ্যবান বান্দাদের আমল বিনষ্ট করবেন না। তাদের পরিপূর্ণ প্রতিদান তারা পাবেই। যেকোনো যমানায় যারা ইউসুফ (আ.)-এর ভাইদের আচরণ গ্রহণ করবে, নিজের মনচাহি কাজ করবে এবং বলবে, পরবর্তী কালে তাওবা করে নেব, আল্লাহ তাদেরকে দুর্ভিক্ষ দ্বারা পাকড়াও করবেন। আর যারা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ন্যায় তাক্ওয়া ও পবিত্র জীবন ধারণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্মানের মুকুট পরিয়ে সিংহাসনে সমাসীন করবেন।

---

৬৭. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৮৮

৬৮. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৮৯, ৯০

দুটি রাস্তা

অতএব, যুবকদের জন্য দুটি রাস্তা রয়েছে। যদি যৌবনের উদয়লগ্নেই অবৈধ বন্ধুত্ব স্থাপন করতে থাকে, নিজের ইচ্ছেমতো চলতে থাকে, তাহলে তারা যেন ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতাগণের ন্যায় জীবন ধারণ করল। অবশেষে অশান্তি ও অস্থিরতা ছাড়া জীবনের কোনো পথ পাবে না। লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা তাদের পিছু ছাড়বে না। পক্ষান্তরে যদি পুণ্যময় পবিত্র জীবন গড়তে পার, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত পথে জীবন যাপন কর, তাহলে আল্লাহ তা'আলার বরকত তোমার সঙ্গী হবে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তোমাকে সম্মানের জীবন দান করবেন। কোনো কবি বলেন–

ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی
خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاغ
حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی
خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ

'কাকের ঘরে কোনোদিন সুপ্রিয় উড়ক্ক পাখি জন্ম নেয় না।
কাকের সান্নিধ্য বাজের জীবনকে ধ্বংস করেছে।'

যুগের চোখে লাজুকতা নেই। সুতরাং তোমার জীবন যেন নিষ্কলুষ থাকে।

বর্তমান সমাজের তরুণদের আল্লাহ তা'আলা নিষ্কলুষ ও পবিত্র জীবন দান করুন। তাদেরকে তাদের পিতামাতার চোখের সুশীতলতা বানিয়ে দিন। এই সমাজকে আল্লাহ মনোমুগ্ধকর বানিয়ে দিন। তাদেরকে আল্লাহ ইহকাল ও পরকালে সম্মানের জীবন দান করুন। আমীন।

চারটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

'এটা এমন মনে করবেন যে, সন্তানের প্রতিপালনের ব্যাপারে যে শত শত কিতাব রয়েছে, সবগুলোর সারসংক্ষেপ হচ্ছে এগুলো। কোনগুলো? ভুলে গেছেন নাকি? সেগুলো হলো, সত্য বলা, পাঁচ ওয়াক্ত নামায সঠিক সময়ে আদায় করা, অন্যের সেবা করা। যে-বালকদের মধ্যে এ তিনটি গুণ এসে যাবে, সে নিজের যুগের ওলী হয়ে যাবে। এগুলো এমন কার্যকরি গুণ।

বলছিলাম, কতিপয় মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব না রাখা। এর মধ্যে একজন হচ্ছে নির্বোধ। দ্বিতীয়জন মিথ্যাবাদী। মিথ্যা এমন বিষয়, যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। কারও কথা শোনে না। সে কারো বশীভূত হয় না। তবে একটা কথা স্মরণ রাখবেন যে, মিথ্যা যতই দ্রুতগ্রামী হোক-না কেন? সত্য এক সময় তাকে গ্রাস করবেই।'

চারটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

'আপনি উপদেশ দিন। নিশ্চয় উপদেশ ঈমানদারদের উপকার পৌঁছায়।'[৬৯]

নসীহত বা উপদেশ কাকে বলে?

কাউকে তার হিতকামনার কথা বলা। উপকারের পরামর্শ দেওয়া। ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকার পন্থা বলা। এমন সহমর্মিতাবিষয়ক কথাকে উপদেশ বলে। একাজ আল্লাহ তা'আলার নিকট খুবই পছন্দীয়। আল্লাহ বলেন, দেখো, আমার বান্দা পরস্পরে হিতকামনার কথা বলছে। তাই উপদেশকে তিনি অত্যন্ত পছন্দ করেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন, উপদেশ দাও। উপদেশ ঈমানদারগণকে উপকার পৌঁছায়। যারা উদাসীন জীবন কাটাচ্ছে, তাদেরকেও দীনের পথে চলার ফায়েদা দেয় এবং যারা ধর্মপরায়ণ, তাদেরও মানোন্নয়নে ফায়েদা দেয়। সুতরাং পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষকেই উপদেশ উপকার পৌঁছিয়ে থাকে।

নসীহতের প্রভাব নিজের সত্তার ওপর

হাকীমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ আলী থানুভী (রহ.) বলেন, কোনো বক্তা যদি এমন বয়ান করেন, যে সম্পর্কে তার নিজের মধ্যেই আমল কম, তাহলে এই নসীহতের বরকতে তার নিজের মধ্যে আমলের আবেগ সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ– নসীহত বা উপদেশ এমন মর্যাদাসম্পন্ন বিষয়, যা অপরকেও ফায়েদা দেয় এবং নিজের সত্তাকেও উপকার পৌঁছায়।

---

৬৯. সূরা যারিয়াত : আয়াত ৫৫

পিঁপড়ার কল্যাণকামিতা

উপদেশ বা কল্যাণকামিতা আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত প্রিয়। তাই একটি পিঁপড়ার উপদেশও আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন। সুলামাইন (আ.) তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে কোথাও যাচ্ছেন। সেই রাস্তায় কিছু পিঁপড়া তাদের আহার্য সন্ধানে বের হয়েছিল। এমন সময় একটি পিঁপড়া তার স্বজাতিদের উপদেশ দিচ্ছে,

يَاأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ

'হে পিঁপড়ার দল! তোমরা নিজের গর্তে প্রবেশ করো।'[৭০]

এমন যেন না হয় যে, সুলাইমান (আ.)-এর বাহিনী তোমাদের পদদলিত করে ফেলে। এবার চিন্তা করুন, একটা পিঁপড়া তার স্বজাতির জন্য কেমন কল্যাণকামী। এটা আল্লাহ তা'আলার নিকট অনেক প্রিয় বিষয়। তাই এই পিঁপড়াদের আলোচনা আল্লাহ পবিত্র কুরআনেও করেছেন এবং এই সূরার নামও সূরা 'নাম্‌ল' (পিঁপড়া) নামে নামকরণ করেছেন। সুতরাং মানুষ পরস্পরে কল্যাণকামী হলে আল্লাহ তা'আলা কেমন পছন্দ করবেন।

আমাদের পূর্বপুরুষদের নসীহতের পদ্ধতি

আমাদের পূর্বপুরুষদের এই নিয়ম ছিল যে, ঘরে-বাইরে, মসজিদে-মাদরাসায় সর্বক্ষেত্রে কল্যাণকামিতা ও উপদেশের কথা বলতেন। সুতরাং আগের যুগের নিয়ম ছিল, পিতা তার সন্তানকে উপদেশ দিতেন। আর বর্তমান যুগ হচ্ছে সন্তান তার পিতাকে উপদেশ দিচ্ছে। পিতা যদি সন্তানকে উপদেশ দিতে চায়, তখন সন্তান বলে, আব্বু! তুমি নীরব থাকো। তুমি এসব বুঝবে না। কিন্তু একটা সময় এমন ছিল, যখন পিতার উপদেশে সন্তানদের জীবন ধন্য হতো। সেই উপকার বর্তমানে কীভাবে হবে? যেখানে পিতা-মাতার মধ্যেই প্রকৃত দীন নেই, তারা আবার সন্তানদের কী উপদেশ দেবে। দুনিয়াদারি এমন প্রসিদ্ধি পাচ্ছে যে, কখনো দেখা যায়, সন্তান সৎপথে চলতে চায়; কিন্তু তার মাতাপিতা তার জন্য এ পথে বাধা হয়ে অবস্থান নিচ্ছে। অথচ আগের যুগে মাতাপিতার উপদেশই ছিল সন্তানের একমাত্র সম্পদ। এর প্রমাণস্বরূপ হযরত আবদুল কাদের জিলানি (রহ)-এর জীবন দেখুন। সন্তান ইল্‌ম শিক্ষার জন্য বাগদাদ যাচ্ছেন। মা বলে দিলেন, বাবা! কখনো মিথ্যা

---

৭০. সূরা নামল : আয়াত ১৮

কথা বলবে না। রাস্তায় ডাকাতদল আক্রমণ করল। সবার মালপত্র কেড়ে নিল। এ বালককে জিজ্ঞাসা করল, তোমার হাতে কী আছে? বলল, আমার হাতে চল্লিশটা দেরহাম আছে। ডাকাতরা অবাক! কী ব্যাপার? এ তো একটা শিশু! সে বলছে, তার নিকট চল্লিশ দেরহাম আছে। না তা হতে পারে না।

সবাই চলে গেল। ডাকাতদের সরদার তাদের প্রত্যেকের কারগুজারি শুনল। এক ডাকাত বলল, আমি ছোট একটা শিশুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমার হাতে কী আছে? সে বলল, আমার হাতে চল্লিশ দেরহাম আছে। তার কথা আমার বিশ্বাস হলো না। আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। এবার সরদার বলল, ওই শিশুকে ধরে নিয়ে আসো। তাকে নেওয়া হলো। সরদার জিজ্ঞাসা করল, তোমার হাতে কী আছে? বলল, আমার হাতে চল্লিশ দেরহাম আছে। কোথায়? তিনি সেলাইকৃত অবস্থায় রক্ষিত জামার ভেতর থেকে চল্লিশ দেরহাম বের করে দিলেন। ডাকাত জিজ্ঞাসা করল, এই বাচ্চা! তোমাকে তো আমরা ছেড়ে দিয়েছিলাম। তুমি না বললে এখনো তোমাকে তল্লাশি করতাম না। তাহলে তুমি মিথ্যা বললে না কেন? তা হলে তো তুমি মুক্তি পেয়ে যেতে। হযরত আবদুল কাদের জিলানি (রহ.) বললেন, এটা আমার অম্মাজানের উপদেশ। আম্মাজান বলছেন, কোনো অবস্থাতেই মিথ্যা বলতে পারবে না। তাই সত্য কথা বলেছি।

তার কথা শুনে ডাকাত সরদারের অন্তর কম্পিত হয়ে গেল। এই একটি শিশু তার মায়ের উপদেশের বিপরীত করতে পারছে না। আর আমরা সারা জীবন ধরে আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করছি। পরকালে কী জবাব দেব? সুতরাং সঙ্গে-সঙ্গে সকল ডাকাত তাওবা করে প্রকৃত মানুষ হয়ে গেল এবং সবার মালপত্র ফেরত দিল। দেখুন, এ হলো মায়ের উপদেশের প্রভাব।

ইমাম যায়নুল আবেদীন (রহ.)-এর মাতাপিতার উপদেশ

ইমাম যায়নুল আবেদীন (রহ.) বলেন, আমার পিতা আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, বাবা! কতিপয় মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো না। এমনকি তাদের সঙ্গে রাস্তায় চলতে হলেও তাদের সঙ্গী হবে না। এরা কারা? বললেন–

(১) নির্বোধদের সাথে বন্ধুত্ব করো না। কারণ, সে তোমার উপকার করতে গিয়ে তোমার ক্ষতি করে ফেলবে।

একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে। একলোক একটি ভল্লুকশাবক লালন করছে। ঠিকমতো সেটাকে পোষ মানাচ্ছে। অবশেষে ভাবল, যদি আমি একে পাখা চালানো শিক্ষা দিই, তাহলে দুপুরে শোওয়ার সময় এ আমাকে বাতাস

করবে। সে একে পাখা পরিচালনার প্রশিক্ষণ দিল। ভল্লুক সেই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। এখন সে দুপুরে শুয়ে থাকে আর ভল্লুক তাকে বাতাস করে। কেউ-কেউ তাকে বাধা দিচ্ছে, ভাই এটা নির্বোধ প্রাণী। এর দ্বারা এমন সেবা নেওয়া ঠিক হবে না। বলা যায় না, কোন দিন কোন ক্ষতি করে বসে। কিন্তু সে কারও কথা শুনছে না। প্রতিনিয়ত এই প্রাণীর কাছ থেকে সেবা নিচ্ছে।

একদা মালিক শুয়ে আছে। ভল্লুক তার পাশে বসে মালিককে বাতাস করছে। এতক্ষণে একটা মাছি মালিকের মুখে বসল। ভল্লুক সেটাকে তাড়াচ্ছে। কিন্তু মাছিটা বারবার মালিকের মুখে বসছে। মালিকের মুখে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। এটা তো হবেই। কারণ, কথায় আছে না, 'মিষ্টির দোকান মাছির আসন।' যাহোক মাছি বারবার আসছে আর ভল্লুক তাকে তাড়াচ্ছে। শেষ ফলে ভল্লুক মাছির ওপর ক্ষেপে যায়, তুই আমার মালিককে ঘুমাতে দিলি না; তোর এখন খবর নেব। ভল্লুক উঠে গিয়ে বিরাট একটি পাথর সংগ্রহ করে আনল। মাছি তার অভ্যাস অনুযায়ী মালিকের মাথায় বসল। এবার ভল্লুক পাথর উঠিয়ে সজোরে মাছির ওপর আঘাত করল।

এবার কী হলো? মাছি তো তার পথ ধরে চলে গেল। এদিকে পাথরের আঘাতে মালিকের মাথা ফেটে মগজ বের হয়ে গেল। মালিক মারা গেল। দেখুন, এ হচ্ছে নির্বোধের কাজ। সে তো তার মালিকের আরাম দিতে চেয়েছিলেন; কিন্তু পরিণামে মালিকের জীবন শেষ হয়ে গেল।

ইমাম যায়নুল আবেদীন (রহ.) বলেন, আমার পিতা আমাকে আরেকটি উপদেশ দিলেন। মিথ্যাবাদীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো না। সর্বদা সত্য কথা বলবে। সব কিছুতে তোমাকে ছাড় দেয়া যাবে; কিন্তু মিথ্যার ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কোনো প্রকার আপস করা হবে না। সমস্ত ভুল সহ্য করা যাবে; কিন্তু মিথ্যা সহ্য করা যাবে না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ঈমানদার সব কিছু হতে পারে; কিন্তু মিথ্যাবাদী হতে পারে না। এটি কিন্তু বাস্তব কথা। খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু বর্তমান যুগে মাতাপিতা সন্তানকে এ উপদেশ কীভাবে দেবে, যেখানে তারা নিজেই শত মিথ্যা বলছে। নিজে সত্য বললে সন্তানদের কাছ থেকে বলার প্রতিশ্রুতি নেওয়া যায়। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এজন্যই উদাসীন জীবনের শুরুই হয় মিথ্যা দিয়ে। কারণ, প্রথমে সে তার একটি কাজ লুকানোর জন্য মিথ্যা বলে। তারপর সেই মিথ্যা চাপা দেওয়ার জন্য আরও শত মিথ্যা বলতে হয়। আস্তে-আস্তে তার জীবনটাই মিথ্যায় পরিণত হয়ে যায়।

সুতরাং সন্তানদের এ উপদেশ দেওয়া চাই যে, কখনো মিথ্যা বলবে না। সব কাজে তাকে ছাড় দেওয়া যাবে; কিন্তু মিথ্যার ব্যাপারে সন্তানের সঙ্গে আপসহীন অবস্থান নেবে। সন্তানকে বলবে–

ہزار خوف ہوں لیکن زبان ہو دل کی رفیق
یہی رہا ہے ازل سے قلندر کار طریق

'বাবা! হাজারো ভয় আসুক; কিন্তু মুখ হবে হৃদয়ের সাথি। এটাই হচ্ছে অনাদি থেকে দরবেশদের নিয়ম।'

(২) ইমাম যায়নুল আবেদীন (রহ.) বলেন, আমার পিতা আমাকে দ্বিতীয় উপদেশ দিলেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায ঠিকমতো আদায় করবে। ক্লান্ত হও, শান্ত হও, নামায বাদ দেওয়া যাবে না। তোমার রাতে ঘুম আসেনি; তাই ফজরে সময় ঘুমিয়ে থাকবে, তা হতে পারে না। এ ব্যাপার কোনো আপস হবে না। কারণ, তোমার নামায ঠিক না হলে তুমি গ্রহণযোগ্য হতে পারবে না। সন্তানের অনেক ত্রুটি মেনে নেওয়া যায়; কিন্তু নামাযের ব্যাপারে উদাসীন হওয়া বরদাশত করা যায় না। এর দীনি ফায়েদা হলো, চেহারায় নেককারদের নূর চমকাতে থাকবে। চেহারা লাবণ্যময় হবে। সব কাজে বরকত হবে। আরও ফায়েদা হচ্ছে, পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের দরুণ তার জীবনে শৃঙ্খলা নেমে আসবে। টাইম টু টাইম কাজ করতে অভ্যস্ত হবে। সময়ের গুরুত্ব আসবে। যদি নামাযের গুরুত্ব না থাকে, তাহলে কোনো কাজে সময়ের পরোয়া করবে না। সুতরাং জামাতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ব্যাপারে তার ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। আর যদি তাকবীরে উলার সাথে পড়তে পারে, তাহলে তো আরও ভালো এবং প্রশংসনীয় কাজ।

(৩) ইমাম যায়নুল আবেদীন (রহ.) বলেন, আমার পিতার তৃতীয় নসীহত হচ্ছে, অন্যের খেদমত করবে। মানুষের প্রকৃতি এমন হয় যে, সে সর্বদা অন্য থেকে সেবা নিতে চায়। সেবা করতে আগ্রহী নয়। কোনো-কোনো ছেলে আছে, যারা কাজকে বোঝা মনে করে। এটা তাদের জন্য বিপদ। এর প্রশ্রয় দেবেন না। সন্তানকে বোঝাবেন, খেদমতকে বড় মনে করো। যখন ছোটরা বড়দের সেবা করবে, মাতাপিতার খেদমত করবে, তখন ওই সন্তানের মধ্যে অটোমেটিক বিনয় এসে যাবে। আমিত্ব ও অহংকার দূর হবে। সুতরাং বন্ধুগণ! এই তিনটি উপদেশ মানবজীবনের সংশোধনির নির্যাস। সন্তান থেকে সত্য বলার অঙ্গীকার নেওয়া। পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময়মতো আদায় করা। সেবা না নিয়ে অন্যের সেবা করা। এ তিনটি বিষয় সুন্দর হয়ে গেলে

আপনার সন্তানের জীবন সুন্দর হয়ে যাবে। তার মুখে নিজে হাতে দুধ, কলা, ঘি, মধু, মিষ্টান্ন খাইয়ে দেবেন; কিন্তু এ তিনটি বিষয়ে কোনো প্রকার নমনীয়তা দেখাবেন না।

সন্তানের প্রতিপালন শত কিতাবের সারসংক্ষেপ

এটা এমন মনে করবেন যে, সন্তানের প্রতিপালনের ব্যাপারে যে শত শত কিতাব রয়েছে, সবগুলোর সারসংক্ষেপ হচ্ছে এগুলো। কোনগুলো? ভুলে গেছেন নাকি? সেগুলো হলো, সত্য বলা, পাঁচ ওয়াক্ত নামায সঠিক সময়ে আদায় করা, অন্যের সেবা করা। যে-বালকদের মধ্যে এ তিনটি গুণ এসে যাবে, সে নিজের যুগের ওলী হয়ে যাবে। এগুলো এমন কার্যকরি গুণ।

বলছিলাম, কতিপয় মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব না রাখা। এর মধ্যে একজন হচ্ছে নির্বোধ। দ্বিতীয়জন মিথ্যাবাদী। মিথ্যা এমন বিষয়, যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। কারও কথা শোনে না। সে কারো বশীভূত হয় না। তবে একটা কথা স্মরণ রাখবেন যে, মিথ্যা যতই দ্রুতগ্রামী হোক-না কেন? সত্য এক সময় তাকে গ্রাস করবেই।

ইসলামের বিজয়

একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে। কান্ধলায় একটি জমি নিয়ে এক মুসলামান ও এক হিন্দুর মধ্যে ঝগড়া বাঁধে। মুসলমান বলছে, আমার জমি। হিন্দু বলছে, আমার জমি। ওই গ্রামে হিন্দু-মুসলমান একত্রে বাস করত। বিবাদ আস্তে-আস্তে বেড়ে যাচ্ছে। তখন মুসলমান ব্যক্তি একটু চালাকি প্রকাশ করল। কেউ-কেউ প্রয়োজনের চেয়েও বেশি চালাক হয়ে যায়। তখন সে কৌশল করতে থাকে। ওই লোক বলছে, জমিটা আমার ঠিকই। তবে এখন আমি একে দখল করতে পারলে এখানে মসজিদ নির্মাণ করব। এবার হিন্দু লোকটি বলল, আমি দখল করতে পারলে এখানে মন্দির নির্মাণ করব।

প্রথমে বিবাদ ছিল তাদের ব্যক্তিগত। এখন বিবাদ দাঁড়াল প্রত্যেকের ধর্ম নিয়ে। সুতরাং গ্রামের সকল মুসলমান ও হিন্দু দুদলে বিভক্ত হয়ে গেছে। ঝগড়ার আকার ধারণ করছে। অবশেষে আদালতে মামলা করা হলো। কোর্টের জজ ছিলেন ইংরেজ। তিনি ভাবলেন, এখন কী করা যায়। কারও পক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ নেই। কার পক্ষে রায় দেব। এতে ঝগড়া আরও বেড়ে যাবে। জনগণের বিরাট ক্ষতি হবে। তাই জজ চাইলেন বিষয়টা আপসে

মীমাংসা করা যায় কীভাবে? তিনি উভয় পক্ষকে ডেকে বললেন, আপনারা বিষয়টা আপসে শেষ করে নিন। বিশৃঙ্খলা যেন আর না বাড়ে।

হাকীমের কথা শুনে হিন্দু লোকটি বলল, মাননীয় বিচারক! আপনি অমুক মুসলমান ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করুন, জমিটি কার? সে যদি বলে মুসলমানের, তাহলে এই জমিতে আমার কোনো দাবি নেই। আপনি জমিটি মুসলমানদের দিয়ে দেবেন। আর সে যদি বলে, জমিটি মুসলমানদের নয়, তাহলে আপনার খুশিমতো রায় দেবেন। এবার বিচারক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। যেহেতু এক পক্ষ একটি সাক্ষীর ওপর রাজি হয়েছে, তাহলে মনে হয় বিষয়টা সমাধান হবে। হাকীম আরেকটি তারিখ দিলেন। আগামী তারিখে আপনাদের মামলার রায় দেওয়া হবে।

হিন্দু লোকটির কথা শুনে মুসলমানরা আনন্দে বাগবাগ। এবার তো আমাদের বিজয় নিশ্চিত। কেননা, সে একজন মুসলমানকে সাক্ষী মেনে নিয়েছে। আর আমরা চাচ্ছি, এখানে মসজিদ নির্মাণ করব। সুতরাং তিনি তো এর বিপক্ষে সাক্ষী দিতে পারেন না। এদিকে হিন্দুরা হতাশ হয়ে গেল। লোকটিকে তিরস্কার করতে লাগল, তুমি এটা কী করলে? মুসলমানকে সাক্ষী মানলে কেন? সে কি আমাদের অনুকূলে? তাহলে আমাদের নিয়ে দল সাজালে কেন? এখন এটা আমাদের মান-সম্মানের ব্যাপার। তুমি জয়ের মামলায় নিজদোষে হেরে গেলে। সে বলল, তোমরা অস্থির হয়ো না। আমি যাকে সাক্ষী মেনেছি, সে সত্যবাদী লোক। জীবনে কোনোদিন মিথ্যা বলে না। আর সে জানে, জমিটি আমার। সুতরাং রায় আমার পক্ষেই হবে। এরপরও হিন্দুরা তাকে নানাভাবে ব্যাঙ্গ করতে থাকে।

যাহোক মামলার তারিখ এল। সাক্ষী উপস্থিত করা হলো। তিনি হলেন আমাদের এই নকশবন্দি তরিকার আবদুল আযীয (রহ.)-এর শিষ্য হযরত মুফতী এলাহি বখশ সাহেব (রহ.)। বিচারক জিজ্ঞাসা করলেন, প্রতিপক্ষ আপনাকে সাক্ষী মেনেছে। আপনি সত্য করে বলুন, জমিটি কার? মুসলমান ব্যক্তি আল্লাহর ওলী, যার সম্পর্কে কাফেরেরও বিশ্বাস যে, তিনি মিথ্যা বলতে পারেন না। তিনি আদালতে সাক্ষ্য দিলেন, জমিটি হিন্দ লোকের।

তার কথা শুনে সমস্ত মুসলমান হতভম্ব হয়ে গেল। তিনি এটা কী করলেন? মুসলমানদের বিপক্ষে, মসজিদের বিপক্ষে কীভাবে সাক্ষ্য দিলেন? জজ সাহেবও অবাক! একজন মুসলমান তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল কীভাবে? বিচারক রায় লিখলেন, আজকের মামলায় সত্য সাক্ষ্যের প্রেক্ষিতে

মুসলমানদের পরাজয় হয়েছে; তবে ইসলামের বিজয় হয়েছে। সাক্ষী মুফতী এলাহী বখশ সাহেবের সাক্ষ্য অনুযায়ী এ মামলায় সংশ্লিষ্ট বিবাদযুক্ত জমিটি অমুক হিন্দু লোকের বলে প্রমাণিত হলো। সুতরাং আদালত জমিটি তাকে প্রদান করছে এবং মুসলমনদেরকে এ জমি নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করছে। অন্যথায় আদালত তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে।

বিচারক তার রায় পাঠ করে শোনালেন। উপস্থিত সবাই শুনছে। হিন্দুরা আনন্দে আত্মহারা। আদালতে আমরা মুসলমানদের ওপর জয় লাভ করেছি। হাকীম সাহেব রায় ঘোষণা শেষ করলেন। এবার ওই হিন্দু লোকটিসহ কতিপয় হিন্দু লোক বলল, মহামান্য আদালত! আপনি আপনার বিচার করেছেন। সঠিক রায় দিয়েছেন। এতে আমরা খুশি। তবে আমাদের কিছু কথা ছিল। আপনি অনুগ্রহপূর্বক শুনবেন। আমাদের কথা বলার জন্য আদালতের অনুমতি চাচ্ছি। বিচারক অনুমতি দিলেন। হিন্দু লোকটি বলল, মামলার রায়ে আপনি লিখেছেন, এ মামলায় মুসলামানদের পরাজয় হয়েছে; তবে ইসলামের বিজয় হয়েছে। সুতরাং যেহেতু ইসলামের বিজয় হয়েছে, তাই আমরাও কালেমা পড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিলাম এবং আমাদের এই জমিটি মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করে দিলাম।

সুবহানাল্লাহ! দেখুন বন্ধুগণ! একটি সত্য কথার সফলতা কী হয়েছে। তাদের কথায় আদাদলতে উপস্থি সকল হিন্দু মুসলমান হয়ে গেছে। আল্লাহু আকবার! সত্য কথা বাহ্যিকভাবে দেখবেন খারাপ লাগছে; কিন্তু বাস্তব এমন হবে না। সত্য কথা সর্বদাই সফলতা বয়ে এনেছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সত্য বলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

হযরত ওমর (রাযি.) ও কথার সংরক্ষণ

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা, প্রায় অর্ধেক পৃথিবীর শাসক হযরত ওমর (রাযি.)-এর শাসনামলে কোনো এক দেশের রাজপুত্রকে গ্রেফতার করে তাঁর দরবারে উপস্থিত করা হলো। হযরত ওমর (রাযি.)-এর ইচ্ছা ছিল তাকে হত্যা করা হোক। কারণ, সে মুসলমানদের অনেক ক্ষতি করেছে। তিনি জল্লাদ ডাকলেন। মৃত্যুর মঞ্চ প্রস্তুত করা হয়েছে। খলীফার নির্দেশ হবে আর সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে। শাহজাদার চেহারা অত্যন্ত বিষণ্ন দেখাচ্ছে। সে কী যেন খুঁজছে। হযরত ওমর (রাযি.) জিজ্ঞাসা করলেন, কী হলো? কিছু সন্ধ্যান করছেন নাকি? লোকটি বলল, জাহাঁপনা! মৃত্যুর সময় আমার একটি আবদার রক্ষা করবেন। হ্যাঁ, বল তোমার কী আবদার,

শাহাজাদা বলল, খলীফাতুল মুসলিমীন! আমি এক গ্লাস পানি পান করতে চাই। আমাকে একটু পানি দেবেন? ওমর (রাযি.) এক গ্লাস পানি আনতে নির্দেশ দিলেন। তাকে পানি দেওয়া হলো, এবার সে পানির গ্লাস হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। পানি পান করছে না। অস্থিরতার ভাব দেখাচ্ছে। খলীফা জিজ্ঞাসা করলেন, এবার কী হলো, পানি পান করছ না কেন? লোকটি বলল, খলীফাতুল মুসলিমীন! আমার ভয় হচ্ছে, আমি যখন পানি পান করতে থাকব। তখন আপনি আমার হত্যার নির্দেশ দিয়ে দেন আর আমার পানি পান করা হবে না।

ওমর (রাযি.) বললেন, না, তুমি পানি পান না করা পর্যন্ত তোমাকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হবে না। বলল, জাহাঁনপনা কি সত্যই বলছেন, আমি এ পানি পান না করা পর্যন্ত আমাকে হত্যার নির্দেশ দেবেন না? বললেন, হ্যাঁ; সত্যই বলছি, তুমি এ পানি পান না করা পর্যন্ত তোমাকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হবে না। খলীফার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে চতুর শাহজাদা তার হাতের গ্লাসের পানি মাটিতে ফেলে দিল এবং বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! এবার আপনি আর আমাকে হত্যা করতে পারবেন না। কারণ, আপনি কথা দিয়েছেন, আমি পানিটুকু পান না করা পর্যন্ত আমাকে হত্যার আদেশ দেবেন না। আর সেই পানি আমার আর কোনোদিন পান করা হবে না। কারণ, সে পানি জমিনে খেয়ে নিয়েছে। হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, ঠিক আছে; যাও তোমার মৃত্যুদণ্ড ক্ষমা করে দিলাম। এবার মুক্তিপ্রাপ্ত শাহজাদা বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। আমিও পাঠ করে নিলাম, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।

আল্লাহু আকবার! হযরত ওমর (রাযি.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, যখন তোমাকে হত্যার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তখন ইসলাম গ্রহণ করনি। এখন মৃত্যুদণ্ড থেকে মুক্তি পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করলে কেন? শাহজাদা বলল, জাহাঁপনা! ওই সময় ইসলাম গ্রহণ করলে মানুষ বলত, প্রাণের ভয়ে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। তাই কোনো বাহানা খুঁজছিলাম, দেখা যাক কোনোভাবে এ আদেশ থেকে রেহাই পাওয়া যায় কি-না। সুতরাং আমি এই কৌশল করেছি এবং দণ্ডাদেশ থেকে মুক্তি পেয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে ইসলাম গ্রহণ করেছি। সাথে সমাজের অপপ্রচার থেকে নিজেকে বাঁচানোরও চেষ্টা করেছি। কিতাবে আছে, ওমর (রাযি.) তাকে তাঁর নিকট রেখে দেন এবং অনেক সময় রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তার কাছ থেকে তিনি পরামর্শ গ্রহণ করেন।

আমি বলছিলাম, বলা হয়েছে, পাপিষ্ঠ ও ফাসেকদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখো না। কেন? কারণ, সে তোমাকে এক লুকমা আহারের কম সময়েও বেঁচে দেবে। অর্থাৎ– এক লুকমার সময় তো একটু গ্রহণযোগ্য সময় ছিল। এর চেয়েও হীন স্বার্থে সে তোমাকে বিক্রি করে দেবে, ধ্বংস করে দেবে। এবার আসুন, আমাদের মূল আলোচনায় ফিরে যাই।

আপন সন্তানকে হযরত লুকমান (আ.)-এর নসীহত

হযরত লুকমান (আ.) নামে আল্লাহ তা'আলার এক বিখ্যাত ওলী ছিলেন। তিনি কৃষ্ণবর্ণের হাবশি লোক ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর লোকালয় বর্তমান ইথিওপিয়া। সেখানকার লোকদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। সেই শহর এখনো ওই নামেই প্রসিদ্ধ আছে, যে নাম তাঁর সময়কালে ছিল।

তিনি কালো বর্ণের আফ্রিকান লোক ছিলেন। তিনি তাঁর সন্তানকে উপদেশ দিচ্ছেন। তার উপদেশ আল্লাহ তা'আলার অত্যন্ত পছন্দ হয়েছে। তাই সূরা লোকমান নামে একটি সূরার নামকরণ করেছেন এবং এর মধ্যে তার সন্তানের প্রতি উপদেশকে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের অংশ বানিয়ে দিয়েছেন। ভেবে দেখুন, আল্লাহ তা'আলা উপদেশ কেমন ভালোবাসেন। কিতাবে লিখেছেন, হযরত লোকমান (আ.) তার সন্তানকে প্রায় চার অথবা চয় হাজার উপদেশ দিয়েছিলেন।

হযরত লোকমান (আ.)-এর নসীহতসমূহের সারসংক্ষেপ

একদা হযরত লোকমান (আ.) তার অতি আদরের সন্তানকে বললেন, বাবা! আমি চার হাজার উপদেশ থেকে কুড়িয়ে তোমার জন্য চারটি উপদেশ চয়ন করেছি। আর এই চারটি উপদেশেই হচ্ছে এ-সকল উপদেশের সারসংক্ষেপ।

ছেলে জিজ্ঞাসা করল, আব্বু এগুলো কী?

তিনি বললেন–

اِحْفَظْ اَرْبَعًا فِيْ اَرْبَعٍ

'চার স্থানে চারটি জিনিসকে হেফাযত করো।'

প্রথম উপদেশ

প্রথম উপদেশ হলো,

اِحْفَظْ عَيْنَكَ فِيْ بُيُوْتِ النَّاسِ

'কারও ঘরে গেলে নিজের দৃষ্টিকে সংযত রেখো।'

এটা সেই যুগের হিসাবে বলা হয়েছিল। মানুষ একে অপরের বাড়ি যেত, মেহমান হতো। ফলে ভয় ছিল, কোনো গায়রে মাহরাম দৃষ্টিগোচর হয়ে যায় আর পর্দার খেলাফ হয়। বর্তমানকার হিসাবে বলতে হবে, দৃষ্টিকে সংযত রাখো। কারণ, বর্তমানে তো হাটে-বাজারে, রাস্তা-ঘাটে, অলিতে-গলিতে বেপর্দা গায়রে মাহরাম থেকে চোখ বাঁচিয়ে রাখাও দায়। সুতরাং হেফাযত করব কীভাবে?

যাহোক তিনি উপদেশ দিলেন, বাবা! কোথাও গেলে নিজের চোখ সংরক্ষণ করো। এটা বর্তমানে যুবকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর মাদরাসার ছাত্ররা কী করে? সারা দিন মাদরাসায় বসে থাকে। আছরের সময় ছুটি হলে সারাদিন আটকে থাকা ছাগলের ন্যায় বিকালবেলা ছাড়া পেয়ে এদিক-সেদিক ঘুরতে থাকে। বাজারে যায়, স্টেশনে যায়, রেললাইনে হাঁটে। এদিক-সেদিক সকল দৃশ্য দেখে, বেগানা মহিলা দেখে। গান-বাজনা ও তামাশা দেখে। সেই দৃশ্য তাদের বিবেক নিয়ে খেলতে থাকে। সারা দিন যা শুনেছিল, পড়েছিল, সেগুলো কিছুই মনে রইল না। রাতে এসে হুজুরকে বলল, হুজুর সবকটা আবার বলে দিন। পুরোপুরি বুঝে আসছে না। হুজুর বলে দিলেন। তবু স্মরণ করতে পারছে না। কারণ হচ্ছে, যেখানে পাপ পাওয়া যাবে, সেখানে ভুলে যাওয়া পেতেই হবে। কেননা, ইল্‌ম হচ্ছে নূর (আলো) আর গুনাহ হচ্ছে অন্ধকার। অন্ধকার ও আলো একত্র হয় না। একটা এলে আরেকটা দূরীভূত হওয়া অনিবার্য।

দ্বিতীয় উপদেশ

اِحْفَظْ لِسَانَكَ فِيْ مُجَالَسَةِ النَّاسِ

'জনসমাবেশে বসে নিজের জিহ্বাকে সংরক্ষণ করো।'

নির্জনে একা বসে থাকো; জিহ্বা সংরক্ষণ করা আবশ্যক নয়। একা বসে তো বকাবকি করে সে, যার মস্তিষ্ক বিগড়ে গেছে। সাধারণত মানুষ একা বসে নিজের কাজই করে। অন্যকে নিয়ে মন্তব্য করে না। যখন দুজন হয়, তখন অন্যের সমালোচনা শুরু হয়। দুজন থেকে তিনজন হলে, আরও বেশি হতে থাকে। কারও গীবত, কারও চোগলখোরি, কাউকে অপবাদ। সুতরাং তিনি বললেন, মানুষের সঙ্গে বসে নিজের জবানকে সংরক্ষণ করো।

তৃতীয় উপদেশ

اِحْفَظْ مِعْدَتَكَ عَلٰى مَائِدَةٍ

'দস্তরখানে বসে নিজের পাকস্থলিকে সংরক্ষণ করো।'

কারণ, দস্তরখানে বসে মানুষ যা আহার করে, তা-ই তার সুস্থতার কারণ হয়। একে ইংরেজীতে বলে, Your health is what uou eat। তুমি যা খাবে, তা-ই তোমার স্বাস্থ্য, তোমার সুস্থতা। বর্তমান তরুণদের তো খাবার ভালোই লাগে না। তাদের Fast Food পছন্দনীয়। Chips খায়। এটা উল্টা এ্যাকশন করছে। আধুনিক যুগে যদি রুটি ও তরকারি দাও, তাহলে তাদের পছন্দ হয় না। তারা বলে, আমাদের Pototo Chips দাও। নতুন-নতুন আরও কত খাবার; আমি সেগুলোর নামও বলতে পারব না। আমরা পুরাতন মস্তিষ্কের মানুষ। এগুলো স্মরণ না থাকারই কথা। সুতরাং তিনি তার ছেলেকে বললেন, দস্তরখানে বসে নিজের পাকস্থলিকে সংরক্ষণ করবে।

চতুর্থ উপদেশ

اِحْفَظْ قَلْبَكَ فِى الصَّلٰوةِ

'নামায পড়ার সময় নিজের অন্তরকে হেফাযত করবে।'

যাতে অন্তরে কোনো প্রকার প্ররোচনা না আসে। বাস্তবেও মানুষ যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন আগের-পিছের অনেক কথা স্মরণ হয়, যা নামায ব্যতীত স্মরণ হওয়া কল্পনা করা যায় না। বর্ণিত আছে, এক লোক তার টাকার থলি কোথায় রেখেছে স্মরণ নেই। ইমাম আবুহানীফা (রহ.)কে বলল, হুজুর আমাকে কোনো তদবির বলে দিন। আর একটু দু'আ করবেন, যাতে আমার টাকাটা পেয়ে যাই। তিনি বললেন, উত্তমরূপে উজু করে নিষ্ঠার সাথে দু-রাকাত নফল নামায পড়ো।

লোকটি ইমাম সাহেবের কথামতো নামাযে দাঁড়ালেন। নামাযের মধ্যে তার টাকার থলির কথা স্মরণ হয়ে গেল যে, অমুক জায়গায় রাখা হয়েছে। কারণ, সে যখন নিষ্ঠার সাথে নামাযে দাঁড়াল, তখন শয়তান চিন্তা করল, এখন কোন কথাটা স্মরণ করিয়ে দিলে তার নামাযে বিঘ্নতা আসবে। তাই তার একেবারে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিল।

সুতরাং তিনি তার ছেলেকে বললেন, নামাযে অন্তরকে সংরক্ষণ করবে। কারণ, নামাযে শয়তান বিভিন্ন ওয়াসওয়াসা দিয়ে থাকে। সুতরাং ভাই! এ চারটি উপদেশ বর্তমান যুগের ছাত্র ও তরুণদের জন্য অমূল্য সম্পদ, সকল

উপদেশের নির্যাস। আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। সেই চারটি উপদেশ হলো, (১) চোখের হেফাযত (২) জবানের হেফাযত (৩) পাকস্থলির হেফাযত (৪) নামাযে অন্তরের হেফাযত।

দুটি কথার আলোচনা করবে না

তারপর লোকমান হাকীম উক্ত চার উপদেশের সঙ্গে আরও দুটি কথা সংযুক্ত করেছেন। তিনি বলেন, যেহেতু তুমি আমার আদরের দুলালী, কলিজার টুকরা; সুতরাং আরও দুটি কথা শোনো! (১) কারও ওপর তুমি দয়া করলে সেই দয়ার আলোচনা করবে না। (২) কেউ তোমাকে কষ্ট দিলে কারও নিকট এরও আলোচনা করবে না। বরং আল্লাহর ওয়াস্তে তাকে ক্ষমা করে দেবে। আর যেহেতু তাকে ক্ষমা করে দিবে; সুতরাং এটাও কারও নিকট আলোচনা করবে না। এ দুটি বিষয় কখনো ভুলবে না।

দুটি বিষয় কখনো ভুলবে না

লোকমান হাকীম তার সন্তানকে বললেন, আরও দুটি বিষয় আছে। সেগুলো কখনো ভুলবে না। জিজ্ঞাসা করলেন, আব্বু সেই দুটি বিষয় কী? জনাব দিলেন–

১. বাবা! আপন প্রভুকে কখনো ভুলবে না।

২. নিজের মৃত্যুকে কখনো ভুলবে না।

এ দুটি বিষয় সর্বক্ষণ স্মরণ রাখবে। আর বাস্তবেও একথাটি ১০০% সত্য। যেব্যক্তি সবর্দা নিজের প্রভু ও নিজের মৃত্যুকে স্মরণ রাখবে, সে কস্মিনকালেও পথহারা হবে না। পক্ষান্তরে যেব্যক্তি তার মৃত্যুকে ভুলে যাবে, সে দুনিয়ার পেছনে মত্ত হয়ে যাবে। তারপর তার পরকাল অন্ধকার হয়ে যাবে। এজন্য হাদীছ শরীফে বলা হয়েছে–

اُذْكُرُوْا هَاذِمَ اللَّذَّاتِ الْمَوْتَ

'সমস্ত আনন্দ ও সুখ চুরমারকারী মৃত্যুকে স্মরণ করো।'

দুঃখের সাথে বলতে হয়, বর্তমানে এমনও খবর পাওয়া যায় যে, ভূমিকম্প হয়েছে। লাখো মানুষের প্রাণহানি হয়েছে। এদিকে একদল মানুষ হাহাকার করছে, অপরদিকে একদল দুস্কৃতিকারী তাদের মালপত্র লুটপাট করছে। ধ্বংস্তূপে মহিলা আটকা পড়ছে। তারা এদের হাত কেটে তাদের

গহনাপত্র ছিনিয়ে নিচ্ছে। এটা খুবই আক্ষেপের বিষয়। নিজের মৃত্যুকে স্মরণ না করার কারণে তারা এরকম কাজ করার দুঃসাহস দেখাতে পারে। আল্লাহ্ আমাদের বোঝার তাওফীক দান করুন। আমীন।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

আমার এক বন্ধু ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহু আকবার! ঘটনাটি স্মরণ হলে শরীর শিহরে ওঠে। আমার বন্ধু প্রফেসর সাহেব বলেন, একজন বড় অফিসার যাচ্ছেন। হঠাৎ দেখা গেল, তার পার্শ্বে একটি বিষধর সাপ। যেব্যক্তি দেখেছিল, সে দৌড়ে গিয়ে সাপের লেজে ধরে দূরে নিক্ষেপ করে দিল। তখন সাপটা একজন ট্যাক্সিচালকের ওপর পড়ে যায়। এতে সাপটা তাকে দংশন করে। সাথে-সাথে লোকটি মারা গেল। পুলিশ এল। লাশ নিয়ে যাবে। তখন দেখা গেল, তার ট্যাক্সির পেছনে একটি ব্রিফকেস বাঁধা রয়েছে। ব্রিফকেসটি পুলিশ খুলল। কী আশ্চর্য! এর ভেতরে মহিলাদের হাত! উপস্থিত সকলেই অবাক। ব্যাপারটা কী? এগুলো সে কোথা থেকে নিয়ে এল?

পরে সন্ধান করে জানা গেল, ওই এলাকায় গত রাতে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছে। এখনো পর্যন্ত অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি হয়েছে। আরও শত-শত মানুষ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আটকা পড়ে আছে। সুতরাং বোঝা গেল, লোকটি ওই ধ্বংস্তূপে গিয়ে যেসব মহিলার হাতে মূল্যবান চুড়ি ও আংটি রয়েছে, তাদের হাতগুলো কনুই পর্যন্ত কেটে ব্রিফকেসে ভরে নিয়ে যাচ্ছিল।

দেখুন, এটা একমাত্র নিজের মৃত্যুকে ভুলে যাওয়ার কারণে হয়েছে। নাহয় মৃত মানুষের হাত কেটে চুরি করার দুঃসাহস হতো না। সুতরাং যারা নিজের মৃত্যুকে ভুলে যায়, তারাই এমন কাজ করতে পারে।

অতএব বন্ধুগণ! আমি বলছিলাম, দুটি জিনিস সর্বক্ষণ স্মরণ রাখবে। এক. আল্লাহকে সর্বদা স্মরণ রাখা। দুই. নিজের মৃত্যুকে স্মরণ রাখা। এ দুটি বিষয় কখনো ভুলবে না। তা হলে পথহারা হবেন না। পক্ষান্তরে এ দুটি বিষয় ভুলে গেলে দুনিয়ার প্রতি মত্ত হয়ে নিজের চিরসুখের জীবন ভুলে যাবে। বিপদগামী হবে। পরকাল হারাবে। আল্লাহর রোষানলে নিপতিত হবে। দুনিয়া ও আখেরাতে লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার গ্লানি সইতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে আল্লাহর স্মরণ ও আপন মৃত্যুকে স্মরণ রাখার তাওফীক দান করুন। আমাদের অতীতের সকল গুনাহ্ মাফ করুন। সুখের জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সময়ের মূল্য

'ইমাম ইবনে জারীর (রহ.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি জীবনে এ পরিমাণ কিতাব রচনা করেছেন, যার পৃষ্ঠার সংখ্যা ছিল প্রায় তিন লাখ আটান্ন হাজার। আল্লাহু আকবার! তার জীবনকে ভাগ দিলে তার রচনার সংখ্যা দৈনিক পৃষ্ঠা সংখ্যা হয় আঠারো। এর মধ্যে প্রাথমিক অবস্থায় লেখাপড়ার জীবন, শৈশবকাল ১৫/১৬ বছর বাদ দিলে দৈনিক প্রায় ৪০ পৃষ্ঠা হয়। এবার ভেবে দেখুন, আমরা একটি নতুন কিতাবের ৪০ পৃষ্ঠা দৈনিক পাঠও করতে পারি না। আর তিনি দৈনিক ৪০ পৃষ্ঠা রচনা করেছেন। তদুপরি বর্তমান যুগের আমাদের হাতে এমন কলম রয়েছে, যা খাতার ওপর থেকে শুরু করলে নিচ পর্যন্ত লেখা যায়। এর ভিতর কলম উঠানোরও প্রয়োজন হয় না। তারা তো দোয়াত-কলম দিয়ে লিখতেন। প্রত্যেক অক্ষর লিখে কালি নিতে হতো। মাঝে-মাঝে পিন বন্ধ হলে মেরামত করা লাগত। আমরা লেখার জন্য এয়ারকন্ডিশন ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া বর্তমানে আমাদের নিকট আল্লাহর নেয়ামত বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে। তাঁরা কুপি জ্বালিয়ে লিখতে হতো। এর দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, তাঁরা তাদের জীবনের একটি মিনিটও অনর্থক ব্যয় করতেন না। তাদের নিকট সময়ের এত মূল্য ছিল।'

সময়ের মূল্য

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔

وَالْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ اَلصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔

'সময়ের শপথ! সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। তবে তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে এবং পুণ্যের কাজ করেছে এবং সত্যের পথে আহ্বান করে ও ধৈর্যের প্রতি ডাকে।'[৭১]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দুটি নেয়ামত এমন যে, অধিকাংশ মানুষ সেগুলো সম্পর্কে উদাসীন থাকে, সেগুলোর অবমূল্যায়ন করে। তা হলো সুস্থতা ও অবসর।

নেয়ামতের বর্ষণ

মহামহিম সৃষ্টিকর্তার অসংখ্য নেয়ামত আমাদের চতুর্দিক ছেয়ে আছে। আমরা সেগুলো ভোগ করছি। সেগুলোর গণনা করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ নিজেই বলেছেন–

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا

'তোমরা যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা করতে চাও, তাহলে সেগুলো গুনতে তোমরা সক্ষম হবে না।'[৭২]

---

৭১. সূরা আছর : আয়াত ১-৩

৭২. সূরা নাহল : আয়াত ১৮

সুতরাং বোঝা যায়, আল্লাহ আমাদের অগণিত নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন।

সময়ের গুরুত্ব কেন?

আল্লাহ তা'আলা অপরিসীম নেয়ামতের মধ্যে অনন্য নেয়ামত হলো সময়। সময়ের মূল্য অনুধাবন করার জন্য এতটুকই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে সময়ের কসম খেয়েছেন।

আল্লাহ বলেন–

وَالْعَصْرِ

'সময়ের শপথ!'

সময় নিয়ে আল্লাহ তা'আলার শপথ করাটাই 'সময়' মূল্যবান হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ। তদুপরি এক জায়গায় নয়– অনেক জায়গায় আল্লাহ সময়ের শপথ করেছেন। একস্থানে আল্লাহ বলেন–

وَالْفَجْرِ ۝١ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝٢

'ফজরের সময়ের শপথ এবং দশ রাতের শপথ।' (যিলহজ মাসের দশ রাত)।[৭৩]

অন্যত্র বলেছেন,

وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۝١٧ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝١٨

'শপথ রাতের, যখন সে আচ্ছন্ন করে। শপথ দিনের, যখন সে আলোকিত হয়।'[৭৪]

আরেক জায়গায় বলেন,

وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۝١٧ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ۝١٨

'শপথ করি সন্ধ্যাকালীন রক্তিম আভার এবং রাত ও তার মধ্যে যার সমাবেশ ঘটে, তার।'[৭৫]

---

৭৩. সূরা ফাজর : আয়াত ১, ২
৭৪. সূরা তাকবীর : আয়াত ১৭, ১৮
৭৫. সূরা ইনশিকাক : আয়াত ১৬, ১৭

আরেক স্থানে বলেন,

وَالضُّحٰى ۝ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۝

'শপথ পূর্বাহ্নের এবং রাতের, যখন তা গভীর হয়।'[৭৬]

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা স্থানে-স্থানে রাত-দিন ও সময়ের শপথ করেছেন। এতে প্রতিভাত হয়, আল্লাহ তা'আলার নিকট সময়ের অনেক মূল্য রয়েছে।

অদৃশ্য নেয়ামত

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.)সূত্রে বর্ণিত, নবীজি ইরশাদ করেছেন, .

نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ اَلصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

দুটি নেয়ামত এমন রয়েছে যে, অধিকাংশ মানুষ সেগুলোর Miss use অপব্যবহার করে। (সেগুলো কোন নেয়ামত?) সুস্থতা ও অবসর।

অধিকাংশ সময় দেখা যায়, আল্লাহ তা'আলা সুস্থতা দান করলে এক্ষেত্রে মানুষের অন্তর সহনশীল থাকে না। পরিশেষে বার্ধক্যে উপনীত হলে এখন আর সুস্থতা পাওয়া যায় না।

সৌভাগ্যবান মানুষ কে?

সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হচ্ছে, যে সুস্থ অবস্থায় সময়ের মূল্যায়ন করে। আর অবসরের মূল্যায়ন তারাই করে, যাদের আল্লাহ তা'আলা বিশেষ নেয়ামত দান করেছেন।

ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর মূল্যবান উক্তি

ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেন, সূফী-সাধকদের দুটি কথায় আমার অনেক উপকার হয়েছে। তারা বলেন, সময় একটি তলোয়ার। যদি তুমি সেটা কাটতে না পার, তাহলে সে তোমাকে কেটে ফেলবে। ব্যাপারটা হলো, কারও সঙ্গে তুমি কথা বললে সে বলবে, সময় ভালোই কাটছে। সময় ভালোই কাটছে। কিছু দিন পর খবর পাওয়া যায়, সময় কাটছে ঠিকই; তবে সময়ে তাকে কেটে ফেলছে। সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে। তাই সময়

---

৭৬. সূর দোহা : আয়াত ১, ২

থাকতে যদি সময়ের মূল্যায়ন করা না হয়, সেই সময় তোমাকে একদিন কেটে ফেলবে।

সম্মানপূর্ণ জীবনের রহস্য

আমাদের পূর্বপুরুষগণ সময়ের যথার্থ মূল্যায়ন করতেন। এমনকি পৃথিবীতে যারা-ই দীন-দুনিয়ার সম্মানে জীবন গড়েছেন, তাদের জীবনী সন্ধান করে দেখো। তাদের নিকট জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তের গুরুত্ব ছিল। আজকের মাহফিলে আমাদের বুযুর্গদের কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করব। তবেই আমাদের উপলব্ধি হবে যে, তাদের নিকট সময়ের কেমন মূল্যায়ন ছিল। তারা সময়ের কী পরিমাণ গুরুত্ব দিতেন।

ইবনে আবু কায়েছ (রহ.)-এর বিজ্ঞোচিত জবাব

ইবনে আবু কায়েছ নামে একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ছিলেন। তিনি সর্বক্ষণ হাদীছ মুখস্থ করা ও বর্ণনার কাজে ব্যস্ত থাকতেন। একদা কেউ জিজ্ঞাসা করল, হুজুর! মাঝে-মাঝে কিছু কথাও বলুন। তিনি জবাব দিলেন, তুমি সূর্যকে থামতে বলো। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব। কারণ, সূর্য প্রতিনিয়ত অস্তমিত হচ্ছে আর মানুষকে বলছে, হে মানবসম্প্রদায়! আজ আমি তোমার জীবনের একটি দিনের জন্য অস্ত যাচ্ছি। এ দিনের জন্য আর ফিরে আসব না। এই দিনটি তোমার হাত থেকে চলে যাচ্ছে। আগামীকাল তোমার জীবনে নতুন দিন উদয় হবে।

ইবাদাতের উত্থান

হাম্মাদ ইবনে আসলামি (রহ.) প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ ও হাফেযে হাদীছ ছিলেন। অধিকাংশ সময় হাদীছের খেদমতেই কাটাতেন। অবসর পেলেই নফল ইবাদতে মগ্ন হয়ে যেতেন। আল্লাহ তা'আলার কুদরত দেখুন। বলা হয়েছে,

كَمَا تَعِيْشُوْنَ تَمُوْتُوْنَ

'তোমরা যেভাবে জীবন গড়বে, সেভাবে মৃত্যুবরণ করবে।'

একদিন আসরের নামায পড়ছেন। ঠিক নামাযের মধ্যেই তিনি ইহধাম ত্যাগ করে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান।

সুবহানাল্লাহ!

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর ফিকহি জ্ঞান

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) হযরত ইমাম আবুহানীফা (রহ.)-এর প্রিয় ছাত্র ছিলেন। অসুস্থ হয়ে অন্তিম শয্যায় শায়িত। তখন তার কতিপয় শিষ্য তাকে দেখার জন্য গেলেন। এমন সময় তিনি জিজ্ঞাসা করছেন رمی جمار (হজের বিশেষ কাজ) শয়তানকে কঙ্কর মারা পদ্রবজে উত্তম, নাকি আরোহণ করে উত্তম? কেউ বললেন, পায়ে হেঁটে। কেউ বললেন, সওয়ার হয়ে কঙ্কর মারা উত্তম। তিনি বললেন, না তোমাদের উত্তর সঠিক হয়নি। তারা বললেন, হুজুর! আপনি বলে দিন। তিনি বললেন, যে কঙ্কর মারার পরে দু'আ করা সুন্নত। অর্থাৎ– প্রথম দুবার, তা পায়ে হেঁটে নিক্ষেপ করা উত্তম। আর যে-নিক্ষেপের পরে দু'আ সুন্নত নয়। অর্থাৎ– শেষবার, তখন আরোহণ অবস্থায় কঙ্কর মারা উত্তম।

মাসআলা হল হয়ে গেল। নামাযের সময় হয়েছে। তারা উঠে গেলেন। বললেন, হুজুর আমরা নামায পড়ে আসি। তারা এখনো দরজা অতিক্রম করেননি। পেছন থেকে কালেমা পাঠ করার শব্দ শোনা যাচ্ছে। তারা পেছনে তাকালেন। দেখলেন, আল্লাহর বান্দা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। দেখুন, ফিকহি মাসআলা বর্ণনা করা অবস্থায় মৃত্যু! আল্লাহু আকবার!

মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেবের দীনের জন্য আত্মত্যাগ

ওলামায়ে দেওবন্দের উত্তরসূরী আল্লামা হাবীবুর রহমান লুধিয়ানভী (রহ.)-এর মৃত্যুকালে তাঁর বুকের ওপর একটি চিরকুট পাওয়ার যায়। তাতে একটি ফতোয়া লিপিবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ– ফতোয়া লেখা অবস্থায় তাঁর ইন্তেকাল হয়। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ইবাদতে মগ্ন ছিলেন। তাই বোঝা যায়, আমাদের বুযুর্গদের নিকট একটি মিনিটেরও বহু মূল্য ছিল। One mintue accuraly Develop একটি মিনিটও তাদের উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিত। আর আমাদের রুটিন এমন হয়েছে যে, এক মিনিট তো দূরের কথা, একটি ঘণ্টা, একটি দিন, একটি জীবনেরও কোনো পরোয়া করছি না।

আশ্চর্যপূর্ণ ঘটনা

আবু যুরআ নামে একজন বিখ্যাত হাফেযে হাদীছ অতিবাহিত হয়েছেন। তাঁর একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে। এক যুবক নতুন বিয়ে করেছে। ইল্‌ম শিক্ষার জন্য তাঁর নিকট আসা-যাওয়া করত। একদা শিক্ষাদানে বিলম্ব হয়ে

যায়। এদিকে তার স্ত্রী অপেক্ষা করছে। অনাহারে বসে আসে। তিনি আজ এত দিরে করছেন কেন? নির্ধারিত সময়ের অনেকক্ষণ পরে ঘরে পৌঁছলে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল, এত দেরি করলেন কেন? কোথাও গেলে আর পেছনের কোনো খবর থাকে না। এদিকে মানুষ না খেয়ে মরুক ইত্যাদি ইত্যাদি যেমনটা মহিলারা সাধারণত বলে থাকে।

যুবক বলল। আরে! আমি হাদীছ শিক্ষার জন্য গিয়েছিলাম। সেখানেই বিলম্ব হয়েছে। তুমি চুপ থাকো, কোনো কথা বলো না। তখন তার স্ত্রী বলল, কার নিকট হাদীছ শিক্ষা করছ। বলল, অমুকের নিকট। স্ত্রী বলল, বুঝেছি। তোমার ওস্তাদেরইবা কী আছে? আর তুমি কী শিক্ষা করবে? এজন্যই তো পেছনের কোনো খবর থাকে না। স্ত্রী যখন তার ওস্তাদ সম্পর্কে অনুচিৎ মন্তব্য করল, তখন সেও তো তরুণ পুরুষ; গায়ের রক্ত গরম। সে ঝটপট বলে দিল, কী বললে? আমার ওস্তাদের বদনাম! আচ্ছা যাও; যদি আমার ওস্তাদের এক লাখ হাদীছ মুখস্থ না থাকে, তাহলে তুমি তালাক।

রাত পোহাল। ফজর হলো। মুয়ায্যিন আযান দিল। উভয়ে ঘুম থেকে উঠে রাতের বিষয় নিয়ে ভাবছে। স্ত্রী বলছে, আমি এ কী করলাম। আমার স্বামীকে এত উত্তেজিত করা আমার জন্য ঠিক হয়নি। স্বামী ভাবছে, হায়! এমন কড়া কথা কেন বললাম। এবার আমাদের বিয়ের অবস্থা কী হবে। যাহোক উভয়ে প্রত্যেকের ভুলের ওপর অনুতপ্ত। পরিশেষে ওস্তাদের নিকট গেল। হুজুর! ব্যাপারটা এ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে; এখন আমি কী করি। আমাদের বিয়ের অবস্থা কী হবে? দয়া করে সঠিক সমাধান দিয়ে দিন।

আল্লামা আবু যুরআ (রহ.) তাঁর শিষ্যের কথা শুনে বললেন, মিয়া! চিন্তার কোনো কারণ নেই। যাও; উভয়ে গিয়ে স্বামী-স্ত্রীর জীবন কাটাও। এক লাখ হাদীছ তো আমার সেরকম মুখস্থ আছে, যেমন মানুষের সূরা ফাতেহা মুখস্থ থাকে। সুবহানাল্লাহ!

হযরত আবু যুরআ (রহ.)-এর অন্তিমকাল

তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত। জীবনের অন্তিমকাল। ছাত্ররা উপস্থিত হয়েছেন। সকলেই অনুভব করছেন, এখন অন্তিম মুহূর্ত শুরু হয়ে গেছে। পাশে বসে সবাই তালকীন শুরু করলেন। তালকীন বলা হয়, কারও মৃত্যুকালে তার পাশে বসে উচ্চৈঃস্বরে কালেমা পাঠ করা। তার মৃত্যু মুখে পতিত ব্যক্তিকে আদেশ দেওয়া যাবে না। নিজেরা পাঠ করবে। তা শুনে ওই লোকের ভাগ্য থাকলে সে পাঠ করে নেবে।

এবার ছাত্ররা ভাবলেন, আমাদের ওস্তাদের এখন অন্তিমকাল। সুতরাং আমরা সেই হাদীছটি পাঠ করি, হাদীছে হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুসংবাদ দিয়েছেন যে, যার শেষ বাক্য লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতএব, তারা এই হাদীছই পাঠ করতে শুরু করল। তাদের পাঠ শুনে তিনিও পাঠ করতে শুরু করলেন। তারা যখন শুনলেন, তিনি فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ অমুক অমুকের থেকে বর্ণনা করছে... এ বাক্য উচ্চারণ করলেন, তখন তারা বুঝে ফেললেন, তিনি অমুক হাদীছটি পড়তে চেষ্টা করছেন। তখন তারাও উক্ত হাদীছটি পড়া শুরু করে দিলেন। যখন পাঠ করতে-করতে তিনি مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِهٖ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ এস্থানে পৌঁছলেন, সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর প্রাণবায়ু চলে গেল। সুবহানাল্লাহ!

তারপর তিনি বাস্তব জান্নাতে পৌঁছে গেলেন। আপনারা কি কল্পনা করেছেন যে, তিনি জীবনের শেষ মুহূর্তও হাদীছের খেদমত করেছেন!

অধ্যয়নের আশ্চর্য অনুমান

হাফেয যাহাবি (রহ.) বলেন, উবায়েদ ইবনে ইয়ায়ীস নামে একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ছিলেন। হাদীছের কিতাব সর্বক্ষণ সামনে থাকত। সর্বদা পাঠ করতেন। কিতাব পাঠে এমন ব্যস্ত থাকতেন যে, পানাহারেরও সুযোগ পেতেন না। তার বোন বারবার খাবার পাকাতেন। গরম করতেন। কিন্তু তিনি খাওয়ার সুযোগ পেতেন না। ফলে বোন বললেন, ভাইজান! আপনার যেহেতু খাওয়ারও সময় নেই, সুতরাং আমি খাবার প্রস্তুত করে মেখে আপনার মুখে তুলে দেব আর আপনি শুধু চিবিয়ে খাবেন আর বিতাব পাঠ করবেন। ফলে একটানা বিশ বছর পর্যন্ত এই ব্যবস্থাপনা চলল। বোন খাবার মুখে তুলে দিচ্ছেন আর তিনি কিতাব পাঠ করছেন।

ইমাম রাযি (রহ.)-এর অধ্যয়নের আগ্রহ

ইমাম রাযি (রহ.) বলেন, আল্লাহর কসম! ওই সময়টার জন্য আমার খুবই আক্ষেপ হয়, যে সময়টা আমার খাওয়ার কারণে নষ্ট হয়, যখন আমি কিতাব পাঠ করতে পারি না। ভেবে দেখুন, কিতাব পাঠ করার জন্য কেমন আবেগবান ছিলেন। আহারের সময় যে পাঠ করতে পারছেন না, এর জন্য আক্ষেপ করছেন!

পৃথিবী যার ওপর উল্লাস করে

একবুযুর্গ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি শুকনা ছাতু আহার করতেন। কেউ জিজ্ঞাসা করল, হুজুর! শুকনা ছাতু খাচ্ছেন কেন? পানি মেশালে তো ভালো স্বাদ হবে। তিনি জবাব দিলেন, পানি দ্বারা ভেজানো ছাতু পাকিয়ে এবং শুকনা ছাতু পাকিয়ে আমি যাচাই করেছি যে, পানি দ্বারা ভিজিয়ে পাক করলে এতে সময় বেশি লাগে। আর শুকনা ছাতু পাকালে তাতে সময় কম লাগে। শুকনা ছাতু পাকালে যে-সময়টা বাঁচে, এ সময়ে কমপক্ষে ৭০ বার সুবহানাল্লাহ বলা যায়। সুতরাং বিগত বিশ বছর যাবৎ আমি শুকনা ছাতু পাকিয়ে আহার করছি। সুবহানাল্লাহ!

হাদীছে নববীর প্রতি মহব্বতের একটি উপমা

ইয়াহয়াহ ইবনে মুঈন নামে একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ছিলেন। হাদীছের মান নির্ণয়ের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন। একদা জানতে পারলেন, মুহাম্মদ ইবনে আফজাল নামে এক মুহাদ্দিছের নিকট একটি হাদীছ আছে, যা তিনি এর পূর্বে কোনোদিন শোনেননি। সুতরাং এই হাদীছ সংগ্রহের লক্ষ্যে ওই মুহাদ্দিছের নিকট গেলেন। দরজায় কড়া নাড়া দিলেন। মুহাদ্দিছ সাহেব বের হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, জনাব! কী উদ্দেশ্যে এসেছেন? বললেন, হুজুর! আপনার নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণের জন্য এসেছি। বললেন, আচ্ছা! ঠিক আছে। এ হাদীছ আমার মুখস্থও আছে এবং আমার কিতাবেও আমি লিপিবদ্ধ করেছি। সুতরাং আপনি বসুন, আমি কিতাব নিয়ে আসছি। কিতাব থেকেই আপনাকে শোনাব।

একথা বলে তিনি কিতাব নিয়ে আসার জন্য যাচ্ছেন। এমন সময় ইয়াহয়াহ ইবনে মুঈন (রহ.) তাঁর জামা আঁকড়ে ধরলেন। বললেন, হুজুর! আপনি কিতাব আনতে যাবেন। এ সময় আমার অথবা আপনার শেষ মুহূর্তও হতে পারে। ফলে আমার আর হাদীছ শোনা হবে না। সুতরাং আপনি এখন মুখস্থ পাঠ করে শুনিয়ে দিন। পরে কিতাব নিয়ে আসার পর না হয় পুনরায় শুনব। সুবহান্নাহ!

হযরত ইমাম ইবনে সফুন (রহ.)-এর গভীর মনোযোগ

ইবনে সফুন মালেকী মাযহাবের একজন প্রসিদ্ধ ইমাম ছিলেন। সর্বক্ষণ কিতাব পাঠে মশগুল থাকতেন। পানাহারেরও সুযোগ পেতেন না। উম্মে

সালাম নামে তাঁর এক দাসি একদিন বারবার আহারের জন্য ডেকে যাচ্ছে আর তিনি বলছেন, আমি কিতাব পাঠ করছি; একটু ধৈর্য ধরো। পরিশেষে দাসি বলল, হুজুর! আমি আপনার মুখে আহারের লুকমা তুলে দিচ্ছি। আপনি শুধু চিবিয়ে খেয়ে নিন। বললেন, ঠিক আছে; অনেক উত্তম কথা। দাসি আহারের লুকমা তার মুখে তুলে দিচ্ছে আর তিনি চিবিয়ে খাচ্ছেন আর কিতাব পাঠ করছেন। সকালবেলা দাসিকে বললেন, উম্মে সালাম! আমাকে খাবার দাও। দাসি বলল, হুজুর! খাবার আপনি খেয়েছেন। খাবারের লুকমা আমি আপনার মুখে তুলে দিয়েছি আর আপনি খেয়েছেন। তিনি বললেন, কখন? আমার তো মনে নেই!

ইমাম নববী (রহ.)-এর বিরল শর্ত

তিনি নাহু (আরবি ভাষার গ্রামার) শাস্ত্রের একজন বিখ্যাত ইমাম ছিলেন। কেউ তাঁকে নিজের ঘরে আমন্ত্রণ জানালে তিনি প্রথমে একটি শর্ত করে দিতেন, ঠিক আছে আমি আপনার বাড়ি যাব; তবে শর্ত হলো, আমার জন্য আলাদা কামরার ব্যবস্থা করতে হবে। আমি আমার কিতাবদি নিয়ে আপনার বাড়িতে উপস্থিত হব। আপনার খাবার পাকাতে বা সরবরাহ করতে যে সময়টুকু লাগবে, ওই সময় আমি কিতাব পাঠ করব। খাবার শেষে একটু বিশ্রাম নেওয়ার সময়ও আমি কিতাব পাঠ করব। এরপর সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করব।

মূল্যবান নসীহত

বর্তমান যুগে আমাদের সমাজে দাওয়াতের অনুষ্ঠান হলে অহেতুক গল্পগুজবে ঘণ্টার-পর ঘণ্টা-চলে সময় যায়। আর অনেক সময় তো দেখা যায়, টেলিফোনে আলাপ চলছেই। কারণ, আমার নিকট সময়ের গুরুত্বের অনুভূতি নেই। এজন্যই বলা হয়, টেলিফোনে আলোচনা সংক্ষেপ করো। এতে দীন ও দুনিয়ার উভয়ের কল্যাণ রয়েছে।

ছাত্রদের জন্য পথপ্রদর্শক দৃষ্টান্ত

ইমাম সা'লাব (রহ.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি রাস্তায় চলার সময়ও অধ্যয়ন করতেন। রাস্তায় কিনারা দিয়ে চলতেন। ট্রাফিক ও জনগণের কোনো খবর ছিল না। তাঁর মৃত্যুও এ অবস্থায়ই হয়েছে। কিতাব পড়তে-পড়তে রাস্তায় যাচ্ছেন। সামনে একটি গর্ত ছিল। তিনি আগে থেকে সেটা

সম্পর্কে জানতেন না। ফলে ওই গর্তে পড়ে যান। এটাই তার মৃত্যুর কারণ হয়।

ইমাম ইবনে জারীর তাবারি (রহ.)-এর প্রচারমূলক কাজ ও আমাদের করুণ অবস্থা

ইমাম ইবনে জারীর (রহ.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি জীবনে এ পরিমাণ কিতাব রচনা করেছেন, যার পৃষ্ঠার সংখ্যা ছিল প্রায় তিন লাখ আটান্ন হাজার। আল্লাহু আকবার! তার জীবনকে ভাগ দিলে তার রচনার সংখ্যা দৈনিক পৃষ্ঠা সংখ্যা হয় আঠারো। এর মধ্যে প্রাথমিক অবস্থায় লেখাপড়ার জীবন, শৈশবকাল ১৫/১৬ বছর বাদ দিলে দৈনিক প্রায় ৪০ পৃষ্ঠা হয়। এবার ভেবে দেখুন, আমরা একটি নতুন কিতাবের ৪০ পৃষ্ঠা দৈনিক পাঠও করতে পারি না। আর তিনি দৈনিক ৪০ পৃষ্ঠা রচনা করেছেন। তদুপরি বর্তমান যুগের আমাদের হাতে এমন কলম রয়েছে, যা খাতার ওপর থেকে শুরু করলে নিচ পর্যন্ত লেখা যায়। এর ভিতর কলম উঠানোরও প্রয়োজন হয় না। তারা তো দোয়াত-কলম দিয়ে লিখতেন। প্রত্যেক অক্ষর লিখে কালি নিতে হতো। মাঝে-মাঝে পিন বন্ধ হলে মেরামত করা লাগত। আমরা লেখার জন্য এয়ারকন্ডিশন ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া বর্তমানে আমাদের নিকট আল্লাহর নেয়ামত বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে। তাঁরা কুপি জ্বালিয়ে লিখতে হতো। এর দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, তাঁরা তাদের জীবনের একটি মিনিটও অনর্থক ব্যয় করতেন না। তাদের নিকট সময়ের এত মূল্য ছিল।

কুরআন বোঝার আশ্চর্য দৃষ্টান্ত

ছাত্ররা তাকে পরামর্শ দিল, হুজুর! পবিত্র কুরআনের একটি তাফসীর রচনা করুন। তিনি বললেন, ঠিক আছে; তোমরা লেখো; আমি বলছি। তিনি তাফসীর পেশ করতে লাগলেন। ছাত্ররা লিখছে। ছাত্ররা উপলব্ধি করল, প্রত্যেকটি শব্দের মাধ্যমে তাঁর ইল্‌মের কোষাগার উন্মুক্ত হচ্ছে। তারা লিখতে-লিখতে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে। একদা কোনো এক ছাত্র জিজ্ঞাসা করল, হুজুর! এভাবে লিখলে তাফসীর মোট কত পৃষ্ঠা হবে? তিনি বললেন, প্রায় ত্রিশ হাজার পৃষ্ঠা হবে। ছাত্ররা হতভম্ব হয়ে গেল। বলল, হুজুর! মাফ করবেন। এত লেখা যাবে না। কিছু সংক্ষেপ করুন। তিনি বললেন, ঠিক আছে; আমি কিছু সংক্ষেপ করে বলছি। এরপর ছাত্ররা লিখতে থাকল। পরিশেষে সাত বছরে সাত হাজার পৃষ্ঠার তাফসীর লেখা হলো। সুবহানাল্লাহ!

ইবনে জাওযির অবস্থা

ইবনে জাওযি (রহ.) বলেন, আমার জীবনে আমি বিশ হাজার কিতাব পাঠ করেছি এবং নিজের আঙুল দেখিয়ে বলতেন, এগুলো দিয়ে আমি দীনের ওপর দু-হাজার কিতাব রচনা করেছি। তার দুটি কথা খুবই আশ্চর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, আমি সর্বক্ষণ লিখতে থাকতাম। কলম নষ্ট হলে আরেকটি কলম বানাতাম। কলম বানানোর সময় আমি আল্লাহ তা'আলার যিকিরে মশগুল হয়ে যেতাম, যাতে কলম বানানোর সময়টাও আমার বেকার না যায়। এ সময়টাও যেন আমার আমল নামায় নেকি লেখা হয়। যে কলমটি অকেজো হয়ে যেত, সেটা জমা করে রাখতেন। শেষে দেখা গেল, তার অকেজো কলমের পরিমাণ প্রায় কয়েক মন হয়ে গেছে। তিনি অসিয়ত করে গেলেন, আমার মৃত্যুর পর যেন এই কলমগুলো দিয়ে লাশের গোসলের পানি গরম করা হয়। সুবহানাল্লাহ!

এক সময় দুটি কাজ

হাকীম শহীদ মুস্তাদরাক (রহ.) সর্বদা লেখার কাজে ব্যস্ত থাকতেন। কেউ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে বলতেন, ভাই! আপনি বলুন, আমি শুনছি। ফলে একদিকে লিখতেন, অপরদিকে আগন্তুকের কথা শুনতেন। এক সাথে দুটি কাজ চালিয়ে যেতেন।

আল্লামা ইবনে আকীল (রহ.)-এর ইলমি উদ্যম

আল্লামা ইবনে আকীল (রহ.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, ৮০ বছর বয়সে তাঁর ইল্‌ম শিক্ষার জন্য যে-আগ্রহ ছিল, ২০ বছরের যুবক তাঁর নিকট বসে লজ্জায় মাথা নত করতে হতো। তিনি কিতাব পাঠ করছেন। রুটি আসছে। রুটি পানিতে ভিজিয়ে রাখছেন। কেউ জিজ্ঞাসা করল, হুজুর রুটি পানিতে ভিজিয়ে রাখছেন কেন? বললেন, নরম হওয়ার জন্য। রুটি নরম হলে খেতে সময় লাগবে কম। এ সময়টা আমি কিতাব পাঠ করতে পারব।

اَلْفُنُوْنُ নামে তিনি একটি কিতাব রচনা করেছেন, যা মোট ৮০০ খণ্ড ছিল। তাঁর অন্তিম সময়ে উপস্থিত ছাত্রদের বললেন, সারা জীবন আমি ওয়াজ-নসিহত করেছি। সব সময় আমার নিকট মানুষ ছিল। এখন আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। আমাকে নির্জনে থাকতে দাও। সবাই চলে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি কালেমা পাঠ করে পরপারে পাড়ি জমালেন।

ফুযায়েল ইবনে ইয়ায (রহ.)-এর হিসাব

ফুযায়েল ইবনে ইয়ায (রহ.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি সর্বদা কিতাব পাঠে ব্যস্ত থাকতেন। তদুপরি যত কথা বলতেন, সব লিখে রাখতেন। এক সপ্তাহ পর শুক্রবারে সবগুলো হিসাব করতেন। বিগত সপ্তাহে আমি কী আমল করেছি। আমার কী পরিমাণ আমল আল্লাহর দরবারে পৌঁছবে। আমরা তো এক দিনের কথাবার্তাও লিখতে অক্ষম। তিনি কেমন কথা বলতেন, এক সপ্তাহের সমস্ত কথাবার্তা লিখে রাখতেন।

আল্লামা জিয়া আল মাকদিসী (রহ.)-এর রাতযাপন

আল্লামা জিয়া আল মাকদিসী (রহ.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি হাদীছের দরস দিতেন আর রাত হলে তিনশত রাকাত তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। আল্লাহু আকবার! আজ আমরা চার রাকাত পড়াই দুষ্কর হয়ে যায়। রমজান মাসে দশ/বিশ রাকাত পড়লে ঘণ্টার হিসাব করতে থাকে। আমি আমার বন্ধুদের বলি, বিশ রাকাত নফল নামায পড়লে শেষ রাকাতে মুখ দিয়ে سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ-এর স্থলে اَوِىَ اللهُ বের হতে থাকবে। আর তারা এ পরিমাণ অধ্যয়নের সাথে-সাথে তিনশত রাকাত নফল নামায পড়তেন।

শিক্ষার সম্মান

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর ছোট ছেলে হযরত ইমাম আবুহানীফা (রহ.)-এর শিক্ষাদানের মজলিসে তার ইন্তেকাল হয়। ওস্তাদের কথা শুনছেন, লিখছেন। এমতাবস্থায় মৃত্যুর সম্মখীন হন। বড় ভাইকে বলছেন, ভাইজান আমি হয়তো এখন চলে যাব। আমার মৃত্যুর পর আপনারা এখানেই আমার জানাযা পড়বেন, যাতে মৃত্যুর পরও আমি আমার ওস্তাদের দরস থেকে বঞ্চিত না হই।

নবীজির হাদীছের প্রতি আল্লামা মুনযিরি (রহ.)-এর মহব্বত

আল্লামা ইবনে শাহীন মুনযিরি (রহ.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে। তিনি হাদীছের দরস দিচ্ছেন। তখন তাঁর ছেলে মারা যায়। উপস্থিত লোকদের বললেন, ভাই! এখানে জানাযা পড়ার ব্যবস্থা করো। ক্লাসরুমের নিকট জানাযার আয়োজন করা হলো। জানাযা পড়ে লাশের সঙ্গে যাওয়া সুন্নত। সেই নিয়তে মাদরাসার গেট পর্যন্ত ছেলের জানাযার সঙ্গে গেলেন। গেট

থেকে ফিরে আসছেন আর কাঁদছেন, এমন যেন না হয় যে, এর দ্বারা আমার হাদীছের দরসে বিঘ্ন ঘটে।

বর্তমানে তো আমরা এক-দুটি দরস দেওয়ার পরই নিজেকে অনেক কিছু মনে করি। ভাবি, আমি তো একজন হয়ে গেছি।

ইমাম আলুসি (রহ.) একজন আদর্শ শিক্ষক

ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর ছাত্রযমানার একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয় যে, তিনি সহপাঠীদের সঙ্গে তাকরার করতে বসতেন। এসময় যদি তার প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন হতো, তখন তার সাথিদের অনুরোধ করতেন, বন্দুগণ! আপনারা একটু উচ্চৈঃস্বরে তাকরার করবেন। কেননা, বাথরুমে থেকে আমি যদিও কিছু বলতে না পারি, তবে আপনাদের তাকরার শুনতে পাব। এতে আমার তাকরারে শরীক থাকা হবে।

তিনি যাঁর সত্যিকারের আশেক

ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কে বর্ণিত আছে, সেকালের বাদশাহ কোনো বিষয়ে তাঁকে কারাগারে বন্দি করে রাখে। সেখানে তিনি কাগজ-কলম চাইলেন। কাগজ-কলম দেওয়া হলো। কূপের মধ্যে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। কূপে বসে-বসেই তিনি একটি নতুন কিতাব রচনা করেন। দুশমনরা সেটা সহ্য করতে পারেনি। ফলে কাগজ-কলম সরবরাহের ব্যবস্থাপনা বন্ধ করে দেয়া হলো। তারপর তিনি কোনো পুলিশকে অনুরোধ করে কিছু কয়লা সংগ্রহ করলেন। সেই কয়লা দিয়ে তিনি কূপের দেওয়ালে লিখতে শুরু করলেন। ফলে কূপের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর কূপের দেওয়ালে লিখিত বাণীগুলো কুড়িয়ে একটি বই রচনা করা হয়। এটি তার জীবনের শেষ কিতাব।

ইমাম নববী (রহ.)-এর কথা

ইমাম নববী (রহ.) দৈনিক মাত্র একবার আহার করতেন। তিনি বলতেন, একবার ছাড়া অন্যান্য খাবারের সময়টাকে আমি অধ্যয়নের কাজে ব্যয় করা বেশি পছন্দ করতাম।

অল্প আহারের উপকার

ইমাম বোখারি (রহ.)কে কোনো ডাক্তার চেক করে বললেন, মনে হচ্ছে, তিনি কোনোদিন মরিচ খাননি। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হযরত! ডাক্তার

সাহেব বলছেন, আপনি মনে হয় কোনোদিন মরিচ খাননি। তিনি বললেন, ঠিকই আছে। আমি বিগত ষোলো বছর যাবৎ মরিচ খাইনি। জিজ্ঞাসা করা হলো, হুজুর! তাহলে কী খেয়েছেন। বললেন, দৈনিক তিনটি অথবা সাতটি বাদাম খেয়েই আমার দিন কাটছে। আমার চব্বিশ ঘণ্টার খাবার এটাই ছিল।

দেখুন, মাত্র সাতটি বাদাম খেয়ে দিন কাটালেন আর আল্লাহর দরবারে কেমন গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছেন। আজ সেই বোখারি শরীফ পাঠ না করে কেউ আলেম হতে পারে না। কেমন অমর কীর্তি তাঁরা রেখে গেছেন।

আল্লামা বাখিল্লানি (রহ.)-এর বরকতময় অভ্যাস

আল্লামা বাখিল্লানি (রহ.)-এর অভ্যাস ছিল, ঘুমানোর পূর্বে তিনি কমপক্ষে ৩৫ পৃষ্ঠা নতুন রচনা না করে ঘুমাতেন না।

সময় বরফের মতো

সম্মানিত শ্রোতৃমণ্ডলি! সময় খুবই মূল্যবান বস্তু। কিন্তু একে বিনষ্ট করতে কোনো প্রকার মূল্য দিতে হয় না। সময় তো তার গতিতেই চলছে। তাই কোনো কবি বলেন,

ہو رہی ہے عمر مثل برف کم * رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بہ دم

'জীবন আস্তে-আস্তে, চুপে চুপে, শ্বাসে-নিঃশ্বাসে বরফের মতো কমে যাচ্ছে,শেষ হয়ে।'

সময়ের দৃষ্টান্ত শিলার ন্যায়। মানুষের কাছে শিলা থাকলে সে ইচ্ছা করলে সেটা দিয়ে শরবত ঠান্ডা করে খেতে পারে। আর যদি কোনো কাজে না লাগায়, তাহলে তার গতিতে সে গলে যাবে। এক সময় তার অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাবে।

হেদায়াতের কারণ

এক বুযুর্গ বলেন, আমার হেদায়াতের কারণ হচ্ছে, এক বরফ বিক্রেতা। এটা কীভাবে? তিনি বললেন, একদা আমি বাজারে গিয়ে দেখলাম, এক লোক বরফ বিক্রি করছে। দিনের আবহাওয়া কিছু শীতল ছিল বিধায় কেউ তার বরফ কিনছে না। সে রাস্তার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছে। যাতায়াতরত সকলের মুখের দিকে তাকাচ্ছে, তার বরফের কোনো গ্রাহক পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু কেউ সেদিকে তাকাচ্ছেও না। আস্তে-আস্তে তার বরফ শেষ

হতে যাচ্ছে। তখন লোকটি চিৎকার করে বলছে, হে লোকসকল ওই ব্যক্তির প্রতি দয়া করো, যার আপাদমস্তক শেষ হতে যাচ্ছে। তার মাথা গলে মাটিতে মিশে যাচ্ছে। তার বাক্য শুনে আমার অনুভূতি হলো, আমাদের জীবনটাও তো এরকম। একদিন শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং সময় থাকতে পাড়ি জমানো দরকার।

The golden words (সোনালি অক্ষরমালা)

এক লেখক তার পুস্তকে লিখেছে,

Suddenly reedize that the days cominy and going aremy life

'হঠাৎ আমার অনুভূতি হলো, যেই দিনটি আসছে আর যাচ্ছে এটিই আমার জীবন।'

একটু মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন। যদি কোনো ওলী আমাদের বলে দেন, তোমার জীবনের পঁচিশটি বছর কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাহলে সেটা কেমন আক্ষেপের বিষয় হবে? খাওয়াদাওয়া সবকিছু ছেড়ে দেবে। সবসময় শুধুই এই ভাবনায় থাকবে। কী হয়েছে জীবনের পঁচিশ বছর কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি আমরা জীবনের ওই সময়গুলোর হিসাব করি, যেগুলো আমরা অলসতায় কাটিয়ে দিচ্ছি, খাওয়াদাওয়া, ঘুম-বিশ্রাম, খেলাধুলা, অহেতুক ক্রীড়া-কৌতুকে কাটিয়েছি, যখন একটি নেক আমলও করিনি, তাহলে মনে হয়, কারও জীবনেই পঁচিশ বছরের কম হবে না। সুতরাং ঐ সময়টার জন্য কি আমরা কোনোদিন চিন্তা করেছি? আমরা টেলিফোনে বাজে আলাপে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা ব্যয় করছি। এগুলো আমাদের চিন্তায় আসে না। আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক অনুভূতি দান করুন। আমীন।

সেল ফোন, নাকি হিলফোন (জাহান্নামের ফোন)

বর্তমানে মোবাইল ফোন আরেকটা মহামারির রূপ ধারণ করেছে। আল্লাহ আমাদেরকে এর মসিবত থেকে রক্ষা করুন। এর প্রতি আমার আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতা রয়েছে। আর এ ব্যাপারে যুবকদের অবস্থা কেমন? কথা চলুক সারা রাত। এভাবেই আমরা আমাদের জীবনের মূল্যাবান সময় নষ্ট করে যাচ্ছি।

আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ কীভাবে সময় ব্যয় করতেন

আমাদের বুযুর্গগণ সময়কে এমন গনিমত মনে করতেন যে, তাঁরা এক সাথে দুটি কাজ চালিয়ে যেতেন। তাঁরা হাতে কোনো কাজ করার সময় অন্তরে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। সুতরাং এক সঙ্গে দুটি কাজ চালিয়ে যেতেন।

হযরত ফযল আলী কোরাইশি (রহ.)-এর যিকিরের ধরন

হযরত ফযল আলী কোরাইশি (রহ.) চাষাবাদের কাজ করতেন। তিনি বলেন, চাষাবাদ করা অবস্থায়ও আমি দৈনিক ৮০ হাজারবার আল্লাহ্ তা'আলার ইসমে যাতের যিকির করতাম। অন্তরে এর চোট লাগাতাম।

হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া (রহ.)-এর আগ্রহ

হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া (রহ.) হযরত শায়খুল হাদীছ (রহ.)-এর সম্মানিত পিতা ছিলেন। তিনি পড়া ও পড়ানোর মধ্যে সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকতেন। একবার তাঁর আখ খাওয়ার আগ্রহ হলো। তখনকার সময় শীতের মৌসুমে সকালে রোদের তাপ গ্রহণ করা হতো। ওই সময় আখ খাওয়ার ধুম পড়ে যেত। তিনি বলেন, বিগত বিশ বছর যাবৎ আমার আখ খাওয়ার সুযোগ হয়নি।

হযরত মুরশিদে আলম (রহ.)-এর আলিশান বাণী

আমাদের পীর সাহেব (রহ.) জীবনের শেষলগ্নে সর্বক্ষণ আল্লাহর যিকিরে ব্যস্ত থাকতেন। তিনি বলেন, আমার অবসর আমার গনীমত। তিনি বলেন, ভাই! তোমার নিকট রাত ও দিনের তফাৎ রয়েছে। কিন্তু আমার রাত ও দিনে কোনো পার্থক্য নেই। দিনের বেলা ইবাদতে কাটাই আর রাতেও যখন ইবাদতে মশগুল হই, তখন রাত ও দিনের কোনো পার্থক্য থাকে না।

হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর রমজানের আমল

হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, পবিত্র রমজান মাস এলে মানুষের আমলে পরিবর্তন দেখা যায়। সারা বছর যেভাবে আমল করে রমজান মাসে এর চেয়ে বহুগুণ বেড়ে যায়। কিন্তু আমার রমজান ও অরমজানের আমলে কোনো প্রকার পার্থক্য নেই। রমজান মাসে যেমন আমল করি, সারা বছরও এভাবে আমল করি।

হযরত মুফতী শফী সাহেব (রহ.)-এর বরকতময় অভ্যাস

মুফতী আজম আল্লামা শফী সাহেব (রহ.) বলেন, আমাদের বুযুর্গদের দেখেছি, তাঁরা একসঙ্গে দুটি কাজ চালিয়ে যেতেন। হাতে কাজ আর মুখে আল্লাহর যিকির। তারা সময়কে কেমন মূল্যায়ন করতেন! তাদের আমল দেখে আমি অভ্যাস বানিয়ে নিয়েছি যে, দুটি কাজের মধ্যে আরেকটি ঢুকিয়ে দেই আর আল্লাহ আমার তৃতীয় কাজটিও সমাধা করে দেন।

কাজের দায়িত্ব কার ওপর অর্পণ করবেন

বুযুর্গগণ বলেছেন, যদি তুমি কোনো কাজ করতে চাও, তাহলে অবসর ব্যক্তিকে তোমার কাজের দায়িত্ব দেবে না। কারণ, অবসরের ব্যস্ততায় সে তোমার কাজ করার সময় পাবে না। আর যেব্যক্তি বর্তমানেও কাজে লিপ্ত আছে, তার হাতে তোমার কাজের দায়িত্ব দিলে সে নিজের কাজের সাথে-সাথে তোমার কাজেরও সময় বের করবে। ফলে তোমার কাজ সঠিক সময়ে আদায় হবে।

পরকালের চিন্তা

আমাদের নকশবন্দি তরিকার উচ্চপদস্থ এক বুযুর্গ ছিলেন হযরত মাওলানা হুসাইন (রাযি.)। তার কাছে কেউ সাক্ষাৎ করতে গেলে সালাম-কালাম করার পর তিনি বলতেন, ভাই! আপনিও পরকালের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, আমিও পরকালের প্রস্তুতি নিচ্ছি। সুতরাং এখন যাওয়া যাক; পরকালে আবার সাক্ষাৎ হবে।

হযরত খাজা মাসুম (রহ.)-এর নসীহত ও তার বিশ্লেষণ

হযরত খাজা মাসুম (রহ.) তাঁর রচিত গ্রন্থ 'মাকতুবাতে' লিখেছেন, ভাই! বর্তমান সময় হচ্ছে কাজের সময়। এর দৃষ্টান্ত আপনারা এরকম মনে করুন যে, পরীক্ষার হলে কোনো ছাত্র পরীক্ষা দিচ্ছে। তার Paper জামা দেওয়ার নির্দিষ্ট সময় আছে। সুতরাং পরীক্ষা চলাকালীন সে তার সমস্ত প্রয়োজনকে চেপে রাখে। খাওয়াদাওয়া, পেশাব-পায়খানা এমনকি wash room এ যাওয়ার প্রয়োজনকে সে চেপে ধরে বসে থাকে। কারণ, সে জানে, তিন ঘণ্টা পর আমার পেপার জমা দিতে হবে। আগে ঠিকমতো লিখে নিই। তারপর সমস্ত প্রয়োজন সেরে নেব। এমনকি ওই সময় যদি পরীক্ষক তার নিকটে এসে কোনো ঘোষণাও দেন, তবু সে ভাবে, তিনি তাড়াতাড়ি শেষ করে

এখান থেকে চলে যাচ্ছে না কেন? তিনি যদি চলে যেতেন, তাহলে আমার জান মুক্তি পেত। আমি লিখতাম, পেপার পুরা করতাম এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দিতাম।

পৃথিবীটা পরীক্ষার হল

সুতরাং ছাত্রদের জন্য পরীক্ষার হল যেমন গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের মুমিনের অন্তরের জন্য পৃথিবীটা তেমন মূল্যবান। পৃথিবীটা আমাদের জন্য পরীক্ষার হল। আমরা পরীক্ষার হলে আছি। স্মরণ রাখবেন, মৃত্যুর পর মানুষ একবার সুবহানাল্লাহ বলার সওয়াবের জন্য অস্থির থাকবে। হায়! যদি আমি আরেকবার সুবহানাল্লাহ বলতে পারতাম, তাহলে আমার জীবন ধন্য হয়ে যেত। অথচ আজ আমার যতবার ইচ্ছা আল্লাহর যিকির করার সুযোগ পাচ্ছি।

বর্তমান সময়টা বিজ্ঞানের যুগ। সময়ের মূল্যকে মানুষ পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে দেখছে। সেভাবেই তার মূল্যায়ন করছে। সুতরাং যত বড়-বড় ইন্ডাষ্ট্রিজ রয়েছে, সেগুলোতে সময় বাঁচানো হয়। সেখানে যে Auto nation করা হয়, এটা হচ্ছে অটো মেশিনের পেছনে একটি Unden line দেওয়া হয়। অর্থাৎ– অল্প সময়ে অধিক ডেলিভারি দেওয়া। সুতরাং পৃথিবী বুঝতে পেরেছে, অল্প সময়ে অধিক প্রোডাকশন দেওয়া যায়। অতএব, মুমিনেরও নিজের সময়ের ব্যাপারে এমন চিন্তা থাকা প্রয়োজন।

আমি অধম একবার টয়োটা কোম্পানির Annuail বার্ষিক রিপোর্ট পড়েছিলাম। সেখানে তারা লিখেছে, আমাদের গাড়ির এ্যাসম্বলি ইউনিট আছে। সেখানে গাড়ির ফ্রেইম প্রথমে রাখা হয়। তারপর কেউ তাতে দরজা ফিট করে। কেউ লাইট ফিট করে। কেউ এটা, কেউ সেটা। মোটকথা, একেকজন একেকটা বস্তু ফিট করে। পরিশেষে সেটি একটি পূর্ণ গাড়ি হয়ে বের হয়। তখন তারা ভাবল, যদি কোনো একজন ব্যক্তি এ-সকল কাজ একা করতে পারে, তাহলে তো আমাদের এতগুলো লোক নিয়োগ দেওয়ার প্রয়োজন হতো না এবং এত টাকা বেতন দিতে হতো না। সুতরাং তারা ঘোষণা দিল, যদি কোনো ব্যক্তি একসঙ্গে দুটা কাজ করতে পারে, তাহলে আমরা তার বেতন ৫০% বৃদ্ধি করে দেব। আরেকজন লোকের বেতনের ৫০% কোম্পানি পাবে আর বাকি ৫০% তাকে দেওয়া হবে। সুতরাং এ ঘোষণা দেওয়ার পর এক লোক এমন ট্রেনিং নিল যে, সে একসঙ্গে দুহাতে কাজ করে। এক হাতে কোনো নাট খুলছে, তো আরেক হাতে অন্য নাট

লাগাচ্ছে। এক হাতে এটা করছে, আরেক হাতে আরেকটা করছে। দেখুন, মানুষ দুনিয়ার অর্থ উপার্জনের জন্য কেমন চিন্তা করছে, কেমন ট্রেনিং দিচ্ছে।

দেখুন, আগের যামানায় মানুষ মেশিনের বিভিন্ন পার্স ক্রয় করত। এর জন্য স্থানে-স্থানে ষ্টোর তৈরি করা হতো। তারপর কোম্পানি ভাবল, আমরা যদি নিজস্ব ষ্টোর নির্মাণ করি, তাহলে জিনিসটি আমাদেরই বিক্রয় হবে। তাই কোম্পানির পক্ষ থেকেই এখন স্থানে-স্থানে ষ্টোরের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অল্প সময়ে তাদের অনেক রফতানি হচ্ছে। মিলিয়ন-বিলিয়ন ডলার ইনকাম করছে। তাই আমরাও অল্প সময়ে আখেরাতের পণ্যের অধিক ব্যবস্থা করা দরকার।

চাষাবাদে উন্নতির রহস্য

এই সময় কত মূল্যবান! কৃষি কাজের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রয়েছে। বর্তমান কৃষি কাজের একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। তাকে Oxygen vegitable (অম্লজ সবজি) বলে। শীতকাল এলে অধিকাংশ কৃষক চাষ করতে পারে না। কারণ, অধিক ঠান্ডায় চারাগাছ মারা যায়। তখন মানুষ কী করে? পলিথিনের মাধ্যমে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে সবজি উৎপাদন করে। মৌসুমের আরও দুমাস পূর্বেই তারা সেটা বাজারজাত করে। ফলে যে-টমেটো মৌসুমে ১০ টাক কেজি বিক্রি হয়, সেই টেমেটো মৌসুমের পূর্বে ১০০ টাকা কেজি বিক্রি করে। দেখুন, দুনিয়া অর্জনের জন্য মানুষ সময়ের কেমন মূল্যায়ন করে। সময়কে গুরুত্ব দেওয়ার কারণে ১০ টাকার টমেটো ১০০ টাকা বিক্রি হচ্ছে। আমাদের বুযুর্গদের সময়ের মূল্যায়ন সম্পর্কে অবগত হোন। দেখুন, তারা সময়ের গুরুত্ব দিয়ে দুনিয়া ও আখেরাতের কেমন কল্যাণ ভোগ করছেন।

যুবসম্প্রদায়ের অজানা অবস্থা

বর্তমানে আমাদের মধ্যে একটি ব্যাধি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। তা হলো, আমরা সময়ের মূল্য দিচ্ছি না। সময়ের মূল্যের অনুভূতিই আমাদের মধ্যে নেই। সুতরাং আমরা কোনো কাজ করতে চাইলে দুই ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা অকারণে চলে যায়। সে সম্পর্কে আমাদের খবরই নেই। ভাই! সময়ের মূল্য দেওয়া একান্ত জরুরি। নাহয় আমাদের জীবনই বেকার অতিবাহিত হবে। আমরা দেখছি, কোনো-কোনো মানুষ পরস্পরে কথা বলে যে, বন্ধু! আমি খুব ভালো একটি চাকরি পেয়েছি। কী চাকরি? আরে অমুক কোম্পানিতে চাকরি

হয়েছে। মূল বেতন এত এবং বাসা ভাড়া এত। চিকিৎসা ভাতা এত। উন্নয়ন ফান্ডে এত জমা হয়। বোনাসে এত টাকা, চিকিৎসা বাবদ ছুটি এত দিন। বার্ষিক এত দিন। এক কথায় সব দিকে সুবিধা রয়েছে। আরও মজার ব্যাপার কী জানিস? কাজ কিছুই নেই। সারাদিন বসে-বসে এটা-ওটা দেখাশোনা করব।

এবার ভেবে দেখুন, যে-সমাজের যুবসম্প্রদায় বলছে, খুব ভালো একটি চাকরি পেয়েছি। লাভ ও সুযোগ-সুবিধা এত। অববেশে বলে, কোনো কাজ নেই, সেই মজার দুনিয়ার প্রতি তার কেমন অগ্রগতি হয়েছে? কিন্তু দীনের ব্যাপারে কী উন্নয়ন হচ্ছে? আমার আক্ষেপ হয়! ওই যুবসম্প্রদায় যদি বলত, ভাই! কাজের ব্যস্ততা এ পরিমাণ যে, বিশ্রাম নেওয়ার সময় নেই। কেননা, তার তো সব সময় দীনের কাজে ব্যস্ত থাকার কথা ছিল। তাহলে অবসর কোথায়? আমাদের আকাবিরগণ নিজের সময়কে অকারণে ব্যয় করতেন না। এজন্যই তারা পৃথিবীতেও রাজত্ব করেছেন, পরকালেও সুখী হয়েছেন। আর আজ আমরা নিজের সময়কে অযথা ব্যয় করার কারণে পৃথিবীতেও মানসিক গোলাম হয়ে জীবন যাপন করছি।

ধারকৃত বস্তু

একটি কথা স্মরণ রাখবেন, আমাদের সমাজে একটি সাধারণ নিয়ম আছে যে, ধারকৃত বস্তু দিয়ে অধিক কাজ করা হয়। যেমন– মনে করুন, আপনার ঘরের ইস্ত্রিটা নষ্ট হয়ে গেছে। আপনার স্ত্রী পাশের ঘর থেকে একটা ইস্ত্রি চেয়ে এনে দিল। এবার আপনি এই ইস্ত্রি দিয়ে নিজের জামা ইস্ত্রি দেবেন। ছেলে-সন্তান, স্ত্রী, মাতাপিতা সবার কাপড় ইস্ত্রি দেবেন। কারণ, এটা ধার করে সংগ্রহ করা হয়েছে। বেশিক্ষণ রাখা যাবে না। কাজেই অল্প সময়ে অধিক কাজ সেরে নিতে হবে। ঠিক তেমনি মনে করুন, আমাদের জীবনটা হচ্ছে ধারকৃত বস্তু। অল্প সময়ে অধিক কাজ সেরে নিতে হবে। সুতরাং সৌভাগ্যবান ওই ব্যক্তি, যে ধারকৃত জীবন দিয়ে স্বল্প সময়ে অধিক আমল করতে পারে।

একটি বিরল উদাহরণ

যেমন– কাউকে গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে বসিয়ে দেওয়ার পর থেকেই হিসাবকারী তার হিসাব করতে থাকে। এখন আপনি গাড়ি চালান আর না চালান, দিন অতিবাহিত হচ্ছেই। একদিন হিসাব করে তার সকল প্রাপ্য

পরিশোধ করতে হবে। ঠিক তেমনিভাবে আপনার-আমার জীবনটাও আমাদের দান করে সেই গাড়িতে আমাদেরকে চালক নিযুক্ত করা হয়েছে। এবার ইচ্ছামতো চালাতে পারবে। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে, আমি এই গাড়ি দ্বারা কী পরিমাণ ইনকাম করেছি। সময় হলে তা আমার হিসাব দিতে হবে।

চিন্তার বিষয়

মহামহিম সৃষ্টিকর্তা আমাদের জীবন দান করেছেন। সেই জীবন যাপন করার আমাদের অবকাশ দিয়েছেন। কিছু কর আর না কর সময় কিন্তু তার গতিতেই চলছে। দিন যাচ্ছে রাত কাটছে। কিন্তু আমাদের চিন্তা করতে হবে, এই সুযোগে আমি কী অর্জন করতে পেরেছি।

যুবসমাজ দৈনিক ৮/৯ ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়েও বলে, ঠিকমতো ঘুম হয়নি। ভাই! ঘুমালে তো সব হারালেন। ইংরেজিতে একে বলে Loose সবকিছু খুয়ে গেল। পাঞ্জাবি ভাষায় বলে, জীবন ঘুমিয়ে ব্যয় করার জন্য নয়। বরং জীবন হচ্ছে কাজ করার জন্য।

সময় সোনা-রুপার টুকরা

সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত সোনা-রুপার টুকরার মতো। আমাদের বুযুর্গগণ বলেছেন,

اَلْوَقْتُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

'সময় সোনা-রুপার টুকরা।'

তোমরা তাকে সোনা-রুপার মতো মূল্যবান জান।

এজন্য মৃত্যুর সময় মানুষ বলে, হায়! যদি আরেকটু সময় অবকাশ দেওয়া হতো! কিন্তু না; কোনো সময় দেওয়া হবে না।

পাঁচটি বস্তুর মূল্যায়ন করো

মানবজাতির রূপকার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, পাঁচটি বস্তুর মূল্যায়ন করো তোমাদের নিকট থেকে সেগুলো বিলুপ্ত হওয়ার পূর্বে। যথা–

১. জীবনের মূল্যায়ন করো মৃত্যুর পূর্বে।

২. যৌবনের মূল্যায়ন করো বার্ধক্যের পূর্বে।

৩. সুস্থতার মূল্যায়ন করো অসুস্থ হওয়ার পূর্বে।

৪. সম্পদের মূল্যায়ন করো দরিদ্রতার পূর্বে।

৫. অবসরের মূল্যায়ন করো ব্যস্ততার পূর্বে।

যেব্যক্তি এ পাঁচটি বিষয়ের যথাযথ মূল্যায়ন করবে, সে অবশ্যই সফলকাম হবে।

আল্লামা কবি ইকবাল কতই-না সুন্দর বলেছেন,

میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو

نہیں ہے بندہ حر کے لئے جہاں میں فراغ

একমাত্র দাসেরাই অবকাশ (সময়) পায়। স্বাধীন মানুষের জন্য পৃথিবীতে অবসর নেই।

তারা সর্বদাই কোনো-না-কোনো কাজে ব্যস্ত থাকে।

নবীজির দিন-রাত

মানবতার শান্তির দূত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সময়ের অনেক মূল্যায়ন করতেন। সারাদিন ইসলামের প্রচার-প্রসারের কাজে নিয়োজিত থাকতেন। অবশেষে রাতে প্রাণপ্রিয় বন্ধুর ইবাদাতে ব্যস্ত হয়ে যেতেন। কেমন ইবাদত করতেন? কিতাবে আছে,

حَتّٰى يَتَوَارٰى قَدَمَاهُ

'দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে তাঁর উভয় পা মোবারক ফুলে যেত।'

সময়ের ধ্বনি

غافل! تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی

کردوں نے گھڑے عمر کی اک اور گھٹادی

'হে উদাসীন! ঘড়ি তোমাকে আহ্বান জানাচ্ছে, প্রতিটা সেকেন্ড তোমার জীবনের একেকটা ধাপ হ্রাস করে দিচ্ছে।'

সুতরাং তুমি মনে করছ, ঘড়ির সেকেন্ড যাচ্ছে, ঘণ্টা হচ্ছে। মূলত সেই সেকেন্ড তোমার জীবনে একেকটা ধাপ বিলুপ্ত হওয়ার সংবাদ জানাচ্ছে।

সারসংক্ষেপ

মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা চাই। তিনি যেন আমাদের সকলকে জীবনের ও সময়ের মূল্যায়ন করার তাওফীক দান করেন। একথা জানা নেই যে, এ মাহফিলে উপবিষ্ট লোকদের কে সর্বপ্রথম এ মায়ার পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবেন্। তবে একটি বিশ্বাস আছে, এক সময় সকলকেই যেতে হবে। কেউ আগে, কেউ পরে যাবেই। আমাদের পূর্বপুরুষগণ তাদের বুযুর্গদের কাছ থেকে জীবনের পরিপূর্ণ ফায়েদা গ্রহণ করেছেন। তদুপরি চলে যাওয়ার সময় বলতেন,

جیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد

بوے گل سیر نہ دیدم وبہار آخر شد

'চক্ষুর আক্ষেপ লাগছে যে, বন্ধুর সাক্ষাৎ শেষ হয়ে যাচ্ছে। বাগানের সুবাস তৃপ্তিসহকারে দেখতে পারলাম না! বসন্ত যে, শেষ হয়ে গেল!'

আল্লাহ আমাদের সবাইকে যথাযথ মূল্যায়ন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

খুতুবাতে যুলফিকার-২০

গ্রহণযোগ্য কে?

"'যেব্যক্তি ধর্মের ক্ষেত্রে এমন মনগড়া কিছু আবিষ্কার করেছে, যা এই ধর্মে ছিল না, তা প্রত্যাখ্যাত।'

আপনারা দেখে থাকবেন, মানুষ বাজারে পণ্য ক্রয় করে। তখন সেই পণ্যের ওপর একটা Brand name (পার্থক্যকারী নাম) পড়ে। পণ্যের ওপরে সিল পড়ে। মেয়াদ ইত্যাদি সঠিক থাকলে মানুষ তা ক্রয় করে, না হয় পরিহার করে। ঠিক তেমনিভাবে কেয়ামতের দিন মানুষের আমল পেশ করা হলে ফেরেশতারা প্রত্যেকটি আমল যাচাই করবেন। তাতে সুন্নতের সিল আছে কিনা দেখবেন। তারপর সুন্নত অনুযায়ী হলে গ্রহণ করবেন। সেটি গ্রহণযোগ্যতা পাবে। অন্যথায় সেটি প্রত্যাখান করা হবে।"

গ্রহণযোগ্য কে?

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মুমিনগণের আমল গ্রহণ করেন।'[৭৭]

قبوليت (গ্রহণযোগ্য) শব্দের বিশ্লেষণ

قبول আরবি শব্দ। لسان العرب নামক অভিধানে এর অর্থ লেখা আছে مُنْقَبِلُ الشَّيْءِ 'কোনো জিনিস গ্রহণ করা।' যেমন– পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا

'তারা ওই সমস্ত লোক, যাদের নেক আমল আল্লাহ গ্রহণ করবেন।'[৭৮]

অর্থাৎ– তাদের পুণ্য গ্রহণ করা হবে। আর যেসব আমল নিষ্ঠাপূর্ণ নয়, সেগুলো প্রত্যাখ্যান করা হবে।

শরীয়তের পরিভাষায় قبول-এর দুটি অর্থ রয়েছে। এক. الصحة বা সঠিক হওয়া। যেমন– হাদীছ শরীফে এসেছে-

لَاتُقْبَلُ صَلٰوةُ اَحَدِكُمْ اِذَا اَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ

'তোমাদের কারও উজু ভেঙে গেলে দ্বিতীয়বার উজু না করা পর্যন্ত তার নামায গ্রহণ করা হবে না।'

---

৭৭. সূরা মায়েদা : আয়াত ২৭
৭৮. সূরা আহকাফ : আয়াত ১৬

অর্থাৎ– সঠিক হবে না।

قبول-এর পারিভাষিক অর্থ হলো আমল পরিশুদ্ধ হওয়া। অর্থাৎ– এখনই আমল সঠিক হবে।

এখন যদি কোনো লোক উজুবিহীন নামাযে দণ্ডায়মান হয় আর বলে, জনাব! আমি খুব ভালো করে নামায আদায় করেছি, তখন শরীয়ত বলে, তোমার নামাযই হয়নি।

অন্য এক হাদীছে তারকা-গবেষকদের ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জ্যোতির্বিদ, যারা ভবিষ্যতের আগাম সংবাদ প্রদান করে, তাদের নিকট যেতে শরীয়ত নিষেধ করেছে। কেননা, এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি মানুষের বিশ্বাস দুর্বল হয়ে যায়। তার কথার ওপর সর্বদা ভীত থাকে। সুতরাং শরীয়ত এর শিকড় কেটে দিয়েছে যে, তোমরা গণকদের ধারেকাছে যেয়ো না।

হাদীছ শরীফে এসেছে–

مَنْ اَتٰى عَرَّافًا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلٰوةُ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا

'যারা জ্যোতিষীদের নিকট গমন করে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাদের নামায গ্রহণ করা হয় না।'

অন্য এক হাদীছে এসেছে, যদি কারও ক্রীতদাস পালিয়ে যায়, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার মালিকের নিকট ফিরে না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না।

قبول-এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, কোনো জিনিস মানুষের ভালো লাগা, পছন্দ হওয়া। মানুষের যখন কোনো বস্তু পছন্দ হয়, তখন সে ওই বস্তুটি গ্রহণ করে। বিবাহের সময় যখন বরকে বলা হয়, তুমি অমুককে তোমার বিয়েতে কবুল করেছ? তখন সে বলে, قبلت (আমি তাকে কবুল করেছি)। অর্থাৎ– তাকে আমার ভালো লেগেছে। আমি তাকে গ্রহণ করেছি।

আমাদের আলোচিত আয়াতে এই দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য হবে।

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ

'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের আমল গ্রহণ করেন।'

মুফরাদাত নামক কিতাবে আল্লামা রাগিব ইস্পাহানি (রহ.) বলেন,

قُبُوْلُ الشَّيْءِ عَلٰى وَجْهٍ يَقْتَضِيْ ثَوَابًا كَالْهَدِيَّةِ

'কেউ কাউকে হাদিয়া দিলে সে যেমন ছাওয়াবের নিয়তে সেই হাদিয়া গ্রহণ করে, তাকে قبول বলে। অনুরূপভাবে মানুষ নিষ্ঠার সাথে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে যে-আমল করে, শরীয়তের বিধান মোতাবেক তখন আল্লাহ সেটি গ্রহণ করেন। একে قبوليت বা গ্রহণযোগ্যতা বলে।

গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠির বিশ্লেষণ

এটি একটি স্বতন্ত্র বিষয়, যা বোঝা দরকার। কোনো আমল যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য না হবে, সেই আমল করে মানুষ কোনো প্রকার উপকার হাসিল করতে পারবে না। অনেক সময় দেখা যায়, জিনিসটা ভালো; কিন্তু আপনি গ্রহণ করছেন না। যেমন– মনে করুন, আপনি বাজারে গেলেন। আপেল কিনবেন। আপনার প্রয়োজন পরিমাণ আপেল ক্রয় করার পর দোকানি বলল, ভাই! নতুন আঙুর এসেছে; খুব ভালো। আপনি দেখলেন, পাকা আঙুর। দেখতে চোখ জুড়ায়। মিষ্টও হবে মনে হচ্ছে। অর্থাৎ– ভালো ফলের সকল গুণাগুন তাতে বিদ্যমান রয়েছে। বণিক জিজ্ঞাসা করল, সাহেব! কিছু দেব? কিন্তু আপনার মন চাচ্ছে না। তখন আপনি সেগুলো একনজর দেখেই প্রত্যাখান করে দেবেন। কেন? এত ভালো ফল হওয়া সত্ত্বেও আপনি কিনলেন না কেন? কারণ, এটা গ্রহণ করতে আপনার মন চাচ্ছে না।

ঠিক তেমনিভাবে আমল সঠিক হওয়া এক বিষয় আর তা পছন্দ হওয়া, গ্রহণযোগ্য হওয়া ভিন্ন বিষয়। এটিই চিন্তার বিষয়, যা পুণ্যবানদের অন্তরে সদা জাগরূক থাকে। তাদের অন্তর কাঁপতে থাকে।

অনেক সময় আপনারা শুনে থাকবেন, দেখে থাকবেন যে, সম্ভ্রান্ত পরিবারের অপরূপা সুন্দরী, চালাক-চতুর ও ঐশ্বর্যশালী রমণী। আল্লাহ তা'আলা নিজহাতে যেন তার অবয়ব সৃষ্টি করেছেন। তাকে তার স্বামী তালাক দিয়ে দেয়। কেন? তার কাছে কী কোনো জিনিসের অভাব আছে? এত গুণের কারণে তাকে পছন্দ করা, গ্রহণ করা উচিত ছিল না? আরও দেখে থাকবেন, কালো, কুশ্রী, গরিব পরিবারের মহিলা। সে তার স্বামীর ঘরে রানির মতো সংসার করছে। কারণ, প্রথমটা গ্রহণযোগ্য হয়নি আর দ্বিতীয়টা গ্রহণযোগ্য হয়েছে। কোনো এক কনেকে তার বান্ধবীরা সাজ্জাচ্ছে। গহনাপত্র

পরিয়ে দিচ্ছে। মেকাপ করছে। আরও যা কিছু করতে হয় করছে। তখন তার কোনো এক বান্ধবী বলল, সখী! তোকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে রে। মনে হচ্ছে যেন আকাশের হুর-পরি জমিনে নেমে এসেছে। বান্ধবীর কথা শুনে বিয়ের সাজে সজ্জিত কনে অঝোর ধারায় কাঁদছে। তার এ অবস্থা দেখে কোনো বান্ধবী জিজ্ঞাসা করল, কী রে সখী! কী হয়েছে? তুই কাঁদছিস কেন? সে বলল, বোন! তোমরা আমার প্রশংসা করছ। আমার রূপের খুব স্তুতি গাইছ। কিন্তু আমি এজন্য কাঁদছি যে, আজ আমি যে-নবজীবনে পা রাখতে যাচ্ছি, সেই সংসার কেমন হবে। আমার এই অপূর্ব সৌন্দর্য যে ভোগ করবে, আমার সুখের ও দুঃখের সাথি যে হবে, তার কাছে আমার এই অবস্থা গ্রহণযোগ্য হবে কি-না। যদি না হয়, তাহলে তো তোমাদের প্রশংসা তোমাদের মুখেই থাকবে। এতে আমার কোনো উপকার হবে না।

সুতরাং বন্ধুগণ! লোকে আমাদের আলেম, হাফেয, কারী, পীর সাহেব বলে। যদি আল্লাহর দরবারে গ্রহণ না হয়, তাহলে লোকমুখের এই বাহবা আমাদের কী উপকারে আসবে? তাই আমাদের উচিত, আমরা এমন জীবন গঠন করব, যা পরম করুণাময়ের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়। একেই 'গ্রহণযোগ্যতা' বলে।

বিখ্যাত ওলী আল্লামা আতাউল্লাহ সেকান্দরি (রহ.)-এর বরকতময় উক্তি

আতাউল্লাহ সেকান্দরি নামে আল্লাহ তা'আলার এক বিখ্যাত ওলী ছিলেন। ইসকান্দারিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। আস্তে-আস্তে পদোন্নতি হয়ে মিশর জামেয়া আযহার-এর শিক্ষকতাও করেছেন। অনেক অভিজ্ঞতাপূর্ণ ও দার্শনিক কথা বলতেন। তার বাণী আজ বিভিন্ন কিতাবে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাঁর এক কিতাবে তিনি লিখেছেন,

رُبَّمَا فُتِحَ لَكَ بَابُ الطَّاعَةِ وَمَا فُتِحَ لَكَ بَابُ الْقَبُوْلِ

'অনেক সময় তোমার জন্য আনুগত্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। কিন্তু তোমার জন্য গ্রহণযোগ্যতার দরজা খোলা হয়নি।'

এর উদাহরণ শুনতে হলে ভেবে দেখুন, মিস্টার ইবলিস কেমন আনুগত্য করেছিল। বলা হয়, গোটা পৃথিবীর এমন কোনো ভূখণ্ড বাকি নেই, যেখানে শয়তান সেজদা করেনি। ফলাফল কী হলো? গ্রহণযোগ্যতা পেল না। সব শেষ হয়ে গেল।

সুতরাং গ্রহণযোগ্যতা ভিন্ন বিষয়। এর জন্য কাকুতিমিনতি করে আল্লাহ তা'আলার দরবারে কাঁদতে হবে। মিনতি না করলে আশ্রয় পাওয়া যাবে না।

তিনি বলেন,

لَوْلَا جَهِيْلُ سَتْرِهٖ لَمْ يَكُنْ عَمَلٌ اَهْلًا لِلْقُبُوْلِ

'যদি তাঁর (আল্লাহর) গোপনকারী গুণ না থাকত, তাহলে কোনো আমলই গ্রহণযোগ্যতার উপযোগী হতো না।

অর্থাৎ– কোনো আমল কবুল হলে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার 'সাত্তার' (গোপনকারী) গুণের অবদানে হয়ে থাকে।

মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.)-এর শাহী ফরমান

ইমামে রব্বানী হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) তাঁর রচিত গ্রন্থ মাকতুবাতে বলেন, মানুষ যতই নিষ্ঠাবান হয়ে একাগ্র চিত্তে বিনয়ের সাথে ইবাদত করুক, তার ইবাদত মহা পরাক্রমাশীল আল্লাহ তা'আলার শান অনুযায়ী হবে না, হতে পারে না। তিনি মহান। তিনি মানুষের ওই অবস্থা থেকে আরও অনেক ঊর্ধ্বে।

এবার ভেবে দেখুন, তাঁর মতো এমন ব্যক্তি এমন কথা বলেছেন। আর আমরা কোন গাজর-মুলা। আমাদের ইবাদাতের অবস্থা কেমন হবে?

প্রিয়নবীর বন্দেগির স্তর

নিশ্চয় মানব-দানব তথা কুল মাখলুকাতের শান্তির দূত নবীগণ ও ফেরেশতাকুলের সরদার হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার দু'আর মধ্যে বলেছেন,

مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ

'হে আল্লাহ! আমি আপনার যথোপযুক্ত ইবাদত করতে পারিনি।'

দেখুন, নবী হয়ে কেমন বিনয় প্রকাশ করেছেন!

ইমাম আবুহানীফা (রহ.)-এর প্রার্থনা

আমাদের মাযহাবের ইমাম আবুহানীফা (রহ.) একটানা চল্লিশ বছর পর্যন্ত ঈশার উজু দ্বারা ফজরের নামায আদায় করেছেন। হারাম শরীফের তাওয়াফ শেষ করে মাকাকে ইবরাহীমে দু-রাকাত নফল নামায পড়ছেন। এই দু-

রাকাতে পবিত্র কুরআন শরীফ সম্পূর্ণ খতম করেছেন। আল্লাহু আকবার! তারপর আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করছেন,

مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ

'হে আল্লাহ! আমি আপনার যথোচিত ইবাদত করতে পারিনি।'

চিন্তা করে দেখুন, যে-বান্দা চল্লিশ বছর পর্যন্ত ঈশার উজু দ্বারা ফজরের নামায আদায় করেছেন, তিনি আল্লাহর ইবাদতে কী পরিমাণ মগ্ন থাকতেন! তিনি এত দীর্ঘ নামায পড়তেন যে, তিনি নামাযে দাঁড়ালে প্রতিবেশীরা মনে করত, ছাদের ওপর যেন কোনো মিনার স্থাপন করা হয়েছে। এত দীর্ঘ কিয়াম করতেন। আর মাকামে ইবরাহীমে নামায আদায় করে তিনি বলছেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার পরিপূর্ণ ইবাদত করতে পারিনি। সুবহানাল্লাহ!

ইবাদত কবুল হয় কীভাবে

এখন প্রশ্ন হয়, আমাদের বুযুর্গদের এত নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত থাকা সত্ত্বেও তাঁরা বলছেন, হে আল্লা! আপনার হক অনুযায়ী আমরা ইবাদত করতে পারিনি। অর্থাৎ– যেভাবেই ইবাদত করা হোক তা আল্লাহ তা'আলার শান অনুযায়ী হবে না। তাহলে ইবাদত কবুল হবে কীভাবে?

এর উত্তর বলতে হলে আগে একটি উদাহরণ শুনুন। আপনার ছেলে আবদুল্লাহকে মাদরাসায় ভর্তি করিয়ে দিলেন। প্রাথমিক অবস্থায় আপনি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। ছুটি হলে আবার নিয়ে আসবেন। তখন সে বলল, আব্বু! আজকে আমরা এক/দুই গণনা লিখেছি। আপনি বলবেন, দেখাও তো তুমি কী লিখেছ? খাতা দেখলেন। লেখার চেয়ে কাটাকাটি বেশি। খাতার মধ্যে শুধু কালো কালির দাগই রয়েছে। লাইনও রয়েছে আঁকাবাঁকা। এরপর আপনার পিতৃত্বের ভালোবাসায় লেখা দেখে তাকে বাহবা দেবেন এবং আদর করে চুমু দেবেন। আইসক্রীম কিনে দেবেন। কেন? লেখা তো ঠিক হয়নি। সে যে এত আদর পেল, আইসক্রীম পুরস্কার পেল, তা তো লেখা সুন্দর হওয়ার জন্য পায়নি। তার হাতের লেখা তো আজ দেখার যোগ্য হয়নি। কিন্তু পিতৃত্বের ভালোবাসায় সে আজ পুরস্কারের যোগ্য হয়েছে। কারণ, সে চেষ্টা করেছে। তাই ভালো না লিখেও পুরস্কার পেয়েছে।

সুতরাং আমরাও যে ইবাদত করি, তা আল্লাহ তা'আলার শান অনুযায়ী হয়নি। তবু মহামহিম প্রভু হলেন,

إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

'আল্লাহ বান্দার প্রতি অতিশয় দয়ালু।'[৭৯]

তিনি বান্দার আবেগ, চেষ্টা-প্রচেষ্টা দেখেন। তারপর সেই অনুযায়ী আমাদের টুটাফাটা ইবাদত কবুল করেন।

জান্নাতে প্রবেশাধিকার হবে কীভাবে

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, আমাদের আমল যদি গ্রহণযোগ্যতার স্তরে না পৌঁছে, তাহলে কাল কেয়ামতের ময়দানে আমরা এ আমলের প্রতিদান কী পাব? এটা খুবই চিন্তার বিষয়।

সুতরাং বলা হয়েছে,

لَيْسَ كُلُّ طَاعَةٍ سَبِيْلًا إِلَى مَثُوْبَةِ اللهِ وَرِضْوَانِهِ

প্রত্যেক আনুগত্য অর্থাৎ– আমল এমন যোগ্যপাত্র হয় না যে, তা আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করতে পারে এবং এর ওপর বান্দা প্রতিদান পায়। অর্থাৎ– সব আমল এমন যোগ্য হয় না।

অন্যস্থানে বলা হয়েছে,

لَا عِبْرَةَ بِالطَّاعَةِ إِذْ لَمْ يَصْحَبْهَا قَبُوْلٌ

ওই আমলের কোনো ধর্তব্য নেই, যে আমলের সাথে গ্রহণযোগ্যতা নেই। অর্থাৎ– যে-আমল আল্লাহ তা'আলার নিকট পছন্দনীয় নয়, সেই আমলের কোনো ফায়েদা নেই। সুতরাং এর প্রতি চিন্তাশীল থাকতে হবে, যাতে আমাদের আমল আল্লাহ তা'আলার দরবারে গ্রহণযোগ্য হয়।

এবার এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, তিবরানি শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে, নবীজি বলেন,

لَا يُدْخِلُ أَحَدًا مِّنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلَا يُجِيْرُهُ مِنَ النَّارِ وَلَا أَنَا إِلَّا بِرَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ

'তোমাদের কারও আমল তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তিও দিতে পারবে না। এমনকি আমিও নয়। কিন্তু একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দয়া ব্যতীত।'

---

৭৯. সূরা হজ : আয়াত ৬৫

অর্থাৎ– আল্লাহ তা'আলার দয়া ব্যতীত নিজের আমল দ্বারা কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

অথচ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

'তোমাদের আমলের বিনিময়ে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো।'[৮০]

সুতরাং কুরআনের আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, মানুষ নিজের আমলের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর হাদীছ দ্বারা বোঝা যায়, একমাত্র আল্লাহর দয়া ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। অতএব, কুরআন ও হাদীছের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেল।

ওপরোক্ত প্রশ্নের জবাব

শুধু এক-দুটি হাদীছ পাঠ করলে পরিপূর্ণরূপে দীন বোঝা যাবে না। এর জন্য হাদীছ সম্পর্কে বিশদ জ্ঞানের প্রয়োজন। অন্যান্য হাদীছে এর ব্যাখ্যা রয়েছে। অন্য জায়গায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

دُخُوْلُ الْجَنَّةِ بِفَضْلِهٖ وَدَرَجَاتُهٗ بِحَسْبِ الْاَعْمَالِ

অর্থাৎ– জান্নাতে প্রবেশ করা হবে আল্লাহ তা'আলার অপুরন্ত দয়ার প্রেক্ষিতে এবং সেখানে মানুষ বিভিন্ন স্তর ও মর্যাদা পাবে তার আমলের প্রেক্ষিতে।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا

'প্রত্যেকের স্তর (আসন) তার আমল অনুপাতে হবে।'

এক হাদীছে নবীজি বলেন,

لَنْ يَّدْخُلَ اَحَدٌ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهٖ

'তোমাদের কেউ তার নিজের আমল দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।'

আরেক হাদীছে এসেছে, নবীজি বলেন–

---

৮০. সূরা নাহল : আয়াত ৩২

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ لِلْجَنَّةِ أَنْتَ رَحْمَتِيْ أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِيْ

'আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে বলেন, তুমি আমার রহমত। আমার বান্দাদের থেকে যাকে ইচ্ছা আমি তোমার মাধ্যমে দয়া করব।

বান্দা কেন নিজের আমলের বিনিময়ে জান্নাতে যেতে পারবে না? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের অনেক মন্তব্য রয়েছে। তারা খুব সুন্দর-সুন্দর জবাব দিয়েছেন। সব গুণের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। শুধু একজন বুযুর্গের মন্তব্য আপনাদের সম্মুখে পেশ করছি।

আল্লামা ইবনে জাওযি (রহ.)-এর বিজ্ঞতাপূর্ণ দলিলসমূহ

আল্লামা ইবনে জাওযি (রহ.) বলেন, উল্লিখিত হাদীছের ব্যাখ্যা হলো, মানুষ নেক আমলের সৌভাগ্য পায় একমাত্র আল্লাহর দয়ায়।

إِنَّ التَّوْفِيْقَ لِلْعَمَلِ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ

'একমাত্র আল্লাহর দয়ায় আমলের তাওফীক পাওয়া যায়।'

কুরআনে বলা হয়েছে,

وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلَّا بِاللهِ

'একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার (আমলের) তাওফীক।'[৮১]

বৈদ্যুতিক মটর চলছে। কিন্তু মেইন সুইচ যার হাতে রয়েছে, তার ইচ্ছা হলে চালু করবে, ইচ্ছা হলে বন্ধ করে দেবে। মেশিন ঠিক আছে। পাইপ ঠিক আছে; কিন্তু পানি উঠছে না। কারণ, যার হাতে মেইন সুইচ রয়েছে, সে বন্ধ করে দিয়েছে। সুতরাং আমলের তাওফীক পাওয়া যায় আল্লাহ তা'আলার দয়ায়। কাজেই সব কিছু আল্লাহর হাতেই বলতে হবে। তাই বলা হয়–

وَلَوْلَا رَحْمَةُ اللهِ سَابِقَةً مَا حَصَلَ الْإِيْمَانُ وَلَا الطَّاعَةُ الَّتِيْ يَحْصُلُ بِهَا النَّجَاةُ

'আল্লাহর রহমত যদি অগ্রগণ্য না হতো, তাহলে বান্দা ঈমানও গ্রহণ করতে পারত না এবং কোনো নেক আমলও করতে পারত না এবং এর দ্বারা জান্নাতও পেত না। সুতরাং সে কীসের ভিত্তিতে জান্নাত পেল? আল্লাহর দয়ার ভিত্তিতে।

---

৮১. সূরা হুদ : আয়াত ৮৮

দ্বিতীয় দলিল তিনি বর্ণনা করেন–

إِنَّ مَنَافِعَ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ

'গোলামের সমস্ত উপার্জন, উপকার, কল্যাণ তার মালিকের জন্য।'

আমরা আল্লাহর গোলাম থেকে আরও নিম্ন শ্রেণির। কাজেই আমাদের সবকিছু মালিকের জন্যই হওয়া চাই।

وَعَمَلُهُ مُسْتَحِقٌّ لِمَوْلَاهُ

'তার সমস্ত আমলের অধিকারী তার মালিক।'

এবার ভেবে দেখুন। একজন গোলাম। সে তার ঘরে কাজ করছে। তারপর তার কাজের বিনিময়ে মালিক তাকে পুরস্কার দিচ্ছে। সে তো এই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য নয়। কারণ, তার সব কাজই তো তার মালিকের। এরপরও মালিক তাকে পুরস্কার দিয়ে থাকে। এটা ভৃতের ওপর মালিকের দয়া।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে আমলের তাওফীক দিয়েছেন। বান্দা আমল করেছে। এরপর এই আমলের বিনিময়ে তাকে জান্নাত দান করা এটা আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত দয়া। নতুবা বান্দা শুধু এরই উপযোগী ছিল যে, সারা জীবন কেবল আমলই করে যাবে। কারণ, সে গোলাম। তার সবকিছু তার মালিকের। তাই বলা হয়,

فَمَهْمَا أَنْعَمَ عَلَيْهِ مِنَ الْجَزَاءِ فَهُوَ مِنْ فَضْلِهِ

'বিনিময়ে যখন তারা কোনো পুরস্কার পায়, সেটা আল্লাহ তা'আলার অশেষ দয়া।'

তৃতীয় আরেকটি দলিল তিনি উপস্থাপন করেন। খুবই আশ্চর্য দাবি তার। তিনি বলেন, মানুষ যে-আমল করে, তা নশ্বর। যার কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। কিন্তু জান্নাত হচ্ছে অবিনশ্বর, যা সর্বদা স্থায়ী থাকবে। সুতরাং নশ্বর কাজের প্রতিদানে অবিনশ্বর বস্তু পাওয়ার যৌক্তিকতা নেই। সুতরাং সেই অবিনশ্বর বেহেশেতের অধিকারী হওয়া একমাত্র আল্লাহর বিশেষ দয়া ছাড়া কিছু হতে পারে না।

সুতরাং মানুষ যে জান্নাত পাবে, তা তার আমলের বিনিময়ে নয়; বরং তা আল্লাহ তা'আলার অশেষ করুণা।

মনে করুন, আপনার হাতে একটা আপেল আছে। আপনি তাকে ফ্রিজে রাখলেন। তখন কেউ দেখে বলল, আপনি তো খুব জালেম; আপনি একে ফ্রিজে রাখলেন? এবার আপনি ফ্রিজ থেকে বের করে আগুনে নিক্ষেপ করলেন। এবার আরেকজন বলবে, আপনি তো অত্যন্ত নির্মম মানুষ। আপনি একে আগুনে ফেলে দিলেন? আচ্ছা, বলুন তো ভাই! এটা আপনার নিজস্ব মালিকানা। একে আপনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। চাইলে ফ্রিজে রাখুন, চাইলে আগুনে ফেলে দিন। এতে আপনি অত্যাচার করলেন কোথায়?

ঠিক তেমনি মনে করুন, আমরা আল্লাহ তা'আলার অধীন গোলাম। তিনি আমাদেরকে যেখানে ইচ্ছা সেখানে রাখতে পারেন। ইচ্ছা হলে জাহান্নামে দেবেন আর ইচ্ছে হলে জান্নাতে দেবেন। এতে জুলুমের কিছু নেই। জাহান্নামে দিলে আল্লাহর অধিকার এবং জান্নাতে দিলে এটা আমাদের প্রতি তাঁর বিশেষ দয়া। তাই হাদীছ শরীফে এসেছে–

لَوْ اَنَّ اللهَ عَذَّبَ اَهْلَ سَمٰوٰتِهٖ وَاَرْضِهٖ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَّهُ

'যদি আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলবাসীকে শাস্তি দেন, তাহলে এর দরুণ কেউ তাকে জালেম বলতে পারবে না।'

আর যদি তাদের ওপর দয়া করেন, তাহলে এটা বান্দার পক্ষে কল্যাণকর।

সুতরাং এতে প্রতিভাত হয় যে, আমাদের কর্তব্য হলো আমল করা এবং সেই আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য চেতনাশীল হওয়া। আজ আমরা নামায পড়ে নিলাম এবং এই নামাযে দুনিয়ার ফিকির থাকুক কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যের চিন্তা থাকুক, তাতে কিছু আসে যায় না। আমরা পড়ে নিলাম; তা-ই যথেষ্ট হয়ে গেছে। এখন কবুল করে নেওয়া আল্লাহর কাজ এমনটা মনে করা যাবে না। বরং নামায আদায়ের সাথে-সাথে তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্যও চিন্তাশীল হতে হবে। কারণ, আমল করা এক জিনিস আর তা গ্রহণযোগ্য হওয়া ভিন্ন জিনিস। সেটা স্মরণ রাখতে হবে।

কবুল হওয়ার আলামত

আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার কিছু নিদর্শন রয়েছে। সেগুলোর দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, আমল কবুল হলো কিনা। সুতরাং সেই আলামতগুলো সম্পর্কে আমাদের জ্ঞাত থাকতে হবে। তবেই বুঝতে পারবেন, আমাদের আমলসমূহ গ্রহণযোগ্যতার স্তরে পৌঁছতে পারল কিনা।

আমলের গ্রহণযোগ্যতার প্রথম মাপকাঠি হচ্ছে নবীজির সুন্নত

বলা হয়েছে–

مُوَافَقَةُ الْعَمَلِ لِمَا جَاءَ بِهِ الشَّرْعُ وَصَحَّتْ بِهِ السُّنَّةُ

আপনি যে আমলই করবেন, তা শরীয়ত ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত মোতাবেক হতে হবে। আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য এটি-ই প্রথম শর্ত। আমল যদি শরীয়তের বিধান অনুযায়ী না হয়, তাহলে সেই আমল গ্রহণযোগ্য হবে না। এমনকি তা শুদ্ধও হবে না। মনে করুন, আজ ফজরের সময় আপনার শারীরিক অবস্থা খুব ভালো। আপনি খুব হাসি-খুশি আছেন। বললেন, আজ যেহেতু আমি খুবই শান্ত, সুতরাং ফজরের নামায দু-রাকাতের পরিবর্তে চার রাকাত পড়ে নেব। একেবারে বিনয় ও নিষ্ঠার সাথে ফজরের ফরজ নামায চার রাকাত পড়ে নিলেন। আপনার এই নামায কি কবুল হবে? না কস্মিনকালেও নয়। কারণ, আপনার এই নামায শরীয়তের বিধানমতো হয়নি। আপনার আমল শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী হতে হবে। তাই বলা হয়-

مِيْزَانٌ لِلْأَعْمَالِ فِيْ مَظَاهِرِهَا

এটি আমলের জন্য বাহ্যিক মানদণ্ড।

যে-আমল করা হচ্ছে, সেটি সুন্নতের দাঁড়িপাল্লায় উঠাও। দেখো, তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে কি-না। সেটি সুন্নত মোতাবেক হয়েছে কি-না। যদি সুন্নত মোতাবেক হয়, তাহলে গ্রহণযোগ্য হওয়ার আশা রাখা যায়। আর সুন্নতের ব্যতিক্রম হলে গ্রহণযোগ্য হবে কীভাবে?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

'যেব্যক্তি ধর্মের ক্ষেত্রে এমন মনগড়া কিছু আবিষ্কার করেছে, যা এই ধর্মে ছিল না, তা প্রত্যাখ্যাত।'

আপনারা দেখে থাকবেন, মানুষ বাজারে পণ্য ক্রয় করে। তখন সেই পণ্যের ওপর একটা Brand name (পার্থক্যকারী নাম) পড়ে। পণ্যের ওপরে সিল পড়ে। মেয়াদ ইত্যাদি সঠিক থাকলে মানুষ তা ক্রয় করে, না হয় পরিহার করে। ঠিক তেমনিভাবে কেয়ামতের দিন মানুষের আমল পেশ করা হলে ফেরেশতারা প্রত্যেকটি আমল যাচাই করবেন। তাতে সুন্নতের সিল

আছে কিনা দেখবেন। তারপর সুন্নত অনুযায়ী হলে গ্রহণ করবেন। সেটি গ্রহণযোগ্যতা পাবে। অন্যথায় সেটি প্রত্যাখান করা হবে।

আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দীয় আমল

মানুষ সঠিক পন্থায় আমল করবে। এটিই আল্লাহ তা'আলার প্রিয়। হাদীছ শরীফে এসেছে–

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

'আল্লাহ তা'আলা পবিত্র। তিনি পবিত্র আমল ছাড়া গ্রহণ করেন না। আর নেক আমল তার পদোন্নতি করে।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

'হে নবীগণ! তোমরা পবিত্র জিনিস আহার করো এবং নেক আমল করো।'[৮২]

তাবরানী শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ (রাযি.)কে উপদেশ দিচ্ছেন-

يَا سَعْدُ أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ

'হে সা'দ! তোমার খাবারকে পবিত্র করো; তা হলে তোমার প্রার্থনা গ্রহণ করা হবে।'

অর্থাৎ– পবিত্র বস্তু আহার করো; তাহলে তোমার দু'আ সরাসরি কবুল হবে।

চোখে দেখা অবস্থা

একবার এটা যাচাই হয়েছে। বর্হিবিশ্বে এক ছাত্র মাদরাসায় লেখাপড়া করার জন্য এল। সে এক বিখ্যাত ডাক্তারের ছেলে ছিল। স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর ছিল। I.Q. Level খুব ভালো প্রতিষ্ঠানে সুযোগপ্রাপ্ত ছাত্র ছিল। প্রেসিডেন্ড পুরস্কারের জন্য তার নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। এমন ধীশক্তির অধিকারী ছাত্র কুরআন শিক্ষার জন্য এল। কিন্তু এক বছরে সে কায়দায়ে বাগদাদিই পড়ে শেষ করতে পারল না। বছরশেষে আমি পরীক্ষা নিলাম।

---

৮২. সূরা মুমিনূন : আয়াত ৫১

ছাত্রদের লেখাপড়া যাচাই করলাম। ওই ছেলে কুরআন তো দূরের কথা কায়দায়ে বাগদাদিই পড়তে পারে না।

আমি ওস্তাদকে তলব করলাম। ওস্তাদ বললেন, হুজুর! তার প্রতি আমার প্রচেষ্টার কোনো ত্রুটি হয়নি। আমি তাকে নিয়মিতই পড়াচ্ছি। কিন্তু কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে সে পেছনের সবক ভুলে যায়। আবার পেছন থেকে শুরু করি। পূর্বের স্থানে আসতে-আসতে পুনরায় পেছনের পড়া ভুলে যায়। এভাবেই তার বছরটা কেটেছে।

ছাত্রকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কী? পড়া সামনে এগুচ্ছে না কেন? সে বলল, হুজুর! আমার চেষ্টায় কোনো প্রকার ঘাটতি নেই। প্রতিদিন ক্লাসে উপস্থিত হই। হুজুর অন্যান্য ছাত্রদের তুলনায় আমার প্রতি অধিক মেহনত করেন। কিন্তু আমার কোনো কিছু স্মরণ থাকে না। আমি সাধারণ ও নিম্ন পর্যায়ের ছাত্র নই। আমি গোল্ডেন প্লাস-এর ছাত্র। কিন্তু বুঝতে পারছি না, কেন আমি পবিত্র কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছি না। এটা আমার ভাষার অনুকূল হচ্ছে না কেন?

তার কথা শুনে আমি অত্যন্ত অবাক হলাম। ব্যাপার কী? সে কুরআন মাজীদ পড়তে পারছে না কেন? আমি তাকে নিরালায় ডেকে নিলাম। তার সাথে অনেকক্ষণ কথা বললাম। আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তরে একটি বিষয় সঞ্চার করে দিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কী খাও? কোন কোন জিনিস তোমার বেশি প্রিয়? সে বলল, মুরগি আর মুগ ডাল। অমুক Peeza এবং Chees মাখন আমার খুব প্রিয়। আমি এগুলো বেশি আহার করি। আর এগুলো আমার আব্বু অমুক হোটেল থেকে নিয়ে আসেন।

তখন আমি বুঝতে পারলাম, তার পিতা সারাদিন ডাক্তারি করে ছেলের জন্য বিকালের খাবার হোটেল থেকে কিনে নিয়ে আসে। ঘি ও মাখন দ্বারা ভুনা উন্মুক্ত খাবার তার জন্য সংগ্রহ করে। ফলে আমার অনুভব হলো, এই খাবার খাওয়ার কারণে তার মধ্যে কুরআনের শিক্ষা স্থান পাচ্ছে না। আমরা একটি শিক্ষক মিটিংয়ের আয়োজন করে ডাক্তার সাহেবকে আহ্বান করলাম। তাতে আমরা তাকে পরিষ্কার বলে দিলাম, আপনি যদি আপনার ছেলেকে কুরআন শিক্ষা দিতে চান, তাহলে এখন থেকে আপনার ছেলেকে আর বাইরের খাবার খাওয়াতে পারবেন না। বাচ্চার মা নিজহাতে যা পাক করে তা আপনার সন্তানকে খাওয়াবেন।

বাচ্চার মা নামাযী ও ধার্মিক মহিলা। সে হালাল বস্তু পাকিয়ে খাওয়াবে। আর যদি আপনি একাজ না করতে পারেন, তাহলে আজই এখান থেকে যাওয়ার সময় আপনার ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। তাকে কুরআন শিক্ষা দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বেচারা যখন দেখল, অবস্থা খুবই কঠোর হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তখন বলল, ঠিক আছে হুজুর! আমি আমার ছেলেকে কুরআন শিক্ষা দিতে চাই। আমি আপনাদের দাবি মেনে নিলাম।

পরদিন থেকে ডাক্তার তার ঘরে পাকানো নামাযী মহিলার হাতের হালাল খাদ্য সন্তানকে খাওয়াতে শুরু করে। এদিকে ছেলে পূর্বের ন্যায় মেহনত করে পড়তে থাকে। দেখা গেল, ওই ছেলে এক বছরে পবিত্র কুরআনের নয় পারা পড়তে সক্ষম হয়েছে। সুবহানাল্লাহ!

হৃদয়ে দুর্বলতার কারণ কী?

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে-

You a healt is what you eat

তোমাদের সুস্থতা হলো তোমাদের আহার্য।

কথাটা একে এভাবেও বলা যায়, Its what you eat তোমাদের হৃদয়ে শক্তি হচ্ছে তার আহার্য।

নামাযে নূর আছে, তেলাওয়াতে নূর আছে। কিন্তু বাইরের কোনো খোলামেলা খাবার খেলে তখন সব কিছু শেষ হয়ে গেল। বর্তমানে মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তি হ্রাস পাওয়ার কারণ কী? এর অনেক কারণ রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো, মানুষ অভিলাষ প্রকাশ করে যে, আজ অমুক ফাস্টফুড থেকে অমুক জিনিস খাব। তমুক জিনিস খাব। আপনি তো খাবার খেলেন; কিন্তু এতে আপনার সবকিছু খুয়ে গেল। চেষ্টা করবেন, যদ্দুর সম্ভব নিজের ঘরের হালাল খাবার খাবেন। একান্ত প্রয়োজনে বাইরের খাবার খেতে হলেও যাচাই-বাছাই করে হালাল বস্তু আহার করবেন।

ফজরের নামাযের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে বলে, হুজুর! ফজরের সময় ঘুম ভাঙে না। আরে ভাই! রাতে শয়নের আগে চিন্তা কর কী খাবার খেয়েছ। যখন হারাম উপকরণ মানুষের দেহে যাবে, তখন সে আমলের নূর থেকে বঞ্চিত থাকবে। মোবাইলে এলার্ম দিয়ে রাখুন; তারপরও সাতটার আগে ঘুম ভাঙবে না। সুতরাং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্মরণ রাখবেন। হৃদয়ের নূর পেতে হলে আপনার খাবার পবিত্র করতে হবে।

এজন্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يَا سَعْدُ اِطَيِّبْ مَطْعَمَكَ

'হে সা'দ তোমার খাবারকে পবিত্র করো।'

تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ

'আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রার্থনা গ্রহণ করবেন।'

এটা আল্লাহ তা'আলার অনেক বড় নেয়ামত। সুতরাং আমল কবুল হওয়ার প্রথম শর্ত কী?

مِيْزَانٌ لِلْاَعْمَالِ فِيْ مَظَاهِرِهَا

আমলের মানদণ্ড হচ্ছে তার বাহ্যিক অবস্থা।

আর বাতেনিভাবে আমল গ্রহণ হওয়ায় মানদণ্ড জেনে নিন।

আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল

আমল গ্রাহ্য হওয়ার বাতেনি মানদণ্ড হচ্ছে,

اِبْتِغَاءُ وَجْهِ اللهِ بِالْعَمَلِ

'আমলের দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করাই একমাত্র উদ্দেশ্য হতে হবে।'

আপনারা একটি হাদীছ শুনে থাকবেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

'আমলের নির্ভরশীলতা, আমলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়তের ওপর।'

সুতরাং নিয়ত পরিশুদ্ধ হওয়া চাই। নিয়ত সঠিক না হলে আমল গ্রহণযোগ্য হবে না। পবিত্র কুরআন এক জায়গায় বলে,

اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ﴿٢٠﴾

'...একমাত্র মহান প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে।'[৮৩]

---

৮৩. সূরা লাইল : আয়াত ৩০

আরেক জায়গায় বলা হয়েছে–

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ

'এবং যারা নিজের সম্পদ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ব্যয় করে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত হলো... ।'[৮৪]

হাদীছ শরীফে এসেছে,

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَتَقَبَّلُ مِنَ الْعَمَلِ اِلَّا مَاكَانَ خَالِصًا وَابْتُغِىَ بِهٖ وَجْهُهٗ

'আল্লাহ তা'আলা কোনো আমল কবুল করেন না। কিন্তু যে-আমল নিষ্ঠাপূর্ণ হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য হয় ।'

কোনো-কোনো বুযুর্গ থেকে একটি বাণী বর্ণিত আছে। তারা বলেন,

مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يُّقْبَلَ عَمَلُهٗ فَلْيُصَحِّ نِيَّتَهٗ

'যেব্যক্তি চায়, তার আমল কবুল করা হোক, সে যেন তার নিয়ত সংশোধন করে ।'

কেননা, আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রত্যেক কাজের প্রতিদান দেন যদি তার নিয়ত সঠিক থাকে। এমনকি স্ত্রীর মুখে খাবারের লুকমা তুলে দেওয়াও ছাওয়াবের কাজ। সুতরাং আমল কবুল হওয়ার দুটি মানদণ্ড পাওয়া গেল। বাহ্যিক মানদণ্ড হচ্ছে, তোমার কাজটি শরীয়তের বিধি অনুযায়ী হওয়া চাই। আর বাতেনি মানদণ্ড হচ্ছে, সকল কাজে তোমার নিয়ত সঠিক হওয়া চাই।

আত্মার শান্তি

আমল কবুল হওয়ার তৃতীয় আলামত হচ্ছে,

زِيَادَةُ الْاَعْمَالِ وَالتَّرَقِّىْ فِى الْاَحْوَالِ

'মানুষ যখন আমল করে, তখন সেই আমলে তার অবস্থার উন্নতি হয়। এক আমল করে আরেক আমলের জন্য আগ্রহী হয়। পরবর্তী আমল করার সৌভাগ্য পায়। আমলের গাড়ি সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য সকল বাধা দূর হয়ে যায়।

আল্লামা আহমদ ইবনে আজীহ (রহ.) বলেন,

---

৮৪. সূরা বাকারা : আয়াত ২৬৫

مَنْ وَجَدَ ثَمَرَةَ عَمَلِهِ عَاجِلًا فَهُوَ دَلِيْلٌ عَلٰى وُجُوْبِ الْقَبُوْلِ عَاجِلًا

'যেব্যক্তি তার ইবাদাতের প্রতিদান দ্রুত পেয়ে যায় (অর্থাৎ– তার অন্তরে প্রশান্তি এসে যায়, কেননা, আমল করলে মানুষের আত্মায় প্রশান্তি লাভ করে), এটা হচ্ছে তার আমল কেয়ামতের দিন গ্রহণযোগ্য হওয়ার দলিল।

এবার এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, জনাব! এটা আপনি কীভাবে উপলব্ধি করবেন যে, আমলের কারণে আপনার অবস্থার এমন পরিবর্তন হয়েছে?

তাহলে শুনুন। কিতাবে আছে, নামায গ্রহণযোগ্য হওয়ার আলামত হচ্ছে, নামাযী ব্যক্তি অনুভব করবে, আমি আমার মালিকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়েছি। সুতরাং তার আত্মায় এ পরিবর্তনের অবস্থা-ই তার নামায কবুল হওয়ার প্রমাণ। তার হজ কবুল হওয়ার আলামত হলো, যেব্যক্তি হজের কার্যাবলি সম্পাদনে সময় ব্যয় করছে, তার ধ্যান-ধারণা দুনিয়াবিমুখ হয়ে আল্লাহর প্রতি মগ্ন হয়ে যাবে। আল্লাহর প্রতি মানুষের অন্তরের সম্পর্ক জড়িয়ে যাবে।

কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে তা কবুল হওয়ার আলামত হলো, তেলাওয়াতের সময় মানুষের মনের এ অবস্থা হবে যে, আমি আমার মালিকের সামনে বসে তার সঙ্গে কথোপকথন করছি।

যিকির কবুল হওয়ার আলামত হলো, তার অন্তরে জাগ্রত অবস্থা এসে যাবে এবং আত্মার মধ্যে মহাপরাক্রমশালী প্রভুর ভয় সঞ্চার হবে। সুতরাং আমল করার সময় যদি এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়, তাহলে এটি কেয়ামতের ময়দানে আমল কবুল হওয়ার জ্বলন্ত প্রমাণ।

স্থিতিশীল আমল

আমল কবুল হওয়ার চতুর্থ আলামত হলো,

اَلْمُدَاوَمَةُ عَلَى الْعَمَلِ

'আমলে স্থিতিশীলতা অর্জন করা।'

মানুষ যে-আমল করবে, তাতে নিয়মানুবর্তিতা পালন করবে। অর্থাৎ– সর্বদা সেই আমল চালিয়ে যাবে। হাদীছ শরীফে এসেছে, নবীজি বলেন–

اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللهِ اَدْوَمُهَا وَاِنْ قَلَّ

'আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল হচ্ছে, যা সর্বদা করা হয় যদিও তা স্বল্প হয়।'

যেমন– কোনো মানুষ দৈনিক এক হাজারবার দরূদ শরীফ পাঠ করতে পারে না। মাত্র একশবার পাঠ করে। তবে প্রতিদিন পড়ে। কোনোদিন ফাঁকা যায় না। তার এই আমল ওই ব্যক্তির আমল থেকে উত্তম, যে দৈনিক এক হাজারবার পাঠ করে; কিন্তু প্রায়ই ফাঁকা যায়।

কোনো বুযুর্গ বলেন, ভাই! তুমি এক ওয়াক্তের নামায আদায় করে দ্বিতীয় ওয়াক্তের জন্য মসজিদে আগমন করা এটা তোমার প্রথম ওয়াক্ত নামায আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবুল হওয়ার আলামত। তোমার প্রথম ওয়াক্ত কবুল না হলে পরের ওয়াক্ত মসজিদে আসার সৌভাগ্য পেতে না। সুতরাং ভাই! তাহাজ্জুদের নামাযে নিয়মানুবর্তিতা অবলম্বন করা চাই। তাহাজ্জুদ তাহিয়্যাতুল মসজিদ ইত্যাদি নামাযের অভ্যাস করা একান্ত জরুরি। চক্ষু হেফাযত করে চলতে চেষ্টা করি। এগুলো আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাওয়া আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার দলিল।

আমলের নিরবচ্ছিন্নতা বজায় থাকা

আমল কবুল হওয়ার আরও একটি আলামত গভীর মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন। আমল কবুল হওয়ার আরেকটি মর্ম হচ্ছে, মানুষ যে আমল করে সেই আমলের ক্রমধারা বজায় থাকে। পরবর্তী কালেও সেই আমল করার সৌভাগ্য পায়। ভবিষ্যতে সেই আমল জারি থাকে। যেমন– দেখুন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আ.)কে তার সন্তানকে কুরবানি করার কথা বলেছিলেন। ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ যথাযথ পালন করেছেন। আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর আমল পছন্দ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বললেন,

سَلَامٌ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ

'ইবরাহীমের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।'[৮৫]

এর অর্থ কী? আমরা যেমন কারও কর্মে খুশি হয়ে বলি, তুমি বেঁচে থাকো, তুমি দীর্ঘজীবী হও। ঠিক ওই রকম বিষয়েই আরবিতে বলা হয়,

سَلَامٌ عَلَيْكَ

'তুমি দীর্ঘজীবী হও।'

---

৮৫. সূরা সাফফাত : আয়াত ১০৯

সুতরাং ইবরাহীম (আ.)-এর আমল আল্লাহ তা'আলার নিকট পছন্দ হয়েছে। আল্লাহ তাকে বাহবা দিয়েছেন এবং পরবর্তী উম্মতের জন্যও এই আমল জারি রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ

'আমি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও এ আমল জারি করে দিলাম।'[৮৬]

অতএব, এ আমল এখানে চালু রয়েছে। ঈদুল আযহার দিনে আমরা যে-কুরবানি করি, এটি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সুন্নত। আল্লাহ তা'আলা তার পক্ষ থেকে এটি কবুল করেছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত জারি রেখেছেন।

হানাফি ফেকাহ শাস্ত্রের (মাযহাবের) গ্রহণযোগ্যতা

আল্লাহ তা'আলার মকবুল বান্দা ইমাম আযম আবুহানীফা (রহ.)-এর কর্মকে আল্লাহ তা'আলা কেমন বৈশিষ্ট্য দান করেছেন! বর্তমানে আপনি পৃথিবীর পূর্ব দিগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্ত প্রর্যন্ত সফর করুন। দেখবেন, অধিকাংশ স্থানে হানাফি মাযহাবের প্রচলন রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বাংলদেশ, ভারত, পাকিস্তান, মাওয়ারাউন্নাহার, উজবেকিস্তান, কাজাকিস্তান, তাজিকিস্তান, চীন, সিগনাই; যেখানেই মুসলিম রয়েছে, সেখানেই ইমাম আবুহানীফার মাযহাবের ওপর আমল রয়েছে। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, পাশ্চাত্যে গেলে আপনি দেখবেন, তারা ইবাদাতের ক্ষেত্রে মালেকি মাযহাবের অনুসারী বেশি। কিন্তু বিচারকার্যের ব্যাপারে তারাও ইমাম আবুহানীফা (রহ.)-এর মাযহাবকে প্রাধান্য দেয়। আল্লাহু আকবার!

সুইডেনের এক জজ সাহেবের সঙ্গে জাহাজের মধ্যে আমার সাক্ষাৎ হলো। কথাবার্তা বললাম। খুবই বিজ্ঞ আলেম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের দেশে কোন মাযহাবের অনুসারী বেশি? তিনি বললেন, আমরা ইবাদাতের ক্ষেত্রে মালেকি মাযহাবের অনুসরণ করি। তবে বিচারকার্যে ইমাম আবুহানীফার মাযহাব অনুযায়ী ফতোয়া দিয়ে থাকি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কেন? তিনি বললেন, বর্তমান পৃথিবীতে ইমাম আবুহানীফা (রহ.)-এর মাযহাবের চেয়ে পরিপূর্ণ কোনো মাযহাব নেই। যেকোনো বিষয়ে এ মাযহাবে তৃপ্তিমূলক সমাধান পাওয়া যায়।

---

৮৬. সূরা সাফফাত : আয়াত ১০৯

মিশর গেলাম। ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় জামেয়া আযহারের এক শিক্ষকরে সঙ্গে কথা হলো। তিনি বললেন, আমরা ইবাদাতের ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর মাযহাব পালন করি। কিন্তু আইনের ক্ষেত্রে ইমাম আবুহানীফার মাহযাবমতো রায় ঘোষণা করি। কারণ, এ মাযহাবে নিখুঁত সমাধান পাওয়া যায়। এটি আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবুল হওয়ার আলামত। বাদশাহ হারুন রশীদ তাঁর একদল প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন চীনের প্রাচীর দর্শন করার জন্য। তারা সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে বললেন, আল্লাহু আকবার! যেখানেই যাচ্ছি, সেখানেই হানাফি মাযহাবের অনুসারী পাচ্ছি।

ইমাম বোখারি (রহ.)-এর রচিত বোখারি শরীফ আল্লাহ তা'আলা কেমন কবুল করেছেন! আজ সেই বোখারি শরীফ না পড়ে কোনো মানুষ আলেম হতে পারে না। এই গ্রহণযোগ্যতা আল্লাহ তা'আলার দরবারে স্থান পেয়েছে। তাই আমলের গ্রহণযোগ্যতার জন্য সচেষ্ট হওয়া চাই। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন।

দারুল উলূম দেওবন্দের অবস্থান

বন্ধুগণ! আপনারা লক্ষ করে দেখুন, পৃথিবীতে অনেক মাদরাসা রয়েছে। কিন্তু সেগুলোর মধ্যে দারুল উলূম দেওবন্দ আল্লাহ তা'আলার নিকট কেমন গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে! আজ সারা বিশ্বে দেওবন্দ মারাসার ছাত্ররা দীনের খেদমত করছে। আপনি বিশ্বের যেখানেই যাবেন, সেখানেই হয়তো সরাসরি দারুল উলূম দেওবন্দের ছাত্র পাবেন, নাহয় মাধ্যমসূত্রে এ মাদরাসার ছাত্র পাবেন। আমি একথাটি আমার বন্ধুদের নিকট আরও অনেকবার বর্ণনা করেছি যে, এই দীনের উসিলায় আল্লাহ তা'আলা আমাকে পৃথিবীর প্রায় পঞ্চাশটি দেশ ভ্রমণ করার সুযোগ দিয়েছেন। পৃথিবীর প্রাচ্য, পাশ্চাত্য সব সফর করেছি। সাইবেরিয়ার মতো দেশে, যেখানে শুধু বরফ আর বরফ, সে দেশ সফর করলাম। রাস্তার পার্শ্বে প্রায় দুই ফুট পর্যন্ত বরফ। নামাযের সময় হলো। বরফের মধ্যেই একটি গর্ত করা হলো। পানি জমা হয়েছে। উজু করলাম। বরফের ওপর জায়নামায বিছিয়ে নামায পড়লাম। আশ্চর্যের বিষয় হলো, সেই বরফখণ্ড এত শক্ত যে, নামায শেষ করলাম; কিন্তু জায়নামায ভিজেনি। তবে অত্যধিক শীতল।

এমন স্থানেও আল্লাহ তা'আলা পৌঁছিয়েছেন, যেখানে শুধু বরফ আর বরফ। মানুষের ঘরবাড়িও বরফের। দরজা, খাট ইত্যাদিও বরফরে তৈরী।

বিভিন্ন দেশের মানুষ লাখ-লাখ ডলার ব্যয় করে শুধু উপভোগ করার জন্য সেখানে গিয়ে থাকে। এই দীনের খাতিরে আল্লাহ তা'আলা আমি অধমকে সেখানে যাওয়ারও তাওফীক দিয়েছেন। এমন একস্থানে গিয়েছি, যাকে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত বলা হয়। আমার খুব অবাক লাগছে। আমার সাথিদের জিজ্ঞাসা করলাম, একে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত বলা হয় কেন? তারা বলল, পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞানী একমত যে, এটা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত। তাই সরকার এখানে সাইনবোর্ড স্থাপন করেছে যে, এটা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তবু একটা কারণ তো অবশ্যই আছে? তারা বলল, হ্যাঁ; এর একটি কারণ রয়েছে। সেটা হলো, এখানে বছরে এমন একটি দিন আসে, যেদিন সূর্য এখানে অস্ত যাওয়া অবস্থায়ই পুনরায় উদিত হয়ে যায়। ওই দিন পৃথিবীর লাখ-লাখ পর্যটক এই দৃশ্য দেখার জন্য এখানে আগমন করে।

বন্ধুগণ! আমার একথাগুলোর উদ্দেশ্য হলো, এই দীনের খাতিরে আল্লাহ আমাকে ওই সমস্ত স্থানেও যাওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন। তবে এই মিম্বরে বসে বলছি, আমি অধম পৃথিবীর যেস্থানেই গিয়েছি, সেখানেই দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসার সরাসরি অথবা মাধ্যমসূত্রে কোনো-না-কোনো ছাত্র পেয়েছি। তারা দীনের কাজ করছে। তা দেখতে যেন এমন–

یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا شہ پارہ ہے
ہر پھول یہاں اک شعلہ ہے ہر سرو یہاں مینارہ ہے
عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا ساعھ عمل
انکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل

এটি ইল্‌ম ও গুণের দোলনা, ইতিহাসের এক শীর্ষ অধ্যায়।

এখানকার প্রত্যেকটি ফুল একেকটি প্রদীপ এবং প্রত্যেকটি মাথা একেকটি মিনারা।

আবেদের বিশ্বাসে এক আলোকোজ্জ্বল দৃশ্য, সৌভাগ্যের সত্য আমল।

চক্ষু কোথায় দেখবে এখলাছের এই তাজমহল?

সেই এখলাছ, সেই নিষ্ঠা আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য। আজ আল্লাহ তা'আলা তার কল্যাণ সারা দুনিয়ায় পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

আমল কবুল হওয়ার পঞ্চম আলামত হচ্ছে 'তাক্ওয়া'। অর্থাৎ– মানুষ সতর্কতার সাথে আমল করবে। আমাদের অনেক সময় কোনো কাজে সংশয় দেখা যায়। যেখানে আমাদের মন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যায়, এটা করব, নাকি ওটা করব। সুতরাং এমন সংশয়ের স্থলে সন্দেহযুক্ত কাজটি আল্লাহর জন্য বর্জন করা। একেই তাক্ওয়া বলে।

তাক্ওয়ার মর্ম আরও সহজে বুঝতে হলে শুনুন। বর্তমান যুগে একে বলা হয় Tobe on the safe side যাতে নিরাপদের চেয়েও ওপরে হয়। যেমন– আপনার ফ্লাইট বিকাল পাঁচটায়। সুতরাং আপনাকে চারটার সময় বিমানবন্দরে প্রবেশ করতে হবে। এক্ষেত্রে আপনি সাড়ে তিনটা কিংবা পোনে চারটায় বিমানবন্দরে ঢুকে গেলেন। অথবা মনে করুন, আপনি ১০ জন মেহমানকে দাওয়াত দিলেন। আপনার স্ত্রীকে বললেন, ১৫জন মেহমানের খাবার পাক করে দাও। একে বলে To be on the side। সুতরাং দুনিয়ার কাজে যারা এমন সতর্কতা অবলম্বন করে, শরীয়তের কাজে এমন সতর্কতা অবলম্বন করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে 'মুত্তাকী' বলে আখ্যায়িত করেন।

অতএব, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ

'আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের আমল কবুল করেন।'

সুতরাং এই পাঁচটি বিষয় আলোচন করলাম, যার দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, মানুষের আমল কবুল হয়েছে কি-না।

আম্বিয়ায়ে কেরামের ভাবনা

একটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আমলের গ্রহণযোগ্যতার চিন্তা মুমিনের অন্তর থেকে দূরীভূত হতে পারে না। সর্বক্ষণ এই চিন্তা লেগেই থাকবে। এমন কোনো মুহূর্ত আসবে না যে, এখন পা গুটিয়ে বসে থাকবে যে, এখন আর আমার আমল কবুল হবে না। আবার এ-ও হবে না যে, আমল করে নিরাপদে বসে থাকবে, আমার আমল তো কবুল হবেই। সর্বক্ষণ এ ভয় থাকবেই যে, আমার আমল কবুল হলো কি-না। আমরা সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, আউলিয়ায়ে কেরাম এবং আম্বিয়ায়ে কেরামেরও এমন চিন্তা থাকত যে, আমার আমল কবুল হয়েছে কি-না। আল্লাহু আকবার! গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনুন-

اِبْتِهَانُ الْاَنْبِيَاءِ اِلَى اللهِ بِاَنْ يَّرْزُقَ الْقُبُوْلَ

'আল্লাহ তা'আলার দরবারে আম্বিয়ায়ে কেরামের আহাজারি যে, আমাদের আমল কবুল হয়েছে কি-না।'

সুতরাং তাদের ন্যায় নিষ্পাপ বান্দাগণও এই আর্তনাদ করেছেন। দেখুন, পবিত্র কুরআন বলেছে,

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ۚ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

'হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.) কা'বা শরীফ নির্মাণ করে আল্লাহর দরবারে কাঁদছেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের পক্ষ থেকে একাজ কবুল করে নিন।'[৮৭]

অন্যস্থানে ইবরাহীম (আ.) দু'আ করেন–

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ۝

'হে আল্লাহ! আমাকে ও আমার বংশধরকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানাও। হে আমার মালিক! আমার প্রার্থনা কবুল করুন।'[৮৮]

নবীগণের হৃদয়ও কম্পিত হতো-

رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ

'হে আল্লাহ! আমার দু'আ কবুল করুন।'

আরও দেখুন পুণ্যবান নারীদের আর্তনাদ। পবিত্র কুরআনে হযরত ইমরান (আ.)-এর স্ত্রীর কথা বলা হয়েছে। তিনি অন্তঃসত্তা, মনে-মনে আশা যে, আমার সন্তান বড় হয়ে পুণ্যবান হবে। এখনো জন্ম হয়নি। তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করছেন,

رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ ۚ

' হে আল্লাহ! আমি মান্নত করেছি, আমার গর্ভে যে সন্তান আছে, তাকে আমি আপনার জন্য উৎসর্গ (স্বাধীন) করে দেব। আপনি তাকে আমার পক্ষ থেকে কবুল করুন।'[৮৯]

---

৮৭. সূরা বাকারা : আয়াত ১২৭
৮৮. সূরা ইবরাহীম: আয়াত ৪০
৮৯. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৩৫

দেখুন, আল্লাহ তা'আলা যাতে কবুল করে নেন সে ব্যাপারে মা অত্যন্ত চিন্তায় ব্যস্ত আছেন। এটা সর্বক্ষণের ভাবনা, যাতে আল্লাহ তা'আলা আমার আমল কবুল করে নেন। এবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা শ্রবণ করুন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা

হাদীছ শরীফে এসেছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানি দেওয়ার সময় এ দু'আ করতেন–

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَمِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ

'হে আল্লাহ! এ প্রাণীর কুরবানি মুহাম্মদ ও মুহাম্মদের উম্মতের পক্ষ থেকে কবুল করুন।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রহ.) সূত্রে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করতেন–

رَبِّ اَعِنِّیْ وَتَقَبَّلْ تَوْبَتِیْ وَاَجِبْ دَعْوَتِیْ

'হে আল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন। আমার তাওবা কবুল করুন এবং আমার প্রার্থনার জবাব দিন।

অর্থাৎ– কবুল করুন।

হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করতেন–

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ حَسَنَاتِ

'হে আল্লাহ! আমার নেক আমলসমূহ কবুল করে নিন।'

দেখুন, যার সামনের ও পেছনের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, তিনিও এমন দু'আ করতেন। বোঝা গেল, তিনি এভাবে প্রার্থনা করার জন্য উম্মতদের শিক্ষা দিয়েছেন।

এমন যেন না হয় যে, নামায আদায় করে নিয়েছে; এ-ই যথেষ্ট হয়ে গেছে। বরং সেই নামায কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করতে হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফতারের সময় দু'আ করতেন–

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ

'হে আল্লাহ! আমি আপনার জন্য রোযা রেখেছি এবং আপনার প্রদত্ত রিযিকের মাধ্যমে ইফতার করছি। সুতরাং আপনি আমার পক্ষ থেকে কবুল করে নিন।'

কাজেই আমল করার পর তা গ্রহণযোগ্যতার জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করতে হবে। তবেই বোঝা যাবে, আপনি আমলের গ্রহণযোগ্যতার জন্য চিন্তাশীল রয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলার অমুখাপেক্ষিতা

এখানে একটি বিষয়ের একটু বিশ্লেষণ করতে চাই যে, শেষ পর্যন্ত এত ভয়ের কারণ কী? একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন! আমি আশা করছি, এ-ব্যাপারে আপনারা আমাকে সহযোগিতা করবেন। আমি যা বলছিলাম, তার নির্যাস আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব। বিষয়টি হলো, পরিশেষে এত ভয়ের কারণ কী?

শুনুন। আমল করার পরও এত ভয়ের কারণ হচ্ছে, এটা সত্য যে, আল্লাহ তা'আলার رحيم (দুয়ালু), كريم (অতিশয় দয়াবান), ستار (গোপনকারী), غفار (ক্ষমাশীল), رؤوف (মেহেরবান)। এই গুণগুলো আল্লাহর মধ্যে রয়েছে। তবে আরেকটি গুণ আছে صمد (অমুখাপেক্ষী)। তিনি কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন। আমরা আমল করলে আল্লাহ তা'আলার কোনো প্রকার লাভ হবে না এবং না করলেও তাঁর কোনো ক্ষতি হবে না। তিনি আমাদের আমলের মুখাপেক্ষী নন। তাই কোনো কবি বলেন,

کیا کیا اپنے زہد واطاعت پہ ناز تھا
بس دفع نکل گیا جو سنا بے نیاز ہے

'পরহেযগারী ও আনুগত্য করে কি আর মহান কাজ করেছ? সব কিছুই শেষ হয়ে যাবে যখন শুনবে, তিনি এগুলোর মুখাপেক্ষী নন।'

যখন আপনি শুনবেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকল আমল থেকে অমুখাপেক্ষী, তখন তো ভয় আসতেই হবে যে, আমাদের আমলসমূহের যদি

আল্লাহ তা'আলার কোনো প্রয়োজনই না থাকে, তাহলে সেগুলোর প্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে কী হবে? এজন্যই প্রত্যেকেই এমনকি নবীগণ পর্যন্ত সেই ভয়ে কাঁদতেন। গভীর রাতে ঘুম ত্যাগ করে আল্লাহর দরবারে আহাজারি করতেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তো আমাদের কাজের মুখাপেক্ষী নন। তিনি এর চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে। তাই আল্লাহ তা'আলা মহত্ত্বের প্রতি চিন্তা করে কাঁদতেন, হায়! তাঁর শানমতো আমাদের কাজ হয়েছে তো? তিনি এগুলো থেকে পূতঃপবিত্র থাকা অবস্থায়ও আমাদের আমল কবুল করবেন কি-না। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ

'জেনে রাখো! আল্লাহ বান্দা ও তার অন্তরের মাঝখানে প্রতিবন্ধক হন।'[৯০]

মানুষের যে আশা থাকে, তা সম্পন্ন হয় না। অন্য এক জায়গায় বলেন,

اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ۚ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

'তারা কি আল্লাহর কৌশল থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে? ক্ষতিগ্রস্ত (কাফের) সম্প্রদায় ব্যতীত কেউ আল্লাহর কৌশল থেকে নির্বিঘ্ন হতে পারে না।'[৯১]

যারা ঈমানদার, তারা অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করবে। এটা কোনো আইনানুগ বিষয় নয় যে, আমি আমল করেছি। তাই আমাকে জান্নাতে দেওয়া আল্লাহ তা'আলার কর্তব্য। মরণ পর্যন্ত এ চিন্তা থাকতে হবে যে, আমার আমল আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবুল হয়েছে কি-না।

পরিশেষে বলতে চাই, সাহাবায়ে কেরামের আমলের প্রতি অবলোকন করো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবানে যাদের জান্নাতের সুসংবাদ এসেছিল, তারা কেমন ভয় করতেন। সাইয়্যেদা আয়েশা (রাযি.), যিনি আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় পাত্রী ছিলেন, তিনি তাহাজ্জুদের নামায পড়ছেন। একটি আয়াত সামনে এলে সঙ্গে-সঙ্গে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়তেন। আয়াতটি হলো,

وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ۝

---

৯০. সূরা আনফাল : আয়াত ২৪

৯১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ৯৯

'কেয়ামতের দিন একটি বিষয় তাদের সম্মুখীন হবে, যে বিষয়ে তারা কল্পনাও করত না।'[৯২]

এ আয়াতটি পাঠ করছেন আর সারা রাত কাঁদছেন। কি জানি, আমারও এমন কোনো বিষয় সম্মুখীন হয়ে যায় কি-না, যার ফলে আমি আল্লাহর সম্মুখে লজ্জিত হতে হয়। দেখুন, দুনিয়াতে যারা আল্লাহর ইবাদাতের প্রতিচ্ছবি, তাঁরাই এমন কাঁদছেন। অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّ قُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ

'আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামত হতে তারা আল্লাহর রাস্তায় যা দান করছে। এরপরও আল্লাহর ভয়ে তাদের হৃদয় প্রকম্পিত হচ্ছে।'[৯৩]

তাঁরা এমন করতেন কেন? কারণ, তাঁরা তাদের প্রভুর প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী।'

আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট দণ্ডায়মান হতে হবে। তাই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ۝

'হে মানবসম্প্রদায়! তোমাকে তোমার পালনকর্তা পর্যন্ত পৌঁছতে কষ্ট স্বীকার করতেই হবে। অবশেষে তোমার পালনকর্তার সাথে সাক্ষাৎ ঘটবেই।'[৯৪]

সুতরাং যে সেই সাক্ষাতের অনুভূতি রাখে, সে কাঁদে, তার চোখ থেকে আরামের ঘুম হারাম হয়ে যায়। অতএব, মুমিন আমলও করে এবং আল্লাহর প্রতি ভয়ও রাখে। কারণ, সে ভাবে, আমি জানি না, আমার পালনকর্তার সঙ্গে আমার মামলার অবস্থা কী হবে। এবার আল্লাহ তা'আলার অমুখাপেক্ষিতার কথা শুনুন।

বনী ইসরাইলের এক দরবেশ

হাদীছ শরীফে এসেছে, বনী ইসরাইলে এক আবেদ ছিল। সে তিনশত বছর আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করেছে। আর আমাদের জীবনই তো মাশাআল্লাহ পঞ্চাশ-ষাট বছর। যাক সে তিনশত বছর আল্লাহর ইবাদত

---

৯২. সূরা যুমার : আয়াত ৪৭
৯৩. সূরা মুমিনূন : আয়াত ৬০
৯৪. সূরা ইনশিকাক : আয়াত ৬

করেছে। এতে সে مستجاب الدعوة (যার দু'আ সরাসরি কবুল হয়ে যায়)-এর যোগ্য হয়েছে। তারপর একটিমাত্র ভুল করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ

'অবশ্যই আমি ইচ্ছা করলে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিতাম সেই নিদর্শনসমূহের বদৌলতে। কিন্তু সে নিজে অধঃপতিত হলো এবং নিজের রিপুর অনুগামী হয়ে রইল।'[৯৫]

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ

'তার দৃষ্টান্ত কুকুরের মতো।'

আল্লাহু আকবার! অন্তর প্রকম্পিত হয়ে যায়। এই আয়াতটি তেলাওয়াতের সময় অন্তর স্তব্ধ হয়ে যায়। ওই বান্দা তিনশত বছর আল্লাহর ইবাদত করেছিল। তিনশত বছর পর্যন্ত আল্লাহর সামনে মাথা নত করার পর আল্লাহ কী বললেন? বললেন, 'তার দৃষ্টান্ত কুকুরের মতো'।

আবু আবদুল্লাহ উন্দুলুসি (রহ.)-এর ঘটনা

শায়খুল হাদীছ (রহ.) হযরত আবু আবদুল্লাহ উন্দুলুসি (রহ.)-এর ঘটনা লিখেছেন যে, তিনি হাফেযে কুরআন ও হাফেযে হাদীছ ছিলেন। এক লাখ হাদীছ তার মুখস্থ ছিল। লাখ-লাখ ছাত্রের ওস্তাদ ছিলেন। ঘটনাটা হলো। তিনি এক লোকালয় দিয়ে যাচ্ছেন। সেখানে ক্রুশদণ্ড বা শূলিকাষ্ঠ স্থাপন করা ছিল। সেটা দেখে তিনি মনে-মনে তাদের ঘৃণা করলেন, কেমন নির্বোধ মানুষ তারা! আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অন্যকে শরীক করে কোন বিবেকে?

সামান্য ওই কথার ওপরই আল্লাহ তা'আলার পাকড়াও এসে গেল। কোনো কবীরা গুনাহ করেননি। খ্রিস্টানদের বর্তমান ধর্মবিশ্বাসকে শুধু ঘৃণা করেছেন। এতেই পাকড়াও কেন? কারণ, তোমার হেদায়াতে তুমি নিজেকে আমার ওপর প্রাধান্য দিয়েছ। তুমি হেদায়াতের ওপর থাকার মধ্যে যে আমি আল্লাহর অফুরন্ত দয়া রয়েছে, সেদিকে একটুও ভ্রূক্ষেপ করনি। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার প্রতি তার যে-আনুগত্য ও বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ তা'আলা সেটি তুলে নিলেন।

---

৯৫. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৭৬

আগেকার যুগে কূপ থেকে পানি উঠিয়ে তার পার্শ্বে পাত্রসমূহ ভরে রাখার জন্য সেই কূপে তরুণীদের নিয়োগ করে রাখা হতো। সুতরাং তিনি এক কূপে উজু করতে গেলেন। সেখানে এক তরুণীর প্রতি তার দৃষ্টি আটকা পড়ে গেল। অন্তরের ভাব তার প্রতি বদ্ধমূল হয়ে গেল। ছাত্রদের বললেন, তোমরা যাও; আমি একটু পরে আসছি। আমি তরুণীর পিতার সঙ্গে কথা বলে, তাকে বিয়ে করব। অনেক অনুনয় বিনয় করার পর ছাত্ররা চলে গেল।

তাঁর এই বিশাল দলের দায়িত্বভার নিলেন তাঁর প্রধান ছাত্র আল্লামা শিবলি (রহ.)। তিনি নিয়মিত অন্যান্য শিষ্যদের তরবিয়ত দিচ্ছেন। এদিকে আবু আবদুল্লাহ উন্দুলুসি ওই তরুণীর খ্রিস্টান পিতার নিকট গিয়ে তার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। সে বলল, ঠিক আছে; আমি তোমার প্রস্তাবে রাজী আছি। তবে তুমি তো আমাদের নিকট অপরিচিত ব্যক্তি। তুমি কিছুদিন আমাদের এখানে থাকো; তোমার চালচলন আমরা দেখি। আমাদের অবস্থাও তুমি অবলোকন করো। সুতরাং তুমি এখানে দু-বছর থাকতে হবে। আমাদের শূকরের পাল আছে। এগুলোর রাখালি করবে। দু-বছর একাজ করার পর তোমার আচরণ আমাদের পছন্দ হলে তোমার নিকট আমার মেয়ে বিয়ে দেব।

তার সকল শর্তে তিনি রাজি হলে গেলেন। খ্রিস্টানের বাড়িতে থাকছেন। শূকর নিয়ে প্রতিদিন জঙ্গলে যাচ্ছেন। সারাদিন শূকরের রাখালি করে বিকালে এসে তাদের পরিবারের সঙ্গে থাকছেন, খাচ্ছেন।

আল্লাহর শান দেখুন। তুমি লাখো মানুষের রাহবর ছিলে। সামান্য একটু কথায় আল্লাহর দৃষ্টি থেকে সরে পড়লে। এখন শূকরের রাখালির কাজে নিয়োজিত হলে।

এক বছর পর আল্লামা শিবলি (রহ.) ওই রাস্তা দিয়ে প্রত্যাবর্তন করছেন। ওস্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হৃদয়ে আবেগ সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, তিনি জানতেন, আমার ওস্তাদ একজন ধার্মিক, মুত্তাকী ও পরহেযগার মানুষ। এখন একটি বিষয়ে শয়তান তার ওপর বিজয়ী হয়ে তাকে ফাঁদে আটকে রেখেছে। আল্লাহর রহমত পুনরায় আপতিত হচ্ছে। লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, এমন-এমন লোকটি অমুক বিষয়ে এখানে ছিল। সে এখন কোথায় আছে? লোকজন বলে দিল, তিনি এই শর্তে অমুক বাড়ির শূকরের রাখালির কাজে জঙ্গলে আছেন। তিনি সেখানে দেখলেন। তার মাথায় খ্রিস্টানদের টুপি আর যে-লাঠিটা হাতে নিয়ে তিনি শিষ্যদের সামনে খুতবা দিতেন, সেই লাঠি দিয়ে

আজ জঙ্গলে শূকর চরাচ্ছেন। ওস্তাদের এ করুণ অবস্থা দেখে তার দুচোখ দিয়ে অশ্রুর ঝরনা বয়ে যায়।

তিনি তার নিকটে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, হুজু! আপনি কুরআনের হাফেজ ছিলেন। কোনো আয়াত কী এখনো স্মরণ আছে? তিনি বললেন, কুরআনের মাত্র একটি আয়াত আমার মুখস্থ আছে। সেটি হলো–

وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ

'আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন, কেউ তাকে সম্মান দিতে পারে না।'[৯৬]

আল্লামা শিবলি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, হুজুর! আপনি হাফেযে হাদীছ ছিলেন। কোনো হাদীছ কি আপনার স্মরণ আছে? বললেন, হ্যাঁ; একটি হাদীছ স্মরণ আছে। সেটি হলো-

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهٗ فَاقْتُلُوْهُ

'যেব্যক্তি তার ধর্ম (ইসলাম) পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা করে ফেলো।'

তার কথা শুনে শিবলি (রহ.) অঝোর ধারায় কাঁদতে শুরু করেন। তাঁর কান্না দেখে উন্দুলুসি (রহ.)-এরও হুশ ফিরে এল। আল্লাহর রহমত আবার আছর করতে থাকে। তিনি আল্লাহর দরবারে হাত তুলে কাঁদতে থাকেন, হে আল্লাহ! আমি তো এমন হওয়া চাইনি। এটা আমার প্রত্যাশা ছিল না। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। আমার ভুল হয়ে গেছে। সাথে-সাথে শিবলি (রহ.)ও দু'আ করছেন, হে আল্লাহ! আমার ওস্তাদকে পুনরায় হেদায়াত দান করুন। উভয়ে আল্লাহর দরবারে কাঁদছেন। আল্লাহ তা'আলা তার প্রার্থনা কবুল করেন এবং তাকে পুনরায় হেদায়াতের নূর দ্বারা ধন্য করেন। আল্লামা শিবলি তাকে তাওবার বাক্য পাঠ করান। আল্লাহর হেদায়াতের সুশীতল ছায়াতলে পুনরায় আশ্রয় নেন।

অতএব, বন্ধু! আমাদের সতর্ক হওয়া দরকার। কে জানে কোন বিপদ তার জন্য কোন সময়ের অপেক্ষা করছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সর্বদা আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করতে হবে। আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতে হবে। আমি জানি না, আমার সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার কেমন আচরণ হবে। হে আল্লাহ! আপনি তো আমাদের অবস্থা জানেন। আজ আমল করি, কাল অলস হয়ে যাই। কাল আমল করি, পরশু স্তব্ধ হয়ে যাই।

---

৯৬. সূরা হজ : আয়াত ১৮

সুতরাং এই অবস্থায় আল্লাহর দরবারে হাজিরা দেব কীভাবে? আমার একটি আয়াতের প্রতি খেয়াল হলো। বিষয়টি ব্যক্তিগত; তবে উপকারের জন্য সবার সম্মুখে আলোচনা করছি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

'নিশ্চয় আমি তোমাদের ওপর কিতাব নাযিল করেছি। এতে রয়েছে তোমাদের জন্য উপদেশ। তোমরা কি বোঝ না?'[৯৭]

তখন মনে-মনে ভাবতে লাগলাম, আমাদের জন্য উপদেশ-এর মর্ম হলো, কুরআন তেলাওয়াতকারী এভাবে মনোযোগ দিয়ে পাঠ করবে যে, কোথায় কী আছে; প্রত্যেকটি আয়াত গবেষণা করে পাঠ করবে এবং কোন আয়াতের ভাবার্থ আমার অবস্থার সঙ্গে ফিট করা যায়। তারপর বাস্তবেই একটি আয়াত পেয়ে গেলাম, যা ১০০% আমাদের জীবনের সঙ্গে প্রযোজ্য। সেই আয়াতটি হলো, আল্লাহ তা'আলা এক গোলামের আলোচনা করে বলেন,

عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَىْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ

'সে কোনো কাজের সামর্থ্য রাখে না। সে তার মালিকের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'[৯৮]

اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ

'সে কোথাও গেলে কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।'[৯৯]

বর্তমানে আমাদের অবস্থাও হুবহু এরকম হবে, যা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ

'সে তার মালিকের জন্য বোঝা হয়েছে।'[১০০]

আমাদের গুনাহ জমিনের ওপর বোঝা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

৯৭. সূরা আম্বিয়া : আয়াত ১০
৯৮. সূরা নাহল : আয়াত ৭৫, ৭৬
৯৯. সূরা নাহল : আয়াত ৭৬
১০০. সূরা নাহল : আয়াত ৭৬

سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ ۝

'হে জিন ও মানব! আমি শীঘ্রই তোমাদের জন্য কর্মমুক্ত হয়ে যাব। তোমাদের ব্যাপারে আমি বসব। তোমরা আমার জমিনের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছ।'[১০১]

সুতরাং ভাই! আমাদের নিকট আহাজারি ও বিনয় ব্যতীত কিছুই নেই। আমাদের অবস্থা হলো এরকম, যেমন– কোনো স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে শাসাচ্ছে। বলছে, কুশ্রী, নির্বোধ, অশিক্ষিত ও অযোগ্য গৃহিণী, কোনো কিছুই তোমরা নিকট নেই। তখন তার স্ত্রী জবাব দিল,

نہیں کوئی اوقات اوگنہاردی

نہیں کوئی اوقات او گنہاردی

হ্যাঁ, আপনার কথা ঠিকই যে, আমি আপনাকে কোনো গুণ দেখাতে পারিনি। তবে একটি জিনিস দিয়েছি। আর তা হলো অকৃত্রিম ভালোবাসা। একথা বলার সঙ্গে-সঙ্গেই স্বামীর ক্রোধ প্রশমিত হয়ে গেল। তাকে আদর করতে লাগল।

সুতরাং আমাদেরও অবস্থাও এটাই হে আল্লাহ! আমাদের নিকট কোনো আমল নেই, যা তোমার দরবারে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। সবকিছুই শূন্য। তবে প্রত্যাশা এতটুকু যে, আপনার কালেমা পাঠ করেছি। আপনার একত্বের সাক্ষ্য দিয়েছি। হে আল্লাহ! শেষ পর্যন্ত আমরা আপনারই বান্দা। সুতরাং আমরা যেন আপনার অবাধ্য হয়ে না যাই, আপনার বন্দেগি থেকে দূরে না সরি। তাই একটু দয়া করুন। আপনি আমাদের কবুল করুন। আমাদের এমন বানিয়ে দিন, যাতে আমরা আপনার পছন্দে এসে যাই।

کون مقبول ہے کون مردود ہے * بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے

جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر * تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے

কে গ্রহণযোগ্য, কে বিতাড়িত হে উদাসীন! তোমার কি খবর আছে কোনটি কী? যখন আমলনামা মিযানে উঠানো হবে, তখন প্রকাশ হবে কোনটি ত্রুটিযুক্ত আর কোনটা নিখাঁদ।

---

১০১. সূরা আর-রাহমান : আয়াত ৩১

হে আল্লাহ! সেই প্রমাণ তো কেয়ামতের দিন হবে। আপনি শুধু একবার আমাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকান। আমরা আপনার পছন্দে এসে যাব। সুতরাং ভাই! আমাদের বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার একটি দৃষ্টির ওপর স্থগিত। আল্লাহ তা'আলার মায়ার দৃষ্টিতে আমাদের প্রতি এক নজর তাকালেই আমাদের ভাঙা তরি কিনারায় এসে যাবে।

কোনো কবি বলেন,

بس اک نگاہ پر ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا

اے اللہ بس اک نگاہ پر ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا

ادا سے دیکھ لو جاتا رہے گلا دل کا

اے اللہ پیار سے دیکھ لو جاتا رہے گلا دل کا

'একটি নজরের ওপর স্থির রয়েছে হৃদয়ের সিদ্ধান্ত। কমনীয় দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখো, বিগলিত হতে যাচ্ছে অন্তর। হে আল্লাহ! একটু মায়ার দৃষ্টিতে দেখো, গলিত হৃদয় কাতরাচ্ছে।'

সুতরাং আজকের পর থেকে দু'আর মধ্যে একথাটি শামিল করবেন যে, হে আল্লাহ! আমাদের এমন বানিয়ে দাও, যাতে আমরা আপনার পছন্দে এসে যাই।

বন্ধুগণ! আমি বলছিলাম, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ

'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের পক্ষ থেকে কবুল করেন।'[১০২]

আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাক্ওয়া ও পবিত্র জীবন দান করুন। আমাদের সকলকে তাঁর প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন।

---

১০২. সূরা মায়েদা : আয়াত ২৭

আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহ

'একটু ভেবে দেখুন, আল্লাহ তা'আলা যদি আমাদের দৃষ্টিশক্তি না দিতেন, তাহলে আমরা অন্ধ থাকতাম। বাকশক্তি না দিলে আমরা বোবা হতাম। শ্রবণশক্তি না দিলে আমরা বধির থাকতাম। সুস্থতা না দিলে আমরা অসুস্থ থাকতাম। পোশাক না দিলে আমরা উলঙ্গ থাকতাম। খাবার না দিলে আমরা ক্ষুধার্ত থাকতাম। পানীয় না দিলে আমরা তৃষ্ণার্ত থাকতাম। ধন না দিলে আমরা সর্বহারা হতাম। সন্তান না দিলে আমরা নিঃসন্তান থাকতাম। বিদ্যা না দিলে আমরা অজ্ঞ থাকতাম। বিবেক না দিলে আমরা পাগল থাকতাম। সম্মান না দিলে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতাম।

বর্তমানে আমরা যে-সম্মানজনক জীবন যাপন করছি, তা একমাত্র মহামহিম প্রভুর অফুরন্ত দয়া। চাওয়া ব্যতীত তিনি আমাদের এসব কিছু দান করেছেন। সুতরাং আমাদের জন্য উচিত, মহান মালিকের অনুকম্পার কৃতজ্ঞতা আদায় করা।'

আল্লাহর নেয়ামতসমূহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

'নিশ্চয় আমি মানুষকে অতিশয় সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছি।'[১০৩]

সৃষ্টির সেরা মানুষের ওপর আল্লাহর নেয়ামতরাজি

পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহ তা'আলা প্রতিনিধি। তাদের বাহ্যিক গুণ পবিত্র। আল্লাহ তা'আলা তাদের অগণিত নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন। সেগুলো গণনা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا

'যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতসমূহ গণনা করতে চাও, তাহলে তোমরা সেগুলো গুনতে পারবে না।'[১০৪]

একটু ভেবে দেখুন, আল্লাহ তা'আলা যদি আমাদের দৃষ্টিশক্তি না দিতেন, তাহলে আমরা অন্ধ থাকতাম। বাকশক্তি না দিলে আমরা বোবা হতাম। শ্রবণশক্তি না দিলে আমরা বধির থাকতাম। সুস্থতা না দিলে আমরা অসুস্থ থাকতাম। পোশাক না দিলে আমরা উলঙ্গ থাকতাম। খাবার না দিলে আমরা ক্ষুধার্ত থাকতাম। পানীয় না দিলে আমরা তৃষ্ণার্ত থাকতাম। ধন না দিলে আমরা সর্বহারা হতাম। সন্তান না দিলে আমরা নিঃসন্তান থাকতাম। বিদ্যা না দিলে আমরা অজ্ঞ থাকতাম। বিবেক না দিলে আমরা পাগল থাকতাম। সম্মান না দিলে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতাম।

---

১০৩. সূরা তীন : আয়াত ৪

১০৪. সূরা ইবরাহীম : আয়াত ৩৪

বর্তমানে আমরা যে-সম্মানজনক জীবন যাপন করছি, তা একমাত্র মহামহিম প্রভুর অফুরন্ত দয়া। চাওয়া ব্যতীত তিনি আমাদের এসব কিছু দান করেছেন। সুতরাং আমাদের জন্য উচিত, মহান মালিকের অনুকম্পনার কৃতজ্ঞতা আদায় করা। মানুষের প্রকৃতি সাধারণত সৎকর্মপরায়ণ ও দুস্কৃতিকারী হয়।

মানুষ সোনা-রুপার মতো

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

اَلنَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

'মানুষ সোনা-রুপার খনির ন্যায় এক প্রকার খনি।'

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা কল্যাণকামিতা রেখেছেন এবং দুস্কৃতিও রেখেছেন। সৃষ্টিগতভাবেই আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে এ দুটি বিষয়ের সমন্বয় রেখেছেন। তবে যার মধ্যে সততার দিক প্রাধান্য হয়, তাকে ভালো মানুষ বলে এবং যার মধ্যে দুস্কৃতির দিক প্রাধান্য থাকে, তাকে দুষ্টু বলে। আল্লাহ বলেন–

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝

'শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তার। তারপর তিনি তাকে অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন।'[১০৫]

ফলে যারা সৎকর্মের দিককে প্রাধান্য দেয়, সে ব্যাপারে বলেন,

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ۝

'যে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে, অর্থাৎ– সৎকর্মের দিককে প্রাধান্য দেয়, সে কৃতকার্য এবং যে অসৎকর্মের দিককে প্রাধান্য দেয়, সে অকৃতকার্য।'[১০৬]

মানুষের আত্মার দুই অবস্থা

নফসে আম্মারা : মানুষের আত্মার দুটি অবস্থা আছে। এক. নফসে আম্মারা বা খারাপ আত্মা। মানুষের আত্মা যখন নফসে আম্মরাহ হয়ে যায়, তখন সেটা অবাধ্য হয়। ভালো-মন্দ যাচাই করতে পারে না। সুশ্রী ও কুশ্রী

---

১০৫. সূরা শামস : আয়াত ৭, ৮

১০৬. সূরা শামস : আয়াত ৯, ১০

পার্থক্য করতে পারে না। সত্য বলে, নাকি মিথ্যা বলে এর অনুভূতি আসে না। হালাল খাচ্ছে, নাকি হারাম খাচ্ছে এর কোনো চিন্তাই থাকে না। উপকার কিংবা অপকারের খবর থাকে না। অন্ধকার ও আলোর ব্যবধান বুঝতে পারে না। মিথ্যা বললাম। এর ফলে আমার অন্তরে কী পরিমাণ আঁধার ছেয়ে আছে এর কোনো অনুভূতি থাকে না। এমন আত্মা কুপ্রবৃত্তির প্রতি ধাবিত হয়।

সুতরাং তার শুধু একই প্রত্যাশা থাকে যে, আমার অভিলাষ পূর্ণ করতে হবে। বৈধ কিংবা অবৈধ যেকোনো পন্থায় তার ইচ্ছা পূরণ করতেই হবে। সে গুনাহ করে স্বাদ পায়। অন্যায়ভাবে অন্যকে কষ্ট দেয়। পরে আবার তা নিয়ে লোকসমাজে গর্ব করে বলে, দেখলি, আমি তার সঙ্গে কেমন আচরণ করেছি? সুতরাং এই নফসে আম্মারা গুনাহ করে অনুতপ্ত না হয়ে বরং এর ওপর গর্ব করে আনন্দ পায়।

নফসে লাওয়ামা : নফসে লাওয়ামা হলো, মানুষ গুনাহ করে তার জন্য অনুতপ্ত হয়, আহ! আমার এরকম কাজ করা উচিত হয়নি। সুতরাং যেব্যক্তি গুনাহ করে এর ওপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়, তার নফস নফসে লাওয়ামার প্রমাণ। কারণ, সে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে। এমন কর্ম করা আমার জন্য উচিত হয়নি। আমি খুবই ঘৃণিত কাজ করেছি। কিন্তু যেহেতু তার কুপ্রবৃত্তি শক্তিশালী, তাই উপস্থিত কাজ করে ফেলে। সুযোগ হলে কথা বলে ফেলে। তারপর এর জন্য হাহুতাশ করে। এমন আত্মা আনন্দ ও কষ্টের কাজ করে ফেলে। পরে চিন্তিত হয়, আমি অনুচিত কাজ করে ফেললাম। শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন করলাম। অপরাধও করে আবার আল্লাহর আনুগত্যও করে। এটা হচ্ছে নফসে লাওয়ামার পরিচয়।

পক্ষান্তরে যদি মানুষ তার নফসকে আরও বেশি পরিশুদ্ধ করে, তাহলে সে এমন স্তর পায়, যেখানে সৎকর্মপরায়ণতা প্রাধান্য হয়ে যায়। সুতরাং তার অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা প্রাধান্য হয়। আদেশ ও নিষেধের আনুগত্যের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক কাজে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের প্রতি খেয়াল রাখে। আল্লাহ তা'আলার নাফরমানির ক্ষেত্রে চিন্তা করতে থাকে। সেই পথে কদমও বাড়ায় না। যেমন ছাগল তার মালিকের ইশরায় ঘাস খাওয়া পরিহার করে, তেমনিভাবে সে-ও তার মালিকের নির্দেশের বাইরে নিজের অভিলাষ সংরক্ষণ করে এবং আল্লাহ তা'আলার বিধান নত শিরে মেনে নেয়। একে বলে, 'নফসে মুতমায়িন্নাহ'। এই অন্তর হাসিল করার জন্য মানুষকে সচেষ্ট হওয়া চাই। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে সফলতার দ্বারা ধন্য করবেন এবং তার মাথায় সম্মানের মুকুট পরিয়ে দেবেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

'হে নফসে মুতমায়িন্না! তোমার পালনকর্তার প্রতি প্রত্যার্বতন করো। তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট।'[১০৭]

فَٱدْخُلِى فِى عِبَٰدِى وَٱدْخُلِى جَنَّتِى

'আমার বান্দাদের দলভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।'[১০৮]

সুতরাং ভাই! এমন প্রচেষ্টাকারী হওয়া চাই, যাতে আল্লাহ তা'আলা আমাদের এমন অন্তর দান করেন। এর জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হবে। যেভাবে মানুষ বিভিন্ন বস্তু অর্জনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে, তেমন চেষ্টা করা অপরিহার্য। যদি হালাল রিযিক ও সত্য কথার অভ্যাস করে, তাহলে মানুষের মধ্যে সৎকর্মের প্রাধান্য পাবে।

আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যের মাধ্যম হচ্ছে কান্না

একটু চিন্তা করুন, মানুষ যখন এ পৃথিবীতে আগমন করে, তখন তার নিকট তার নিজস্ব কিছুই থাকে না। তার গায়ে পোশাক থাকে না। তার নিজস্ব জায়গা থাকে না। শরীরে এমন শক্তিও থাকে না যে, স্বেচ্ছায় দাঁড়াতে পারবে। কোনো বিবেক-বুদ্ধিও থাকে না। তার নিজস্ব কিছুই থাকে না। অথচ আল্লাহ তা'আলা ওই সময়ও তার সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ করেন। আল্লাহ তা'আলা সেই অবুঝ শিশুকে একটি নেয়ামত দিয়ে থাকেন, যাকে বলা হয় 'কান্না'। কান্না এমন একটি নেয়ামত যে, শিশু কাঁদছে আর সঙ্গে-সঙ্গে মাতাপিতা তার দুধের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। শিশু অসুস্থ হচ্ছে, কাঁদছে; মাতাপিতা তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করছে। ঘুমের ঘরে শিশু কাঁদছে। মা তার বিছানার ব্যবস্থা করছে। শিশুর যা কিছুর প্রয়োজন শুধু কান্নার উসিলায় আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন।

এখানে কোনো আল্লাহর ওলী একটি সূক্ষ্মতা বর্ণনা করেন। হে মানুষ! তুমি কাঁদতে জানলে আল্লাহ তোমার সব কাজ পরিপাটি করে দেবেন আর এখন তুমি কান্না ভুলে যাবে, তখন তোমার সকল কাজে ব্যাঘাত ঘটবে।

---

১০৭. সূরা ফাজর : ২৭, ২৮

১০৮. সূরা ফাজর : ২৯, ৩০

তারপর শিশু আস্তে-আস্তে বড় হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা আরও অসংখ্য নেয়ামত তাকে দান করছেন। যেমন– শৈশব থেকে যৌবনে পদার্পণ করল। আল্লাহ তা'আলা তাকে শক্তি দিলেন, বুদ্ধি দিলেন, ইল্‌ম দিলেন ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ.) সম্পর্কে বলেন–

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا

'সে যখন যৌবনে পা রাখল, আমি তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম।'

আল্লাহ তা'আলা তাকে জ্ঞান-বুদ্ধি, শক্তি, প্রজ্ঞা ইত্যাদি দান করেন। সে বিভিন্ন প্রকার কষ্ট সহ্য করতে পারে। উপকার ও ক্ষতির পার্থক্য অনুধাবনের অনুভূতি দান করেন। সে বুঝতে পারে, এটা উপকারী, ওটা অপকারী। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে ঘর দেন, বাড়ি দেন, সম্পদ দেন, স্ত্রী দেন, সন্তান দেন, সমাজে সম্মান দেন, ভালোবাসা দেন। ক্রমান্বয়ে অসংখ্য নেয়ামত দ্বারা তাকে পরিপূর্ণ করেন।

যৌবনকাল কীভাবে কাটাবে

যৌবনকাল এমন একটি সময়, যখন মানুষ সম্পূর্ণ নেয়ামতে পরিপূর্ণ থাকে। সুতরাং এ-সময়টা কীভাবে যাপন করবে? আল্লাহ তা'আলা আপনাকে-আমাকে এই অসংখ্য নেয়ামত দান করার মধ্যে একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। তা হলো, আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আমার বান্দা! আমার এতসব নেয়ামত তোমাকে ধার দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এ-সকল বস্তু তুমি তার মালিকের ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে হবে। কখনো দেখা যায়, মানুষ সেগুলো পেয়ে তার দাতাকে ভুলে যায়। যেব্যক্তি ধারকৃত বস্তুর প্রতি আসক্ত হয়ে অপাত্রে ব্যবহার করে সেটা ভেঙে ফেলে, কেউ তাকে জ্ঞানী বলে না। তাকে সবাই নির্বোধ বলে আখ্যায়িত করে। অতএব, মানুষ তার যৌবনকালে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়। সে ওই নেয়ামতগুলোকে ভালোবাসে। কিন্তু এগুলোর মালিককে ভুলে যায়। মাতলামিতে মত্ত হয়ে যায়। কারণ, যৌবনকালটা এমনই হয়ে থাকে। এজন্যই বলা হয়, মানুষ যখন তার জীবনের মূল্য বোঝে, তখন তার জীবনের অর্ধেকের চেয়েও বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। এটাই হচ্ছে জীবন।

আল্লাহর ইবাদতে পাগল যুবক

যারা চরিত্রবান হয়, তারা যৌবনেও আল্লাহর ইবাদতে মত্ত হয়।

হাদীছ শরীফে এসেছে–

شَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللهِ

'সেই যুবক যে আল্লাহর ইবাদাতের মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছে।'

যে-তরুণ যৌবনকালে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতে মত্ত হয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে কেয়ামতের দিন তার আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন। তাই কোনো কবি বলেন–

در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری * وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگاری

'যৌবনকালে তাওবা করা আম্বিয়ায়ে কেরামের আদর্শ। কেননা, বার্ধক্যে হিংস্র বাঘও দরবেশ হয়ে যায়।'

জ্ঞান ও ইচ্ছার দ্বারা গুনাহ বর্জনের ওপর পুরস্কার

আমাদের কোনো-কোনো বুযুর্গ বলেছেন, যে-যুবক কবীরা গুনাহ থেকে নিজেকে হেফাযত করে পুণ্যময় পবিত্র জীবন ধারণ করে, সে আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাত উঠিয়ে দু'আ করলে আল্লাহ তার দু'আ কবুল করে নেন। সুতরাং স্মরণ রাখবেন, যেব্যক্তি ইল্‌ম ও ইচ্ছার দ্বারা গুনাহের কাজ পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রার্থনা প্রত্যাখান করা ছেড়ে দেন। অর্থাৎ– কবুল করেন।

জীবন একটি আমানত

এই যৌবনকাল এজন্যই প্রদান করা হয়েছে যে, আমরা আমাদের পালনকর্তাকে সন্তুষ্ট করব। তাঁর নির্দেশমতো এ নেয়ামত ব্যবহার করব। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন–

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا

'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তোমাদের আমানত তার হকদারের নিকট পৌঁছিয়ে দাও।'[১০৯]

সুতরাং এই আমানতসমূহ আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট সোপর্দ করতে হবে। এর অর্থ কী? অর্থ হলো, আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় ব্যবহার করতে হবে। একটু ভেবে দেখুন, আপনি ভাড়া বাড়িতে বাস করেন। এখন যদি আপনি বাড়িটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না রাখেন, ময়লা-আবর্জনা দিয়ে বাড়ির পরিবেশ নোংরা করে রাখেন, তাহলে বাড়ির মালিক বলবে, আগামী মাস

---

১০৯. সূরা নিসা : আয়াত ৫৮

থেকে আপনি আমার বাড়ি ছেড়ে দেবেন। কারণ, আপনি বাড়িটা আমার ইচ্ছেমতো ব্যবহার করছেন না।

এবার দেখুন, এ পৃথিবীতে বাড়ির মালিক যদি তোমার এ নোংরা পরিবেশ সহ্য করতে না পারল, তাহলে ভাই! আমাদের এই ছয় ফুট দেহটা আমাদের নিজস্ব নয়। এটা আমাদের মালিকের। আল্লাহ তা'আলা কিছু দিনের জন্য এটা ব্যবহারের অধিকার দিয়েছেন। এখন যদি আমরা আমাদের অঙ্গপতঙ্গকে আল্লাহ তা'আলার মর্জিমতো ব্যবহার করি, তাহলে তিনি আমাদের প্রতি খুশি হবেন। অন্যথায় এই যৌবনকাল বেশি দিনের নয়। কিছুদিন পরই এই বিলুপ্তির যবনিকা টানবে।

নেয়ামতসমূহের প্রত্যাবর্তন

তারপর আল্লাহ তা'আলা এই নেয়ামতসমূহ ফিরিয়ে নিয়ে থাকেন। প্রথমে তোমার দৃষ্টিশক্তি ৬/৬ ছিল। বয়স পঞ্চাশ অতিক্রম করল। এখন কাছের জিনিস দেখতে হলেও চশমা ব্যবহার করতে হয়। কিছুদিন পর তা-ও কাজ করে না। আরও পাওয়ারফুল চশমা লাগাতে হয়। আস্তে-আস্তে তোমার দৃষ্টিশক্তির বিলুপ্তি ঘটছে। এটা হচ্ছে তোমার নিকট থেকে নেয়ামত ফিরিয়ে নেওয়ার আলামত। প্রথমে দূরে থেকে নিম্নস্বরে কেউ কোনো কথা বললে তাও শুনতে পারতে। আজ কাছে থেকে উচ্চৈঃস্বরে বলতে হয়; নুতবা কিছু শুনতে পাচ্ছ না। আগে ৩২টি দাঁত অক্ষত ছিল। সব কটি এক সঙ্গে কাজ করত। এখন কোনোটা পড়ে গেছে, কোনোটা নড়ছে। কোনোটা ব্যথা করছে। এগুলো নেয়ামত চলে যাওয়ার নিদর্শন। আগে হজমশক্তি এমন ছিল যে, যা খেতে তা-ই পরিপাক হয়ে যেত। এখন সামান্য শক্ত বস্তু আহার খেলেই পেটের বারোটা বেজে যায়। পূর্বে দৌড়াদৌড়ি করতে ক্লান্তির কোনো ভয়ই করতে না। এখন বসা থেকে দাঁড়ালে মাথায় চক্কর মারে। সারাটা দুনিয়া অন্ধকার দেখায়। তোমার পূর্ণতার সময় আল্লাহ তা'আলা এ নেয়ামতসমূহ তোমাকে দিয়েছিলেন। এখন ক্রমান্বয়ে সবকিছুর বিলুপ্তি ঘটছে। এমনকি মৃত্যুর সময় আল্লাহ তা'আলা তোমার সবকিছু নিয়ে যাবেন।

একটি বিরল উদাহরণ

একটি উদারহণ শুনুন। জনৈক কোটিপতি পিতা তার সন্তানকে বলছে, আমি দশ-বিশ লাখ টাকার একটি প্রজেক্ট তোমার হাতে অর্পণ করে দিচ্ছি। তুমি যদি এগুলো দিয়ে তোমার কর্মদক্ষতা দেখাতে পার, তা হলে আমার সমস্ত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান তোমার হাতে তুলে দেব। এবার যদি ছেলে এক

বছরেই তার লাভে-আসলে সবকিছু লোকসান করে ফেলে, তাহলে পিতা কি আর তার হাতে ব্যবসার দায়িত্ব দেবেন? কখনো দেবেন না। ঠিক তেমনি আল্লাহ তা'আলা আমাদের হাতে এ সমস্ত নেয়ামত দিয়ে আমাদের কর্মদক্ষতা দেখতে চান যে, সঠিকভাবে তার মর্জিমতো পরিচালনা করতে হবে। অন্যথায় তোমার মৃত্যুর সময় তোমার নিকট থেকে যে-নেয়ামতসমূহের বিলুপ্তি ঘটবে, সেগুলোর মুখ আর কোনোদিন দেখবে না।

সুতরাং মৃত্যু হচ্ছে ওই সমস্ত নেয়ামত হনন হওয়ার নাম। তারপর কেয়ামতের দিন মানুষকে দাঁড় করানো হবে। সে এই নেয়ামতসমূহ সঠিক কাজে ব্যবহার করেছি কি-না যাচাই করা হবে। যদি সেখানে সঠিক ব্যবহার পাওয়া যায়, তাহলে আল্লাহ সেগুলো পুনরায় দান করে জান্নাত দেবেন এবং আরও বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেবেন। আর যদি প্রমাণিত হয়, সে এগুলো সঠিক খাতে ব্যয় করেনি, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামের ফয়সালা দেবেন এবং এ সমস্ত নেয়ামত তার থেকে চিরতরে বিদায় নিয়ে চলে যাবে।

নেয়ামতসমূহের উত্থান-পতন

যদি মানুষ পৃথিবীতে তার চক্ষু নামক নেয়ামতটিকে সঠিক পথে ব্যবহার করে থাকে, একমাত্র শরীয়তের নির্দেশিত পন্থায় কাজে লাগায়, শরীয়তের নিষিদ্ধ বস্তু দর্শন থেকে বাঁচিয়ে রাখে, তাহলে বোঝা গেল, সে তার পরিপূর্ণ মূল্যায়ন করেছে। তারপর যখন কবরে, হাশরে, পুলসিরাতে প্রমাণিত হবে, এ লোক তা সঠিক পন্থায় ব্যবহার করেছে, তখন আল্লাহ তাকে আরও বহু গুণ বাড়িয়ে সেই নেয়ামত পুনরায় প্রদান করে তাকে জান্নাতে দেবেন, যার ফলে সে এই নেয়ামত দ্বারা আল্লাহর দর্শন লাভ করবে। আল্লাহ বলেন–

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۝ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝

'কতিপয় চেহারা সেদিন সমুজ্জ্বল থাকবে। তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি তাকাতে থাকবে।'[১১০]

অর্থাৎ– আল্লাহ তা'আলাকে দেখবে।

চোখের মতো নেয়ামতের অপব্যবহার

তাদের আপন পালনকর্তার প্রতি তাকাবে। এই নেয়ামতের কেমন পাওয়ার, কেমন সৌভাগ্য। আল্লাহু আকবার! পক্ষান্তরে যদি প্রমাণিত হয়, তাকে পৃথিবীতে অপব্যবহার করা হয়েছে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর

---

১১০. সূরা কিয়ামা : আয়াত ২২, ২৩

সময় তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেবেন। ফলে তাকে আর হাশরেও দেওয়া হবে না, জাহান্নামেও পুনরায় দেওয়া হবে না। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

وَمَنْ كَانَ فِي هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ۝

'যে পৃথিবীতে থাকাকালীন আল্লাহর বিধানের প্রতি মুখ ফিরিয়ে অন্ধের ন্যায় ছিল, তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধের ন্যায় উপস্থিত করা হবে।'[১১১]

সুতরাং কেয়ামতের দিন অন্ধ হয়ে উপস্থিত হবে। অন্ধ অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। কোনো আলো পাবে না। সেখানে কিছুই দেখতে পাবে না। দৃষ্টিশক্তি তার থেকে হনন করা হয়েছে। সে এটা ফিরে পাওয়ার উপযোগী নয়। কারণ, সে দুনিয়াতে তার অপব্যবহার করেছে।

কান নামক নেয়ামতের প্রত্যাবর্তন

এমনিভাবে যদি পৃথিবীতে মানুষ তার কান বা শ্রবণশক্তি সঠিক কাজে ব্যবহার করে, এর দ্বারা আল্লাহওয়ালাদের নসীহত শ্রবণ করে, কুরআন তেওলায়াত শোনে, হাদীছ শোনে, না'ত শোনে, তাহলে মৃত্যুর সময় তার সেই শ্রবণশক্তি নিয়ে যাওয়া হবে সত্য; কিন্তু পরবর্তী কালে এর চেয়ে আরও উত্তম করে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এমনকি জান্নাতে যখন আল্লাহ তা'আলা স্বকণ্ঠে পবিত্র কুরআনের সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করবেন, তখন বান্দা নিজকানে সেই তেলাওয়াত শ্রবণ করবে। পক্ষান্তরে যদি সে শ্রবণশক্তি অপাত্রে ব্যবহার করে থাকে; গান-বাজনা শ্রবণ করে, তাহলে তার শ্রবণশক্তি বিলুপ্ত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে সে বধির থাকবে।

জবান নামক নেয়ামতের অপব্যবহার

মানুষ যদি তার বাকশক্তি শরীয়তের নির্দেশিত পন্থায় ব্যবহার করে; ভালো কথা বলে, গীবত থেকে জবানকে সংরক্ষণ করে, চোগলখুরি থেকে বেঁচে থাকে, এই জবান দ্বারা মানুষকে কষ্ট না দেয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর সময় তার বাকশক্তি নিয়ে পুনরায় এর চেয়ে উত্তম করে ফেরত দেবেন। তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। ওই বান্দা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে কথোপকথন করবে। পক্ষান্তরে যদি অশ্লীল পন্থায় সেই জবান ব্যবহার করে; মিথ্যা বলে, খারাপ কথা বলে, তাহলে মৃত্যুর সময় তার সেই বাকশক্তি ফিরিয়ে নেওয়া হবে। পুনরায় আর দেওয়া হবে না। আর বোবা অবস্থায় তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

---

১১১. সূরা ইসরা : আয়াত ৭২

কুরআনে আল্লাহ বলেন–

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا

'কেয়ামতের দিন আমি তাদেরকে অন্ধ, বধির ও বোবা বানিয়ে উপস্থিত করব।'[১১২]

সে তা পুনরায় পাওয়ার যোগ্যতা রাখে না। কারণ, সে এগুলো অবৈধ পন্থায় ব্যবহার করছে। নিজের মনচাহি আচরণ করেছে। সে ওই কথা উপলব্ধি করতে পারেনি যে, আমার এই নেয়ামতগুলো ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

পা নামক নেয়ামতের ব্যবহার

চলার জন্য আল্লাহ তা'আলা পা দান করেছেন। সুতরাং যদি মানুষ এই পা দিয়ে মসজিদের দিকে যায়, আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করে, তাহলে সে এই পা দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় পথ অতিক্রম করল। অতএব, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা এমন পা দান করবেন, যা দিয়ে সে জান্নাতে পৌঁছে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا

'যারা আল্লাহকে ভয় করত, তাদের দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।'[১১৩]

সেই পা দিয়ে তারা জান্নাতের পথে হাঁটবে। আর যদি সেই পা দিয়ে অন্যায় পথে হেঁটে থকে, খারাপদের মাহফিলে গমন করে থাকে, তাহলে কেয়ামদের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অধঃমুখী করে দাঁড় করাবেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ

'আমি কেয়ামতের দিন তাদের অধঃমুখী করে দাঁড় করাব।'[১১৪]

যেরূপ মানুষ তার মাথা নিচের দিকে দিয়ে দণ্ডায়মান হয়, মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন, তদ্রূপ কেয়ামতের দিন পাপিষ্ঠরা তাদের পাপের দরুণ নিচের দিকে মাথা দিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। কোনো রকম চলাফেরা করতে পারবে না। তারপর এই অবস্থায় তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

---

১১২. সূরা ইসরা : আয়াত ৯৭
১১৩. সূরা যুমার : আয়াত ৭৩
১১৪. সূরা ইসরা : আয়াত ৯৭

সুতরাং ভাই! এ-সকল নেয়ামত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদের নিকট আমানত। যদি আমরা সেগুলোর সঠিক ব্যবহার করি, তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম নেয়ামত দান করবেন। আর যদি আমরা এগুলোর অপব্যবহার করি, তাহলে আল্লাহ এগুলো আমাদের থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।

সুন্নতের মূল্যায়ন

যদি কোনো মানুষ পৃথিবীতে তার পোশাক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতমতো ব্যবহার করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

'এবং সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমি কাপড়ের।'[১১৫]

এর উত্তম পোশাক তাদের দান করবেন।

পক্ষান্তরে যদি অশালীন পোশাক ব্যবহার করে, সুন্নতের বিপরীতে অর্ধ দেহে পোশাক পরে, অর্ধ-উলঙ্গ হয়ে রাস্তায় চলে, তাহলে আল্লাহ তাদেরকে সেই রকম পোশাক পরিধান করিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ

'তাদেরকে গন্ধকের দুর্গন্ধযুক্ত পোশাক পরানো হবে।'[১১৬]

ফোকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, জাহান্নামিদের পোশাক এমন দুর্গন্ধ হবে যে, যদি পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ও পশু-পাখি মরে পচে-গলে যায়, তবু জাহান্নামিদের পোশাকের দুর্গন্ধের সমান হবে না। আজ আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতকে সঠিক পন্থায় ব্যবহার করলে কেয়ামতের দিন রেশমি পোশাক পরিধান করবে। আর যদি সেই নেয়ামতের মূল্যায়ন না কর, তাহলে দুর্গন্ধময় পোশাক পরিধান করে জাহান্নামে যেতে হবে।

বেহেশতি ও দোযখিদের বিপরীতমুখী পুরস্কার

যদি মানুষ দুনিয়ায় হালাল খাবার খায়, তাহলে আখেরাতে আল্লাহ তাকে বেহেশতে প্রবিষ্ট করিয়ে পাখির ভুনা গোশত তাদের প্রদান করবেন। পক্ষান্ত

---

১১৫. সূরা হজ : আয়াত ২৩

১১৬. সূরা ইবরাহীম : আয়াত ৫০

রে যদি সর্বদা হারামে লিপ্ত থাকে, হারাম খাওয়া-ই তার প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহ তার সমস্ত নেয়ামত হনন করে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। তাদের খাবার হবে– আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ۝ طَعَامُ الْأَثِيمِ ۝ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ۝

'নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ। পাপিষ্ঠদের খাবার। গলিত তামার ন্যায় পেটে ফুটতে থাকবে।'[১১৭]

আল্লাহ তা'আলা তাদের যাক্কুম ফল খাওয়াবেন। এটা কাঁটাদার দানা, যা চূড়ান্ত পর্যায়ের তিক্ত হবে। সকালে মুখে দিলে সন্ধ্যা পর্যন্ত মুখ তিক্ত থাকবে। তদুপরি কাঁটাবিশিষ্ট থাকবে। মানুষ যখন সেটা খাবে, তখন তা গিলতেও পারবে না এবং উগড়ে নিক্ষেপও করতে পারবে না। গলার মধ্যে আটকা পড়ে যাবে। এর বিষক্রিয়ায় তার গলা মোমের মতো গলে যাবে। তারপর অশান্তির কোনো সীমা থাকবে না।

সুতরাং হালাল খেলে জান্নাতে আল্লাহর নেয়ামত ভোগ করবে। আর হারাম খেলে জাহান্নমে যাক্কুম ফল তাদের ভাগ্যে আসবে। যদি পৃথিবীতে হালাল পানীয়, দুধ, মধু, হালাল জুস পান করে, তাহলে আল্লাহ জান্নাতে তাকে সুশীতল পবিত্র শরবত পান করাবেন। আরও অসংখ্য নেয়ামত তাদের দান করবেন। আর যদি পৃথিবীতে হারাম পানীয় পান করে, তাহলে আল্লাহ তার নেয়ামত ছিনিয়ে নিয়ে যাবেন এবং তাদের পান করাবেন–

وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ۝ لَّا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۝

'ক্ষতনিঃসৃত পূঁজ ব্যতীত (তাদের) কোনো খাদ্য নেই। গুনাহগার ব্যতীত কেউ এটা খাবে না।'[১১৮]

মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন, জাহান্নামিদের ক্ষতস্থান থেকে যে-রক্ত ও পূঁজ নির্গত হবে, সেগুলো পেয়ালায় নিয়ে ফেরেশতারা জাহান্নামিদের পান করতে দেবে। সেই রক্ত-পূঁজের দুর্গন্ধের দরুণ মানুষ তার নিকটও দাঁড়াতে পারবে না। আর আজ সেটা তাদের পানীয় হবে। হে হারাম পানীয় পানকারীরা! তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর নেয়ামতের অপব্যবহার করছ। আজ দেখে নাও, এর মজা কত।

---

১১৭. সূরা দুখান : আয়াত ৪৩, ৪৫

১১৮. সূরা হাক্কা : আয়াত ৩৬, ৩৭

পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ঘরবাড়ি দিয়েছেন। যদি আজ তোমরা সেই ঘর হালাল উপার্জন দিয়ে নির্মাণ করে থাক, নামায, কুরআন তেলাওয়াত এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত দ্বারা যদি তাকে সাজাও, তাহলে এই নেয়ামতের মূল্যায়ন করার কারণে তোমাকে পরকালে আল্লাহ তা'আলা এত বড় ঘর দান করবেন। হাদীছ শরীফে এসছে, যেব্যক্তি সর্বশেষ জান্নাতে যাবে, তাকে ও আল্লাহ বর্তমান পৃথিবীর চেয়ে দশ গুণ বড় একটি বেহেশতের মালিক বানিয়ে দেবেন। পক্ষান্তরে যদি এই ঘর হারাম উপার্জন দ্বারা নির্মাণ করে, এতে গুনাহের আড্ডা জমায়, গান-বাজনার আসর তৈরি করে, সর্বপ্রকার গর্হিত কাজের কেন্দ্র বিন্দু বানায়। ঘরে নামায, কুরআন তেলাওয়াত না হয়। ফজরের সময় সবাই নাক ডেকে ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ তাদের সমস্ত নেয়ামতের বিলুপ্তি ঘটিয়ে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে জায়গা হবে সংকীর্ণ। এত ছোট হবে যে, মানুষ সেখানে সঠিকভাবে ওঠাবসা তো দূরের কথা, নড়াচড়াও করতে পারবে না। এমন সংকীর্ণ অবস্থায় থেকে মানুষ পরিশেষে মৃত্যুর জন্য আবদার জানাবে, হে আল্লাহ! আমাকে মৃত্যু দিয়ে দাও। কিন্তু সেখানে তো আর মৃত্যু হবে না। তাদের আহ্বানের পর আল্লাহ তা'আলা বলবেন–

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَّاحِدًا وَّادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٤﴾

'আজ এক মৃত্য নয় অসংখ্য মৃত্যুর আহ্বান কর।'[১১৯]

তোমাদের প্রাণ এখান থেকে মুক্তি পাবে না। এখন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ভাবছ, মরে যাবে। মরেও যখন শান্তি পাবে না, তখন কোথায় যাবে? শান্তি একমাত্র আল্লাহর পথে।

পৃথিবীতে যখন মানুষ ভালো কাজ করবে, কল্যাণময় জীবন যাপন করবে, তখন আল্লাহ তাকে জান্নাত দেবেন। সেখানে সে শান্তির বাণী শ্রবণ করবে।

سَلٰمٌ ۖ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيمٍ ﴿٥٨﴾

'পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদের শান্তির বাণী পৌঁছবে।'[১২০]

জান্নাতে গেলে ফেরেশতারাও মোবারকবাদ দেবে–

وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾

---

১১৯. সূরা ফুরকান : আয়াত ১৪

১২০. সূরা ইয়াসীন : আয়াত ৫৮

'ফেরেশতারা তাদের নিকট আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। বলবে, তোমাদের ধৈর্যের কারণে তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর তোমাদের এ পরিণামগৃহ কতই-না চমৎকার!'[১২১]

ফেরেশতাদের মোবারকবাদ ও শান্তির বাণী শ্রবণ করবে। পক্ষান্তরে যদি পৃথিবীতে তাদের অভিলাষমতো জীবন যাপন করে, তাহলে পরিণামে জাহান্নামে যাবে এবং সেখানে তারা নিজেই আর্তনাদ করে বলবে–

رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ

'হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের ওপর বিজয়ী হয়ে গেছে। আমরা ভ্রষ্ট হয়ে গেছি।'[১২২]

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا

'হে আল্লাহ! আমাদের একবার বের করে দিন।'[১২৩]

فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ

'যদি আমরা পুনরায় সীমালঙ্ঘন করি, তাহলে বাস্তবেই আমরা জালেম।'

কিন্তু কোনো লাভ হবে না। আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর এমন অসন্তুষ্ট হবেন যে, কুরআন বলে,

قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ

'অধঃমুখী হয়ে তথায় পড়ে থাকো; কোনো কথা বলো না।'[১২৪]

দুনিয়া পরীক্ষার হল

এ পৃথিবী আমাদের জন্য পরীক্ষার হল। আমরা যদি আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামত শরীয়ত ও সুন্নতমতো ব্যবহার করতে পারি, তাহলে এই নেয়ামত আরও বহু গুণে বৃদ্ধি করে আমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আর যদি কোনো মানুষ আমাদের দশ/বিশ লাখ টাকার ব্যবসা সামাল দিতে না পারে, তাহলে তাকে কোটি টাকার ব্যবসার দায়িত্ব কে দেবে?

সুতরাং ভাই! এ নেয়ামতসমূহ আমাদের মালিকানা নয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের দান করেছেন। শুধু একথা জানার জন্য যে, হে বান্দা! তুমি

---

১২১. সূরা রা'দ : আয়াত ২৩, ২৪
১২২. সূরা মুমিনূন : আয়াত ১০৭
১২৩. সূরা মুমিনূন : আয়াত ১০৭
১২৪. সূরা মুমিনূন : আয়াত ১০৮

পৃথিবীতে এগুলো দিয়ে কী কর দেখি? তাই আমরা যদি এই নেয়ামতসমূহ শরীয়ত ও সুন্নতমতো ব্যবহার করি, তা হলে পরকালে আরও অনেকগুলো বেশি পাব। আরও উত্তম করে আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ নেয়ামতরাজি ফিরিয়ে দেবেন। পাঁচ আঙুল কখনো সমান হয় না। এ পৃথিবীতে পাপীদের সংখ্যা বেশি হলেও আল্লাহর বান্দা এ উম্মতে আবির্ভূত হয়েছেন।

উম্মতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ

ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদ আলফেছানী (রহ.) বলেন, এ উম্মতের মধ্যে এমন বুযুর্গ ব্যক্তিও অতিবাহিত হয়েছেন, যাদের গুনাহ লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা বিশ বছর পর্যন্ত তাদের আমলনামায় কলম বসানোর সুযোগ পাননি। সুবহানাল্লাহ!

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.) বলেন, আমি এক মহিলাকে দেখেছি, সে তার জীবনে কোনোদিন কুরআনে আয়াত ব্যতীত কোনো কথা বলেনি। অর্থাৎ– সাধারণ কথাবার্তাও সে কুরআনের আয়াতের মাধ্যমেই বলত। আল্লাহু আকবার! কোথায় ওই সমস্ত মানুষ আর কোথায় আমরা! যাদের মুখ দিয়ে কত কথা বের হয়, তার কোনো খবরই থাকে না। সুতরাং এ উম্মতে আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য নেক বান্দাও অতিবাহিত হয়েছেন।

একটি আশ্চর্য ঘটনা

জনৈক ব্যক্তি নদীর কিনারে হাঁটছেন। পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা। হঠাৎ দেখলেন, নদীতে একটা আপেল ভাসছে। তিনি সেটা উঠিয়ে খেয়ে ফেললেন। খাওয়ার পর অনুভূতি হলো, আমি যে এই ফলটা খেলাম, এর মালিক তো আমি নই। সুতরাং অনুমিত ছাড়া কার ফল ভক্ষণ করলাম! পরকালে এর জবাব কী দেব? সে নদীর উজানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। কিছু দূর গিয়ে একটি বাগান পান। তার একটি গাছের শাখা নদীর দিকে ঝুঁকে রয়েছে। বুঝতে পারলেন, এ গাছের ফলটিই নদীতে ভেসে গেছে। বাগানের মালিককে খুঁজে বের করে তাকে বললেন, ভাই! আমি একজন দরিদ্র মানুষ। নদীতে ভেসে যাওয়া আপনার বাগানের একটি ফল আমি পেটের ক্ষুধায় খেয়ে ফেলছি। বিনিময় পরিশোধ করার মতো কোনো টাকা-পায়সা আমার কাছে নেই। অনুগ্রহপূর্বক আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।

লোকটি বলল, না; আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারব না। এদিকে বারবার তিনি ক্ষমা চাচ্ছেন। এ দিকে মালিক বারবার প্রত্যাখান করছে।

অবশেষে পথিক বলল, ভাই! তাহলে আমার ক্ষমা পাওয়ার কি কোনো পন্থা আছে? কী করলে আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। লোকটি বলল, হ্যাঁ আছে। আমার একটি বিবাহ যোগ্য মেয়ে আছে। সে বোবা, অন্ধ, লেংড়া যদি তুমি আমার ওই মেয়েকে বিয়ে করো এবং তার সেবা করে তাকে নিয়ে জীবন সংসার করো, তাহলে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিতে পারি। পথিক চিন্তায় পড়ে গেলেন, এখন কী করা যায়। পরিশেষে স্থির করলেন, আর কী করব? যেকোনো মূল্যে আমাকে ক্ষমা নিতেই হবে। নতুবা পরকালে আমি মুক্তি পাব না। সুতরাং মালিককে বললেন, ভাই! ঠিক আছে। আমি আপনার প্রস্তাবে রাজী আছি। তবু আমাকে ক্ষমা পেতে হবে?

বিয়ে হয়ে গেল। বরকে বাসর ঘরে পাঠানো হলো। তিনি সেখানে গিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। কারণ, যে-রমণীর নিকট তিনি গমন করলেন, সে অপরূপা সুন্দরী। হাত, পা, চোখ, কান, সবকিছু ঠিক আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা আপনি কি আপনার পিতার একমাত্র মেয়ে? নাকি আপনার অন্য কোনো বোন আছে? সে বলল, না। আমি আমার পিতার একমাত্র মেয়ে। পরে তিনি বুঝতে পারলেন, আমার শ্বশুর কোনো ভুলবশত আমাকে এ-ঘরে পাঠাইনি তো। রাত কাটালেন। সকালে শ্বশুড়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। শ্বশুড় জিজ্ঞাসা করলেন, কী খবর; নতুন মেহমানকে কেমন পেয়েছ? বলল, সবকিছু ব্যতিক্রম পেলাম। তবে আমি বুঝতে পারিনি, আপনি এমন বলছেন কেন? শোনো! সে আমার একমাত্র মেয়ে। জীবনে কোনোদিন কোনো পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলেনি; তাই বোবা বলছি। জীবনে কোনো পরপুরুষ দেখেনি; তাই অন্ধ বলেছি। জীবনে কোনো পরপুরুষের কথা শোনেনি; তাই বধির বলছি। আমার অনুমতি ছাড়া কোথাও যায়নি; তাই লেংড়া বলছি।

আর আমি চাচ্ছি, আমার এই কন্যার জন্য কোনো খোদাভীরু পাত্র মিলে যায়, তাহলে সে আমার মেয়েকে আদর-সোহাগ দিয়ে তার সঙ্গে রাখবে।

ভাই! এ হলেন মা। আর ওই পথিক হলেন, বাপ। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে একটি সন্তান দান করেন। তার নাম রাখলেন নোমান। বড় হয়ে তিনি ইমাম আবুহানীফা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

মা যদি ফাতেমা হন আর আলী বাপ হন, তাহলে তাদের ঘরে হাসান-হুসাইন জন্ম নেবেনই।

সুতরাং পৃথিবীতে এমন লোকও অতিবাহিত হয়েছেন, যারা আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের যথাযথ মূল্যায়ন করেছেন। আর আমাদের ন্যায়

উদাসীন লোকের কথা তো আর বলতেই হয় না। কখনো তাকবীরে উলা, কখনো নামায কাজা হচ্ছে। আর কুরআন তেলাওয়াতের তো সময়ই পাচ্ছি না। কখনো নিজের অজীফা ছুটে যাচ্ছে। কখনো জবানে মিথ্যা বেরিয়ে আসছে। এখনো সময় আছে। আমরা আমাদের গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে সত্যিকারের তাওবা করি। হে আল্লাহ! হে আমার মালিক জীবনের যে-অংশ চলে গেছে তো গেছেই; ভবিষ্যতে আমরা আর এমন অপরাধ করব না। বাকি জীবনটা তোমার নির্দেশমতো পরিচালিত করার তাওফীক দাও। শরীয়ত ও সুন্নতমতো জীবন গড়ার সৌভাগ্য চাই। আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত দয়ালু। তিনি আমাদের তাড়িয়ে দেবেন না। তিনি একথা বলবেন না, তুমি আমার দরবার থেকে চলে যাও। তোমার মনচাহি জীবন গড়ো। আল্লাহ তা'আলা আমাদের কাছে টেনে নেবেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

গুনাহের হাকীকত

হাকীমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, যেব্যক্তি যে প্রকারের গুনাহ করবে। বাতেনিভাবে ওই ব্যক্তির আকৃতি গুনাহবিশিষ্ট প্রাণীর ন্যায় হয়ে যায়। তিনি বলেন, যেব্যক্তি অন্যায়ভাবে অন্যকে কষ্ট দেয়, বাতেনিভাবে তার আকৃতি বিচ্ছুর ন্যায় হয়ে যায়। যার মধ্যে লালসা বেশি থাকে, তার আকৃতি কুকুরের অনুরূপ হয়ে যায়। যেব্যক্তি আলেম হয়েও আমল করে না, তার আকৃতি গাধার মতো হয়ে যায়। যার মধ্যে বেহায়াপনা বৃদ্ধি পায়, তার আকৃতি শূকরের মতো হয়ে যায়। আর যারা ধোঁকাবাজ, ছিনতাইকারী হয়, তাদের আকৃতি হিংস্র প্রাণীর মতো হয়ে যায়।

হযরত আল্লামা আহমদ আলী লাহোরি (রহ.) বলেন, একদা আমি বাজারে যাচ্ছি। অকস্মাৎ এক আল্লাহর ওলীকে দেখতে পেলাম। আমি তাকে চিনতে পারিনি। নিকটে গিয়ে আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি উত্তর না দিয়ে আমাকে বললেন, আহমদ আলী! মানুষ কোথায় বাস করে? তাঁর কথা শুনে আমি অবাক হলাম। বললাম, হুজুর! এই তো বাজারে শত-শত মানুষ রয়েছে। তিনি আমাকে কাছে ডাকলেন, কোথায় মানুষ? এদিকে তাকিয়ে দেখো তো। তিনি বলার সাথে-সাথে ওদিকে তাকালাম। দেখছলাম, যেখানে আমি অক্ষুনি শত-শত মানুষের সমাবেশ দেখেছিলাম, ওখানে শুধু কুকুর আর শূকর চলাফেরা করছে। দু-চারজন মানুষ ছাড়া সকলকে বিভিন্ন প্রাণীর আকৃতি দেখা যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর আমার এ অবস্থা দূরীভূত হলো। মানুষকে মানুষই দেখছি। তবে ওই আল্লাহর ওলীকে আর দেখতে পাইনি। তিনি আমার সামনে থেকে উধাও হয়ে গেছে। তিনি পবিত্র কুরআনের দরস দেওয়ার সময় এ ঘটনা বলেছিলেন। তিনি আরও বলেন,

সবার মালিক একজন; কিন্তু মালিকের জন্য মাত্র একজন। সেই একজন হাজারে পাবে না। লাখের মধ্যে খুঁজতে হবে। অর্থাৎ– লাখের মধ্যে একজন পাবে, যারা পবিত্র কুরআনের

ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

'তোমরা সার্বিকভাবে ইসলামে ঢুকে পড়ো।'[১২৫]

এ আয়াতের যোগ্য পাত্র হয়েছেন। তারা ওই সমস্ত লোক, যাদের ওপর আল্লাহ তা'আলার নেক বান্দার উপাধি প্রয়োগ হয়। তাদের দেখে আল্লাহ তা'আলা খুশি হন। তারা যখন আল্লাহর দরবারে হাত উত্তোলন করেন, তখন আল্লাহ তা'আলা সেই হাত ফিরিয়ে দেন না। তারা কোনো কসম খেলে আল্লাহ তা'আলা তাদের কসম পুরা করিয়ে দেন। সুতরাং ভাই! পুণ্যময় জীবন গড়া আমাদের কর্তব্য; তাহলে আল্লাহ আমাদের মায়া করবেন।

আট সাক্ষী

মহা সংকটের দিন প্রত্যেক মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের খাতিরে আমরা কত গুনাহ করি। আর সেই অঙ্গ কেয়ামতের দিন আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে। হে আল্লাহ! এই বান্দা আমাকে দিয়ে এমন-এমন গুনাহ করেছে। ওই বান্দা নারাজ হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করবে–

لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا

'তোমরা আমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন?[১২৬]

قَالُوْا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ

'তারা বলবে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের বাকশক্তি দান করেছেন, যিনি সকল বস্তুকে বাকশক্তি দিয়ে থাকেন।'[১২৭]

---

১২৫. সূরা বাকারা : আয়াত ২০৮

১২৬. সূরা হামীম সেজদা : আয়াত ২১

১২৭. সূরা হামীম সেজদা : আয়াত ২১

তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন–

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ

'তোমরা গুনাহ করে যা গোপন করতে যে তোমাদের শ্রবণশক্তি, কান চোখ, তোমাদের ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না।'[১২৮]

সুতরাং সেগুলোই আজ তোমাদের বিপক্ষে রাজসাক্ষী। অতএব, ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, কেয়ামতের দিন বান্দার গুনাহ সম্পর্কে আটটি বস্তু সাক্ষ্য দেবে।

আট সাক্ষী কী-কী?

প্রথম সাক্ষী : ওলামায়ে কেরাম বলেন, সেই আটটি বস্তুর মধ্যে সর্বপ্রথম হবে স্থান। বান্দা যেস্থানে গুনাহ করেছে, ওই স্থান তার সমস্ত কৃতকর্ম ভিডিও ক্যামেরার ন্যায় সংরক্ষণ করে রেখেছে। তখন

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۝ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ۝

'কেয়ামতের দিন জমিন তার ওপর কৃত সমস্ত সংবাদ প্রকাশ করবে। কেননা, আল্লাহ তাকে সে ব্যাপারে প্রত্যাদেশ দেবেন।'[১২৯]

অর্থাৎ– আল্লাহ তা'আলা জমিনকে নির্দেশ দেবেন, তোমার ওপর ওই বান্দা কী করেছে সবকিছু খুলে বলো। তখন জমিনের যে-অংশে যা করা হয়েছে, প্রত্যেকটি অংশ তার ওপর কৃত সকল কর্মের সাক্ষ্য দেবে। সুতরাং মানুষের বিপক্ষের প্রথম সাক্ষী হবে তার কৃতকর্মের স্থান।

দ্বিতীয় সাক্ষী সময় : 'সময়' বান্দার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। হাদীছে আছে,

يُنَادِىْ كُلَّ يَوْمٍ اَنَا يَوْمٌ جَدِيْدٌ وَاَنَا فِىْ مَا تَعْمَلُ فِيْهَا شَهِيْدٌ

'হে বান্দা! আমি সময়। আমি নতুন দিন। আমার অভ্যন্তরে তুমি যে গুনাহ করেছ, কেয়ামতের দিন আমি তোমার বিরুদ্ধে সেগুলোর সাক্ষ্য প্রদান করব। সুতরাং সময়ও তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

তৃতীয় সাক্ষী জিহ্বা : জিহ্বা বা জবান। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ

'কেয়ামতের দিন মানুষের জবান তার বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে।'

---

১২৮. সূরা হামীম সেজদা : আয়াত ২২
১২৯. সূরা যিলযাল : আয়াত ৪, ৫

হাদীছ শরীফে এসেছে, মানুষের সকল অঙ্গ কেয়ামতের দিন তার জবানকে বলবে, যদি তুমি সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাক, তাহলে আমরা সকলেই ঠিক আছি। আর তোমার ভুলভাবে ব্যবহৃত হওয়ার দ্বারা আমরা সকলেই বিপদে পড়ে যাব।

হাদীছ শরীফে এসেছে, বান্দা নেকি করতে-করতে জান্নাতের উপযোগী হয়ে যায়। তারপর তার জবান দ্বারা এমন বাক্য নির্গত হয়। আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে থাকে। তার অকৃজ্ঞতার দরুণ আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন। তাই আমাদের বুযুর্গগণ বলেন,

جِرْمُهُ صَغِيْرٌ وَجُرْمُهُ كَبِيْرٌ

'এর দৈহিক অবয়ব ছোট; কিন্তু তার অপরাধ অনেক বড়।'

সুতরাং তোমার মুখের একটি কথা অনেক সময় তোমার জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হয়ে যায়।

চতুর্থ সাক্ষী শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ : মানুষের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তার হাত, নাক, কান, চোখ ইত্যাদি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٦٥﴾

'আমি তাদের হাতের সঙ্গে কথা বলব এবং তাদের পাসমূহ তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।'[১৩০]

পঞ্চম সাক্ষী কেরামান কাতিবীন : মানুষের বিপক্ষের পঞ্চম সাক্ষী স্থান ও কেরামান কাতিবীন দুই ফেরেশতা। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿١٢﴾

'তোমাদের ওপর কাতিবীন দুই ফেরেশতা আছে। তারা সেগুলো লিপিবদ্ধ করে। তারা জানে, তোমরা কী করছ।'[১৩১]

সুতরাং ফেরেশতারা সাক্ষ্য দেবে, হে আল্লাহ! এই বান্দা ওই স্থানে তোমার অমুক বিধান লঙ্ঘন করেছে।'

ষষ্ঠ সাক্ষী তোমাদের আমলনামা : তোমরা যা কিছু করছ সবকিছু সেখানে লিপিবদ্ধ করা হয়। সেগুলো রেকর্ড থাকে। তোমার কৃতকর্মের

---

১৩০. সূরা ইয়াসীন : আয়াত ৬৫
১৩১. সূরা ইনফিতার : আয়াত ১০-১২

চার্জশিট তৈরি হচ্ছে। কেয়ামতের দিন সবকিছু তোমার সামনে উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, যখন মানুষ তার সামনে তার আমলনামা দেখবে। বলবে–

يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ

'আমার দুর্ভাগ্য! এটা কেমন আমলনামা।'[১৩২]

لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰىهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ﴿٤٩﴾

'যা ছোট-বড় কোনো কিছুই বাদ দেয়নি। সবকিছু সংরক্ষণ করে রেখেছে এবং যা কিছু করেছে, সব বিদ্যমান পাবে। এতে তোমার প্রভু কারও ওপর জুলুম করবেন না।'[১৩৩]

নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারছ। পালিয়ে-পালিয়ে গুনাহ করছ। দৌড়ে-দৌড়ে গুনাহ করছ। কাজেই নিজের আমলনামা দেখে ভাবতে থাকবে। হায় আফসোস! যদি আমরা নেক আমল করতাম।

يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ﴿٢٨﴾

'হায়! যদি আমি অমুককে আমার বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম!'

অতএব, মানুষের আমলনামা সাক্ষ্য দেবে। তদুপরি আরও একটি বিরল সাক্ষী হবে। সেটি কী?

সাত নং সাক্ষী : সাত নং সাক্ষী হলেন আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ﴿٤١﴾

'তখন কী অবস্থা হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত হতে সাক্ষ্য নেব এবং তাদের বিপক্ষে তোমার সাক্ষ্য নেব।'[১৩৪]

আমলনামা নবীজির সম্মুখে উপস্থিত করা হবে

বিশ্বমানবতার শান্তির দূত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন। তারা বান্দার কৃতকর্ম আমার সম্মুখে উপস্থিত করে।

---

১৩২. সূরা কাহ্ফ : আয়াত ৪৯
১৩৩. সূরা কাহ্ফ : আয়াত ৪৯
১৩৪. সূরা নিসা : আয়াত ৪১

সুতরাং মানুষের আমলনামা আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উপস্থিত করা হয়। যারা নেক আমল করে, তা দেখে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হন এবং যারা পাপ কাজ করে, তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়। আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি রাতে নিদ্রা ত্যাগ করে চোখের অশ্রু ফেলেছেন এই দীনের জন্য, তিনি কেয়ামতের দিন বলবেন, হে আমার উম্মত! তুমি আমার চোখের পানির মূল্যায়ন করনি। তুমি দুনিয়ার মোহে ভুলে গিয়েছিলে, তোমার আমলনামা আমার নিকট পেশ করা হচ্ছে। সুতরাং পাপকর্মের দ্বারা আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কষ্ট হয়।

শিক্ষণীয় ঘটনা

একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে। মির্জা বায়দাল নামে এক বিখ্যাত কবি ছিল। কোনো এক সময় সে খুব আশ্চর্য ধরনের কিছু কবিতা রচনা করে। তখন ওই কবিতাগুলো ইরানের কোনো এক শায়খের দৃষ্টিগোচর হয়। কবিতা পাঠ করে তিনি আশ্চর্য বোধ করেন এবং কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য দেওয়ানা হয়ে যান। ফলে তিনি একদা কবির নিকট গমন করেন। গিয়ে দেখলেন, মির্জা বায়দাল তার মুখ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত অপসারণ করছে। অর্থাৎ– দাড়ি কাটছে।

কবির এ অবস্থা দেখে শায়খের শরীর শিহরে ওঠে। তৎক্ষণাৎ তিনি বললেন, কী ব্যাপার! তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত কেটে ফেলছ? কবি জবাব দিল, আমি দাড়ি মুণ্ডন করছি; কারও অন্তরে আঘাত দেইনি। শায়খ চিৎকার করে বললেন, তুমি তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে আঘাত দিচ্ছ। তুমি অন্তরের নেতার হৃদয়ে ছুরি চালাচ্ছ। শায়খের কথা শুনে কবি মির্জা বায়দাল-এর অন্তরে চোট লাগে। তিনি কবিতার মাধ্যমে বললেন–

جزاك الله كه چشم وا كردى * مرا باجان جاں ہمراز ك ردى

'আল্লাহ তা'আলা যেন তোমার প্রতিদান দেন। তুমি আমার চোখ খুলে আমার মাহবুবের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে দিলে।'

তাই বলছিলাম, ভাই! আমাদের সমস্ত কৃতকর্ম আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পেশ করা হয়। সুতরাং যদি তা

অপছন্দনীয় হয়, তাহলে সেটা আমাদের জন্য খুবই লজ্জাজনক ব্যাপার ও অত্যন্ত দুঃখের কথা। তাই আল্লামা কবি ইকবাল বলেন–

تو غنی از ہر دو عالم من فقیر * روز محشر عذرہائے من پذیر

'তুমি উভয় জাহানের ধনী আর আমি ফকির। তাই হাশরের দিন আমার ওজর গ্রহণ করো।'

گر تو غنی حسابم ناگزیر * نگاہ مصطفیٰ بن پنہاں بگیر

'হে আল্লাহ! যদি আপনি আমার হিসাব গ্রহণ করেনই, তাহলে তা যেন প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে পেশ না করা হয়। অর্থাৎ– তাঁর সামনে যেন লজ্জা না দেওয়া হয়।

নবীজি কী বলবেন? আমাদের মাথার মণি কী বলবেন যে, তোমরা আমার সুন্নত নিয়ে বিদ্রূপ করছ। কেয়ামতের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সাক্ষ্য দেবেন।

৮ নং সাক্ষী আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং : এর চেয়ে আরও বিরল সাক্ষী হলেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। ওলামায়ে কেরাম বলেন, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা মানুষের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا

'তোমরা যেকোনো আমলই কর আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত থাকি।' অর্থাৎ– আমি সেই কাজের সাক্ষী হয়ে যাই।'[১৩৫]

বন্ধুগণ! আমরা ওই মালিকের সামনে গুনাহের কাজ করি, যার অসংখ্য নেয়ামত দ্বারা আমাদের জীবন সজ্জিত। আমাদের মালিক কী বলবেন? আমরা তাঁর নিকট কী জবাব দেব, যখন তাঁর সামনেই আমরা অপরাধ করে যাচ্ছি? আল্লাহ তা'আলার কি কষ্ট হচ্ছে না যে, দেখো, আমার বান্দা আমার অসংখ্য নেয়ামত ভোগ করে কীভাবে আমার নেয়ামতের অবমূল্যায়ন করছে!

এক বুযুর্গের মোবারক বাণী

জনৈক বুযুর্গ বলেন, মহান আল্লাহ আমার অন্তরে এলহাম করেছেন। আমার অন্তরে একথা আপতিত করেছেন যে, হে আমার বান্দা! তুমি

---

১৩৫. সূরা ইউনুস : আয়াত ৬১

মানুষদের বলে দাও, তোমরা গুনাহ্ করার সময় সবার দৃষ্টির আড়ালে করে থাক। সমস্ত দরজা তোমরা বন্ধ করতে পার। তবে আমার দরজা তো বন্ধ করতে পার না। আমার দৃষ্টির আড়ালে তো তুমি গুনাহ্ করতে পার না। তবে কি তোমাদের দরজা ও দৃষ্টি থেকে আমার দরজা ও দৃষ্টিকে তুচ্ছ্য মনে করছ? আল্লাহু আকবার! আমরা কোথায় গুনাহ্ করব? সব জায়গাই তো আমাদের মালিক উপস্থিত। তখন আমাদের কী অবস্থা হবে, যখন তিনি আমাদের পাপের সাক্ষ্য দেবেন?

সুবর্ণ সুযোগ

এখনো সময় আছে, আমাদের মালিকের দরবারে ক্ষমা চেয়ে প্রার্থনা জানাই। হে আল্লাহ! আমাদের পুণ্যময় জীবন দান করুন। নিজেকে গুনাহ্ থেকে বিরত রাখি। নিজের আত্মার ওপর নির্ভরশীল না হয়ে সর্বদা আল্লাহর সাহায্য চাই।

কোনো কবি বলেন,

بھروسہ کچھ نہیں اِ نفس امارہ کا اے زاہد

فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگماں رہنا

'হে খোদাভীরু! নিজের নফসের ওপর ভরসা করো না। সে যদি ফেরেশতা হয়ে যায়, তবু তার প্রতি খারাপ ধারণা রাখতে হবে।'

নিজের ওপর নিজের ভরসা করো না। কারণ, গুনাহের প্রতি আকর্ষণ বান্দার জন্য সহজ কাজ। সুতরাং পাপের সুযোগ থেকেও আল্লাহর দরবারে আশ্রয় চাও। হে আল্লাহ! গুনাহের সুযোগ থেকে আমাদের হেফাযত করো। কেননা, গুনাহের সুযোগ পেলে আমরা তা থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব নয়। কোনো কবি বলেন,

غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا

کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا

میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا

مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا

হে আল্লাহ! জীবনের সংশয় মুহূর্তের ছায়ায় আমাদের আবদ্ধ করো না। আমি দুর্বলের হৃদয়কে দুর্বল করো না। হে আমার মালিক! আমি পরীক্ষার যোগ্য নই। গুনাহের সুযোগ ফেলে আমাকে পরীক্ষা করো না।

সুতরাং সর্বদা এই প্রার্থনা করবে, হে আল্লাহ! গুনাহের সুযোগ থেকে আমাদের রক্ষা করো।

হযরত আবুহুরায়রা (রাযি.)-এর দু'আ

বার্ধক্যে চুল সাদা হয়ে গেছে। তখনো হযরত আবুহুরায়রা (রাযি.) আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করেছেন,

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَزْنِیَ وَاَسْرِقَ

'হে আল্লাহ! যেনা ও চুরি থেকে আমি আপনার দরবারে আশ্রয় চাই।'

বৃদ্ধাবস্থায় তার মুখে এমন দু'আ শুনে কেউ জিজ্ঞাসা করল–

كَبُرَ سِنُّكَ وَاَنْتَ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَخَافُ عَلٰى نَفْسِكَ مِنَ الزِّنٰى وَالسَّرِقَةِ

'আপনার বয়স বার্ধক্যে পরিণত হয়ে গেছে। তদুপরি আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্যশীল সাথি। এমতাবস্থায় আপনি আপনার নিজের ওপর যিনা ও চুরির ভয় করছেন?'

হযরত আবুহুরায়রা (রাযি.) জবাব দিলেন,

كَيْفَ اٰمَنُ عَلٰى نَفْسِیْ وَاِبْلِيْسُ حَیٌّ

'আমার নফসের ওপর আমি কীভাবে নিরাপদ থাকতে পারি? অথচ ইবলিস এখনো জীবিত। সে যেকোনো সময় মানুষের অধঃপতন ঘটাতে পারে।

ঈমান রক্ষা করবেন কীভাবে

জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন। যেব্যক্তি এভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে, সে ঈমান নিয়ে পরকালে গমন করবে। তার ওপর আল্লাহর রহমত হবে। সুতরাং আল্লাহর রহমত দ্বারা ফায়েদা গ্রহণ করে আজকের মাহফিলে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা ভিক্ষা চাই, আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের অতীতের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেন এবং ভবিষ্যতের পুণ্যময় ও পরহেযগারীর জীবন যাপন করতে সচেষ্ট হই।

বলা হয়, জনৈক ব্যক্তি নাপাকি দ্বারা ভরপুর হয়ে নদীর কিনারে দাঁড়িয়ে আছে। নদী জিজ্ঞাসা করল, হে নাপাকমিশ্রিত মানব! তুমি গোসল করে পবিত্র হচ্ছ না কেন? সে বলল, আমার ভয় হচ্ছে, আমার এই নাপাকি দ্বারা তোমার পানি নাপাক হয়ে যায়। নদীর পানি বলল, আরে নির্বোধ! তোমার মতো হাজারো লোক নাপাকি নিয়ে আমার মধ্যে ডুব দেয়। আমার প্রবহমান পানি তাকে পবিত্র করে দেয় আবার আমি নিজেও পবিত্রই থাকি।

সুতরাং ভাই! সাধারণ দরিয়ার যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলার রহমতের সাগরের কী অবস্থা হতে পারে? আমরা যদি সত্যিকারের তাওবা করতে পারি, তাহলে আল্লাহর রহমত এভাবে প্রবাহিত হবে যে, আমাদের অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতেও আমাদের পুণ্যময় জীবন দান করবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

অন্ধ লোকের বুদ্ধিমত্তা

ভাই! পরিশেষে এমন সময়ের আগমন চাই যে, আমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে লুটিয়ে পড়ি। আমরা সত্যিকারের তাওবা করি। আর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, আজকের পর থেকে আর আল্লাহর নাফরমানি করব না। কুরআন-সুন্নাহর বিধানের লঙ্ঘন করব না। দেখুন, একজন অন্ধ লোকের প্রতিভা কত।

কথিত আছে, জনৈক লোক ভিক্ষা করছে। হাতে বাটি নিয়ে দুয়ারে-দুয়ারে যাচ্ছে। একদা এক দরাজায় গিয়ে হাঁক দিল। কেউ জবাব দেয়নি। পুনরায় আবদার জানাচ্ছে। এতেও কেউ জবাব দেয়নি। তৃতীয়বার আবেদন করল। কেউ জবাব দিল না। ফলে সে বলল, আমি কোন কৃপণের দরজায় এলাম। আমাকে ভিক্ষা দেবে দূরের কথা আমার ডাকের কেউ জবাবই দিচ্ছে না। তখন কেউ বলল, আরে ভাই! এটা মসজিদ। এটা আল্লাহর ঘর; এখানে তোমাকে ভিক্ষা দেবে কে?

লোকটির কথা শুনে অন্ধ বলল, আচ্ছা! আমি আল্লাহর দরজায় এসে গেছি! তাহলে ঠিক আছে। এই দরজা থেকে আর কারও দরজায় যাব না। একথা বলে লোকটি তার হাতের থালাটা দেওয়ালে ছুঁড়ে মেরে ভেঙে ফেলল। যেহেতু আমি আল্লাহর দরজায় এসেই গেলাম, তাহলে আর কোনো দুয়ারে যাব না।

হে আল্লাহ! তোমারই কাছে চাই; তুমিই আমাদের দান করো

আজ আমরাও আল্লাহ তা'আলার ঘরে এসেছি। সুতরাং আমরা আল্লাহর দরবারে দু'আ করি, হে আল্লাহ! মন্দির থেকে বের হয়ে কেউ জাহান্নামে গেলে এতে কোনো আক্ষেপ নেই। আক্ষেপ হচ্ছে, আজ আমরা তোমার ঘরে এসে বসেছি। এখান থেকে যদি সত্যিকারের তাওবা না করে বের হয়ে যাই। তারপর জাহান্নামে যেতে হয়, তাহলে এর চেয়ে বড় কোনো আক্ষেপ হতে পারে না। অতএব, হে আমাদের মালিক! আমরা তোমার দরবারে ক্ষমা চাই। মসজিদ থেকে বের হয়ে জাহান্নামে যেতে চাই না। তাই কোনো কবি বলেন,

اے اللہ تمہی سے مانگیں گے تمہی روگے

تمہارے در سے ہی لو لگی ہے

عمل کی اپنے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے

رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے

'হে আল্লাহ! তোমার কাছেই চাই, তোমারই নিকট কাঁদি।
তোমার দরবার থেকে নিরাশ হয়ে যেন ফিরে না যাই।'

আমলের নিজস্ব কী ভিত্তি আছে? লাঞ্ছিত আর অপমানিত হওয়া ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। শান্তি একমাত্র তোমারাই সান্নিধ্যে। এটাই আমার আশা ও ভরসা।

হে আল্লাহ! আমরা তোমার একত্বের বাণী পাঠ করেছি। তোমার হাবীবের নবুওতের সাক্ষ্য দিয়েছি। তোমার কিতাব সত্য বলে সাক্ষ্য প্রদান করছি। হে আল্লাহ! সেই ঈমানের বদৌলতে আজ আমাদের প্রতি দয়া করো। পবিত্র কুরআনে তুমি বলেছ,

وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝

'আবেদনকারীকে ধমক দিয়ো না।'[১৩৬]

তাকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিয়ো না। হে আল্লাহ! আমাদের ন্যায় দুর্বলদের প্রতি তোমার নির্দেশ হচ্ছে ভিক্ষুককে তাড়িয়ে না দেওয়া। সুতরাং

---

১৩৬. সূরা দোহা : আয়াত ১০

আমরা তো তুমি মহান স্রষ্টার দরবারে ভিখারীর ন্যায় হাজির হয়েছি। সুতরাং আমাদের প্রতি রহমতের একটি নজর দাও। আমাদের হৃদয়কে ধুয়ে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের অবস্থা সংকটাপন্ন। পাপ করতে-করতে আমরা ক্লান্ত হয়ে গেছি। আমাদের আত্মা অপবিত্র হয়ে গেছে। অতএব, আমার নাপাক আত্মা তোমার রহমত দিয়ে ধৌত করে দাও। ভবিষ্যতে পুণ্যময় পবিত্র জীবন গড়ার তাওফীক দান করো, যাতে কেয়ামতের দিন আমরা তোমার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে হাসিমুখে উপস্থিত হতে পারি এবং তাঁর হাতে হাউজে কাওছারের অমীয় সুধা পান করতে পারি। হে আল্লাহ! দুনিয়ার এমন দুর্যোগপূর্ণ সময়ে আমরা আগমন করেছি, যখন আপনার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। তদুপরি যদি হাশরের দিনও আপনি আমাদের অন্ধ বানিয়ে উপস্থিত করেন, তাহলে তোমার হাবীবকে দেখা আমাদের নসিব করো। পৃথিবীতে যদিও আমরা তাঁকে দেখতে পারিনি, আপনি আমাদেরকে পরকালে এ নেয়ামত দ্বারা ধন্য করুন। আমরা ওই চেহারাটি দেখতে চাই, যাকে আপনি والضحى বলে সম্বোধন করেছেন। আমরা ওই লালিমাটি দেখতে চাই, যাকে আপনি والليل বলে আখ্যায়িত করেছেন। যে চেহারা আপনার প্রেমে আকাশের প্রতি তাকিয়ে নিজের মনের বেদনা প্রকাশ করত, যার সম্পর্কে আপনি বলেছেন,

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ

'তুমি যে তোমার চেহারা আকাশের দিকে ফিরাচ্ছ, আমি তা দেখছি।'[১৩৭]

কেয়ামতের দিন আমাদের সেই কদমের নিচে আশ্রয় দিয়ো। তাঁর হাতে হাউজে কাওছারের পানি পান করিয়ে আমাদের তৃষ্ণার্ত অন্তরকে সান্ত্বনা দান কোরো। আর বাকি জীবনটা তোমার নির্দেশমতো গড়ার সৌভাগ্য দান করো। হে আল্লাহ! আপনি কবুল করুন। আমীন।

---

১৩৭. সূরা বাকারা : আয়াত ১৪৪

কলব জারি হওয়া

'কতিপয় লোক অনেক সময় অভিযোগ উত্থাপন করে, হুজুর! আমরা যিকির করতে বসি, মুরাকাবা করি; তখন আমাদের ঘুম এসে যায়। সে ক্লান্ত হওয়ার কারণে ঘুম আসেনি। এখানে কোনো বিছানা নেই। অথচ এই অবস্থায় নিদ্রা এসে যায়। এর জন্য সে অস্থিরতা বোধ করে। একথাটি ভালো করে বুঝে নাও যে, মুরাকাবায় ঘুম-তন্দ্রা এলে অস্থির হবেন না। চেষ্টা করবেন ঘুম না আসার জন্য। মানুষ তার নিজের পক্ষ থেকে চেষ্টা করবে যে, জাগ্রত অবস্থায় স্বজ্ঞানে বসে আল্লাহর যিকির করি। তথাপি যদি আকস্মাৎ ঘুম এসেই যায়, তাহলে চিন্তার কোনো কারণ নেই এর দ্বারা তোমার মুবাকাবার ব্যাঘাত ঘটবে না। সুতরাং এটি আপনাদের জন্য খুশির সংবাদ।'

কলব জারি হওয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

'যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।'[১৩৮]

অধিক পরিমাণে যিকিরের প্রভাব

খোদাপ্রেমিকগণ যখন অধিক পরিমাণে আল্লাহ তা'আলার যিকির করেন, তখন তাঁদের মধ্যে আলাদা অবস্থা শুরু হয়, যা যিকির থেকে বিমুখ ব্যক্তিদের হয় না। তাই আমাদের মাশায়েখগণ বলেন, যারা যিকির করে না, তাদের মধ্যে যিকিরের আলাদা বৈশিষ্ট্যও জারি হয় না। যিকির করলে তার মধ্যে যিকিরের প্রভাব অবশ্যই পড়বে।

হাদীছে আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ

'তাদের (যিকিরকারীদের) ওপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়।'

যিকিরকারীদের ওপর আল্লাহ তা'আলা রহমতের যে আলাদা নূর ও বিশেষ অবস্থার প্রকাশ পায়, তাকে 'সাকীনা' বলে।

যিকিরের প্রভাবসমূহের আলামত

মানুষের ওপর সাকীনার প্রভাব বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। কখনো মানুষের হৃদয়ে অস্থিরতা দূর হয়, অন্তরে প্রশান্তি আসে। অন্তর শান্ত হয়। সর্বপ্রকার

---

১৩৮. সূরা আনকাবুত : আয়াত ৬৯

দুঃশ্চিন্তা তার থেকে দূরীভূত হয়। নিজের দেহ ও প্রকৃতি সুস্থ অনুভূত হয়। এটা হচ্ছে সাকীনার আলামত। কখনো যিকিরকারী তার অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসার বৃদ্ধি অনুভব করে। কখনো নিজের কৃত অপরাধের ওপর অধিক অনুতপ্ত হওয়ার লক্ষণ পাওয়া যায়। অপরাধ স্মরণ হলে আল্লাহর ভয়ে কান্না আসে। আফসোস করতে থাকে। কখনো তার কাছে দুনিয়াকে তুচ্ছ্য মনে হয়, খুবই মূল্যহীন মনে হয়। তার মনে হয়, আমি কীসের পেছনে ঘুরছি। আমি কোন মালিকের দরবার থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। কখনো সেই বান্দার মনে হয়, আমি এমন জীবন নিয়ে বেঁচে আছি কেন? এর চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো। আল্লাহর ভয়ে এমন করাও সাকীনার আলামত। কখনো মনে হয়, আমি আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যেতে চাই। এসব কিছুই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাকীনা বা বিশেষ প্রশান্তি অবতীর্ণ হওয়ার লক্ষণ।

এক তরুণের ঘটনা

এক তরুণ কোনো বুযুর্গের নিকট এসে বলছে, হুজুর! আমার মৃত্যুকে খুব ভয় হয়। মৃত্যুর কথা স্মরণ হলেই আমার প্রাণ কম্পিত হয়ে যায়। হুজুর বললেন, তোমার নিকট ধনসম্পত্তি আছে কি? সে বলল, জি, কিছু তো আছে। বললেন, যাও; সেগুলো আল্লাহর রাস্তায় দান করে দাও। বুযুর্গের কথামতো সে তার সম্পত্তি আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিল। কিছুদিন পর তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে বুযুর্গ জিজ্ঞাসা করলেন, এখন তোমার অবস্থা কেমন? সে বলল, হুজুর! এখন আমার মনে হয়, আমি এখনই মরে যাই। আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আচ্ছা হুজুর, অবস্থার এমন পরিবর্তন কীভাবে হলো?

বুযুর্গ উত্তর দিলেন, শোনো, মানুষের অন্তর তার প্রতিই আসক্ত হয়, যেখানে তার কোষাগার থাকে। আগে তুমি ভবিষ্যতের জন্য কিছু সম্পদ সঞ্চয় করে রেখেছিলে। তাই মৃত্যু সম্পর্কে তোমার ভয় হচ্ছিল। কারণ, মৃত্যুর পরে তোমার জমাকৃত কিছুই নেই। এখন সেই সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিয়েছ। সুতরাং তোমার আসল ভবিষ্যতের জন্য কিছু জমা হয়েছে। তাই এখন আর মৃত্যুকে ভয় লাগে না। কারণ, সেখানে তোমার কিছু পাথেয় আছে। সুতরাং যেখানে কোষাগার আছে, সেখানকার প্রতিই মন আকৃষ্ট থাকবে। তাই নেক আমল দ্বারা মানুষের অন্তরের অবস্থায় পরিবর্তন হয়ে থাকে।

মানুষের যে তন্দ্রার ভাব দেখা দেয়, এটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে সাকীনার আলামত। এর প্রমাণ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

'...তারপর আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের ওপর তাঁর সাকীনা নাযিল করলেন।'[১৩৯]

বদর যুদ্ধের সময় এই অবস্থা হয়েছিল।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বলছেন, তিনি তাঁর রাসূল ও তাঁর সাহায্যকারী মুমিনদের ওপর সাকীনা নাযিল করলেন। সাথে-সাথে বললেন, যখন তাদের তন্দ্রা এসেছিল। সুতরাং তন্দ্রা আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত।

খোদাপ্রেমিকদের কথা

কতিপয় লোক অনেক সময় অভিযোগ উত্থাপন করে, হুজুর! আমরা যিকির করতে বসি, মুরাকাবা করি; তখন আমাদের ঘুম এসে যায়। সে ক্লান্ত হওয়ার কারণে ঘুম আসেনি। এখানে কোনো বিছানা নেই। অথচ এই অবস্থায় নিদ্রা এসে যায়। এর জন্য সে অস্থিরতা বোধ করে। একথাটি ভালো করে বুঝে নাও যে, মুরাকাবায় ঘুম-তন্দ্রা এলে অস্থির হবেন না। চেষ্টা করবেন ঘুম না আসার জন্য। মানুষ তার নিজের পক্ষ থেকে চেষ্টা করবে যে, জাগ্রত অবস্থায় স্বজ্ঞানে বসে আল্লাহর যিকির করি। তথাপি যদি আকস্মাৎ ঘুম এসেই যায়, তাহলে চিন্তার কোনো কারণ নেই এর দ্বারা তোমার মুবাকাবার ব্যাঘাত ঘটবে না। সুতরাং এটি আপনাদের জন্য খুশির সংবাদ।

একটি বিরল উদাহরণ

মনে করুন, কোনো ফকির ফজরের নামাযের পর কোনো দানশীল ব্যক্তির দরবারে উপস্থিত হলো। দানশীল ব্যক্তি এখনো বাড়ির বাইরে আসেনি। সে তার বারান্দায় বসে তন্দ্রায় হাবুডুবু খাচ্ছে। ঘণ্টাখানেক ঘুমাচ্ছে। তারপর দানশীল ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কখন উপস্থিত হয়েছ? এখন কি ওই লোক তার তন্দ্রার সময়টুকু বাদ দিয়ে বলবে? নাকি বলবে, জনাব! আমি ফজরের পরেই আপনার দরবারে হাজির হয়েছি। সুতরাং ফজরের পর থেকেই তার হাজিরা লেখা হয়। অতএব, দুনিয়ার সাধারণ দানবীরের নিকট

---

১৩৯. সূরা তাওবা : আয়াত ২৬

যদি তন্দ্রার সময় বাদ না দেওয়া হয়, তাহলে মহা মহিম দানবীর শাহানশাহের দরবারে মুরাকাবা অবস্থায় তোমার তন্দ্রার সময় বাদ যাবে কেন?

বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ

এবার এখানে বাস্তব একটা উদাহরণ দিতে চাই। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগ। অনেক কিছু বোঝানো সহজ হয়েছে। দেখুন, আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে মোবাইল ফোন আবিষ্কৃত হয়েছে। কেউ তার ফোনটা চার্জিংয়ে লাগান। এবার তার ফোন চালু থাকুক কিংবা বন্ধ থাকুক সেটা চার্জ হতেই থাকবে। ঠিক তেমনিভাবে আপনিও মুবারাকাবার মাধ্যমে আপনার অন্তরের ব্যাটরি চার্জ দিচ্ছেন। এখন আপনার প্রাণের মোবাইল Off থাকুক কিংবা On এতে কোনো পার্থক্য নেই। আপনার ব্যাটারি চার্জ হবেই।

আল্লাহ তা'আলা মানুষের নিয়ত দেখেন

মুরাকাবায় বসে তন্দ্রা এলে ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই। তবে যদ্দুর সম্ভব নিজের পক্ষ থেকে জাগ্রত থাকার প্রতি সতর্ক থাকবেন। কারণ, অনেক সময় ক্লান্তির কারণেও ঘুম আসতে পারে। কখনো তার অভ্যাসের দরুণ ঘুম এসে যায়। কেউ-কেউ তো আছে, মাশাআল্লাহ সব সময়ই তন্দ্রা তাকে গ্রাস করে থাকে। তার ধারা-ই এরকম। যখন চায় তখনই ঘুমাতে পারে। সুতরাং ওই ব্যক্তি মুরাকাবায় মাথা অবনত করলে কি বুঝবেন যে, তার মুরাকাবা আগে হয়, নাকি, ঘুম আগে আসে। তবে অনিচ্ছায় তন্দ্রা এসে গেলে এতে কোনো পার্থক্য হতে পারে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা মানুষের নিয়ত দেখেন। আচ্ছা বলুন তো, আপনি যিকির শুরু করার সময় মুরাকাবার নিয়ত করেছিলেন, নাকি ঘুমের নিয়ত করেছিলেন?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتُ

'নিশ্চয় আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।'

আর যদি আপনি নিয়তই করেন, আমি মুরাকাবার অবস্থায় ঘুমের কাজ সেরে নেব, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। তবে মুরাকাবায় মগ্ন ব্যক্তি এমন নিয়ত করতে পারে না। সে আল্লাহর স্মরণেই চলে। এমতাবস্থায় যদি তার তন্দ্রা এসে যায়, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই।

যিকিরকারীদের ওপর সাকীনার অবতরণ

আসল ব্যাপার হচ্ছে, ভাই! আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিশেষ রহমত সাকীনা বা প্রশান্তি অবতণের সময় মানুষের মধ্যে তন্দ্রার ভাব এসেই থাকে। এটা তন্দ্রা নয়। মূলত এটা সাকীনার আলামত। এজন্যই যারা মুরাকাবার সময় তন্দ্রা যায়, তারা আশপাশের সকল কথা বুঝতে পারে। একে ঘুম বলে না। তাই বলছিলাম, ভাই! মুরাকাবায় তন্দ্রা আসা দোষের নয়। যিকিরকারীরা এটা বুঝতে পারে না। তারা মনে করে, আমার উন্নতি হচ্ছে না। আমার তো সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুম এসে যায়। মুরাকাবায় বসা আমাদের কাজ আর রহমত নাযিল করা আমাদের মালিকের কাজ। সুতরাং মানুষ যখনই মুরাকাবায় বসে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রহমত বর্ষিত হতে থাকবে।

نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ

'তাদের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়।'

অতএব, যখন রহমত বর্ষিত হচ্ছে, তখন এর প্রভাব তো পড়বেই। এটা কীভাবে হয় যে, রহমত বর্ষণ হচ্ছে আর তার প্রভাব পড়বে না? আর যখন প্রভাব পড়বে, তখন তার অবস্থার পরিবর্তন প্রকাশ হতে থাকবে। কেননা, প্রভাবের দ্বারাই অবস্থার সৃষ্টি হয়।

মানবিক পর্যবেক্ষণ

আপনারা দেখে থাকবেন, বৃষ্টি হলে সাধারণত জমিনে কিছু-না-কিছু উৎপন্ন হয়েই থাকে। তবে হ্যাঁ, যদি কোনো পাথুরে জমিন হয়, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। নতুবা সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, বৃষ্টির মৌসুমে, বর্ষার সিজনে চতুর্দিক খুব সবুজ-শ্যামল দেখায়। বলা হয়, শ্রাবণের ঝড় সবুজের সমারোহ। সুতরাং শ্রাবণের মৌসুম এমনই হয়। কারণ, তখন বর্ষাকাল। আর বর্ষকালে প্রচুর উদ্ভিদ ও ফসল উৎপন্ন হয়।

রহমতের বর্ষণ

অতএব, যখন আল্লাহ তা'আলার রহমতের বর্ষণ শুরু হয়, তখন মানুষের হৃদয়ে নতুন-নতুন চারাগাছ গজিয়ে ওঠে এবং তা থেকে ফসল উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ– তার অবস্থার পরিবর্তন হয়। সেই অবস্থাকে আর কোনো কিছু বারণ করতে পারে না। যিকিরের কারণে বান্দার কিছু-না-কিছু নতুন অবস্থা আসবেই। তার অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবেই।

যিকিরের মধ্যে আলাদা বৈশিষ্ট্য না পাওয়ার কারণ

যদি কেউ বলে, যিকিরের মধ্যে আমার আলাদা কোনো অবস্থা অনুভব করতে পারিনি, তাহলে এটাও একটা অবস্থা। এজন্যই বলা হয় Some thing is to be wrong somewhere কিছু-কিছু জিনিসি কোনো-কোনো জায়গায় ভুলও হয়। সেটা মেনে নেওয়া চাই। তার অন্তরে আলাদা কোনো প্রভাব সৃষ্টি হতে পারে। তার অন্তরে আলাদা অবস্থা না হওয়ার কারণ কী? তার অন্তরে যিকিরে সেই বরকত প্রকাশ না হওয়ার কারণ কী? এর কারণ হলো, সে এমন কোনো মারাত্মক গুনাহে লিপ্ত হয়েছে, যার ফলে যিকিরের দ্বারাও তার হৃদয়ের অবস্থার পরিবর্তন হয় না। তার হৃদয়ে তালা লেগে আছে। হৃদয়ের দ্বার খুলছে না। অথবা তার জীবনে কি কোনো হারাম ঘুরপাক খাচ্ছে যে, যিকিরের দরুণ যে-অবস্থা সৃষ্টি হয়, তা সেই পাপকর্ম চাপা দিয়ে রাখে।

আশ্চর্য ঘটনা

ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) বলেন, আমার এক খাদেম ছিল। আর সাধারণত খাদেমের ব্যাপারে কিছু নমনীয় ব্যবহার করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ۝

'দয়ার প্রতিদান দয়া ব্যতীত আর কী হতে পারে?'[১৪০]

একদা সে এসে বলল, হুজুর! আমার ভাইয়ের অন্তিম সময় শুরু হতে যাচ্ছে। অনুগ্রহপূর্বক যদি আপনি আমাদের বাড়িতে আসেন, তাহলে আপনি আমার ভাইয়ের জন্য দু'আ করবেন এবং তার প্রতি তাওয়াজ্জুহ (খাছ মনোনিবেশ) দেবেন। এতে আমার ভাইয়ের জীবন ধন্য হবে, তার শেষ পরিণাম মঙ্গলজনক হবে। তার কথায় আমি সেখানে গেলাম। তার জন্য দু'আ করলাম। তার প্রতি খাছ তাওয়াজ্জুহ দিয়ে অনেকক্ষণ তার পাশে বসে রইলাম। কিন্তু তার অন্তরের কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি না। আল্লাহর কোনো খাছ বান্দা কারও প্রতি তাওয়াজ্জুহ প্রদান করলে তার অন্তরের পরিবর্তন হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তিনি বলেন, তার অবস্থার কোনো পরিবর্তন অবলোকন করতে পারছি না। আমি অনেকক্ষণ সেখানে বসে থাকি। কিন্তু

---

১৪০. সূরা আর-রাহমান : আয়াত ৬০

কোনো পরিবর্তন না দেখে অত্যন্ত অস্থির হয়ে গেলাম। তারপর আমি মহান আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করলাম, হে আল্লাহ! এই বান্দার অবস্থা আমার নিকট প্রকাশ করে দাও। ফলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমার অন্তরে এলহাম করা হলো, এই বান্দা সারা জীবন বদকারদের সঙ্গে চলাফেরা করেছে, বেদীন কাফেরদের সঙ্গে ওঠাবসা করেছে। তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রেখেছে, তাদের কথাবতার্তা ও চালচলন গ্রহণ করেছে। সেই অন্ধকার আজ যুগের মুজাদ্দিদের তাওয়াজ্জুহের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে।

একটু চিন্তা করে দেখুন, হাজার বছরের মুজাদ্দিদ, যাঁর আধ্যাত্মিক তাওয়াজ্জুহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মানুষের ওপর এক হাজার বছর পর্যন্ত পৌঁছতে থাকে। তিনি সরাসরি সেই বান্দার অন্তরে তাওয়াজ্জুহ দিচ্ছেন; তবু কোনো প্রকার প্রভাব হচ্ছে না।

নবীজির মোবারক ফরমান

হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِيْ

'নিশ্চয় আল্লাহ হলেন দাতা আর আমি হলাম বণ্টনকারী।'

অতএব, সেই তাওয়াজ্জুহ অন্তরের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে দৌড়ায়। যেমন– তারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমাদের পর্যন্ত পৌঁছায়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

দেখুন ভাই! বৃষ্টিবর্ষণ করেন কে? আল্লাহ তা'আলা। কিন্তু মেঘ তার মাধ্যম হয়। সন্তানাদি কে দান করেন? আল্লাহ তা'আলা। কিন্তু মাতাপিতা মাধ্যম হন। এমনিভাবে মানুষের হৃদয়ে নূর প্রদান করেন কে? আল্লাহ তা'আলা। কিন্তু পীর সাহেব এর মাধ্যম হন। সুতরাং এটা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, হৃদয়ে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নূর আনতে হলে অন্তরকে একটা পর্যায়ে তৈরি করতে হবে ।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত

উল্লিখিত বিষয়টি বোঝার জন্য একটি উদাহরণ শুনুন। যেমন দেখুন, বিদ্যুতের প্লান হাই ভোল্টেজ থাকে। তারপর এই হাই ভোল্টেজের সামনে একটি ট্রান্সফরমার লাগানো হয়। তার পরে বিদ্যুতের বাল্ব সংযোগ দেয়া

হয়। কারণ, এই বাল্ব সরাসরি সেই ভোল্টেজ ধারণ করার ক্ষমতা রাখে না। তাই সরাসরি বাল্বে কানেকশন দিলে তা ফিউজ হয়ে যাবে। তেমনিভাবে কোনো সৃষ্টজীবের এই ক্ষমতা নেই যে, সে সরাসরি আল্লাহ তা'আলা থেকে কল্যাণ ও রহমত গ্রহণ করবে। সুতরাং উম্মতের জন্য আম্বিয়ায়ে কেরাম মাধ্যম হলেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের সেই যোগ্যতা প্রদান করেন। তাঁরা সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে সেই রহমত সংগ্রহ করেন এবং উম্মতের মাঝে বণ্টন করেন।

আল্লাহর নবীর বৈশিষ্ট্য

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেরাজের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَأَوْحَىٰٓ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَآ أَوْحَىٰ ۝

'তিনি তাঁর বান্দার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করার করেছেন।'[১৪১]

অর্থাৎ– আশেক ও মাশুকের মধ্যে কী কথোপকথন ও একান্ত সাক্ষাৎ হয়েছে, তা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি আল্লাহ তা'আলার থেকে রহমত ও বরকত সংগ্রহ করেন। আর বান্দারা যে রহমত পেয়ে থাকে, তা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমেই পেয়ে থাকে। এবার হয়তো বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছেন। এমনিভাবে আমরা যারা আছি, আমাদের ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝখানে আমাদের মাশায়েখগণের অন্তর বিদ্যমান রয়েছে। মনে করুন! আপনার অন্তর আমার শায়খ মুরশিদে আলম (রহ.)-এর অন্তরের সঙ্গে সংযুক্ত। তাঁর অন্তর তাঁর শায়খের অন্তরের সঙ্গে যুক্ত। এভাবে প্রত্যেক অন্তর পরিষ্কারভাবে সংযুক্ত রয়েছে। অবশেষে সবার অন্তর সাইয়্যেদুনা আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর অন্তরের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে। সবশেষ তাঁর অন্তর মাহবুবে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তর মহা মহিম আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে, যেখান থেকে এই রহমত ও বরকতের প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়। সুতরাং যে-বান্দা যিকিরের মাধ্যমে

---

১৪১. সূরা নাজম : আয়াত ১০

মুরাকবায় বসে, তার অবস্থায় কিছু-না-কিছু পরিবর্তন আসবেই। যদি সেই পরিবর্তন উপলব্ধি না-ও করতে পারে, তবে তাকেও তার একটি অবস্থা বলে মেনে নিতে হবে। এরও কোনো-না-কোনো প্রভাব রয়েছে।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.)-এর মর্যাদা

আমি আপনাদের বলেছিলাম, ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.), যিনি হাজার বছরের মুজাদ্দিদ। উম্মতের সমস্ত ওলামায়ে কেরামের ঐক্যমতে তাঁর শানে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.), যিনি হিজরতের দ্বিতীয় হাজার বছরের মুজাদ্দিদ। এর মধ্যে যত আউলিয়ায়ে কেরাম এসেছেন, যেকোনো তরিকারই হোন-না কেন? এবং যেকোনো স্তরেরই হোন-না কেন? সবাই তাঁর ফয়েজ ও বরকতের অনুসরারী। কারণ, তিনি সকল তরিকার অনুসারী ছিলেন। তিনি চার তরিকার সম্পর্ক হাসিল করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর থেকে নকশবন্দি তরিকার খেদমত বেশি নিয়েছেন। পরবর্তী যে-ফয়েজ ও বরকত চলতে আসছে, সবই তাঁর মাধ্যমে চলছে।

একটি ব্যাধি ও তার লক্ষণ

যদি মানুষ মুরাকাবায় বসে তার আলাদা কোনো অবস্থা সৃষ্টি না হয়, তবে এটিও একটি নির্দেশনা। এটি E.C.U সেকশনের ব্যাধি।

আধ্যাত্মিক চিকিৎসা

এখানে বসে তার চিকিৎসা হবে না। যখন মারাত্মক রোগ হয় তখন সবাই তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায়। মা, বাবা, স্ত্রী, পুত্র সবাই বলে, তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাও। এমনিভাবে কতিপয় লোক আত্মিকভাবে E.C.U এর রোগী হয়। তাকে আধ্যাত্মিক পীরের নিকট চিকিৎসা করা চাই। তারপর সেখানে কিছু সময় লাগানো দরকার। তার পীরের সান্নিধ্য অর্জন করা অবশ্যক। তারা ওই সমস্ত লোক, যাদের বাণী ওষুধ এবং যাদের অন্তর্দৃষ্টি নিরাময় হয়ে থাকে।

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

বন্ধুগণ! সূর্যের কিরণের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়। আগেকার যুগে এ-বিষয়টা বোঝানো কঠিন হতো। আমি আগেই বলেছি, বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে

অনেক কিছু বোঝানো সহজ হয়েছে। ক্যান্সারের চিকিৎসা কীসের মাধ্যমে করা হয়? লেজার রশ্মির মাধ্যমে করা হয়। বর্তমানে কারও পাথর হলে সেটা লেজারের মাধ্যমে চুরমার করা হয়। সুতরাং যদি পার্থিব ব্যাধির চিকিৎসা কিরণের মাধ্যমে করা যায়, তাহলে আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসা আলোকরশ্মির মাধ্যমে করা যাবে না? বুযুর্গদের দৃষ্টি তো আলোকরশ্মির ন্যায় দীপ্তিমান। কোনো কবি বলেন,

تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں

خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں

তোমার চিকিৎসা দৃষ্টি বই কিছু নয়।

হকার ও সাংবাদিকের নিকট সংবাদ ছাড়া কিছুই নেই।

সুতরাং দৃষ্টির প্রভাব পড়ে। শরীয়তের দৃষ্টিতে আমি এর প্রমাণ দিচ্ছি।

হাদীছের আলোকে নজর লাগা

হাদীছ শরীফে এসেছে, এক সাহাবির ওপর কারও নজর লেগে যায়। তাকে অসুস্থ দেখা যাচ্ছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার ওপর তোমার অমুক ভাইয়ের নজর লেগেছে। তারপর তিনি সেটা দূরীকরণের পন্থা বলে দিলেন।

হাদীছ শরীফে এসেছে,

اَلْعَيْنُ حَقٌّ

'নজরের প্রভাব সত্য।'

অর্থাৎ– নজর লাগে। নজর তার প্রভাব বিস্তার করে। এবার বলুন, যে-নজরে দুশমনি, হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা, ক্রোধ, লিপ্সা, আশা রয়েছে, সেই নজর যদি অন্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে, তাহলে আল্লাহওয়ালাদের নজর, যার মধ্যে দয়া, ভালোবাসা, অনুগ্রহ, অনুকম্পা রয়েছে, তাতে প্রভাব হবে না কেন? সুতরাং আল্লাহওয়ালাদেরও নজর লাগে। যাদের ওপর বদনজর লাগে, তার থেকে অকল্যাণ প্রকাশ পায়। আর যার মধ্যে নেক নজর লাগে, তার মধ্যে শুভ লক্ষণ প্রকাশ হতে থাকে। ওই বান্দার অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা সঞ্চার হয়। তার জীবনের পরিবর্তন ঘটে। আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক করার তামান্না তার মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকে।

ইংরেজি ভাষার মূল তত্ত্ব

সাধারণত এটাই উচিত ছিল যে, আমি মোটামোটি ইংরাজিতেই আলোচনা করব। কিন্তু অপারগতার দরুণ আমাকে উর্দূ ভাষাই আলোচনা করতে হচ্ছে। কারণ, কিছু-কিছু শব্দের হুবহু ইংরেজী শব্দ আমি খুঁজেই পাচ্ছি না। যেমন– আপনারাই বলুন توجه শব্দের আমি কী ইংরেজী বলব। فيض শব্দের ইংরেজি কী বলব। আমার বুঝেই আসছে না। تجليات শব্দের ইংরেজি কী বলা যাবে। আরও কত শব্দ রয়েছে, যেগুলো ইংরেজিতে বলা সম্ভব নয়। আর আজকের আলোচনা যেহেতু একটি নির্ধারিত বিষয়ের ওপর হবে। অর্থাৎ– অন্তরের যিকির, অন্তর জারি হওয়া; সুতরাং কলব জারি হওয়ার বিষয়টি আমি ইংরেজীতে কী বলব।

যাক আমার পাশে একজন বসে আছেন, যিনি ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে দক্ষ। তিনি আপনাদের বোঝাবেন। আমরা তো ইংরেজি শিক্ষা করেছি। আর তাদের মাতৃভাষাই হচ্ছে ইংরেজি। এই পরিবেশেই তারা বসবাস করেছেন। আর আমরা ইংরেজি ভাষায় বললেও তা হবে আমাদের দেশীয় উচ্চারণ ও দেশীয় ভঙ্গিতে। আর তিনি তো মাশাআল্লাহ ইংরেজি ভাষার কারী। তার বাচনভঙ্গিও সেই রকম। তার কাছে জিজ্ঞাসা করে নিবেন 'কলব জারি হওয়া'কে ইংরেজিতে কী বলে। আপনাদের বোঝানোর মতো ইংরেজি শব্দ আমার স্মৃতিপটে নেই। তাই আমি উর্দূ ভাষায় আলোচনা করব। আর আপনারা বুঝে নেবেন, 'কলব জারি হওয়া' কাকে বলে।

সুতরাং এই অপরাগতার দরুণ, বিশেষ করে আজকের বয়ান আমি উর্দূ ভাষায় করব, যাতে আমার পক্ষে আপনাদের বোঝানো সহজ হয়। আর আপনারা বুঝে নেওয়াও সহজ হয়। একান্তই যদি কারো বুঝতে কঠিনই হয়, তাহলে বোঝার জন্য একটু চেষ্টা করবেন। আমরা যে-রকম ইংরেজি বলতে চেষ্টা করি, তেমনি আপনারা উর্দূ ভাষা বোঝার জন্য একটু চেষ্টা করে নেবেন। এমন তো নয় যে, আপনারা বলবেন, আমরা একমাত্র ইংরেজিই বুঝতে পারি। আপনারা কিছু চেষ্টা করবেন। আমিও মোটামুটি বলার চেষ্টা করব। তাহলে বোঝা ও বোঝানো সহজ হবে।

সুতরাং যারা যিকির করার পরও অবস্থার কোনো পরিবর্তন উপলব্ধি হয় না, এরও কোনো-না-কোনো কারণ রয়েছে। এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, যারা যিকির করবে, এর কিছু-না-কিছু প্রভাব তার ওপর পড়বেই। কোনো প্রভাব না হওয়া অসম্ভব।

মৌলিক বিষয়

আমি আপনাদের একটি মূলনীতি শিক্ষা দিচ্ছি যে, আপনি না বললেও পীর সাহেবের অনুমান হয়ে যায়, কে যিকির করে আর কে করে না। তবে তিনি আলিমুল গায়েব নন। আলিমুল গায়েব একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। কিন্তু তাঁদের নিকট অন্তর্দৃষ্টি থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাদের অবগত করে দেন।

এখন আমি আপনাদের একটি মহৎ বিষয় বলব। যদি কোনো লোক নিয়মতান্ত্রিকভাবে যিকির আদায় করে, তাহলে তার ওপর যিকিরের প্রভাব পড়বে। যদি প্রভাব হয়, তাহলে সে পীর সাহেবকে আরও জিজ্ঞাসা করবে, পরামর্শ নিবে। পক্ষান্তরে যদি কেউ কোনোদিন পীর সাহেবকে কোনো কিছুই জিজ্ঞাসা করে না, সবকও গ্রহণ করে না, সাক্ষাৎ, কথাবার্তা বা ফোনের মাধ্যমেও যোগাযোগ না রাখে, যিকির সম্পর্কে মুযাকারাও করে না, তাহলে এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সে নিয়মানুযায়ী যিকির করে না। যারা যিকির করে, তাদের অবস্থা সঙ্গে-সঙ্গে প্রকাশ পায়। পীর সাহেব অনুমান করতে পারেন, কে কী পরিমাণ যিকির করে। আল্লাহ তাদের অবগত করে দেন। এটা অদৃশ্যের সংবাদ জানা নয়। এটা নিরীক্ষণ, এটা অন্তর্দৃষ্টি, এটা মানবিক তীক্ষ্মতা।

একটি চিত্তাকর্ষক উদাহরণ

বিজ্ঞ ডাক্তার হলে তিনি রোগী দেখেই বলতে পারেন, তার ম্যালেরিয়া হয়েছে। তাকে কোনো ধরনের Test করতে হয় না। তিনি সামান্য লক্ষণ দেখেই বলে দেন, তোমার এই হয়েছে। আর বাস্তবও এমনই হয়ে থাকে। সুতরাং যেভাবে দৈহিক ডাক্তার রোগী দেখেই তার বিভিন্ন অবস্থা বলতে পারেন, তেমনিভাবে আধ্যাত্মিক ডাক্তার পীর সাহেবও শিষ্যের অবস্থা দেখেই বলতে পারেন তার মধ্যে কী আছে আর কীসের অভাব রয়েছে।

বর্তমান যুগের মুরীদ

বর্তমান যুগের মুরীদরাও খুব চতুর। মানুষ ডাক্তারের নিকট গমন করলে মনচাহি ব্যাধির কথা প্রকাশ করে এবং পীর সাহেবের নিকট এলেও সঠিক কথা বলে না। স্বপ্নের কথা বললেও তার দৃষ্টিতে যা ভালো সেই অংশই বলে। আর যে অংশে কিছু গরবর দেখা দেয় তা গোপন রাখে। তখন পীর সাহেব দ্বিধায় পড়ে যান। সে যা বলছে, তা শত ভাগ সঠিক হচ্ছে না। সে কিছু বলছে আর কিছু পীর সাহেবকেও বলতে হচ্ছে।

সুতরাং যখনই যিকিরের প্রভাব পড়বে, তখন অবশ্যই কিছু সম্পর্কের সৃষ্টি হবে। এটা কীভাবে হয়? সে যখন ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন নিয়ে ওষুধ খেতে শুরু করল, তখন সামান্য কাশি হলেই ফোন করে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে। সুতরাং যিকিরের দ্বারা অবস্থার পরিবর্তন অনুভব হলে পীর সাহেবের শরণাপন্ন হবে না কেন?

মুরাকাবার নিয়মানবর্তীতার প্রভাব

নিয়মতান্ত্রিকভাবে যারা মুরাকাবা করে, তাদের ওপর অবশ্যই এর প্রভাব পড়ে। এর উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হলো, তার অন্তর জারি হয়ে যাবে। সুতরাং বুঝে নিন, অন্তর জারি হওয়া কাকে বলে?

অন্তর জারি হওয়া কাকে বলে?

'অন্তর জারি হওয়া' কাকে বলে? আমি আজকের মাহফিলে সেই আলোচনা করছি। কেননা, এখানে অনেক পুরনো ওলামায়ে কেরাম ও তালিবে ইল্‌ম রয়েছেন। সুতরাং তাদের সম্মুখে ওই ধরনের কথা প্রকাশ করা উচিত।

সাধারণ মাহফিলে এ-ধরনের আলোচনা করা সমীচীন নয়। খুবসম্ভব আপনারা এমন আলোচনা আর শোনেননি। বিশেষ মাহফিলে যেখানে সত্যিকারের যিকিরকারী, শিক্ষা গ্রহণকারী, অর্জকারী, প্রচেষ্টাকারী উপস্থিত থাকেন, তাদের বোঝানো যায় অন্তর জারি হওয়া কাকে বলে।

অন্তরের অবস্থা

কলব বা অন্তরের অবস্থান কোথায়? মানুষের বুকে বাম স্তনের দুই আঙুল নিচে খালি জায়গায় মানুষের অন্তরের অবস্থান।

প্রাথমিক অবস্থা

সাধারণত মুরাকাবাকারীদের নিয়মানুবর্তিতার প্রতি লক্ষ রাখা, তাক্‌ওয়া ও পবিত্রতা অবলম্বন করা, সুন্নতের অনুসরণ করাই প্রাথমিক অবস্থা হয়ে থাকে। অন্তরের অবস্থান স্থলে তার এক প্রকার অস্থিরতার ভাব দেখা দেবে। আশ্চর্য ধরনের অস্থিরতা উপলব্ধি করবে। আপনারা দেখে থাকবেন, কখনো-কখনো বসা থাকা অবস্থায় মানুষের শরীরের অনেক স্থানের গোশত আশ্চর্য ধরনের নড়াচড়া করতে থাকে। কখনো কোমরের, কখনো রানের, কখনো বিভিন্ন

অঙ্গের। এমনিভাবে অনবরত তার হৃদয়ে এক আশ্চর্য অবস্থার সৃষ্টি হয়, যা উত্তেজিত হতে থাকে।

হৃৎকম্প ও উদ্বেগ

অন্তরের কম্পন বা ভীতি ভিন্ন জিনিস এবং যিকিরের কারণে তার উদ্বিগ্নতা ভিন্ন জিনিস। উভয়টি এক নয়।

হৃৎকম্পের একটি জরিপ

অন্তরের যে কম্পমান অবস্থা, তাকে Pulpitation of Heart বলে। এটা হৃৎকম্প। এটা মিনিটে প্রায় ৭০/৭৫ বার কাঁপতে থাকে। দ্রুত চললে বা পলায়ন করলে মিনিটে একশবারও কাঁপতে থাকে। আরও হয়রান হলে মিনিটে একশত বিশবারও হয়। তবু এ কম্পমান অবস্থা সাধারণ ধর্তব্য হয়।

তীক্ষ্ম স্থানের অবস্থা

এই যে কম্পমান অবস্থার অনুভূতি হয়, এটা মানুষের সূক্ষ্ম স্থানের ওপর অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলতে থাকে। সেটা কেমন হয়? অত্যন্ত দ্রুত হয় এবং কম্পমান অবস্থার অনুভূতি হয়।

বাস্তব বিশ্লেষণ

মনে করুন, কোনো বাস দাঁড়িয়ে আছে। তার ইঞ্জিন চালু রয়েছে। এমতাবস্থায় কেউ তাতে উঠে বসে থাকলে সে অনুভব করবে, যেন বাসের সারাটা বডি কাঁপছে, যেন হালকা ধরনের ভাইব্রেশন লাগিয়ে রাখা হয়েছে। তেমনিভাবে মানুষের হৃদয়েও ভাইব্রেশন লেগে থাকে।

দৃষ্টি আকর্ষণ

কতিপয় লোক সর্বদা সেই অবস্থা উপলব্ধি করে। কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করলেই তার সেই অবস্থা উপলব্ধি হয় এবং তা দ্রুত হতে থাকে। এটা হৃদয়ের কম্পমান অবস্থান। এটা ভাইব্রেশন। বান্দাও তার ভাইব্রেশন ওই সূক্ষ্ম জায়গার উপলব্ধি হয়। সে তা বুঝতে পারে। ফলে কতিপয় বান্দা, যারা সেই অবস্থা অনুভব করে, তারপর অধিক পরিমাণে যিকির করতে থাকে। এতে তার যিকিরের অবস্থা আরও মজবুত হয়। তার প্রভাব প্রাধান্য পেতে থাকে। প্রথমে সেই কম্পমান অবস্থার উপলব্ধি করতে থাকবে। তারপর সেই

অবস্থা প্রাধান্য পেতে থাকে। এরপর যদি সেদিকে মনোযোগ না হয়, তবু সেটা প্রাধান্য পেতে থাকে। সুতরাং প্রথমে তাওবা করত অধিক পরিমাণে যিকিরের কারণে। তারপর তা আরও দৃঢ় হয়। এমনকি সে নিজের চোখের সামনে তার প্রভাব দেখতে পায়। এমন বান্দা যখন তার সেই কম্পমান অবস্থার উপলব্ধি করে, তখন তা প্রাধান্য পেতে থাকে। কারণ, কলবের কম্পমান অবস্থা প্রাধান্য হতে থাকে। এটা সাধারণ মানুষ অনুভব করতে পারে। কিন্তু সে তা অনুভব করতে পারার আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

উদাহরণ

বিষয়টি একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝুন; তাহলে আপনাদের বুঝতে সহজ হবে। যদি কোথাও রুমের মধ্যে ছাদে টিউব লাইট লাগানো হয় আর নিচে সিলিং ফ্যান থাকে। তারপর সিলিংফ্যান চালানো হয়, তাহলে নিচে বিছানার মধ্যে আলাদা ধরনের এক প্রকার আলোর বিকাশ হয়। ফ্যানের কোনো ছায়াও থাকে না। কারণ, ফ্যান খুব দ্রুতগতিতে চলতে থাকে এবং সে আলো যেন নড়াচড়া করতে থাকে। ঠিক তদ্রূপ আল্লাহওয়ালাদের দৃষ্টির সামনে তোমার অবস্থা ওই রকম প্রস্ফুটিত হতে থাকে।

আন্তরিক অবস্থাসমূহ

আপনি উদাহরণস্বরূপ ওই লোকের দৃষ্টান্ত দিতে পারেন। তবে এটা জরুরি নয় যে, সবার অবস্থা একই রকম হবে। এজন্যই আমি বলেছিলাম, সাকীনা (আল্লাহর বিশেষ রহমত) দ্বারা অন্তর ও মানুষের মধ্যে যে প্রভাব প্রকাশ পায়, তা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কারও হৃদয়ে আনন্দ অনুভব হয়, কারও গুনাহের প্রতি অনীহা উপলব্ধি হয়। এর পরিপূর্ণ ব্যাখ্যার সারাংশ হলো, প্রত্যেক মানুষের অবস্থা ভিন্ন হয়। তবে সাধারণত মানুষ যে প্রতিবেদন পেশ করে, তা আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এই অবস্থা কারা উপলব্ধি করে?

অধিকাংশ লোকই এমনটা অনুভব করে। কম্পমান অবস্থা সৃষ্টি হয়। একেই বলা হয়, বান্দার কলব জারি হয়েছে। এটা হচ্ছে প্রাথমিক অবস্থা। এই অবস্থা প্রকম্পিত অনুভব হয়। তারপর যখন সে তাক্ওয়া ও পবিত্র জীবন যাপন করতে থাকে এবং আরও গুরুত্ব দিয়ে যিকির করে, তখন তার এই অবস্থা স্মারকে পরিণত হয়। অর্থাৎ– সে সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকে। সর্বদা তার অন্তর আল্লাহ-আল্লাহ বলতে থাকে। তখন তার এই

কম্পমান অবস্থা আলাদা একটি আকৃতি ধারণ করে। আল্লাহর ধ্যানে সারাক্ষণ মগ্ন থাকে। তখন এমন যিকিরকারী হাঁটতে-চলতে, উঠতে-বসতে সর্বদা তার হৃদয় থেকে আল্লাহ শব্দের ধ্বনি প্রকাশ হতে থাকে। তবে সেটা অন্য লোক শুনতে পায় না। শুধু সে নিজে অনুভব করতে পারে।

এর দৃষ্টান্ত এভাবে মনে করুন যে, বর্তমান যুগে যারা গান-বাজনা ইত্যাদির আশেক, তারা পকেট মোবাইল ইত্যাদি রেখে কানে ওয়াকম্যান লাগিয়ে রেখে বিভিন্ন জিনিস শুনতে থাকে। ফলে সে হঠাৎ হাসি-ঠাট্টা ও বিভিন্ন প্রকার অঙ্গভঙ্গি করতে থাকে। তখন লোকজন তাদের দেখে কখনো পাগল মনে করে। কারণ, তার মধ্যে বাহ্যিক কোনো কিছু দেখা যাচ্ছে না। আল্লাহ মালুম, সে ওয়াকম্যানের মাধ্যমে কী শ্রবণ করছে। এর মাধ্যমে সে অনেক কিছু উপলব্ধি করছে। ঠিক তেমনিভাবে যারা প্রকৃত যিকিরকারী, তাদের অন্তরে যিকিরের কারণে আলাদা অবস্থার সৃষ্টি হয়, যা অনুভব করে সে ভরমজলিসে কখনো হাসে, কখনো কাঁদে। মজলিসে থেকেও যেন সে কোথাও গায়েব হয়ে যায়।

তাই কোনো কবি বলেন–

اگر خلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کا مزہ آئے

جو آئے اپنی جلوت پر تو ساقط وسخانی

یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر

یہی ہیں جن کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی

'নির্জনে বসেও সে জনসমক্ষের স্বাদ ভোগ করে।
সে জনসমক্ষের ন্যায় কথোপকথন করতে থাকে।
সে শুয়ে থেকেও ইবাদাতের সাওয়াব পায়।
তার তাক্ওয়ার ওপর মুসলমানিত্ব গর্ব করে।'

একে বলে মাহফিলে বসেও নির্জনতার স্বাদ আস্বাদন করা। জনসমক্ষে বসে থেকে আপন মাহবুবের ধ্যানে মগ্ন হওয়া। তখন বলে,

تم میرے پاس ہوتے ہو گویا

جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا!!!

আমি একা থাকলে তুমি আমার পাশে থাক। আল্লাহ তাদের সঙ্গে থাকেন। সর্বদা তাদের এমন অবস্থার বিকাশ হয়।

অতএব, কলব জারি হওয়ার প্রাথমিক অবস্থা হলো অন্তরে কম্পমান অবস্থা সৃষ্টি হওয়া। তারপর আস্তে-আস্তে তা মাশুকের স্মারকে পরিণত হয়। আল্লাহর যিকির সর্বদা তার অন্তরে বিরাজ করে। এমন যিকিরকারী সম্পর্কেই বলা হয়, তার অন্তর জারি হয়েছে।

সুতরাং সে আল্লাহকে কখনো ভুলতে পারে না। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, চলতে-ফিরতে সর্বদা আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকে। তাই কোনো কবি বলেন,

خَيَالُكَ فِيْ عَيْنِيْ وَذِكْرُكَ فِيْ فَمِيْ * وَمَثْوَاكَ فِيْ قَلْبِيْ فَأَيْنَ تَغِيْبُ

'তোমার ভাবনা আমার চোখে, তোমার আলোচনা আমার মুখে, তোমার অবস্থা আমার হৃদয়ে। সুতরাং তুমি কোথায় অদৃশ্য হবে।'

সুতরাং বান্দার অবস্থা এমন হয়। সে সর্বদা আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করতে থাকে। এজন্যই তাদের আল্লাহওয়ালা বলা হয়। তারা সর্বদা আল্লাহর সঙ্গ গ্রহণ করে। এটা হলো যিকিরের অবস্থা। তারপর তাদের ওপর আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমত নাযিল হয়। একেই বলা হয় 'কলব জারি হওয়া'।

অন্তর জারি হওয়ার লক্ষণ

এবার আরও একটু সামনে শুনুন। কোনো-কোনো ওলামায়ে কেরাম বলেন, কলব জারি হওয়া বান্দার বিশেষ অবস্থা। তবে এটা জরুরি নয় যে, প্রত্যেকেরই বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হবে। বিশেষ অবস্থার কথা সাধারণত এটাই বলা হয়। তবে এটা কোনো পরিপূর্ণ মূলনীতি নয়। প্রত্যেক মানুষের আলাদা-আলাদা অবস্থার সৃষ্টি হয়। সুতরাং কোনো মূলনীতিও হওয়া চাই। এটা তো বিশেষ অবস্থা। শয়তান তার ওপর এমন অবস্থা চাপিয়ে দেয়, যা প্রকৃতপক্ষে অন্য কিছু। অথচ ওই ব্যক্তি মনে করে, আমার অন্তর জারি হয়ে গেছে এবং আমার অন্তর যিকির করছে। সুতরাং নির্ভরযোগ্য কোনো মূলনীতি হওয়া চাই।

অতএব, আমাদের মাশায়েখগণ স্বতঃসিদ্ধ মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। তারা বলেন, যাদের অন্তর জারি হয়, তাদের জন্য এটা জরুরি নয় যে, তাদের অন্তরের অবস্থা কম্পমান ও ধ্বনিত হবে। এটা অনুভব হবে, সেটা অনুভব হবে। তার লক্ষণ হলো, তার মধ্যে শরীয়তের বিধান জারি হয়ে

যাবে। অন্তরের বিধান তার বাহ্যিক অঙ্গে প্রকাশ পাবে। যখন তার অঙ্গ হৃদয়ের অনুগামী হয়ে যাবে, যখন অন্তর আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত হয়ে যাবে; অর্থাৎ– হৃদয়ের অবস্থা বাহ্যিক অঙ্গে প্রয়োগ হবে, অন্তরের নির্দেশ যখন বাহ্যিক অঙ্গে প্রভাব ফেলবে, তখন তার অন্তর জারি হয়ে গেল। এক্ষেত্রে এটাই মূলনীতি।

নির্ভরযোগ্য মূলনীতি

অতএব, ওই বান্দার অন্তর জারি হয়েছে বলে বিবেচ্য হবে, যাকে আমরা দেখব, তার বাহ্যিক অবস্থা সুন্নতের অনুগামী হয়েছে। সুতরাং এখন আমরা একটি পরিপূর্ণ মূলনীতি পেলাম। এখন যদি কোনো লোক এসে বলে যে, জনাব আমার অন্তর খুব জারি হয়েছে আর তার মধ্যে নামাযের গুরুত্ব না থাকে, তাহলে তার অন্তর জারি হওয়ার ব্যাপারে কী বলবেন? আমরা বলব, ভাই! আপনার অন্তর তো জারি হয়নি; বরং আপনাকে কোনো প্রতারণা গ্রাস করেছে। এটাই পরিপূর্ণ মূলনীতি যে, শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী হতে হবে।

সুতরাং যেব্যক্তি তার অন্তর জারি হওয়ার অবস্থা অনুভব করবে, তার সর্বপ্রথম নিদর্শন হবে, সে শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী হবে, সুন্নতের ধারক বাহক হবে, পবিত্রময় জিন্দেগি গ্রহণ করবে, দুনিয়া বিমুখ হবে, এক্ষেত্রে আরও উন্নতি অনুভব করবে। এখানেই যিকিরকারীকে অনুমান করা যায়। তার শায়খ তার তা অনুমান করে নেবেন। তার কলব জারি হোক বা না হোক, সুন্নতের অনুসরণে উন্নতি হবে, এখলাছে উন্নতি হবে। শায়খের দৃষ্টিতে তা প্রস্ফুটিত হয়ে যায় যে, তার অন্তরে যিকিরের প্রভাব পড়েছে কিনা?

সবকের উন্নতি হয় কীভাবে

কেউ-কেউ জিজ্ঞাসা করে, এক অজীফার পর শায়খ অন্য অজীফার সবক দেন কীভাবে? ভাই! শায়খ অন্য সবক এভাবে দেন যে, বান্দার মধ্যে এক সবকের আমলের দ্বারা যে প্রভাব ও লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে, তার ব্যক্তিত্বের যে পরিবর্তন হয়েছে, তা শায়খের দৃষ্টিতে প্রস্ফুটিত হলে শায়খ তাকে অন্য সবক প্রদান করেন, যার দ্বারা বান্দার জীবনের উন্নতি হতে থাকে।

যিকিরকারী প্রেমিক কে?

'সুলুক' বলা হয় এই রাস্তাকে আর 'সালিক' বলা হয় এই রাস্তায় গমনকারীকে। এবার যদি কোনো বান্দা যিকিরই না করে, ঠিকমতো অজীফা

আদায় না করে, তাহাজ্জুদের ধারেকাছেও না যায়, তাক্ওয়া অবলম্বন না করে, তাহলে সে সালিক বা প্রেমিক হতে পারে না; বরং সে হালিক (ধ্বংসশীল) হয়। সে বিপর্যস্তদের অন্তর্ভুক্ত। সে বিশেষ নেয়ামত হতে বঞ্চিত। ভাই! যেব্যক্তি সফরের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে গেল, সে দাঁড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তার সফর পূর্ণ হয়ে যায়নি। সুতরাং যেব্যক্তি যিকির করে না, অজীফা আদায় করে না, শায়খের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না, সে ওই লোকের মতো। তার সফর পূর্ণ হবে কীভাবে? এর জন্য যিকির, মুরাকাবা, তাহাজ্জুদ ইত্যাদির গুরুত্ব দিতে হবে। বর্তমান যুগের মুরীদরা চায়, আমরা কিছুই করব না। যা করার পীর সাহেব নিজেই করবেন। সে শুধু আসে আর যায় আর পীর সাহেবের সঙ্গে তিনটা কথা বলে।

প্রথম কথা : বর্তমান যুগের মুরীদরা পীর সাহেবের নিকট এসেই বলে, হুজুর! আমি অমুক বুযুর্গকে স্বপ্নে দেখেছি এবং বড়-বড় বিখ্যাত বুযুর্গদেরও দেখেছি। কিন্তু আপনার নিকট বায়'আত হয়েছি। অর্থাৎ– বোঝাতে চায়, আরও বড়-বড় বুযুর্গ রয়েছেন; কিন্তু আপনাকেই বাছাই করেছি। মার্কেটে অনেক মাল পাওয়া যায়। অর্থাৎ– আপনার ওপর আমি দয়া করেছি। তারপর বলে, জনাব! আমি অনেক বড় বুযুর্গের সান্নিধ্যে বসেছি। অমুকের মাহফিলে গিয়েছি। সব কিছু বর্ণনা করে। তারপর বলে, আমি একমাত্র আপনাকেই চয়ন করেছি। সুতরাং হুজুর! আমার থেকে তো কিছু হবে না। যা করার আপনিই করবেন। আমার প্রতি একটু তাওয়াজ্জুহ্ দিন। এমনিভাবে বলে যে, আমার দ্রুত যেতে হবে। অর্থাৎ– কথা বলতে-বলতে একথাও বলে যে, আমাদের তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

দ্বিতীয় কথা : দ্বিতীয় কথাটা এই বলে যে, হুজুর! কাজ-কারবার ঠিকমতো হচ্ছে না। যা চলছে, তার চেয়ে কিছু বাড়িয়ে বলে। সাথে-সাথে একথাও বলে যে, আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে। তাই দ্রুত পীর সাহেবের নিকট থেকে চলে যায়।

তৃতীয় কথা : তৃতীয় কথাটা বলে, হুজুর! আমার স্ত্রী পরিপূর্ণভাবে আমার কথা মানে না। সুতরাং দু'আ করবেন, সে যেন আমার আয়ত্তে এসে যায়। আরও কিছু বাড়িয়ে বলে দ্রুত বলে যাওয়ার আবেদন করে।

এ হলো বর্তমান যুগের মুরীদের তিনটি কথা। প্রথম ঘোষণা হলো, আমার থেকে পরিপূর্ণভাবে অজীফা আদায় হয় না। আপনি একটু তাওয়াজ্জুহ দেবেন। দ্বিতীয় কথা, কাজকারবার ঠিক মতো হচ্ছে না। তৃতীয় কথাটা হলো

পরিবারসংক্রান্ত। এই তিনটি কথা বলেই আবদার করে, হুজুর! আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

এবার বলুন তো, এমন মুরীদের ব্যাপারে পীর সাহেব কী করবেন? রোগী যখন ডাক্তারকে চিকিৎসার সময়ই দিল না, ডাক্তারকে ট্রিটম্যান দিয়ে বলল, জনাব! আমার শরীরটা খারাপ লাগছে; আমি চলে যাই; যা করার আপনি করে নেবেন। ওই রোগীর চিকিৎসা হবে কীভাবে? অথচ ডাক্তার বলছেন, তোমাকে এখানে ভর্তি হতে হবে। সুতরাং ভাই! পীর সাহেব বলেন, তোমাকে খানকায় থাকতে হবে। মাহফিলে আসতে হবে। মুরাকাবা করতে হবে। যিকির করতে হবে। তার কথা তোমাকে মানতে হবে। এরপর তোমার আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসা হবে।

যিকিরের বিশেষ অবস্থার কষ্ঠিপাথর সুন্নতের সীমারেখা

এজন্যই আমাদের ওই রোগের চিকিৎসা ও যিকির করতে হবে। তাহলে অন্তর জারি হওয়া আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন। অধিকাংশ সময় সেই অবস্থা উপলব্ধি করা যায়। তবে তার লক্ষণ দ্বারাই বোঝা যায়, সেটা সত্য, না মিথ্যা। সুতরাং যদি সুন্নতের অনুসরণে তোমার উন্নতি হয়, তাহলে বুঝে নেবে, তোমার অন্তর জারি হতে যাচ্ছে। আর যদি অবস্থারও পরিবর্তন অনুভব হয়, সাথে-সাথে কবীরা গুনাহেও লিপ্ত হয়, মিথ্যা কথাও বলে, ওপর থেকে লা-ইলাহা আর ভেতরে কালি বালা জপ করে, তাহলে তার কম্পমান অবস্থাকে কী বলা যাবে? তার সেই অবস্থাকে পায়ে লাথি দিয়ে দূর করা চাই।

ভাই! যদি সুন্নতের অনুসরণে তোমার উন্নতি না হয়, তাহলে তোমার সেই বিশেষ অবস্থা দিয়ে আমরা কী করব? তাই, পুণ্যবানদের সরদার শায়খ জুনায়েদ বাগদাদি (রহ.) মৃত্যুর পর কাউকে স্বপ্নে বলেছিলেন, আমার সমস্ত ইবাদত ও বিশেষ অবস্থাসমূহ নিঃশেষ হয়ে গেছে। সর্বশেষ রাতে যে আমি দু-রাকাত তাহাজ্জুদের নামায আদায় করেছিলাম, তা-ই আমার উপকারে এসেছে। এজন্যই যারা বলে, আমার খুব বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হয় আর বাহ্যিকভাবে শরীয়ত ও সুন্নতে তার কোনো উন্নতি হয় না, আমাদের মাশায়েখগণ তার দাবি কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করতেন। ওই সমস্ত লোকের মুখের যিকিরকে তারা মুখের অর্ধাঙ্গ ব্যাধি বলে আখ্যায়িত করতেন। তাদের মূলনীতিতে বলা হয়েছে, যদি তোমরা শরীয়তের গণ্ডিতে প্রবেশ করতে না পার আর বল, আমার খুব অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহলে মাশায়েখগণ বলেন,

মুখের অর্ধাঙ্গ ব্যাধির কারণে যে-রকম মুখ নড়াচড়া করে, তেমনি তারও মুখ নড়াচড়া করছে। আর তার অন্তরে যিকির হলো একমাত্র শয়তানের ধোঁকা। এর চেয়ে বেশি কিছু হতে পারে না।

মূল বস্তু

মূল বিষয় হচ্ছে সুন্নতের অনুসরণ। মহামহিম পালনকর্তা সর্বাবস্থায় আমাদের পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) শরীয়তের মহত্ত্ব সম্পর্কে একস্থানে বলেছেন,... সেটি পাঠ করলে অন্তর খুশি হয়ে যায়। আমি সেই পাঠ পড়ে হযরতের উচ্চ মর্যাদার জন্য দু'আ করেছি। সেই পাঠটি আমার এত ভালো লেগেছে যে, যখনই আমার স্মরণ হয়, তখনই আমি কিতাব খুলে সেই পাঠটি পড়ি আর তাঁর জন্য দু'আ করি, হে আল্লাহ! আমার পক্ষ থেকে আমাদের নেতার প্রতি উত্তম প্রতিদান করুন।

তিনি বলেছেন–

'আমাদের মাশায়েখগণ পবিত্র শরীয়তের মূল্যবান মোতি শিশুদের ন্যায় আখরুট ও মনাক্কার বিনিময়ে বিক্রি করতেন না।'

তিনি বলেন, শিশুরা কী করে? তার হাতে মোতি থাকলে এর বিনিময়ে সে আখরুট ও মনাক্কা খরিদ করে ফেলে। আমাদের মাশায়েখগণ শরীয়তের বিধানকে মূল্যবান মোতির সঙ্গে তুলনা করেছেন। সুবহানাল্লাহ!

অর্থাৎ– শরীয়তের বিধান ডিঙিয়ে পাপকর্মের দিকে আকৃষ্ট হতেন না। মূল্যবান মোতি দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআন ও হাদীছ।

'উসূলে হিকাম' নামে একটি কিতাব আছে, যা তাসাওউফের ওপর রচিত। সেখানে বলা হয়েছে, ওই যে অবস্থা; সেটা পাপ আর শরীয়তের ভাষ্য হচ্ছে নির্দেশবাণী। فتوحات مدينه থেকে فتوحات مكيه এর দিকে দিয়ে তালগোল পাকাতেন না। অর্থাৎ– যেখানে হাদীছের কথা এসেছে, তাকে فتوحات مدينه বলা হয়। আল্লাহু আকবার! কতই না উত্তম ইবারত। এটা আল্লাহপ্রদত্ত বাচনভঙ্গি। فتوحات مدينه سے فتوحات مكيه এর দ্বারা তাসাওউফের কিতাব উদ্দেশ্য। সুতরাং তিনি বলেন, আমাদের মাশায়েখগণ শরীয়তের মূল্যবান মোতির বিনিময়ে আখরুট, মনাক্কা ক্রয় করতেন না যেমনিভাবে শিশুরা মোতির বিনিময়ে আখরুট ইত্যাদি ক্রয় করে থাকে। অর্থাৎ– পাপকর্মের প্রতি আকৃষ্ট হতেন না।

অন্য জায়গায় তিনি বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা আমাদের মাশায়েখগণকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। যারা আমাদেরকে তাদের পেছনে চলার পরিবর্তে শরীয়তের পেছনে চলার জন্য সুস্পষ্ট পন্থার দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।'

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আমাদের পূর্বপুরুষদের সান্নিধ্য অর্জন করার এবং তাদের প্রদর্শিত পথে জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন।

হে আল্লাহ! আপনারই ইচ্ছা

আমার বন্ধুগণ! যিকিরের প্রতি গুরুত্ব দাও; তাহলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই আমাদের মধ্যে তার ভালোবাসার বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি করে দেবেন। কোনো সময় আমরাও তাঁর ভালোবাসায় দেওয়ানা হয়ে যাব। তাঁর ভালোবাসায় দুনিয়া বিসর্জন দেব। পৃথিবীর প্রতি অনীহা প্রকাশ করব। কোনো সময় আমরাও বলব, হে আল্লাহ! আপনার ইচ্ছা-ই আমাদের কাম্য। হে আল্লাহ! আপনি ছাড়া আমাদের কেউ নেই। আমরা বলব, আল্লাহ তা'আলাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনিই আমাদের সব। আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা আমরা সেই অবস্থা অনুভব করব। কেননা, দুনিয়াতে আল্লাহর ভালোবাসায় যাদের একটা মুহূর্তও অতিবাহিত হবে, কেয়ামতের দিন সে তার উত্তম প্রতিদান পাবে।

আরও একটি আশ্চর্য কথা শুনুন। আশাজাগানিয়া কথা। আমাদের বুযুর্গগণ বলেছেন, যেব্যক্তি পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসার জন্য চেষ্টা করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে দুশমনদের কাতারে দাঁড় করাবেন না। এটা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দয়া। তিনিই আমাদের এমন মাহফিলে আসার তাওফীক দান করেন। এটা ওই কথার প্রমাণ যে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা কল্যাণকর। তিনি কিছু দিতে চান। তিনি তাদের ডাকেন, যাদের কিছু দেওয়ার ইচ্ছা হয়। যাদের দেওয়ার ইচ্ছা নেই, তাদের আমন্ত্রণই জানান না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপস্থিতিকে কবুল করুন। আমীন।

আমাদের জবান হৃদয়ের ভাষ্যকার

'খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) প্রায়ই নিজের জিহ্বা স্পর্শ করে বলতেন, হে জবান! তোমার কারণে অসংখ্য মানুষ জাহান্নামে যাবে।

হাদীছের ভাষ্য হচ্ছে, একলোক নেক আমল করতে-করতে জান্নাতের নিকটবর্তী হয়ে যাবে। জান্নাতের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু তার জবান দ্বারা এমন অকৃতজ্ঞতার শব্দ বের হবে, যার দরুণ আল্লাহ তাকে সেখান থেকে টেনে এনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

সুতরাং বন্ধুগণ! আজ কাউকে কমবখত বলা সহজ, কাউকে লাঞ্ছিত করা সহজ, কাউকে বেঈমান বলা সহজ; কিন্তু কাল কেয়ামতের দিন যখন আম্বিয়ায়ে কেরামই আল্লাহ তা'আলার জালালিয়াতের ভয়ে কাঁপতে থাকবেন, তখন আমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি অমুক ব্যক্তিকে কমবখত বলছিলে কেন? তখন আমাদের জন্য তার জবাব দেওয়া কেমন কঠিন হবে। সুতরাং আমাদের জন্য উচিত, আমরা সেই অঙ্গসমূহকে সঠিক পন্থায় ব্যবহার করব।'

আমাদের জবান হৃদয়ের ভাষ্যকার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ اٰيَةٍ اُخْرٰى: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ۔ او كما قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ.

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা কেন তা বলছ, যা তোমরা করছ না।'[১৪২]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'প্রকৃত মুসলামান ওই ব্যক্তি, যার মুখ ও হাত হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।'

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى

নারী ও পুরুষদের যারা নেক আমল করে।[১৪৩]

হে ঈমানদারগণ! যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের স্বীকৃতি দিয়েছ, তোমরা এমন কথা কেন বলছ যা তোমরা করছ না? এটা আল্লাহ তা'আলার নিকট খুবই অপছন্দনীয় যে, তোমরা এমন কথা বলছ যা তোমরা করছ না।

মুমিনের শব্দসমূহ

মুমিনের মুখ থেকে নির্গত শব্দসমূহ আল্লাহ তা'আলার নিকট খুবই প্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ। দেখুন, একজন পুরুষ ও একজন মহিলা যাদের পরস্পরে দেখা-

---

১৪২. সূরা সফ : আয়াত ২

১৪৩. সূরা নাহ্‌ল : আয়াত ৯৭

সাক্ষাৎ করা হারাম ছিল, বিয়ের সময় কোনো প্রকার বাধ্যবাধকতা ব্যতীত স্বামীকে বলা হয়, তুমি এই মহিলাকে গ্রহণ করেছ কি? স্বামী বলে 'আমি তাকে গ্রহণ করলাম।' শুধু এতটুকু কথার মাধ্যমে সেই অপরিচিতা মহিলা তার বিবাহে আবদ্ধ হয়ে যায়, যাকে দেখা হারাম ছিল। তার সঙ্গে ঘরসংসার করা জায়েয হয়ে যায়। তেমনিভাবে যদি (আল্লাহ না করুন) এই স্বামীর মুখে তালাকের শব্দ উচ্চারিত হয়ে যায়, তাহলে যে-মহিলার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক হলো, যার থেকে তার সন্তান হলো, যার সঙ্গে এমন নৈকট্যের সম্পর্ক ছিল, সে আবার অপরিচিতা হয়ে যায়। তাকে দেখা, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হারাম হয়ে যায়।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট মুমিনের মুখের কথার অত্যন্ত গুরুত্ব রয়েছে। এজন্যই আমাদের সঙ্গে ফেরেশতা নিযুক্ত রাখা হয়েছে। আমাদের সকল কথা তারা রেকর্ড করে। কাল কেয়ামতের দিন আমাদের জবান থেকে নির্গত সকল কথার জবাব আমাদের দিতে হবে। তাই মুমিনের জন্য উচিত নিজের জবানকে সংরক্ষণ করা। নিজের জবান দ্বারা উত্তম কথা প্রকাশ করা, কল্যাণকর কথা ব্যবহার করা। এমন কথা না বলা, যার দ্বারা অন্যের মনে কষ্ট পায়, কারও অন্তরে আঘাত লাগে। অথবা কাউকে নিয়ে এমন ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে না, যাতে তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। শরীয়ত এমন কথা থেকে নিষেধ করেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করো না। হতে পারে যাদের তোমরা ঠাট্টা করছ, আল্লাহ তা'আলার নিকট তারা তোমাদের থেকে উত্তম।'[১৪৪]

এতে প্রতিভাত হয়, আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের উৎসাহ প্রদান করেছেন যে, এটি তোমাদের জন্য আল্লাহপ্রদত্ত একটি নেয়ামত। তাকে উত্তম পন্থায় ব্যবহার করো। আপনি চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহ যাদের বধির করেছেন, তারা কত বড় নেয়ামত হতে বঞ্চিত হয়েছে। আমি অনেক তরুণকে দেখেছি, তারা অত্যন্ত সুদর্শন, সুস্থ, সকল ক্ষেত্রে উচ্চাঙ্গের এবং ঈর্ষার যোগ্য; কিন্তু তার মুখ কাজ করছে না। সে বোবা, কথা বলতে পারে

১৪৪. সূরা হুজুরাত: আয়াত ১১

না। সে তার আবেগও প্রকাশ করতে পারে না। নিজের স্ত্রী, মাতাপিতা, ভাই-বোন কারও সঙ্গে তার অনুভূতি প্রকাশ করতে পারছে না। ইশারায়-ইঙ্গিতে কোনো কিছু বোঝাতে চাচ্ছে। তখন উপলব্ধি করা যায়, জবান আল্লাহ তা'আলার কত বড় নেয়ামত। এটা তো এজন্য দেওয়া হয়নি যে, এর দ্বারা আপনি উল্টাপাল্টা বা মিথ্যা কথা বলবেন। এমন কথা বলবেন, যা মানুষের জন্য অস্থিরতার কারণ হয়।

জবানের হাকীকত

আমাদের বুযুর্গগণ বলেছেন,

جِرْمُهُ صَغِيْرٌ وَجُرْمُهُ كَبِيْرٌ

'জবানের অবয়ব আয়তনে ছোট; কিন্তু তার অপরাধ বিরাট।'

কেননা, গীবত জবানের দ্বারাই করা হয়। গীবত বলা হয়, কারও অনুপস্থিতে তার সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা শুনলে তার মনে আঘাত লাগবে। তবে বাস্তবে তার মধ্যে এমন বিষয় রয়েছে। আর যদি বাস্তবে তার মধ্যে এমন আচরণ না থাকে আর তা বলা হয়, তাহলে তাকে অপবাদ বলে। বর্তমানে আমাদের গীবতের অনুভূতিও নেই। হাদীছ শরীফে এসেছে–

اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا

'গীবত যেনা থেকেও গুরুতর।'

মানুষ যখন গীবত করে, তখন যেন সে তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এর মর্ম প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা কি কোনো মৃতের গোশত আহার করতে পছন্দ করবে? জবানের দ্বারাই মানুষ মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যা আল্লাহ তা'আলার নিকট এত ঘৃণিত যে, হাদীছ শরীফে এসেছে, মানুষ অনেক সময় মিথ্যা বলতেই থাকে, বলতেই থাকে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তার নাম মিথ্যাবাদীদের তালিকাভুক্ত করে দেন।

এই জবান দ্বারা মানুষ চোগলখোরি করে। অন্যের ওপর অপবাদ এই জবান দ্বারা মানুষ আরোপ করে। সুতরাং দেখুন, এই মুখ বা জবান অত্যন্ত ছোট; কিন্তু এর দ্বারা কত বড়-বড় অপরাধ হচ্ছে! এমন একটি গুনাহ রয়েছে, যা বান্দার সমস্ত আমল বিনষ্ট করে দেয়। সেটা কী? সেটা কুফরি কথা। এই মুখের দ্বারা মানুষ আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকার করে এবং অন্তরে তা বিশ্বাস

করে। কিন্তু হঠাৎ এই জবান দ্বারা এমন কথা প্রকাশ পায়, যা কুফরি। আর এই কুফরি কথার কারণে তার ঈমান নষ্ট হয়ে তার জীবনের সমস্ত নেক আমল বরবাদ হয়ে যায়।

কুফরি শব্দসমূহ

অসংখ্য শব্দ রয়েছে, যেগুলোকে ওলামায়ে কেরাম কুফরি শব্দ বলেছেন, অথচ সেগুলো সম্পর্কে আমাদের অনুভূতিই নেই। যেমন– একজন অপরকে বলে (অপরের কুফরি কথা উদ্ধৃত করলে কুফর হয় না) কোথায় থাক? সে বলল, অমুক গ্রামে। তখন প্রথম ব্যক্তি বলল, হ্যাঁ আল্লাহর পেছনে থাকছ। এবার দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, হ্যাঁ আল্লাহর পেছনেই থাকছি। উলামায়ে কেরাম বলেন, এক্ষেত্রে তারা উভয়ে কুফরি কথা বলল।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, দুই ব্যক্তি পরস্পর কথা বলছে। এমন সময় একজন বলল, ভাই! এটা তো শরীয়তের বিধান। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, আরে রাখো তোমার শরীয়ত। একথার কারণে দ্বিতীয় ব্যক্তি কাফের হয়ে গেল। কারণ, সে শরীয়তের বিধানকে তুচ্ছ মনে করছে।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, যদি কেউ শারীরিক ক্লান্তি ও অলসতার দরুন ফরজ বিধান পরিত্যাগ করে, তাহলে সে গুনাহগার হবে। কিন্তু যদি মুখে অস্বীকার করে, তাহলে সে কাফের হয় যাবে। সুতরাং জবানের ব্যবহারে আমাদের সতর্ক হাওয়া চাই।

দুটি বস্তুর জিম্মাদারি

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেব্যক্তি আমাকে তার দুটি বস্তু সঠিক পন্থায় ব্যবহার করার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেবে; অর্থাৎ– এ দুটির জামিন হবে, তাকে বেহেশতে ঘর দেওয়ার জন্য আমি তার জামিন হয়ে যাব। সেই দুটি বস্তু হচ্ছে দুই চোয়াল ও দুই পায়ের মধ্যবর্তী অঙ্গ।

অর্থাৎ– জিহ্বা ও লজ্জাস্থান। আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যেব্যক্তি এ দুটি অংশের জামিন হবে। অর্থাৎ– এ দুটি বস্তুর সঠিক ব্যবহার করবে, বেহেশতে ঘর দেওয়ার জন্য আমি তার জামিন হয়ে যাব।

যদি আপনি চিন্তা করেন, তাহলে দেখবেন, এ দুটির সঙ্গে Double Protection হয়। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, জিহ্বাকে আল্লাহ দুই ঠোঁটের

মাধ্যমে গোলাকৃতিতে বেষ্টন করেছেন এবং দাঁতের মাধ্যমে তার দেওয়াল দিয়েছেন, যাতে তোমরা তা ব্যবহার করার পূর্বে চিন্তা কর। জবানের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা কোনো হাড্ডি রাখেননি। একেবারে কোমল করে সৃষ্টি করেছেন। এর দ্বারা হেকমত হলো, হে বান্দা! তুমি এর দ্বারা কটু ও তিক্ত কথা বলো না, যা বন্দুকের গুলির ন্যায় অন্যের অন্তরে আঘাত করে। অর্থাৎ– হাড্ডিবিহীন এই জবান দ্বারা নম্র ও ভদ্র কথা বলার অভ্যাস করো।

সায়্যেদুনা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর আমল

খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) প্রায়ই নিজের জিহ্বা স্পর্শ করে বলতেন, হে জবান! তোমার কারণে অসংখ্য মানুষ জাহান্নামে যাবে।

হাদীছের ভাষ্য হচ্ছে, একলোক নেক আমল করতে-করতে জান্নাতের নিকটবর্তী হয়ে যাবে। জান্নাতের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু তার জবান দ্বারা এমন অকৃতজ্ঞতার শব্দ বের হবে, যার দরুণ আল্লাহ তাকে সেখান থেকে টেনে এনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

সুতরাং বন্ধুগণ! আজ কাউকে কমবখত বলা সহজ, কাউকে লাঞ্ছিত করা সহজ, কাউকে বেঈমান বলা সহজ; কিন্তু কাল কেয়ামতের দিন যখন আম্বিয়ায়ে কেরামই আল্লাহ তা'আলার জালালিয়াতের ভয়ে কাঁপতে থাকবেন, তখন আমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি অমুক ব্যক্তিকে কমবখত বলছিলে কেন? তখন আমাদের জন্য তার জবাব দেওয়া কেমন কঠিন হবে। সুতরাং আমাদের জন্য উচিত, আমরা সেই অঙ্গসমূহকে সঠিক পন্থায় ব্যবহার করব।

প্রকৃত মুসলমান

এক হাদীছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানের পরিচিতি বর্ণনা করেছেন, তার পরিচয় দিয়েছেন।

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ

'প্রকৃত মুসলমান ওই ব্যক্তি, যার জবান ও হাত থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে।'

জবানের শক্তি

সাধারণত বোঝা যায়, মানুষ হাত দ্বারা অন্যকে অধিক কষ্ট দিয়ে থাকে। বলা হয়, হ্যাঁ অমুকের হাত খুব লম্বা ও শক্তিশালী। সে এর মাধ্যম অমুককে

কষ্ট দিয়েছে, প্রহার করেছে। তাই সাধারণত হাতের কথাই উল্লেখ করা হয়। কিন্তু হাদীছ শরীফে নবীজি জবানের কথা আগে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, প্রকৃত মুসলান সেই ব্যক্তি, যার জবান থেকে এবং যার হাত থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে।

এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ রহস্য রয়েছে। তা হলো, হাত দ্বারা কাউকে কষ্ট দিতে হলে ওই লোকের সামনে উপস্থিত হতে হয়। কিন্তু জবান দ্বারা অনুপস্থিত লোককেও কষ্ট দেওয়া যায়, তার ক্ষতি সাধন করা যায়। সামনাসামনি হওয়ার দরকার পড়ে না। যখন সে তার কথা শুনবে, তখনই তার অন্তরে আঘাত লাগবে। দ্বিতীয়ত হাত দ্বারা জীবিত মানুষকে কষ্ট দেয়া যায়। কিন্তু মুখের কথা দ্বারা মৃত মানুষকেও কষ্ট দেওয়া যায়। তার গীবত করে তাকে কষ্ট দেয়। হাত দ্বারা কষ্ট দিতে হলে শক্তির প্রয়োজন হয়। কারণ, অন্যকে আঘাত করতে হলে তার আঘাত তোমাকে প্রতিহত করতে হবে। তাকে তুমি দু-চারটি আঘাত করলে তোমাকেও কমপক্ষে একটি হলেও সহ্য করতে হবে। কিন্তু জবান দ্বারা অতিশয় দুর্বল মানুষও মহা ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের কষ্ট দিতে পারে। আরও স্মরণ রাখবেন, তলোয়ার ও হাত দ্বারা আঘাত করা হয় দেহে আর জবান দ্বারা আঘাত করা হয় অন্তরে। তাই কোনো কবি বলেন,

جِرَاحَةُ السِّيَامِ لَهَا الْتِيَامُ * وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ

'তলোয়ারের আঘাতের উপশম আছে; কিন্তু জবানের আঘাতের কোনো প্রতিকার নেই।'

যে-আত্মীয়স্বজনকে তলোয়ার দ্বারা আঘাত করার যায় না, তাদেরও মুখের একটা কথার মাধ্যমে চিরতরে দূর করা যায়।

অতএব, মানুষের জন্য উচিত, কথা বলার সময় চিন্তা-ফিকির করে কথা বলা। আল্লাহর যিকিরের সাথে কথা বলা। অন্যথায় চুপ থাকা। আল্লাহর ধ্যানে যারা নীরব থাকে, তারা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কথা বললেও অনেক ফেতনা থেকে হেফাযত থাকে।

হাদীছ শরীফে এসেছে–

مَنْ صَمَتَ نَجَا

'যে চুপ থাকল, সে মুক্তি পেল।'

আল্লামা বাকি বিল্লাহ (রহ.)কে কেউ বলল, আপনি ওয়াজ-নসীহত করুন; এতে মানুষের উপকার হবে। উত্তরে তিনি বললেন, যেব্যক্তি আমার নীরব থাকার দ্বারা কিছু গ্রহণ করতে পারল না, সে আমার ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমেও কিছু গ্রহণ করতে পারবে না। কবি ইকবাল বলেন,

کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت

جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش

'সাগরের নিস্তব্ধতা নদীর প্রবাহের শাঁ-শাঁ শব্দকে বলছে, যার গভীরতা ও প্রশস্ততা যেমন, সে তেমন নীরব থাকে।'

আশ্চর্যের বিষয়

হযরত আলী (রাযি.) বলেন,

اَلْمَرْءُ تَحْتَ لِسَانِهٖ

'মানুষ তার জবানের নিচে আবৃত।'

যতক্ষণ পর্যন্ত কথা বলছেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ জানতে পারে না, লোকটি শিক্ষিত, নাকি অশিক্ষিত। কথা বললে তার আসল রূপ প্রকাশ হয়ে যায়।

ভয়ানক ব্যাপার

ওলামায়ে কেরাম বলেন, জবানের স্খলন পায়ের স্খলন থেকে ভয়াবহ। যার ওপর তার জবান শাসক হয়ে গেছে, তার জীবন-মরনের সিদ্ধান্ত সে-ই ঠিক করে। পায়ের পদস্খলনের দ্বারা শুধু তার প্রাণ যায় আর জবানের স্খলনের দ্বারা সে তার ঈমানও হারায়।

আল্লাহওয়ালাদের উপদেশ

এক যুবক অহেতুক বকাবকি করছে। তার মনচাহি কথার মাধ্যমে আনন্দ ভোগ করছে। কোনো আল্লাহওয়ালা তাকে দেখে বললেন, ভাই! আপনি চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহর নামে আপনি কেমন চিঠি প্রেরণ করছেন। আমরা যা বলি, সব কিছু আমাদের আমলানামায় লিপিবদ্ধ থাকে। কাল কেয়ামতের ময়দানে সবগুলো আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। তাই চিন্তা করুন, আমরা ভালোবাসার চিঠি আল্লাহর নামে প্রেরণ করছি কি-না।

সুতরাং কথা বলার সময় উত্তম কথা বলা চাই। মানুষের সঙ্গে নেকির কথা বলা চাই। তাহলে আল্লাহ তা'আলা খুশি হবেন। কেউ বলে, আরে ভাই! আমি তো মুখের দ্বারা এরকম কথা বলে আনন্দ ভোগ করছি। এটা খুবই স্পষ্ট যে, যার কথার মধ্যে লাজুকতা থাকবে, সে তার কর্মের ক্ষেত্রেও সেই লাজুকতাকে অগ্রাধিকার দেবে।

একটি বিরল উদাহরণ

ইয়াহইয়া ইবনে মু'আয (রহ.) বলেন, মানুষের অন্তর ডেকচির ন্যায় আর তার জবান হলো চামুচের মতো। সুতরাং চামুচের মধ্যে তা-ই উঠবে, যা পাত্রে রয়েছে। পাত্রে সবজি থাকলে চামুচে সবজিই উঠবে আর পাত্রে গোশত থাকলে চামুচে গোশতই উঠবে। অতএব, মানুষের অন্তরে যা থাকে, তা-ই তার জবান দ্বারা নির্গত হয়। সাধারণত দেখা যায়, পুরুষের হাত তার আয়ত্তে থাকে না। সে যা সামনে পায় তা-ই ধরতে চায়। আর স্ত্রী লোকদের জবান তার আয়ত্তের বাইরে থাকে। সে যা মন চায় বলে বেড়ায়। তারা জবানকে সংরক্ষণ করতে পারে না। মনে রাখবেন, জবান এমন একটি তলোয়ার, যাতে কখনো মরিচা ধরে না।

জবানের হেফাযত

বুযুর্গরা বলেন, আলেমদের সামনে বসলে জবানকে সংরক্ষণ করে বসো এবং আল্লাহওয়ালাদের সামনে বসলে অন্তরকে পরিষ্কার করে বসো। কেননা, লম্বা জবান তোমার জীবনকে সংকীর্ণ করে দেয়। কারণ, তলোয়ারের আঘাত শরীরে লাগে আর জবানের আঘাত অন্তরে লাগে। তলোয়ারের আঘাত কিছুদিন পর নিরাময় হয়ে যায়; কিন্তু জবানের আঘাতের উপশম নেই। কোনো বুযুর্গ বলেন, মানুষের মুখে মাছি ঢোকে না। তবে মাছি ওই সময় ঢোকে, যখন তার মুখ খোলা থাকে। তাই যারা চুপ থাকার অভ্যাস করে, তারা অনেক ভুল থেকে বেঁচে থাকে। কোনো কবি বলেন,

کہے ایک جب سن لے انسان دو * خدا نے زبان ایک دی کان دو

'শোনো, মানুষ বলে এক, শোনে দুই। কেননা, আল্লাহ তা'আলা জবান দিয়েছেন একটি আর কান দিয়েছেন দুটি। সুতরাং দুটি কথা শোনো এবং একটি বলো। আর বর্তমানে আমাদের অভ্যাস হলো, শুনতে চাই না শুধু বলতেই থাকি। নিয়ম হয়ে গেছে, যখন আমার বিয়ে হয়েছিল, তখন শুধু

আমি বলেছিলাম এবং আমার স্ত্রী শুনেছিল। তারপর সন্তান হলো। তখন আমার স্ত্রী বলছে আর আমি শুনছি। তারপর বার্ধক্য এল। এখন আমরা বলি আর পাড়ার লোকজন শোনে।

কখনো এমন হয় যে, মানুষ শুধু সে নিজেই বলে– কারও কথা শোনে না। সুতরাং ভাই! আমাদের জন্য উচিত আমরা উত্তম কথা বলব। নম্র, ভদ্র ও প্রিয় কথা বলব। শরীয়ত শুধু মহিলাদের বলেছে, যদি তারা কোনো প্রয়োজনে গায়রে মাহরামের সঙ্গে কথা বলতে হয়, তাহলে

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ

'তোমরা নম্র ও মধুময় ভাষায় বলো না। অন্যথায় যাদের হৃদয়ে ব্যাধি (গুনাহ) রয়েছে ,তারা তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাবে।'[১৪৫]

আর এটা হচ্ছে বর্তমান যুগের ভুল। মহিলারা তাদের স্বামীর সঙ্গে কর্কশ ভাষায় কথা বলে, যেন সারা পৃথিবীর তিক্ততা তার কথার মধ্যে মিশ্রিত করা হয়েছে। আর পরপুরুষের সঙ্গে কথা বললে এমন মধুর ভাষায় বলে, যেন সারা পৃথিবীর মধু তার কথার মধ্যে মিশ্রিত করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং শরীয়ত শুধু এক ক্ষেত্রে মহিলাদের কর্কশ ভাষায় কথা বলতে নির্দেশ দিয়েছে। সোজা দুয়েকটি কথা বলে তার জবাব দিয়ে দাও, যাতে সে দুকথা বললে তিন কথা বলার সুযোগ না পায়। কারণ, কথায় কথা বাড়ে। অনেক রমণী বলে, আমরা তো শুধু কথা বলছি। এতে আর কী হবে? না! এই কথা-ই সকল গুনাহের মূল। কারণ, সবাই প্রথমে কথা-ই বলে। ফলে পরস্পরে সাক্ষাতের আগ্রহ জাগে। অবশেষে সাক্ষাৎ হলে সকল গুনাহের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়।

একটি ইল্‌মি সূক্ষ্মতা

একটু ভেবে দেখুন, দুনিয়াতে এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর আগমন করেছেন। কেউ এই আগ্রহ প্রকাশ করেননি যে, 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদের দেখা দিন। আমি আপনাকে দেখতে চাই।' একমাত্র মূসা (আ.) এই আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে মুফাসসিরীনে কেরাম একটি সূক্ষ্মতা বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মূসা (আ.) হলেন কালীমুল্লাহ, যিনি সরাসরি আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে কথা বলেছেন। সুতরাং যখন কথা হয়েছে। তখন

---

১৪৫. সূরা আহযাব : আয়াত ১১

তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আগ্রহ পয়দা হয়েছে। অন্তরে প্রত্যাশা জন্মেছে। তাই কথা বলতে সাবধান! যখন কোনো পুরুষ কোনো মহিলার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পায়, তখন তারা পরস্পর সাক্ষাতের জন্য অস্থির হয়ে যায়। সুতরাং যুবতি রমণীদের জন্য এটা খুবই সোনালি নীতিমালা। যদি কথা বলা শুরু করে দাও, তাহলে জেনে রেখো, ধীরে-ধীরে সকল গুনাহের দ্বার খুলে যাবে।

দ্বিতীয় কথা হলো, মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকবে।

মুমিনের পরিচয়

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুমিন সব কিছু হতে পারে; তবে মিথ্যাবাদী হতে পারে না। সত্য কথা সর্বদা সমুন্নত হয়। যারা সত্য বলায় অভ্যস্ত হয়, তারা সকলের প্রিয় পাত্র হয়ে যায়।

বুদ্ধিমান কে?

কেউ বলেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তি চিন্তা করে কথা বলে আর নির্বোধ কথা বলার পর চিন্তা করে। নির্বোধের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে হয় না। সে কথা দ্বারাই প্রমাণ করে, আমি নির্বোধ। এজন্যই আমাদের বুযুর্গগণ বলেন, আগে মাপো, তারপর বলো। মানুষ প্রথমে চিন্তা করে, তারপর বলে। কেননা, মওকামতো বলা কথা সোনার টুকরার মতো মূল্যবান হয়।

কথাবার্তা কেমন হবে?

একটা কথা স্মরণ রাখবেন যে, নম্র ও ভদ্র জবাব সর্বদা অন্যের ক্রোধ নিরাময় করে। এজন্য যখন স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে কথা বলবে, তখন নম্র ও মহব্বতের ভাষায় বলবে। একে অপরে ভালোবাসাপূর্ণ কথা বলবে। এতে পরস্পরে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। যেভাবে জিহ্বার আকৃতি ও রং দেখে মানুষের হজমশক্তির অনুমান করা যায়, তেমনি মানুষের কথার মাধুর্যের মাধ্যমে তার উত্তম চরিত্রের অনুমান করা যায়।

আমাদের বুযুর্গগণ বলেছেন, যেব্যক্তি তোমাকে অকথ্য ভাষায় গালি দেয়, তার কথার জবাব দেবে না। কারণ, তার নিকট তোমাকে বলার জন্য এর চেয়ে আরও খারাপ কথা রয়েছে।

আল্লাহর ঘৃণা কীসের প্রতি

ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, ছয়টা জিনিসের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনীহা আছে। সেগুলো দিলের কানে শ্রবণ করুন।

যথা–

১. উঁচু চোখ। কতিপয় লোক সর্বদা তার ঘাড় এলিয়ে-দুলিয়ে অন্যের চেহারার প্রতি তাকায়। তদুপরি অন্যের দোষ তালাশ করে। আফসোস! যদি ওই চোখগুলো বন্ধ হয়ে যেত, তাহলে তাদের গর্দান নিচু হয়ে যেত। প্রত্যেকের দৃষ্টি তার বুকের প্রতি থাকত। হে ভাই! চিন্তা করুন। আমার নিজের মধ্যে কী আছে।

২. ছোট্ট একটা জবান। এর প্রতিও আল্লাহ তা'আলার অনীহা রয়েছে।

৩. খারাপ প্রতিজ্ঞাকারী অন্তর। অনেক সময় মানুষ নিজের অন্তরে গুনাহের পরিকল্পনা করে যে, আমি কিভাবে আমার মনের চাহিদা মেটাতে পারি। এমন খারাপ সংকল্পকারী অন্তর আল্লাহ তা'আলার নিকট খুবই অপছন্দনীয়।

৪. খারাপ কাজের দিকে অগ্রগামী পা আল্লাহ তা'আলার নিকট ঘৃণিত।

৫. নিষ্পাপ মানুষকে কষ্ট প্রদানকারী হাত। নিষ্পাপ মানুষকে কষ্ট দেওয়া আল্লাহ তা'আলার নিকট অপছন্দনীয়। আপনারা দেখে থাকবেন, অনেক সময় ছেলের মাতাপিতা তার স্ত্রী সম্পর্কে এবং মেয়ের মাতাপিতা তার স্বামী সম্পর্কে এমন এমন কথা বলে, যার ফলে তাদের অন্তরে একে অপরের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয়। তাদের ভালোবাসায় ফাটল ধরে। সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসায় ফাটল সৃষ্টিকারী আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত।

এমন কোনো কথা বলবেন না, যার দরুণ স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি ক্ষেপে যায়। পরস্পর অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর ভালোবাসা আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত প্রিয়। শরীয়ত বলে, যদি কোনো কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়ে যায়, তারপর কেউ তাদের মধ্যে সংশোধিত ব্যবস্থা করতে চায়, এক্ষেত্রে যদি সে কোনো মিথ্যা কথাও বলে, তাহলে তার এই মিথ্যার জন্য সে আল্লাহ তা'আলার দরবারে পাকড়াও হবে না। স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার ক্ষেত্রে শরীয়ত তার নিজ অধিকার রহিত করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা খুবই ভালোবাসেন।

জবান আল্লাহ তা'আলার অপূর্ব নেয়ামত

আমাদের জন্য উচিত, আমরা আমাদের জবানকে আল্লাহর নেয়ামত মনে করব। এর দ্বারা আমরা কল্যাণকর কথা বলব। আল্লাহ বলেন–

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

'তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে, নেক আমল করে এবং বলে, আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।'[১৪৬]

এটি আল্লাহ তা'আলার নিকট খুবই প্রিয়। আল্লাহ তা'আলার অশেষ দয়ায় বর্তমানে তো অনেক স্ত্রী লোক এমন রয়েছেন, যারা একাজকে নিজের জীবনের মাকসাদ বানিয়ে নিয়েছেন। অন্যদের নেকির কাজের প্রতি আহ্বান করেন। তারা এ পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার মুখপাত্র। তারা এ পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার সমন্বয়ক হয়। তারা উদাসীন স্ত্রীলোকদের, গুনাহে নিমজ্জিত নারীদের আল্লাহ তা'আলার প্রতি আহ্বান করেন, নেকির প্রতি আমন্ত্রণ জানান।

পুরুষরাও এমন কাজ করা চাই। অন্যের সঙ্গে কথা বললে কল্যাণকর কথা বলা চাই এবং ভালো কাজে স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে সহায়তা করা চাই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى

'তোমরা ভালো কাজে একে অপরকে সহায়তা করো।'[১৪৭]

সুতরাং স্বামী পুণ্যবান হতে চাইলে স্ত্রী তাকে সহায়তা করবে। এমনিভাবে স্ত্রী পুণ্যবান হতে চাইলে স্বামী তাকে সহায়তা করবে। নেকির রাস্তায় একে অপরের বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। তবেই তারা আল্লাহর নজরে পড়বে।

কার দু'আ কবুল হয়

যেব্যক্তি সদা সত্য কথা বলে, আল্লাহ তা'আলা তার জবান থেকে নির্গত দু'আ প্রত্যাখ্যান করেন না। তাই ওলামায়ে কেরাম বলেন, যেব্যক্তি সত্য কথায় অভ্যস্ত হয়ে যায়, তার জবান থেকে যখনই যে-দু'আ বের হয়, আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করে নেন।

---

১৪৬. সূরা ফুসসিলাত : আয়াত ২৩

১৪৭. সূরা মায়েদা : আয়াত ২

সত্য ও মিথ্যা

সত্যের একটি অনন্য সৌন্দর্য রয়েছে যে, মিথ্যা যতই দ্রুতগামী হয়ে পলায়ন করুক অবশেষে সত্য তাকে ধরে ফেলবেই। বাহ্যত দেখা যায়, মিথ্যা বলে মুক্তি পেয়ে যাব। অথচ আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اَلصِّدْقُ يُنْجِيْ وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ

'সত্য মুক্তি দেয় এবং মিথ্যা ধ্বংস করে।'

সত্য মানুষকে মুক্তি দেয় এবং মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে।

সুতরাং সত্যের দ্বারা মুক্তি পাওয়া যায়। মিস্টার ইবলিস অন্তর থেকে মিথ্যার প্রতি ঘৃণা দূরীভূত করার জন্য তার নাম পরিবর্তন করে দিয়েছে। একে বলা হয় বাহানা বা কৌশল। স্ত্রী বলে, আমি আমার স্বামীর সম্মুখে কৌশল করছি। স্বামী বলে, আমি আমার স্ত্রীর সামনে কৌশল অবলম্বন করছি। অথচ বাস্তবে সেটা মিথ্যা।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ

'আমি উত্তম চরিত্র পরিপূর্ণ করার জন্য এ ধরায় প্রেরিত হয়েছি।'

আর উত্তম চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি বিষয় রয়েছে। এক. সত্য কথা বলা। দুই. সততাপূর্ণ আচরণ করা। আর একথাটিও ভুলে যাবেন না যে, মিথ্যা যতই দ্রুতগামী হোক সত্য তাকে গ্রাস করবেই।

হাদীছ শরীফে এসেছে, কা'ব ইবনে মালেক (রাযি.) নামে এক সাহাবি ছিলেন। তিনি কোনো এক সফরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যেতে পারেননি। তবে তিনি বাহানা না করে সত্য কথা বলেছিলেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা কিছু দিন তাঁর প্রতি বিশেষ রহমত নাযিল করেন। তাঁর তাওবা কবুল করেন। তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সুসংবাদ দেন।

ওমর (রাযি.)-এর সত্য বলা এবং কাফেরের ইসলাম গ্রহণ

একদা খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর (রাযি.)-এর দরবারে এক কাফের শাহজাদাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হলো, যে মুসলমানদের

অত্যন্ত কষ্ট দিত। হযরত ওমর (রাযি.) চাইলেন তাকে হত্যা করা হোক। জল্লাদ ডাকলেন। মৃত্যুর মঞ্চ তৈরি করা হলো। অভ্যাস অনুযায়ী হযরত ওমর (রাযি.) তাকে মৃত্যুর আগমুহূর্তে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার জীবনের শেষ আকাঙ্ক্ষা কিছু থাকলে বলো। তখন সে বলল, আমি এক গ্লাস পানি পান করতে চাই। তাকে পানি দেওয়া হলো।

পানির গ্লাস হাতে নিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। অন্তরে যেন ভয়ের সঞ্চার হচ্ছে, হাত কাঁপছে। হযরত ওমর (রাযি.) জিজ্ঞাসা করলেন, কী হলো; পানি পান করছ না কেন? সে বলল, আমার ভয় হচ্ছে, আমি পানি পান করতে শুরু করি আর এদিকে আমার ওপর তলোয়ার চালানো হয়ে যায়; তাহলে আমার আর পানি পান করা হবে না। হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, না, তুমি নির্ভয়ে পানি পান করো। পান করা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমার হত্যার নির্দেশ হবে না।

তখন সে বলল, খলীফাতুল মুসলিমীন! আপনি কি সত্য বলছেন যে, এ পানি পান না করা পর্যন্ত আমাকে হত্যা করা হবে না? হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, হ্যাঁ, সত্যিই বলছি। তুমি এ পানিটুকু পান না করা পর্যন্ত তোমাকে হত্যা করা হবে না। একথা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে সে সমস্ত পানি মাটিতে ফেলে দিয়ে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! এখন আর আপনি আমাকে হত্যা করতে পারবেন না। কারণ, আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন, এ পানি পান না করা পর্যন্ত আমাকে হত্যার আদেশ দেবেন না। আর এ পানি আমার আর কোনোদিনও পান করা হবে না। কেননা, এ পানি মাটি পান করে নিয়েছে।

আমাদের মতো কেউ হলে তখন বলত, ধোঁকাবাজের বাচ্চা! কোথায় চাতুরি করছিস? এদিকে জল্লাদকে বলত, তাড়াতাড়ি একে শেষ করে দাও। কিন্তু আধা জাহানের বাদশাহ খলীফাতুল মুসলিমীন ওমর (রাযি.) বললেন, হ্যাঁ, আমি তোমাকে কথা দিয়েছি। এখন আর তোমাকে হত্যা করা হবে না। তখন শাহজাদা বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। এখন আমি পাঠ করে নিলাম লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

হযরত ওমর (রাযি.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মৃত্যুর দণ্ডাদেশ থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করার কারণ কী? আগে ইসলাম গ্রহণ করনি কেন? সে বলল, এ ধর্মের মহত্ত্ব ও মর্যাদা আমার নিকট আগে থেকেই প্রিয় ছিল। কিন্তু লোকে বলবে, আমি মৃত্যুর ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছি। তাই

কোনো বাহানা খুঁজছিলাম। এবার মুক্তি পেয়ে আনন্দ চিত্তে ইসলাম গ্রহণ করলাম। এখন আমাকে কেউ মৃত্যুর ভয়ের অপবাদ দিতে পারবে না। এ হচ্ছে সত্য কথার ফল।

সত্যের জয়

ইন্ডিয়ায় একবার একটি ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনাটি হলো বান্দনা নামে এক গ্রামে কিছু খাস জমি ছিল। এক মুসলমান বলছে, এটা আমার। এক হিন্দুলোক বলছে এটা আমার। প্রাথমিক অবস্থায় তাদের উভয়ের ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল। পরে মুসলমান ব্যক্তি চালাকি করে বলল, আমি যদি এই জমি দখল করতে পারি, তাহলে আমি এখানে মসজিদ নির্মাণ করব। এখন হিন্দুলোক বলল, আমি এটা দখল করতে পারলে এখানে মন্দির নির্মাণ করব। এবার ঝগড়াটা প্রত্যেকের ধর্মীয় দ্বন্দ্বের রূপ নিল। মুসলমান ব্যক্তির পক্ষে সকল মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হলো। হিন্দুর পক্ষে সকল হিন্দু জোট করল। অতিশীঘ্রই শহরে খুন-খারাবি ঘটে যাওয়ার উপক্রম হলো। তখন কেউ বলল, ভাই! তোমরা বিষয়টা আদালতের মাধ্যমে মীমাংসা করে নাও। ঝগড়ার কোনো দরকার নেই। সুতরাং আদালতে মামলা দায়ের করা হলো। অসংখ্য মুসলামান ও হিন্দু আদালত প্রাঙ্গনে সমবেত হলো। উভয়পক্ষের অসংখ্য সমর্থক দেখে বিচারক বিপাকে পড়ে গেলেন। বাস্তব কোনো প্রমাণ নেই। নির্ভরযোগ্য কোনো সাক্ষী নেই। এবার কার পক্ষে রায় দেব। ফলে ফেতনা আরও বৃদ্ধি পাবে। অবশেষে তিনি বললেন, ভাই! আপনারা পরামর্শ দিন, বিষয়টা কীভাবে মীমাংসা করা যায়।

তখন হিন্দু লোকটি বলল, মাননীয় আদালত! আপনি অমুক মুসলমান ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করুন, জমিটি কার। তিনি যদি বলেন, জমিটি মুসলমানদের, তাহলে আপনি জমি তাদের দিয়ে দেবেন। এতে আমার কোনো আপত্তি নেই। আর যদি বলেন, জমিটি আমার, তাহলে আপনি বিচার অনুযায়ী রায় দেবেন। মুসলমানরাও প্রস্তাবটা মেনে নিল।

এবার বিচারক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। যেহেতু উভয় পক্ষ একজন সাক্ষীর ওপর আশ্বস্ত হয়েছে; তাহলে অবশ্যই ফয়সালা করা যাবে। তিনি আরেকটি তারিখ নির্ধারণ করলেন। এবার মুসলমানরা আনন্দে আত্মহারা। এখন আর হিন্দুরা জমি নেয় কীভাবে। কারণ, তিনি তো মুসলামান। তিনি জানেন, এখানে আমরা মসজিদ নির্মাণ করব। সুতরাং মসজিদের বিপক্ষে

তিনি সাক্ষ্য দিতে পারেন না। এদিকে হিন্দুরা তাকে দোষারোপ করছে, এ তুমি কী করলে? একজন মুসলমানকে সাক্ষী মানলে কী করে? সে কি আমাদের পক্ষে কথা বলবে? মামলায় তুমি জিততে-জিততে হেরে গেলে। এভাবে যদি মুসলমানদের জমি দিয়ে দেওয়ার তোমার ইচ্ছা ছিল, তাহলে আমাদের সাজালে কেন?

সে বলল, শোনো তোমরা অস্থির হয়ো না। রায় আমাদের পক্ষেই হবে। কারণ, আমি যাকে সাক্ষী মেনেছি, তিনি সত্যবাদী লোক। তিনি মিথ্যা বলতে পারেন না। আর তিনি জানেন, জমিটা আমার। সুতরাং ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই।

নির্ধারিত তারিখ এল। বিচারক সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করলেন, উভয় পক্ষ আপনাকে সাক্ষী মেনেছে। আপনি সত্য করে বলুন, জমিটা কার? তিনি জবাব দিলেন, জমিটা হিন্দু লোকের।

তার কথা শুনে বিচারক অবাক। মুসলমান হয়ে মসজিদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলেন। মুসলমানরা হতভম্ব। বিচারক বললেন, আপনি শুনেছেন, হিন্দুরা এখানে মন্দির নির্মাণ করবে। তারপরও আপনি...। তিনি বললেন, আমি জানি জমিটা হিন্দু লোকের। সুতরাং সে তার মালিক। তার মালিকানা জমিতে সে যা ইচ্ছা করতে পারে। এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

তিনি হলেন শাহ আবদুল আযীয (রহ.)-এর শিষ্য আল্লামা মুফতী এলাহী বখশ সাহেব (রহ.)।

হাকীম রায় লিখলেন, আজকের মামলায় মুসলমানরা পরাজিত হয়েছে। তবে ইসলামের বিজয় হয়েছে। বিচারক হুবহু একথাটাই পাঠ করে শোনালেন। হিন্দুরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। এবার হিন্দু লোক বলল, মাননীয় আদালত! আপনি আপনার রায় দিয়েছেন। বলেছেন, আজকের মামলায় মুসলমানরা পরাজিত হলেও ইসলামের বিজয় হয়েছে। সুতরাং আমার রায়ও আপনি শুনে নিন। যে ইসলামের এমন বিজয় হয়, আমিও সেই ইসলাম গ্রহণ করে নিলাম এবং এই জমি মসজিদের জন্য ওয়াকফ করে দিলাম।

আল্লাহু আকবার! এ হলো সত্যের ফলাফল। অতএব, হে বন্ধুগণ! সত্যের সাথে সর্বদা আল্লাহ তা'আলার রহমত অবতীর্ণ হয়। অনেক মানুষ খুব ইবাদত করে; কিন্তু মিথ্যা কথা পরিহার করতে পারে না। তার ওপর ইবাদাতের আছর হয় না।

এজন্যই ভাই! আমাদের উচিত অন্তরের দ্বারা সত্যিকারের তাওবা করব। গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আমরা আল্লাহর সামনে অঙ্গীকার করব, হে আল্লাহ! ভবিষ্যতে আমাদের পুণ্যময় পবিত্র জীবন দান করুন। দীনের খেদমতের জন্য আমাদের কবুল করুন। যদি আমরা গ্রহণযোগ্য হয়ে যাই, তাহলে এটা আমাদের ওপর আল্লাহ তা'আলার দয়া।

আল্লাহর প্রিয়পাত্র কারা?

যারা দীনের কাজ করে, কুরআন হাদীছের শিক্ষা-শিক্ষাদানে ব্যস্ত থাকে, তাদের মধ্যে কল্যাণকামিতা থাকে। তারা আল্লাহ তা'আলার প্রিয় পাত্র। তাই আমাদের উচিত আমার সর্বদা আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব।

তাই কোনো কবি বলেন,

منت منے کہ خدمت سلطاں کنی * منت ازو شناس کہ بے خدمت گزاشتند

'তুমি বাদশাহর খেদমত করছ বলে খোঁটা দিও না যে, আমি বাদশাহর খেদমত করি। বাদশাহর সেবার জন্য অনেক লোক রয়েছে। বরং শুকরিয়া আদায় করো যে, বাদশাহ তোমাকে খেদমত করার সুযোগ দিয়েছেন।'

সুতরাং আল্লাহ যদি আমাদের দীনের জন্য কবুল করেন, তাহলে এটি আমাদের ওপর আল্লাহর দয়া। আমরা দু'আ করি, আল্লাহ আমাদের জবানকে সঠিক পন্থায় ব্যবহার করার তাওফীক দান করুন। দীনের মেহনতের জন্য, খেদমতের জন্য, দাওয়াতের কাজের জন্য, তা'লীমের জন্য, এই জবানকে ব্যবহার করার তাওফীক দান করুন। জীবনের শেষ মুহূর্তে উচ্চৈঃস্বরে এই জবানে যেন জারি করে দেন لا اله الا الله محمد رسول الله। আমীন।

ওলামায়ে দেওবন্দের ইল্‌মি কৃতিত্ব

'দারুল উলূম দেওবন্দ নামে ইল্‌মের একটি বাগান স্থাপিত হয়েছে। এটিও তিনটি স্তর অতিক্রম করেছে। প্রথম স্তরে ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) তার জমিনে কাজ করেছেন। জমি প্রস্তুত করেছেন। বাদশাহ আকবার যখন দীনে এলাহীর প্রবর্তন করল, তখন সত্যের আওয়াজ নিয়ে তিনি তার মোকাবেলা করেছেন। গোয়ালিয়ার ঘাঁটিতে দু-বছর বন্দি জীবনের কষ্ট সহ্য করেছেন। তৎকালের গভর্নরদের অন্তরে আধ্যাত্মিক তাওয়াজ্জুহ দিয়েছেন, যা সুফিয়ায়ে কেরামদের রীতি। তারপর শরীয়তের শক্তি স্থাপন করেছেন। পরিশেষে নিজের লেখনির মাধ্যমে মানুষের অন্তরে সঠিক দীন পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। শরীয়তের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব প্রচার করেছেন, যার ফলে তিনি ৫,০০০ লোককে নেসবতের নূর দ্বারা নূরান্বিত করে বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করেছিলেন। তারা স্থানে-স্থানে দীনের খেদমত করেছেন, যার ফসল হিসেবে হযরতের সাহেবজাদা আল্লামা খাজা মাসুম (রহ.), তারপর আল্লামা সাইফুদ্দীন (রহ.) কাজ করেছেন। তাদের শ্রমের বিনিময়ে আওরঙ্গজেব নামে এক ধার্মিক বাদশাহ এর (মাদরাসার) জমিন প্রস্তুত করার জন্য মুখপাত্র হয়ে কাজ করেছেন।'

ওলামায়ে দেওবন্দের ইল্‌মি কৃতিত্ব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

তিনটি ঘাঁটি বাস্তব

এ পৃথিবী উপকরণের জায়গা। মৌলিকভাবে প্রত্যেক বস্তু পূর্ণতায় পৌঁছার জন্য ধাপে-ধাপে সামনে অগ্রসর হতে হয়। যেমন– সন্তান ভূমিষ্ট হলো। তখন শৈশবকাল কৈশোরকাল পাড়ি দিয়ে যৌবনকালে উপনীত হয়। এমনিভাবে কেউ বাগান লাগালে সেক্ষেত্রে তিন স্তরে কাজ করতে হয়। প্রথমে জমিন থেকে আগাছা দূর করতে হয়। পরে হাল চাষ করতে হয়। তারপর জমিনে চারা লাগিয়ে পূর্ণ গাছ হওয়া পর্যন্ত হেফাযত করতে হয়।

দারুল উলূম দেওবন্দের তিন স্তর

দারুল উলূম দেওবন্দ নামে ইল্‌মের একটি বাগান স্থাপিত হয়েছে। এটিও তিনটি স্তর অতিক্রম করেছে। প্রথম স্তরে ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) তার জমিনে কাজ করেছেন। জমি প্রস্তুত করেছেন। বাদশাহ আকবার যখন দীনে এলাহীর প্রবর্তন করল, তখন সত্যের আওয়াজ নিয়ে তিনি তার মোকাবেলা করেছেন। গোয়ালিয়ার ঘাঁটিতে দু-বছর বন্দি জীবনের কষ্ট সহ্য করেছেন। তৎকালের গভর্নরদের অন্তরে আধ্যাত্মিক তাওয়াজ্জুহ দিয়েছেন, যা সুফিয়ায়ে কেরামদের রীতি। তারপর শরীয়তের শক্তি স্থাপন করেছেন। পরিশেষে নিজের লেখনির মাধ্যমে মানুষের অন্তরে সঠিক দীন পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। শরীয়তের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব প্রচার করেছেন, যার ফলে তিনি ৫,০০০ লোককে নেসবতের নূর দ্বারা নূরান্বিত করে বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করেছিলেন। তারা স্থানে-স্থানে দীনের খেদমত করেছেন, যার ফসল হিসেবে হযরতের সাহেবজাদা আল্লামা খাজা মাসুম (রহ.)

তারপর আল্লামা সাইফুদ্দীন (রহ.) কাজ করেছেন। তাদের শ্রমের বিনিময়ে আওরঙ্গজেব নামে এক ধার্মিক বাদশাহ এর (মাদরাসার) জমিন প্রস্তুত করার জন্য মুখপাত্র হয়ে কাজ করেছেন।

দুটি জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি

দুটি জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির চিন্তা সর্বপ্রথম আল্লামা মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) উত্থাপন করেন। এটি হচ্ছে দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম স্তর, যা অদৃশ্যভাবে আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তরে জমি প্রস্তুত করার জন্য একজন বীর মুজাহিদ সৃষ্টি করেছিলেন।

দ্বিতীয় স্তরে আল্লামা শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.)-এর জন্ম গ্রহণ

দ্বিতীয় স্তরে যিনি কাজ করেছেন, তিনি হলেন শাহ আবদুর রহীম (রহ.)-এর ঔরসজাত আল্লামা শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহ.)। ১৭০২ সালে তিনি যৌবনের শুরুলগ্নে মদীনা মুনাওয়ারায় গিয়ে আল্লামা আবু তাহের মাদানী (রহ.)-এর নিকট হাদীছশাস্ত্রের শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরে আরও বিভিন্ন ওস্তাদের নিকট হাদীছ ও তাফসীর শিক্ষা করেন। দিল্লীতে এসে ইল্‌মের মোতির বিকাশ ঘটান। এটা বুঝে নিন যে, তাঁরা হৃদয়জগতে ইল্‌মের বীজ বপণ করেছেন।

সুতরাং দ্বিতীয় স্তরে শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) ও তার বংশধর কাজ করেছেন। আল্লামা শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহ.) সর্বপ্রথম ফার্সি ভাষায় কুরআন মজীদের তাফসীর লিখেছেন। তাঁর সুযোগ্য সাহেবজাদা আল্লামা আবদুল আযীয (রহ.) উর্দূ ভাষায় তাফসীরে আযীযি রচনা করেন। এরপর তার দুই পুত্র শাহ রফিউদ্দীন ও শাহ আবদুল কাদের (রহ.) সর্বপ্রথম উর্দূ ভাষায় পবিত্র কুরআনের তরজমা লেখেন। একজন পারিভাষিক অনুবাদ লিখেছেন, অপরজন শাব্দিক অনুবাদ লিখেছেন।

শাহ আবদুল কাদির (রহ.)-এর এলহামি অনুবাদ

হযরত শায়খুল হাদীছ (রহ.) বলেন, শাহ আবদুল কাদের (রহ.)-এর কুরআন তরজমা এলহামি (আল্লাহপ্রদত্ত) ছিল। যেহেতু ওলামায়ে কেরামের মাহফিল; তাই কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। তাহলে বুঝতে পারবেন, বাস্তবিকই তার অনুবাদ কেমন।

إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ

'নিশ্চয় পুণ্য পাপকে দূরীভূত করে।'[১৪৮]

এরকম অনুবাদ লেখার সাথে-সাথে তিনি টীকায় লিখেছেন, 'সাবান যেমন ময়লা দূর করে দেয়, তেমনি পুণ্য গুনাহকে নিঃশেষ করে দেয়।'

অন্য আয়াতে আছে–

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ

'বরং তাঁর উভয় হাত উন্মুক্ত।'

এই আয়াতের তরজমায় তিনি লিখেছেন, দুটি হাত। একটি কহরের (ক্রোধের), একটি মহরের।

এমনই অনুবাদ করেছেন যে, আয়াতে মর্ম ভালোভাবে বুঝিয়ে দিলেন।

نَسِيًا مَّنْسِيًّا

অধিকাংশ মুফাসসির এর অর্থ লিখেছেন বিলুপ্ত হওয়া। আর তিনি এর অর্থ লিখেছেন, একদম বিস্মৃত হয়ে যাওয়া।

لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ

এর অর্থ অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, লজ্জাস্থানের হেফাযত করা। আর তিনি লিখেছেন, লজ্জাস্থান দমন করে রাখা, যার ফলে আয়াতের মর্ম পরিপূর্ণরূপে মস্তিষ্কে বসে যায়।

اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَآءَ

অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এর অর্থ লিখেছেন, যদি তোমরা মহিলাদের স্পর্শ কর। আর হযরত শাহ সাহেব এর অর্থ লিখেছেন, যদি তোমরা মহিলাদের সঙ্গে লেগে যাও। এমন শব্দ দ্বারা অনুবাদ করেছেন, যার ফলে সমস্ত মতভেদের নিরসন হয়ে যায়।

হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহ.)-এর ফতোয়া

১৭৬২ সালে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহ.)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর সুযোগ্য সন্তান আল্লামা শাহ আবদুল আযীয (রহ.) তাঁর

---

১৪৮. সূরা হূদ : আয়াত ১১৪

স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি যখন দেখলেন, ব্রিটিশরা বিভিন্নভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে, তখন তিনি ১৭৭২ সালে একটি ফতোয়া দিলেন, বৃটিশদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরজ। কারণ, মুসলমানদের স্বাধীনতা পাওয়া দরকার। এই ফতোয়া পরবর্তী কালে সংঘটিত সকল আন্দোলনের পটভূমি। সুতরাং রেশমী রুমাল আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন, স্বাধীনতা যুদ্ধ, গোলামি ছাড়ো আন্দোলন, জেল ভরো আন্দোলন। ঐতিহাসিক বালাকোটের যুদ্ধ সবকিছু এই ফতোয়ার ফলেই সংঘটিত হয়েছিল। এটা ছিল অন্তরজগতে ইল্‌মের বীজ বপণ করার স্তর, যা শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহ.)-এর বংশধর থেকে সূচনা হয়েছিল।

তৃতীয় স্তর

তৃতীয় স্তর আলেমকুল শিরোমনি আল্লামা কাসিম নানুতবী (রহ.)-এর হাতে বাস্তব রূপ লাভ করে। ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনে বিজয়ের পর ব্রিটিশরা মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের স্টীমরোলার চালাতে শুরু করে। ধনী ও নেতৃবর্গের জমি বাজেয়াপ্ত করে। মসজিদ-মাদরাসার নামে যে-সমস্ত জমি ওয়াকফ করা ছিল, সেগুলোর গলা চেপে ধরে সকিছু সরকারি খাতে নিয়ে যায়। দিল্লীতে ৪,০০০ মাদরাসা বন্ধ করে দেয়। শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.)-এর প্রতিষ্ঠিত রহীমিয়া মাদরাসার ভবনগুলো বুল্ডোজার দ্বারা ধূলিসাৎ করে দেয়। ওই সময় ইল্‌ম শিক্ষার উল্লেখযোগ্য তিনটি কেন্দ্র ছিল। দিল্লীতে তাফসীর ও হাদীছের ওয়ালীয়ে এলাহী মারকায। লাক্ষ্ণৌতে ফেকাহ ও উসূলে ফেকাহর মারকায। খয়রাবাদে ফনুনাতের মারকায। সব কটি মারকায বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়। ব্রিটিশরা ভেবেছিল, মনে হয় এর পরে পৃথিবীতে ইসলামের নাম উচ্চারণকারীও কেউ থাকবে না। কিন্তু যাদের অন্তরে ব্যথা থাকে, তারা সেই চেতনা থেকে নীরব থাকতে পারে না। পরিশেষে মুসলমানদের সম্পদ চলে গেছে এতে কোনো দুঃখ নেই। কারণ, তা পুনরায় পাওয়া যাবে। কিন্তু মুসলমানদের দীন তো তাদের হাতে রয়েছে।

হযরত কাসিম নানুতবী (রহ.)-এর ব্যথিত অন্তর

অতএব, এক ব্যথিত অন্তরের অধিকারী আল্লামা কাসিম নানুতবী (রহ.) শ্বশুড় বাড়ি এলাকায় দেওবন্দ নামক ছোট একটি গ্রামে একজন ছাত্র ও একজন শিক্ষকের মাধ্যমে একাজ শুরু করেন। শিক্ষক ছিলেন মোল্লা মাহমুদ (রহ.) আর ছাত্র ছিলেন হযরত মাহমুদুল হাসান (রহ.)। ঘর-দুয়ার নেই। ডালিম গাছের নিচে শুরু হয়। তবে একাজ অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে চলে, যাতে

কেউ টের না পায়। অবশেষে যখন কয়েক বছর পর মুসলমানদের স্বাধীনতা অর্জন হয়, তখন সেটি ইল্‌মের এক বৃহৎ কেন্দ্র হিসেবে পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করে।

দারুল উলূম দেওবন্দের ভিত্তিপ্রস্তর

মাওলানা আবদুল গনী মুজাদ্দিদী (রহ)-এর ছাত্র মাওলানা মামলুক আলী সাহেব, যাকে ওস্তাদেকুল বা সকলের ওস্তাদ বলা হতো, তাঁর সুযোগ্য ছাত্র আল্লামা কাসিম নানুতবী (রহ.) ১৮৬৭ সালে ৩০ মে ১০ মুহাররম দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ভিত্তিপ্রস্তরও একজন বুযুর্গের হাতে করা হয়েছিল, যার নাম মনে শাহ ছিল, যাঁর সম্পর্কে আল্লামা কাসিম নানুবতী (রহ.) ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, তিনি জীবনে কোনো কবীরা গুনাহ তো করেনইনি, এমনকি কোনোদিন গুনাহের ইচ্ছাও করেননি। এমন বুযুর্গের হাতে দারুল উলূম দেওবন্দের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল। স্বপযোগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারুল উলূম দেওবন্দের যে-মানচিত্র এঁকে দিয়েছিলেন, সে অনুযায়ী তার ভিত্তি স্থাপন করা হয়।

উসূলে হাশতেগানা বা আট নীতিমালা

আটটি নীতিমালা তৈরি করে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা করে এর ভিত্তি স্থাপন করা হয়। আল্লাহ তা'আলার প্রতি দৃষ্টি রাখার এমন সবক শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, আমরা বলতে পারি, এর ভিত্তি أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى এর ভিত্তির ওপর দুনিয়াতে অস্তিত্বে এসেছে।

তোমরাই ভবিষ্যতের কর্ণধার

এই প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় দফায় যারা ইল্‌ম হাসিল করেন, তাদের মধ্যে ছিলেন আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (রহ)। তদুপরি এমন আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিবর্গ ছিলেন, যাঁরা সারাক্ষণ ইল্‌ম অনুযায়ী আমল ও এখলাছের সাথে কাজ করেছেন। যখন তাদের দস্তারবন্দির প্রস্তুতি নেওয়া হয়, তখন হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে চোখের পানি নির্গত অবস্থায় আরজ করলেন, হুজুর! আমরা শুনেছি, মাদরসা কর্তৃপক্ষ আমাদের জন্য দস্তারবন্দির ব্যবস্থা করছে। তাই আমরা কয়েকজন আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি, যাতে আমাদের জন্য এই ব্যবস্থাপনা না করা হয়। হতে পারে, এতে মাদরাসার দুর্নাম হবে।

হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) হেলান দেওয়া থেকে সোজা হয়ে বসে বললেন, আশরাফ আলী! আজ তোমরা তোমাদের ওস্তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছ; তাই এমন কথা বলছ। একটা সময় এমন আসবে, যখন দীনের ময়দানে শুধু তোমরাই থাকবে। তখন আমরা থাকব না। দীনের কাজ তোমাদেরই করতে হবে।

আল্লাহু আকবার! সেই মহামানবের কথা বাস্তবায়িত হয়েছে। যুগ প্রমাণ করেছে, সেই মহামনীষীর অমূল্য বাণী অক্ষরে-অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছে। আল্লাহ্ হযরত থানভী (রহ.)কে এমন ব্যক্তিত্ব দান করেছিলেন যে, তার যুগে তিনি দীনের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে কাজ করেছেন।

ওলামায়ে দেওবন্দের কতিপয় উল্লেখযোগ্য গুণ

মহান আল্লাহ ওলামায়ে দেওবন্দকে উল্লেখযোগ্য কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুণ দান করেছিলেন। সেগুলো আমি সাতটি বিভিন্ন ধরনে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

তাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা ও মহত্ত্ব এমন ছিল যে, তারা শির্ক ও শির্কসম্পর্কিত বিষয়ের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জিনিস পর্যন্ত কস্মিনকালেও গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। এর প্রতিকারের জন্য তারা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করেছেন। হযরত ইসমাঈল শহীদ (রহ.) তাকবিয়াতুল ঈমান নামে গ্রন্থ রচনা করেছেন। হযরত খলিল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.) বারাহীনে কাতেয়া নামক গ্রন্থ রচনা করেছেন। হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহি (রহ.) ফতোয়ায়ে রশীদিয়াতে শির্ক ও বিদয়াত নির্মূল করার জন্য সহীহ আকীদাসমূহ সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন।

মূর্তিপূজা, যৌনপূজা, কবরপূজা ও আত্মপূজার অবসান

তাঁরা ওই সমস্ত মহামনীষী ছিলেন, যাঁরা এ পৃথিবী থেকে মূর্তিপূজা, কবরপূজা, আত্মপূজা ও যৌনপূজাসহ সকল পূজার অবসান ঘটিয়ে এক আল্লাহর উপসনার শিক্ষা দিয়েছিলেন।

আকাবিরে দেওবন্দ ও নবীজির মহব্বত

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল, তাঁদের অন্তরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত অতিশয় মজবুত ছিল। তাদের হৃদয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসায় পরিতৃপ্ত ছিল। আকাবিরে দেওবন্দের

থেকে মাত্র দুজন বুযুর্গের দুটি কথা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। একজন আল্লামা কাসিম নানুতবী (রহ.)। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশেক ছিলেন। তিনি বলতেন,

سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا
پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون ومکاں کو سجایا گیا
وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی
علم وحکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہرا امیوں میں اٹھایا گیا

'সর্বপ্রথম মহা মহিম পালনর্কতার অনুগ্রহে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় আকৃতি বানানো হয়। তারপর সেই চেহারা থেকে নূর সংগ্রহ করে যা হয়েছে যা হবে সেগুলো সাজানো হয়েছে। তিনি মুহাম্মদও, আহমদও, মাহমুদও, সাধারণ সৌন্দর্যের সাক্ষীও, সাক্ষ্যের বস্তুও, সীমাহীন জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারীও। বাহ্যিকভাবে অজ্ঞদের মধ্যে উঠানো হয়েছে।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এমন মহব্বত ছিল যে, হারামাইন শরীফাইন যিয়ারতের জন্য মদীনায় উপস্থিত হলে বীরে আলী বা আলী নামক কূপের নিকট গিয়ে বাহন থেকে নেমে জুতা হাতে নিয়ে চলতে থাকেন। জীর্ণ-শীর্ণ দেহ ছিল। পা জখম হওয়ার আশঙ্কা ছিল। সাথিরা বলল, হুজুর এমন করেছেন কেন? তিনি উত্তর দিলেন, যে জমিনে আমার সরদার মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদচিহ্ন লেগেছে, কাসিম নানুতবীর জন্য এটা শোভা পায় না যে, সে এই জমিনে জুতাপায়ে হাঁটবে।

একলোক সবুজ রঙের জুতা হাদিয়া দিয়েছিল। তিনি আদবের দরুণ সেই জুতা পরিধান করনেনি। জিজ্ঞাসা করা হলো, হুজুর! এত মূল্যবান জুতা ব্যবহার করছেন না কেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমার হৃদয় এটা সহ্য করতে পারছে না যে, আমার প্রিয়তমের গম্বুজের রংও সবুজ আর আমি সেই সবুজ রঙের জুতা আমার পায়ে ব্যবহার করব।

একদা মদীনা শরীফে উপস্থিত হয়ে রওজা মোবারক দেখে বললেন,

وہ مکتار ہے تیرے روضہ کا منظر چمکتی رہے تیرے روضے کی جالی
ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر ہمیں بھی عطا ہو روح بلالی

চমকাতে থাকবে তোমরা রওজার দৃশ্য, চকচক করছে তোমার রওজার চালি। আমাদেরও দেওয়া হয় আবুযরের ভালোবাসা আগ্রহ এবং রূহে বেলালী।

তিনি বলতেন,. লাখো আশা ও প্রত্যাশা রয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় আশা হলো, মদীনার কুকুরদের মধ্যে যেন গন্য হই। জীবিত অবস্থায় যেন সঙ্গে থাকে হেরেমের মহা অবদান প্রহরী এবং মরণে যেন মদীনার কীটপতঙ্গ ও সাপ বিচ্ছু আমাকে খায়। একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজায় এমন আনুনয়-বিনয়ের সালাম পেশ করে বের হলেন। তখন তার চেহারায় আশ্চর্য জ্যোতি প্রকাশ পায়। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, হুজুর! আজকের অবস্থা বিস্ময়কর দেখাচ্ছে। তিনি জবাব দিলেন,

میرے آقا کا مجھ پر اتنا کرم تھا* بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے

یہ اتنے کرم کا عجب سلسلہ ہے * نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے

'আমার ওপর আমার নেতার বা মালিকের এমন অনুগ্রহ যে, আঁচল বিছানোর পূর্বেই তা ভরে দিয়েছেন। এটা এমন দয়ার ক্রমধারা যে, নেশা পান করার পূর্বেই তা তার কার্যকারিতা শুরু করে দিচ্ছে।

মদীনা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় সুবজ গম্বুজের প্রতি তাকিয়ে কবিতা পাঠ করতেন–

ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا

جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ میں تجھ سے جدا ہوتا

'হে মদীনা! আমি তোমার প্রতি হাজারবার আসক্ত।

সাধ্য থাকলে আমি মৃত্যুর পরও তোমার থেকে পৃথক হতাম না।'

কারও হাতে শরীয়তের পেয়ালা, কারও হাতে হামানদিস্তা

হামানদিস্তা অর্থ পান গুঁড়ো করার লৌহমর্গ। হযরত গাঙ্গুহি (রহ)কে আল্লাহ তা'আলা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন মহব্বত দিয়েছিলেন যে, একদা তিনি ছাত্রদের হাদীছ পড়াচ্ছেন। এমন সময় বৃষ্টি এলে ছাত্ররা তাড়াহুড়া করে দৌড়ে ঘরে চলে যায়। তাদের জুতা সেখানে পড়ে থাকে। তিনি তার রুমাল দ্বারা সকলের জুতা গাট্টি বেধে মাথায় নিয়ে

ঘরে যান। তাঁর এই অবস্থা দেখে ছাত্ররা চিৎকার দিয়ে বের হয়ে বলছে, হুজুর! এ আপনি কী করছেন! আমাদের জুতা আপনি...! তিনি উত্তর দিলেন, যারা قال الله تعالى এবং قال رسول الله صلى الله عليه وسلم বলে, তাদের জুতা রশীদ আহমদ মাথায় নেবে না তো কী করবে। সুবহানাল্লহ!

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা তাঁকে অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন। এটি এমন মনে করুন যে, আল্লাহ তাঁর এক হাতে তাওহীদ এবং অপর হাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত দান করেছিলেন।

ওলামায়ে দেওবন্দের ইল্‌মি কৃতিত্ব

ওলামায়ে দেওবন্দের ইল্‌মি পূর্ণতা এমন ছিল যে, মানুষ তাদের ইল্‌ম দেখে হয়রান হয়ে যায়।

হযরত কাসিম নানুতবী (রহ.) বাদশাহ শাহজানের সমাধিস্থলে গমন করতেন এবং সেখানে গিয়ে ইসলামের সত্যতা বিশ্লেষণ করতেন। এতে সেখানে উপস্থিত সকল লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিত।

হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) যখন পবিত্র কুরআনের দরস দিতেন, তখন তার খাস শাগরেদ ও খাস খলীফা হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া (রহ.) এবং হযরত শায়খুল হাদীছ (রহ)-এর সম্মানিত পিতা সেগুলো শুনে সঙ্গে-সঙ্গে নোট করে রাখতেন। তিনি আরবিতে তাকরীর দিতেন। পরবর্তী কালে সেগুলো একত্রিত করলে لامع الدراري ও كوكب الدري নামে দুটি কিতাব আত্মপ্রকাশ করে।

হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) একবার শীতের মৌসুমে তার সংরক্ষিত কিতাবগুলো রোদে শোকাতে চাইলেন। কারণ আর্দ্রতার দরুন হাতের লেখা কিতাবসমূহ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। সেকালে তো এত প্রচুর পরিমাণ ছাপাখানা ছিল না। যাক তিনি কিতাবগুলোতে রোদের তাপ লাগানোর জন্য বাইরে ছড়িয়ে দিলেন। এক ছাত্র বলল, হুজুর! একটি কিতাবরে কিছু পৃষ্ঠা উঁইপোকা খেয়ে ফেলেছে। তিনি বললেন, যেখান থেকে নষ্ট হয়েছে, সেখানে সাদা কাগজ লাগিয়ে কিতাবের পড়া লিখে নাও। ছাত্র বলল, হুজুর! এই কিতাব আমি গত বছর পড়েছি। ইবারত মুখস্থ নেই। তিনি বললেন, মিয়া! গত বছর কিতাব পড়েছ আর আজই মুখস্থ নেই। বলো, সেটি কোন কিতাব। সে বলল, 'মাইবুজী', যা মানতিক শাস্ত্রের কিতাব। তিনি বললেন, অক্ষত পড়া যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে পড়ো। ছাত্র

কিতাবের অক্ষত ইবারত পড়ল। যেখানে গিয়ে সে থামল, সেখান থেকে তিনি পড়তে লাগলেন। ছাত্র লিখল। অবশেষে সারা কিতাব পরিপূর্ণ করা হলো। সুবহানাল্লাহ!

হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি (রহ.)-এর স্মৃতিশক্তি

হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি (রহ.) ভাওয়ালপুর খতমে নবুওতের বিতর্ক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেন। কাদিয়ানিরা একটি কিতাবের ইবারত পেশ করল, যাতে তাদের দাবি প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে। বিচারকও দেখলেন, কিতাবও ঠিক, পড়াও ঠিক। সুতরাং তাদের দাবি প্রমাণিত হয়। তখন হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি (রহ.) দাঁড়িয়ে বললেন, হুজুর! আমি একজন তালিবে ইল্‌ম। আমি এই কিতাবটি দেখতেই চাই। বিচারক তার হাতে কিতাবটি দিলেন। তিনি কিতাব পাঠ করে বললেন, হুজুর! এর মধ্যে লিপিকারের ভুলে একটি লাইন বাদ পড়ে গেছে। বর্তমানে যেভাবে আছে, এতে তাদের দাবি প্রমাণিত হয়। সুতরাং অনুগ্রহপূর্বক এ কিতাবের অন্য একটি কপি সংগ্রহ করুন। আরেকটি কপি সংগ্রহ করে দেখা গেল, হযরত শাহ সাহেবের কথা হুবহু সঠিক। মাঝখানে একটি লাইন ছাড় পড়েছে। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তুমি কীভাবে বুঝতে পারলে, এখানে একটি লাইন ছাড় পড়েছে। তিনি বললেন, সাতাশ বছর পূর্বে আমি এটি পড়েছি। কিন্তু কিতাবের ইবারত আমার এখনো হুবহু স্মরণ আছে।

হযরত থানভী (রহ.)-এর ইল্‌মি স্তর

হযরত আকদাছ আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত সম্পর্কে نشر الطيب فى ذكر النبى الحبيب صلى الله عليه وسلم নামে একটি কিতাব রচনা করেছেন। তাঁর অন্যান্য কৃতিত্বের সাথে এটিও একটি কৃতিত্ব যে, তিনি তাসাওউফ ও মারেফতের ব্যাপারে তাঁর রচিত তাফসীরে বায়ানুল কুরআনে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। কুরআন-হাদীছ দ্বারা এগুলো প্রমাণিত করেছেন, যা অনন্য বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। কাশ্মিরি (রহ.)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি উর্দূ কিতাব পড়তে ছাত্রদের নিষেধ করতেন; কিন্তু বয়ানুল কুরআন পড়ে তিনি বলেছিলেন, আমার মনে হয়, এখন ইল্‌ম আরবি থেকে উর্দূ ভাষায় স্থানান্তরিত হচ্ছে। এখন আর আমি ছাত্রদের উর্দূ কিতাব পড়তে নিষেধ করব না। এতে প্রতীয়মান হয়, পূর্বে শুধু আরবি ভাষার তাফসীরই পাঠ করা হতো। সুতরাং এর দ্বারা তাফসীরে

বয়ানুল কুরআনের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। এই কিতাবের খাতিরে তিনি উর্দূ ভাষায় কিতাব পড়ার অনুমতি দিয়েছেন।

হযরত মাদানী (রহ.)-এর হাদীছের দরস

হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) অধিকাংশ সময় তাঁর বিভিন্ন প্রোগ্রাম থেকে গভীর রাতে মাদরাসায় উপস্থিত হতেন। ছাত্ররা দারোয়ানকে বলে রাখত, হুজুর মাদরাসায় উপস্থিত হলে আমাদের জাগিয়ে দিয়ো। হুজুর মাদরাসায় এসে দু-রাকাত তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামায আদায় করতেন। এতক্ষণে দারোয়ান ছাত্রদের জাগিয়ে দিত। হুজুর সালাম ফিরিয়ে দেখতেন, ছাত্ররা হাদীছ শিক্ষার জন্য উপস্থিত হয়ে গেছে। তিনি রাত তিনটায় দরস শুরু করে দিতেন।

হযরত মাওলানা ইয়াহয়াহ (রহ.)-এর ইল্‌মি ব্যস্ততা

মাওলানা ইয়াহয়াহ (রহ.)-এর কাসীদায়ে বুরদা, হামাসা, মুতানাব্বী ও নাফহাতুল ইয়ামান মুখস্থ ছিল। সুল্লামুল উলূম তিনি দুইশতবার পাঠ করেছিলেন। একদা মনে আগ্রহ জাগল, শীতকালে রোদে বসে আঁখ খাব। বললেন, ভাই! বিগত ১৮ বছর যাবত আমি আখ খাওয়ার সুযোগ পাইনি।

শিক্ষা বিষয়ে ওলামায়ে দেওবন্দের খেদমত

হযরত কাসিম নানুতবী (রহ.) ইসলামি আন্দোলন বা জিহাদের বিরুদ্ধে আর্য সম্প্রদায়ের অগ্রযাত্রায় যে তুফান ছিল, তা তিনি চিরতরে বন্ধ করে দেন।

শায়খুল হিন্দ (রহ.) : মাল্টায় বন্ধী হয়ে তিনি তাফসীর লিখেছিলেন। হযরত কাশ্মিরি (রহ.) : বোখারি শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন।

হযরত মাদানী (রহ) : একটানা ১৮ বছর মসজিদে নববীতে বসে হাদীছের দরস দেন।

আল্লামা জাফর আহমদ ওছমানী (রহ.) : এয়াইয়াউস সুনান রচনা করেন।

আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) : পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটিতে একটি কিতাব আছে, যাতে লিখা রয়েছে, আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) দীনে ইসলামের ওপর ২৮০০ কিতাব রচনা করেন। সেখানে তাঁর সমস্ত কিতাবের তালিকাও রয়েছে।

হযরত সাহারানপুরী (রহ.) : তিনি بذل المجهود গ্রন্থ রচনা করেন। হযরত ইলিয়াছ (রহ.) : দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুক করেন, যা বর্তমানে আলহামদু লিল্লাহ প্রায় ১৮০ টিরও বেশি দেশে এর মেহনত চলছে।

আল্লামা যাকারিয়া (রহ.) : তিনি ফাযায়ালে আমল কিতাব লিখেছেন, যা আল্লাহ তা'আলার দরবারে অপূর্ব গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। আল্লাহু আকবার! বর্তমান পৃথিবীতে আল্লাহর কালাম পবিত্র কুরআনের পরে সর্বাধিক পঠিত কিতাব ফাযায়ালে আমল।

সুতরাং ওলামায়ে দেওবন্দের ইল্‌মি কামালিয়াতের মাধ্যমে বর্তমান পৃথিবীতে ইল্‌মি খেদমত নিরবচ্ছিন্নভাবে চলছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, ওলামায়ে দেওবন্দ প্রত্যেক ক্ষেত্রে ইসলামকে সঠিক ধারায় উম্মতের সামনে উপস্থাপন করে গেছেন।

ওলামায়ে দেওবন্দের ঐতিহাসিক কৃতিত্ব

ওলামায়ে দেওবন্দ প্রমাণ করে গেছেন, মৌলবিয়াত হচ্ছে ইমাম আবুহানীফা (রহ.)-এর ফেকাহ-এর নাম।

মৌলবিয়াত হচ্ছে ইমাম মালেক (রহ.)-এর সাহসিকতার নাম।

মৌলবিয়াত হচ্ছে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর অনড় অবস্থার নাম।

মৌলবিয়াত হচ্ছে ইবনে দীনার (রহ.) কর্তৃক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অনুসরণের নাম।

মৌলবিয়াত হচ্ছে মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.)-এর পরিচ্ছন্নতার নাম।

মৌলবিয়াত হচ্ছে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহ.)-এর দূরদর্শিতার নাম।

মৌলবিয়াত হচ্ছে ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর শাহাদাতের নাম।

মৌলবিয়াত হচ্ছে কাসিম নানুতবী (রহ.)-এর হেকমত ও কৌশলের নাম।

মৌলবিয়াত হচ্ছে শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর সুখ্যাতির নাম।

মৌলবিয়াত হচ্ছে হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর সম্মানের নাম।

ওলামায়ে দেওবন্দের ইল্‌মি খেদমতের মধ্যে অন্যতম খেদমত হলো, তাঁরা সর্বকালে বাতিলের মোকাবেলা করেছেন।

ওলামায়ে দেওবন্দের বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্ব

যদি ওলামায়ে দেওবন্দের জীবনী সম্পর্কে জানতে চাও, তাহলে মাল্টার দরজা ও দেওয়ালকে জিজ্ঞাসা করো, শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর ব্যক্তিত্ব কেমন ছিল।

করাচির দিনা হলের দরজা ও দেওয়ালকে জিজ্ঞাসা করো, হযরত মাদানীর (রহ.)-এর সাহসিকতা কেমন ছিল।

আন্দামান দ্বীপকে জিজ্ঞাসা কর, হযরত জাফর খান তানিছিরী (রহ.)-এর সম্মান কেমন ছিল।

বালাকোটের পাথুরে জমিনকে জিজ্ঞাসা করো, হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর বীরত্ব কেমন ছিল।

মিয়াওয়ালী ও সাখখারি কারাগারকে জিজ্ঞাসা করো, হযরত শাহ আতাউল্লাহ বোখারি (রহ.)-এর অনড় অবস্থান কেমন রূপ ছিল।

ওলামায়ে দেওবন্দের ইল্‌মি খেদমতের অবস্থা জানতে হলে দিল্লি থেকে পেশোওয়ার পর্যন্ত খায়বারজার লিলি রোডের দু-পাশের বড়-বড় গাছকে জিজ্ঞাসা করো, তাদের জবানবন্দি নাও, ওলামায়ে দেওবন্দকে যখন তোমাদের শাখায় ফাঁসির রশিতে ঝুলানো হয়েছিল, তখন তোমরা তাদের অনড় অবস্থা কেমন পেয়েছিলে? বরং ফাঁসির রশিগুলোকে জিজ্ঞাসা করো, তোমাদের কারা চুমু দিয়ে নিজের বুকের সঙ্গে আলিঙ্গন করেছিল? আল্লাহর নামের ওপর ফাঁসির কাষ্ঠে উত্তীর্ণ হয়ে তাঁরা প্রমাণ করে গেছেন, আমরা আমাদের প্রাণ উৎসর্গ করে দিতে পারি; কিন্তু আমাদের ঈমান অন্যের কাছে বিক্রি করতে পারি না।

কোনো কবি বলেন,

کفر ناچا جن کے آگے تگنی کا ناچ
جس طرح جلتے توے پر ناچ کرتا ہے سپند
ان میں قاسم ہو یا انور شاہ کہ محمود الحسن
سب کے دل تھے دردمند اور سب کی فطرت ارجمند

'কাফেররা নৃত্য করে, যাদের সামনে রয়েছে সংকটের নৃত্য। যেমন জলন্ত কড়াই কালিদানা নাচে। তাদের অন্যতম ছিলেন কাসিম, আনোয়ার শাহ, মাহমুদুল হাসান। সবার অন্তরে ব্যথা ছিল; কিন্তু সবার হাকীকত ও প্রকৃতি ছিল ভাগ্যবান।'

ওলামায়ে দেওবন্দ পূর্বপুরুষদের সঠিক ধারক-বাহক

ওলামায়ে দেওবন্দের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, পূর্বপুরুষদের সঙ্গে তাঁদের সত্যিকারের সম্পর্ক ছিল এবং তা খুবই গাঢ় ছিল। এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত আশ্চর্যজনক। একটু মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন।

ইমাম মালেক (রহ.) মদীনার মসজিদে হাদীছের দরস দিয়েছিলেন। আর ওলামায়ে দেওবন্দের হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) তাঁর রূহানি ওয়ারিশ হয়ে তা বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন। তিনি একটানা আঠারো বছর মদীনার মসজিদে হাদীছের দরস দিয়েছেন।

ইমাম বোখারি (রহ.)কে দাফন করার পর তাঁর কবর থেকে সুগন্ধি বের হতে থাকে। আর তার রূহানি সন্তান আল্লামা আহমদ আলী লাহোরি (রহ.) থেকে তা বাস্তবে প্রকাশ পায়। তাকে মিয়ানি কবরস্তানে দাফন করার পর সেখান থেকে সুগন্ধি বের হতে থাকে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) 'কুরআন সৃষ্ট' মাসয়ালায় নজিরবিহীন অটলতা দেখিয়েছেন, যার প্রতি সারা দুনিয়া হতভম্ব। এদিকে তাঁর রূহানি সন্তান হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) মাল্টার বন্দি দশায় সেই অবস্থা বাস্তবায়িত কের দেখিয়েছেন। ব্রিটিশরা তাকে খুবই শাস্তি দিত। রাতে অসহনীয় কষ্ট দিত। তখন হযরত মাদানী (রহ.) অস্থির হয়ে যেতেন এবং আপন শায়খকে বলতেন, হুজুর! এমন কোনো কথা স্বীকার করে নিন, যাতে তারা আর আপনাকে শাস্তি না দেয়। হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) বললেন, তা কখনো হতে পারে না।

একদা কয়েকজন ছাত্র একত্রিত হয়ে হুজুরের নিকট এই আবদার পেশ করে যে, হুজুর! আপনার কষ্ট আমাদের সহ্য হচ্ছে না। সুতরাং আপনি এমন কোনো কথা স্বীকার করে নিন, যাতে আপনার ওপর এই নির্যাতন বন্ধ হয়ে যায়। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) তো তথা 'কৌশলের অধ্যায়ে' বিভিন্ন সূরত বর্ণনা করেছেন। সুতরাং দ্ব্যর্থবোধক কোনো শব্দ বলে আপনি এই নির্যাতন থেকে মুক্ত হওয়ার কৌশল গ্রহণ করুন। তখন তিনি শোওয়া থেকে উঠে বসে বললেন, হোসাইন আহমদ! তুমি আমাকে কী ভাবছ? আমি হযরত বেলাল

(রহ.)-এর রূহানি সন্তান। আমি হযরত খুবাইব (রহ.)-এর উত্তরাধিকারী। আমি বিবি সুমাইয়া (রহ.)-এর আধ্যাত্মিক বংশধর। আমি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর অটলতার উত্তরসূরী। এই নির্দয় জালেমরা আমার থেকে প্রাণবায়ু বের করতে পারবে। তবু আমার ঈমান হরণ করতে পারবে না। কোনো কবি বলেন,

حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا
ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا
گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا
لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا

'দুর্যোগের পদতলে বাদশাহ নিপতিত হয় না। আকাশ থেকে যে তারকা খসে পড়ে, তা মাটিতে পতিত হয় না। নদী খুব আগ্রহের সাথে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়; কিন্তু সমুদ্র কোনোদিন নদীতে পতিত হয় না।

আল্লাহপ্রদত্ত সম্পর্ক

কতিপয় বস্তু মানুষের আয়ত্তের বাইরে থাকে। সেগুলো অদৃশ্য অস্তিত্ব দানের ফলে বাস্তবে আসে। কিন্তু সেগুলোর সঙ্গের মানুষের সম্পর্কের পূর্ণ সত্যতা পাওয়া যায়। শাহ আবদুল আযীয (রহ.)কে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছিলেন। তিনি ১২৩৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) 'তাকবিয়াতুল ঈমান' গ্রন্থ রচনা করে শির্ক-বিদআতের মূলোৎপাটন করেছেন। তার পূর্ণ একশ বছর পর আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.) 'বারাহীনে কাতে'আ' রচনা করেন। তিনি ১৩৪৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। আল্লামা শামী (রহ.), যার ফেকার দক্ষতা আজ পৃথিবীতে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট, বর্তমান যুগের সমস্ত দারুল ইফতায় ফতোয়ায়ে শামী বিদ্যমান। তিনি ১২৫২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর ঠিক একশ বছর পর ১৩৫২ হিজরীতে আল্লামা কাশ্মিরি (রহ.) ইন্তেকাল করেন। এটাই হচ্ছে অদৃশ্যভাবে আল্লাহপ্রদত্ত সম্পর্ক। আল্লাহ তা'আলা আমাদের বুযুর্গদের একের-পর-এক ওয়ারিশ বানিয়ে তাদের সম্পর্ক বাস্ত বায়ন করেছেন।

একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো, ১৮২৮ সালের ১লা মে রোজ রবিবার পেশোয়ারের বাজারে দাঁড়িয়ে হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) শরীয়ত বাস্তবায়িত করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। তারপর ১৯৭২ সালের ১লা মে রোজ রবিবার আল্লামা মুফতী মাহমুদ সাহেব (রহ.) ওই বাজারে মদ নিষিদ্ধের ঘোষণা দেন।

যেখানকার খামির, মাটি সেখানেই পৌঁছে যায়

কিছু-কিছু বিষয় মানুষের অধীনে আছে। আর কিছু-কিছু বিষয় তার সাধ্যের বাইরে। সেগুলোর প্রতিও যদি গভীর দৃষ্টিপাত করা হয়, তাহলে দেখা যাবে, আমাদের ওলামায়ে দেওবন্দের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে আল্লাহ সত্য সম্পর্ক রেখেছেন। অতএব, প্রত্যেক মুমিনের অন্তরে এই আকাঙ্ক্ষা থাকে, সবার অন্তর এর জন্য অস্থির থাকে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ের নিচে যেন আমার সমাধি হয়। জান্নাতুল বাকিতে (মদীনার প্রসিদ্ধ কবরস্তান) যদি আমার কবর হতো। ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতো বুযুর্গ এ প্রত্যাশায় অস্থির ছিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রহ.)-এর মতো সাহাবি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতেন, হে আল্লাহ! আমাকে শাহাদাতের মৃত্যু দান করো এবং মদীনাতে দাফন হওয়ার সৌভাগ্য দান করো।

এরকম সৌভাগ্যও আল্লাহ আমাদের ওলামায়ে দেওবন্দকে প্রদান করেছেন। হযরত হাজ্বী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) মক্কার প্রসিদ্ধ কবরস্তান জান্নাতুল মুয়াল্লায় উম্মতের মা হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাযি.)-এর পাশে দাফন হয়েছেন। তারপর আল্লামা আহমদ আলী লাহোরি (রহ.)-এর বড় সাহেবজাদা। জান্নাতুল মুয়াল্লায় মা খাদীজাতুল কুবরা (রাযি.)-এর পায়ের দিকে তাঁকে দাফন করা হয়।

তাঁর সুযোগ্য ছাত্র হযরত বদরুল আলম সাহেব, যিনি ওলামায়ে দেওবন্দের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন, মদীনায় তাঁর ইন্তেকাল হয়। ফলে জান্নাতুল বাকিতে হযরত ওছমান (রহ.)-এর পার্শ্বে তাঁর দাফন হয়। হযরত মাওলানা আবদুল গফুর মাদানী (রহ.)ও মীদানায় ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকিতে হযরত ওছমান (রাযি.)-এর ডান পার্শ্বে তাঁর দাফন হয়। হযরত খলীল আহমদ মিরাঠির (রহ.)-এর ইন্তেকাল মদীনায় হয়। নবীজির আদরের দুলাল হযরত ইবরাহীম (রাযি.)-এর পায়ের দিকে তাঁর দাফন হয়।

হযরত কারী শের মুহাম্মদ (রহ.) মদীনায় ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকিতে হযরত ফাতেমাতুয যাহরা (রাযি.)-এর পায়ের নিচে তাঁর দাফন হয়। শায়খুল হাদীছ হযরত যাকারিয়া (রহ.)-এর মদীনায় ইন্তেকাল হয়। উহুদ যুদ্ধে শহীদগণের পাশে তাঁর দাফন হয়।

দেখুন, ওই সমস্ত আশেককানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারা জীবদ্দশায়ও قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ও قال الله تعالى এর মধ্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন এবং মৃত্যুর পরও আপন নেতা ও মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদতলে সমাধি পেয়েছেন। কোনো কবি বলেন,

آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا

اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا

'হে আমার মনিব! তোমার মেরাজ আল্লাহ তা'আলার লৌহ-কলম পর্যন্ত পৌঁছেছিল। আমার মেরাজ হলো, আমি আপনার পাদদেশ পর্যন্ত পৌঁছেছি।

আল্লাহ তা'আলা ওলামায়ে দেওবন্দকে আধাত্মিক পূর্ণতাও প্রচুর দান করেছিলেন। সুতরাং তাঁরা শুকনা মোল্লা ছিলেন না; বরং তাঁরা আধ্যাত্মিক জগতের অতন্দ্র প্রহরী ছিলেন। হাদীছের মসনদে বসলে তাঁরা আসকালানি ও কাস্তলানি (রহ.)-এর রূপ ধারণ করতেন। তরীকতের মসনদে বসলে জুনায়েদ বাগদাদি (রহ.)-এর রূপ ধারণ করতেন। যেমন– কিছুক্ষণ পূর্বে এক বুযুর্গ বলে গেছেন, দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম থেকে শুরু করে দারোয়ান পর্যন্ত সবাই আধ্যাত্মিক সম্পর্কের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

হযরত শায়খ আনযার শাহ (রহ.)-এর সঙ্গে আমি অধমের সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি আমাকে বলেছিলেন; দারুল উলূমে প্রথম পঞ্চাশ বছর যারা দাওরায়ে হাদীছ সমাপণ করেছে, তাঁদের সার্টিফিকেট দেওয়া হতো সত্য; তবে যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো বুযুর্গের সান্নিধ্যে থেকে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক অর্জন না করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত পাগড়ি দেওয়া হতো না। তারপর মাদরাসা পরিচালনা কমিটি পরামর্শ করল, এভাবে ছাত্রদের অনেক সময় লেগে যায়। প্রায় দশ বছর লেখাপড়ার পর আরও দু-চার বছর এখানে থাকতে হয়। এতে তাদের কর্মজীবনের ব্যাঘাত ঘটে। সুতরাং এখন থেকে ছাত্রদের লেখাপড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাদের পাগড়ি প্রদান করে নিজ-নিজ এলাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে আর সেখানে গিয়ে তারা নিকটতম কোনো বুযুর্গের হাতে

বায়'আত গ্রহণ করে সেই লাইনে মেহনত চালিয়ে যাবে। তাই প্রথম পঞ্চাশ বছরের পর থেকে দাওয়ায়ে হাদীছ শেষ করার সঙ্গে-সঙ্গে তাদের পাগড়ি প্রদান করা হয়।

এজন্য আমি বলে থাকি, যদি কারও দর্শন ও তর্কশাস্ত্রে গর্ব থাকে, তাহলে তুমি হযরত কাসিম নানুতবী (রহ.)-এর জীবনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করো।

আর যদি ফেকাহ্ শাস্ত্রের প্রতি তোমার গর্ব থাকে, তাহলে হযরত রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি (রহ.)-এর জীবনীর প্রতি তাকাও।

দীন প্রতিষ্ঠার প্রতি কারও গর্ব হলে তুমি হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর জীবনের ওপর আলোকপাত করো।

গ্রন্থ রচনার প্রতি কারও গর্ব থাকলে তুমি আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর জীবনীর প্রতি নজর দাও।

স্মৃতিশক্তির প্রতি কারও গর্ব থাকলে তুমি আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি (রহ.)-এর জীবনীর প্রতি তাকাও।

তাক্ওয়ার প্রতি কারও আত্মতৃপ্তি থাকলে তুমি হযরত মুজাফফর হোসাইন কান্দলভী (রহ.)-এর জীবনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করো।

তাওহীদের প্রতি কেউ আশ্বস্ত হলে তুমি হযরত ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর জীবনীর প্রতি তাকিয়ে দেখো।

জযবা, আবেগ ও দাওয়াত-তাবলীগের প্রতি কারও আসক্তির গর্ব হলে তুমি আল্লামা ইলিয়াছ (রহ.)-এর জীবনীর প্রতি চেয়ে দেখো।

আরবি সাহিত্যের প্রতি কারও দখল থাকলে তুমি আল্লামা সালমান নদভী (রহ.)-এর জীবনীর প্রতি মনোযোগ দাও।

বক্তৃতার জাদুর প্রতি কারও গর্ব হলে তুমি হযরত আতাউল্লাহ বোখারি (রহ.)-এর জীবনীর প্রতি তাকাও।

আগ্রাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের ওপর কারও গর্ব হলে তুমি হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর জীবনীর প্রতি আলোকপাত করো। দেখবে, তাঁরা প্রমাণ করে গেছেন, তাঁরা বাহ্যিকভাবেও দীনের কাজের আঞ্জাম দিয়েছেন, সাথে-সাথে বাতেনিভাবেও নূরের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছেন।

নূরের সঙ্গে সঙ্গ স্থাপনকারী বুযুর্গদের আল্লাহ তা'আলা দীনের খেদমতের জন্য কবুল করেছিলেন। আমীরে শরীয়ত হযরত শাহ আতাউল্লাহ বোখারি (রহ.) বলতেন, আমার এরকম অনুভূতি হয় যে, সাহাবায়ে কেরামের জামাত

পথ চলছিল। তাদের থেকে কতিপয় আত্মাকে আল্লাহ পেছনে রেখে দিয়েছেন। বর্তমানে সেগুলোর আবির্ভাব হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রেরণ করে আমাদের পূর্বপুরুষদের আদর্শের দৃষ্টান্ত পেশ করছেন, দেখো, আল্লাহ তা'আলা এরকম পবিত্র আত্মা সৃষ্টি করেছিলেন।

ওলামায়ে দেওবন্দের সম্পর্ক

ওলামায়ে দেওবন্দের ইল্‌মি সম্পর্ক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে। প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! আমাদের ওলামায়ে কেরামগণ ইল্‌মি সম্পর্কে খুবই মজবুত ও পরিপূর্ণ ছিলেন। একটু মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করো। হযরত কাসিম নানুতবী (রহ.) হাদীছ শিক্ষা করেছিলেন আল্লামা শাহ আবদুল গনী মুজাদ্দিদি (রহ) থেকে। তিনি এই নূর অর্জন করেছিলেন শাহ ইসহাক (রহ)-এর কাছ থেকে। তিনি এই জ্ঞান অর্জন করেছিলেন শাহ আবদুল আযীয (রহ.) থেকে। তিনি ইল্‌ম শিক্ষা করেন আল্লামা শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহ.) থেকে। তিনি এই নূরে নুবওয়াত হাসিল করেছিরেন শায়খ আবু তাহের মাদানী (রহ.) থেকে। তিনি হাদীছ শিক্ষা করেন আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আহমদ মাজমাউল বিহার প্রণেতা থেকে। তিনি জ্ঞান অর্জন করেন আল্লামা শায়খ ইসামুদ্দীন সাহেব কানযুল উম্মাল গ্রন্থের প্রণেতা থেকে। তিনি ইল্‌ম শিক্ষা করেন আল্লামা রবী ইবনে সাঈদ (রহ.) থেকে। তিনি হাদীছ শিক্ষা করেন ইমাম ঈসা (রহ.) থেকে। তিনি হাদীছ শিক্ষা করেন ইমাম আবু ঈসা তিরমিযি (রহ.) থেকে। তিনি ইল্‌ম শিক্ষা করেন আল্লামা ইমাম বোখারি (রহ.) থেকে। তিনি হাদীছ শিক্ষা করেন আল্লামা ইয়াহয়াহ ইবনে মুঈন (রহ.) থেকে। তিনি ইল্‌ম শিক্ষা করেন আল্লামা ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) থেকে। যখন তাকে হাদীছের ধারক-বাহক উপাধি দেওয়া হয়েছিল। তিনি ইল্‌ম শিক্ষা করেন উম্মতের নক্ষত্র হযরত ইমাম আবুহানীফা (রহ.) থেকে। তিনি ইল্‌ম শিক্ষা করেন আল্লামা হাম্মাদ (রহ.) থেকে। তিনি ইল্‌ম শিক্ষা করেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রহ.) থেকে। তিনি এ হাদীছের নূর অর্জন করেন সেই নূরের প্রস্রবণ হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে।

এ হলো আমাদের আকাবিরদের ইল্‌মি সম্পর্ক যা অত্যন্ত মজুবত ও দৃঢ়। আল্লাহ আমাদের পক্ষ থেকে তাদের উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। যারা আমাদের নিজের পেছনে চলার পরিবর্ততে শরীয়তের দীপ্তিমান রাস্তায় চলার জন্য পথপ্রদর্শন করে গিয়েছেন।

সর্বশেষ কথা হলো, আল্লাপাক আমি অধমকে এ দীনের খাতিরে পৃথিবীর অনেক দেশ সফর করার সৌভাগ্য দান করেছেন। পূর্ব দিগন্ত দেখেছি। পশ্চিম দিগন্ত দেখেছি। আমেরিকা, আফ্রিকা সফর করেছি। এমন এলাকাও দেখেছি, যেখানে ছয় মাস রাত আর ছয় মাস দিন থাকে। এমন স্থানও দর্শন করেছি, যেখানে লক্ষ-লক্ষ রাজা-বাদশাহর অভিমত লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, এটা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত। সাইবেরিয়ার মতো দেশ, যেখানে মানুষ সারা বছর বরফের তৈরী ঘরবাড়িতে জীবন যাপন করে। আফ্রিকার জঙ্গলে গিয়েও বসবাস করেছি। অতঃপর আমি অধম এই মসজিদে অজুসহকারে বসে বলছি, আমি পৃথিবীর যেখানেই গিয়েছি, সেখানেই ওলামায়ে দেওবন্দের কোনো-না-কোনো রূহানি সন্তান পেয়েছি, যারা পূর্বে থেকেই সেখানে দীনের কাজ করছে। তাই কোনো কবি বলেছেন,

یہ علم ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہ پارہ ہے
ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے ہر سرو یہاں مینارہ ہے
عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل
آنکھوں نے کہا دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل
کہسار یہاں دب جاتے ہیں طوفان یہاں رک جاتے ہیں
اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں
یہ علم ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہ پارہ ہے
ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے ہر سرو یہاں مینارہ ہے

'এটা এলম ও প্রজ্ঞার ধ্বনি, যা ইতিহাসের এক শাহী খণ্ডচিত্র। প্রত্যেকটি ফুল এখানে জ্যোতি। প্রত্যেক শির একটি মিনার। আবেদের বিশ্বাসের দীপ্তি। সৌভাগ্যের নিস্কলুষ আমল। চোখ কোথায় দেখবে নিষ্ঠার এই তাজমহল। পাহাড়ি ঝঞ্ঝা এখানে থেমে যায়। তুফান এখানে স্তব্ধ। রাজপ্রাসাদ মাথা নত করে। এটা জ্ঞান ও গুণের জ্যোতি। প্রত্যেকের শির একটি মিনার।'

আল্লাহ তা'আলা আমাদের ওই বুযুর্গদের শিক্ষার আলোতে জীবন যাপন করার তাওফীক দান করুন। কেয়ামতের ময়দানে তাদের পদতলে আমাদের আশ্রয় দিন। আমীন।

পবিত্র জীবন অর্জনের সোপান

'মানুষ তার নিজের সত্তার ব্যাপারে চিন্তাশীল থাকবে। অন্যের প্রতি ভালো ধারণা রাখবে। এটাই মানুষের জন্য কাম্য। বর্তমানে আমরা এর বিপরীত করছি। অন্যের ব্যাপারে মন্তব্য করি, সে এমন, সে তেমন। আর নিজের ব্যাপারে আত্মগরিমায় মত্ত থাকি। নিজের প্রতি ভালো ধারণা রাখি যে, আমরা কেয়ামতের দিন খুব আরামে থাকব। তাই মানুষের কেয়ামতের কথা স্মরণ হলে সে ভাবতে থাকে, হাশরের মাঠ কায়েম হবে, সকল মানুষ উপস্থিত হবে, হিসাব শুরু হবে। বিরাট মিযান স্থাপন করা হবে। নেকি-বদি ওজন করা হবে। কেউ জান্নাতে যাবে, কেউ জাহান্নামে যাবে। আর আমি দেয়ালের পাশে বসে সেই দৃশ্য দেখব। নিজের ব্যাপারে এ চিন্তা করছে না যে, আমি কোন দলের অন্তর্ভুক্ত হব। জান্নাতিদের সাথি হব, নাকি জাহান্নামের গহবরে যাব।'

পবিত্র জীবন অর্জনের সোপান

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

'যারাই সৎকর্ম করবে পুরুষ হোক বা নারী এমতাবস্থায় যে, তারা মুমিন, আমি তাদের পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যে আমল করেছে, এর চেয়ে উত্তম প্রতিদান আমি তাদের প্রদান করব।'[১৪৯]

উক্ত আয়াতে ঈমান ও সৎকর্মের সঙ্গে পবিত্র জীবনকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

আমলের শক্তি

পৃথিবীর সকল মানুষই চায়, আমি পবিত্র জীবন অর্জন করি। সুতরাং এ আয়াতে সেই রহস্যের মুখোশ উন্মোচন করেছে যে, হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা নেক আমল কর, সৎকর্মকে আপন জীবনের সাথি বানাও, তাহলে আমি তোমাদের পবিত্র জীবন দান করব। এতে প্রতীয়মান হয়, আল্লাহ তা'আলা আমলের মধ্যে এই ক্ষমতা বা যোগ্যতা রেখেছেন। এজন্যই যারা সঠিকভাবে নামায আদায় করবে, তাদের সফলতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন–

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝

'মুমিনরা সফলকাম, যারা বিনয়ের সাথে নামায আদায় করে।'[১৫০]

---

১৪৯. সূরা নহল : আয়াত ৯৭

১৫০. সূরা মুমিনূন : আয়াত ১, ২

فلاح বা সফলতার সংজ্ঞা

فلاح বা সফলতা বলা হয় এমন কৃতকার্য হওয়াকে, যার পরে ব্যর্থতা নেই। আল্লাহ তা'আলার দরবারে এমন সম্মান পাওয়া, যার পরে আর অসম্মানিত হতে হয় না। আর এটি আল্লাহ সঠিকভাবে বিনয়ের সাথে নামায আদায়কারীকে দান করেন।

মনের প্রশান্তির ব্যবস্থাপত্র

আল্লাহর যিকিরের ওপর অন্তরে প্রশান্তি পাওয়ার ব্যাপারে মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আল্লাহ বলেন–

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ؕ

জেনে রেখো! আল্লাহর যিকির দ্বারা অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।'[১৫১]

কোনো কবি বলেন–

نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے * تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے

'দুনিয়া, ধন-দৌলত ও ঘরবাড়ি নির্মাণে প্রশান্তি আসে না। প্রশান্তি আসে আল্লাহর স্মরণে।'

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার স্মরণে মানুষের অন্তরে প্রশান্তি ও স্থিরতা আসে। এটা মহামহিম স্রষ্টার অঙ্গীকার।

তাক্ওয়ার ওপর পুরস্কার

রোযার দ্বারা মানুষের তাক্ওয়া অর্জন হয়। তাক্ওয়া হাসিল হলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য রহমতের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। এজন্য রোযা ফরজ করার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন–

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

'যাতে তোমরা তাক্ওয়া হাসিল করতে পার।'[১৫২]

তোমরা মুত্তাকী হয়ে যাও।

তাক্ওয়া বা খোদাভীরুতার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

---

১৫১. সূরা নহল : আয়াত ২৮

১৫২. সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৩

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

'যদি গ্রামবাসী ঈমান গ্রহণ করত এবং তাক্ওয়া অর্জন করত, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আসমান ও জমিন থেকে বরকতের দরজাগুলো খুলে দিতাম।'[১৫৩]

প্রত্যেক মানুষ চায়, আমার বরকত নসিব হোক। আমার সুস্থতায় বরকত হোক। আমার সময়ে বরকত হোক। আমার রিযিক, সন্তানাদি, ধর্ম, কর্ম সবকিছুতে বরকত হোক। সুতরাং আমরা প্রত্যেক বস্তুতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বরকতের প্রত্যাশী। অতএব, আল্লাহ তা'আলা বলেন, যদি তোমরা তাক্ওয়াপূর্ণ জীবন ধারণ কর, তাহলে সর্বক্ষেত্রে তোমাদের জন্য আমার বরকতের দরজা খুলে দেব।

ক্ষমা ও রিযিকের প্রশস্ততার প্রতিশ্রুতি

হজ করার ওপর বান্দার জন্য ক্ষমা ও রিযিকের প্রশস্ততার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। হাদীছ শরীফে নবীজি ইরশাদ করেন–

بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَاِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ

'তোমরা হজ ও ওমরা বারবার কার। কেননা, এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে দরিদ্রতা ও গুনাহ থেকে মুক্তি দেন।'

সুতরাং বান্দা ক্ষমা ও আহার্য উভয়ই পেয়ে গেল।

প্রভাবসমূহ

আমলের মধ্যে শক্তি ও প্রভাব রয়েছে। এটি আল্লাহপ্রদত্ত অঙ্গীকার। বস্তুর প্রভাব আমাদের পরীক্ষিত। বিদ্যুতের স্পর্শে মানুষের মৃত্যু হয়ে যায়। কাজেই কোনো মানুষ বিদ্যুতের খোলা তারে হাত দেয় না। বিষক্রিয়ায় মানুষের মৃত্যু হয়। তাই সকল মানুষ বিষাক্ত বস্তু থেকে দূরে থাকে।

আমলের ওপর বিশ্বাস

এমনিভাবে যদি মানুষের এ বিশ্বাস হয় যে, সৎকর্মের দ্বারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কল্যাণ পাওয়া যায় এবং পাপকর্মের কারণে আল্লাহর শাস্তি পেতে হয়, তাহলে কোনো মানুষ পাপের দিকে পা বাড়াবে না। বরং তারা সারা জীবন পুণ্যের জন্য উৎসর্গ করে দেবে। দুই ব্যক্তি একটি কাজ

---

১৫৩. সূরা নহল : আয়াত ৯৮

করে। একজনের কাজ সংশোধিত হয়; সে সফলতা পায়। অন্যজনের কাজ বিনষ্ট হয়; সেই কর্মের জন্য সে আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি পায়।

নামাযের দরুন সফলতার প্রতিশ্রুতি

একটু ভেবে দেখুন, উত্তমরূপে নামায আদায়কারীর প্রতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সফলতার প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝٢

'মুমিনগণ সফলকাম, যারা বিনয়ের সাথে নামায আদায় করে।'[১৫৪]

সুতরাং যে কৃতকার্য হলো, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর এই নামাযকে বিনষ্ট করলে জাহান্নামে যাওয়ার ফয়সালা হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝٤ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝٥

'ধ্বংস নামাযীদের, যারা তাদের নামায হতে উদাসীন থাকে।"[১৫৫]

একই নামায সঠিকভাবে আদায়কারী জান্নাত পেল। আর সেই নামাযে উদাসীন ব্যক্তি জাহান্নামের জন্য নির্ধারিত হয়ে গেল।

কুরআন শিক্ষার আমন্ত্রণ

উত্তমরূপে কুরআন তেলাওয়াত করা মানুষের শান্তির কারণ হয়। যেব্যক্তি হাফেয তাকে কেয়ামতের দিন বলা হবে, তুমি কুরআন তেলাওয়াত করো আর জান্নাতের উচ্চ স্তরে আরোহণ করো। হাদীছে এসেছে–

وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا

'থেমে-থেমে, তারতীলের সাথে তেলাওয়াত করো যেভাবে পৃথিবীতে তেলাওয়াত করতে।'

সুতরাং সে জান্নাতে গেল কুরআনের কারণে। জান্নাতে ফেরেশতারা তাকে সালাম প্রদর্শন করবে। অন্যান্য জান্নাতিরাও সালাম দেবে। পক্ষান্তরে যদি

---

১৫৪. সূরা মুমিনূন : আয়াত ১, ২

১৫৫. সূরা মাউন : আয়াত ৪, ৫

কুরআনের শিক্ষার বিপরীতে অর্থাৎ– ভুল করে কুরআন পাঠ করে, তাহলে এদের ব্যাপারে হাদীছ শরীফে এসেছে–

رُبَّ قَارِئٍ يَقْرَءُ الْقُرْاٰنَ وَالْقُرْاٰنُ يَلْعَنُهُ

'অনেক কুরআন তেলাওয়াতকারী এমন হয়, যারা কুরআন তেলাওয়াত করে আর কুরআন তাদের অভিশাপ দেয়।'

সুতরাং একই কুরআন একজন পাঠ করল আর জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে আসন পেল। অপরজন ভুল পাঠ করল। সে উল্টো সাজার ভাগীদার হলো। সুতরাং আমাদের যদি আমল করতেই হয়, তাহলে সেটি সঠিকভাবে করছি না কেন? সেটি সুন্দরভাবে করার চেষ্টা করতে হবে।

হযরত সুলাইমান (আ.)-এর রাজত্ব

হযরত সুলাইমান (আ.)কে আল্লাহ তা'আলা এমন রাজত্ব প্রদান করেছিলেন, যা তার পূর্বে কাউকে দেওয়া হয়নি এবং ভবিষ্যতেও কাউকে এমন রাজত্ব দেওয়া হবে না। মানব-দানব, জিন-পরী, পশু-পাখি, জল ও স্থলের সমস্ত সৃষ্টজীবের বাদশাহ বানিয়েছিলেন। প্রত্যেক বস্তুর ওপর তার শাসন চলত। এমন রাজত্ব আল্লাহ তাঁকে দান করেছিলেন। কিন্তু সাথে-সাথে আল্লাহ বলে দিয়েছেন, তিনি আল্লাহর নিকট যে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছেন, তা তাঁর আমলের বিনিময়ে পেয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٌ

'সে আমার কতই-না উত্তম বান্দা। সে আমার প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী ছিল।'[১৫৬]

সুতরাং তিনি 'আব্দ' বা দাসত্বের নেয়ামত পেয়েছিলেন। দাসত্ব নামক নেয়ামতের যে মুকুট তাঁর মাথায় পরানো হয়েছিল, এর মূল ভিত্তি বলা হয়েছে, তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল ছিলেন।

হযরত আইয়ূব (আ.)-এর ধৈর্যের পুরস্কার

অন্য দিকে দেখুন, হযরত আইয়ূব (আ.)-এর ওপর পরীক্ষা এল। সমস্ত আসবাবপত্র বিলুপ্ত হয়ে গেল। বাগবাগিচা বিলীন হয়ে গেল। স্ত্রীও মারা

---

১৫৬. সূরা সাদ : আয়াত ৩০

গেল। সন্তানাদি মারা গেল। নিজেও কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। এত পরীক্ষার পরও আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য পেলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۚ نِّعْمَ الْعَبْدُ ۖ

'আমি তাকে ধৈর্যশীল পেয়েছি; আমার উত্তম বান্দা।'[১৫৭]

إِنَّهُ أَوَّابٌ

'সে আমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।'[১৫৮]

সুতরাং এতে প্রতিভাত হয়, পৃথিবীর বাদশাহি পুনরায় ফিরে পাওয়া গেল আল্লাহ তা'আলার প্রতি মনোযোগী হওয়ার কারণে।

আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়ার উপকরণসমূহ

সুতরাং বোঝা গেল, আল্লাহ তা'আলার সান্নিদ্য পাওয়া যায় আমলের দ্বারা। এর মধ্যে দুনিয়ার ধনসম্পদের কোনো দখল নেই। একজন মানুষ কুঁড়েঘরে বসে আল্লাহ তা'আলার ওলী হতে পারে। আরেকজন ফোমের গদিতে অবস্থান করেও আল্লাহর ওলী হতে পারে। দুনিয়া একটি বাহ্যিক বস্তু, একটি জাগতিক বস্তু। আল্লাহর রাস্তায় এর কোনো মর্যাদা নেই।

দুটি সুসংবাদ

ঈমান ও আমলধারী ব্যক্তির জন্য দুটি সুসংবাদ ও দুটি নেয়ামত রয়েছে।

এক.

فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ

'আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব।'[১৫৯]

দুই.

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

'এবং আমি তাদের আমলের চেয়ে উত্তম প্রতিদান তাদের দান করব।'[১৬০]

---

১৫৭. সূরা সাদ : আয়াত ৩০
১৫৮. সূরা সাদ : আয়াত ৩০
১৫৯. সূরা নাহল : আয়াত ৯৭
১৬০. সূরা নাহল : আয়াত ৯৭

অর্থাৎ– পৃথিবীতে পবিত্র জীবন ও পরকালে উত্তম প্রতিদান। যেমন প্রতিদান, তেমন মর্যাদা।

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا

'প্রত্যেকের জন্য রয়েছে মর্যাদার স্তর, তারা যা আমল করেছে তার বিনিময়ে।'[১৬১]

দুটি শাস্তি

পক্ষান্তরে আমল বিনষ্টকারীদের জন্য দুটি শাস্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ۝

'আমার স্মরণ থেকে যারা বিমুখ হবে, নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে সংকীর্ণ জীবন এবং পরকালে আমি তাদের অন্ধ বানিয়ে উপস্থিত করব।"[১৬২]

প্রথম শাস্তি হলো, তার জীবন সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে। জীবন সংকীর্ণ হওয়ার মর্ম এটা নয় যে, তার ব্যবসায় বেচাকেনা হবে না। তার টাকা পয়সা থাকবে না। এর মর্ম হলো, তাকে অস্থিরতার জীবন দান করা হবে। অশান্তির খাবার দেওয়া হবে। এমন রিযিক পাবে, যে তাকে গ্রাস করবে। মাথার ওপরে অন্ধকার ছেয়ে যাবে।

আপনারা দেখে থাকবেন, বড়-বড় কোম্পানির মালিক। রাতে ঘুম আসে না। আমি কোম্পানির শেয়ার খুলতে চাই। কী পরিমাণ শেয়ার খোলা হয়েছে, তারও খবর নেই। সর্বক্ষণ টেনশনে ভুগছে। আমি কোম্পানির একটা ডেলিভারী পাঠিয়েছিলাম; সেটা আটকানো হয়েছে। আমি একটি প্রডাকশন দেওয়ার কথা ছিল; সময় মতো দিতে পারিনি। আরও কত টেনশন। সুতরাং কোটির মধ্যে হাবুডুবু খেয়েও শান্তি নেই। তাই مَعِيْشَةً ضَنْكًا এর মর্ম হলো, রিযিকের মধ্যে অশান্তি দেখা দেবে। রিযিকের পক্ষ থেকে শুধু অশান্তি আর অশান্তি প্রকাশ পাবে। কখনো এই খাতে কিছু টাকা লোকসান হয়ে যাবে, কখনো ধোঁক খাবে, ছিনতাইকারী টাকা নিয়ে যাবে। এক কথায়

---

১৬১. সূরা আহকাফ : আয়াত ১৯

১৬২. সূরা তাহা : আয়াত ১২৪

তার মানসিক টেনশন দূর হবে না। এ সমস্ত লোক নামাযের মধ্যে তার সম্পদ নিয়ে চিন্তায় পড়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা তাদের জীবনের এমন অশান্তি বিরাজ করে দেন যে, তারা নিজের স্ত্রীর সঙ্গেও সুখময় কোনো সময় ব্যয় করতে পারে না। আল্লাহ বলেছেন, আমি তাদের مَعِيْشَةً ضَنْكًا সংকীর্ণ জীবন দান করব। অর্থাৎ– রিযিকের অশান্তি তার মাথায় চাপিয়ে দেব।

দ্বিতীয় শাস্তি হলো–

وَنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى

'কেয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ বানিয়ে দাঁড় করাব।'

হে আল্লাহ! সেই শাস্তি কেমন হবে? শরীয়তের নীতিমালা হচ্ছে–

جزا من جنس العمل

'যেমন কর্ম তেমন ফল।'

যেমন করবে তেমন পাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, পৃথিবীতে সে আমার রিযিক, আমার শিক্ষা ও আমার বিধান থেকে চোখ বন্ধ করে রেখেছিল। সেগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্ধের ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকত। পৃথিবীতে যেহেতু সে অন্ধত্ব প্রকাশ করেছে, সুতরাং কেয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ বানিয়ে উপস্থিত করব। এবার বলুন, আমলকারীদের জন্য কী পরিমাণ কল্যাণ রয়েছে? আর যারা নিজের আমল বিনষ্ট করে, তাদের ক্ষতির পরিমাণ কত? সুতরাং যারা চায়, নিজের সত্তাকে মূল্যবান বানাবে, সে যেন তার নিজের মধ্যে মেহনত করে।

সাধারণ নিয়ম হলো, যে-বস্তুর ওপর শ্রম দেওয়া হয়, তা মূল্যবান হয়ে যায়। কাঠের মধ্যে শ্রম দিলে সেটা ফার্নিচার হয়ে উচ্চ মূল্যে বিক্রি হয়। মানুষ পাথরের মধ্যে মেহনত করে যখন তাকে সুন্দর ও মসৃণ করে বের করে, তখন সেটা কত দামী হয়। লোহাকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে যখন তাকে জাহাজ বানানো হয়, তখন সেটা কেমন মূল্যবান হয়। বালুর ওপর মানুষ শ্রম দিয়ে তা দ্বারা সার্কিট বানায়, তা কত মূল্যবান হয়। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এ সিলিকন সোনার চেয়েও তিন গুণ বেশি মূল্যবান হয়ে যায়।

সুতরাং ভাই! বিভিন্ন ধাতুর মধ্যে মেহনত করলে যদি তা সোনার চেয়েও মূল্যবান হতে পারে, তাহলে তোমার নিজের সত্তার মধ্যে মেহনত করলে তুমি কী আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে মূল্যবান হবে না? লোহা যদি আকাশে উড়তে

পারে, তাহলে তোমরা রূহানিভাবে উড়তে পারবে না কেন? সুতরাং তোমার শ্রমের লক্ষ্য বস্তু তোমার সত্তাকে বানিয়ে নাও।

একটি সোনালি নীতি

মানুষ তার নিজের সত্তার ব্যাপারে চিন্তাশীল থাকবে। অন্যের প্রতি ভালো ধারণা রাখবে। এটাই মানুষের জন্য কাম্য। বর্তমানে আমরা এর বিপরীত করছি। অন্যের ব্যাপারে মন্তব্য করি, সে এমন, সে তেমন। আর নিজের ব্যাপারে আত্মগরিমায় মত্ত থাকি। নিজের প্রতি ভালো ধারণা রাখি যে, আমরা কেয়ামতের দিন খুব আরামে থাকব। তাই মানুষের কেয়ামতের কথা স্মরণ হলে সে ভাবতে থাকে, হাশরের মাঠ কায়েম হবে, সকল মানুষ উপস্থিত হবে, হিসাব শুরু হবে। বিরাট মিযান স্থাপন করা হবে। নেকি-বদি ওজন করা হবে। কেউ জান্নাতে যাবে, কেউ জাহান্নামে যাবে। আর আমি দেয়ালের পাশে বসে সেই দৃশ্য দেখব। নিজের ব্যাপারে এ চিন্তা করছে না যে, আমি কোন দলের অন্তর্ভুক্ত হব। জান্নাতিদের সাথি হব, নাকি জাহান্নামের গহবরে যাব।

কেয়ামতের দিন এবং সফলতার মাপকাঠি

কেয়ামতের দিনকে আল্লাহ তা'আলা يوم التغابن বা ক্ষতির দিন, হার-জিতের দিন বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ

'সমবেত হওয়ার দিনে তোমাদের সমবেত করা হবে। সেটি হচ্ছে হার-জিতের দিন, ক্ষতির দিন।'[১৬৩]

জীবনের খেলায় হয় তুমি জিতবে, নাহয় হারবে।

সুতরাং এরকম দিনের প্রতি আমরা চিন্তাশীল হওয়া চাই। নিয়ম হলো নিজের ব্যাপারে চিন্তাশীল হওয়া আর অন্যের ব্যাপারে ভালো ধারণা রাখা। যেব্যক্তি নিজের ব্যাপারে চিন্তাশীল হবে এবং অন্যের ব্যাপারে ভালো ধারণা রাখবে, সে কামিয়াব হবে।

এই পৃথিবীতে পুণ্যবান ও অসৎ উভয়ের ওপর এক ধরনের অবস্থার প্রাচুর্য সৃষ্টি হয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। একজনের

---

১৬৩. সূরা তাগাবুন : আয়াত ৯

ঈমান আছে, আরেকজনের ঈমান নেই। যেমন– আখ ও বাঁশ দেখতে একই রকম; কিন্তু বাঁশের ভেতর থাকে শূন্য আর আখের ভেতরে থাকে মধু। তেমনিভাবে নাফরমান ও অনুগত্য বান্দা উভয়ের মধ্যে একই প্রকার অবস্থার সৃষ্টি হয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য থাকে। নাফরমান বান্দাকে আল্লাহ নেয়ামত দিয়ে পরে তাকে গ্রেফতার করেন আর আনুগত বান্দাকে মহা পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। তাদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য নেমে আসে। আল্লাহ বলেন–

حَتّٰٓى اِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا

'এমনকি যখন পয়গম্বররা নিরাশ হয়ে যেত এবং এমন ধারণা করত যে, তাদের অনুমান বুঝি মিথ্যায় পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন তাদের নিকট আমার সাহায্য পৌঁছে।'[১৬৪]

সুতরাং নাফরমানদের আল্লাহ প্রথমে নেয়ামত দেন। তারপর তাদের গ্রেফতার করেন। তাদের প্রহারের ক্ষেত্র বানান। আর অনুগত বান্দাকে প্রথমে শ্রম-সাধনা করিয়ে পরিশেষে তাদের সাহায্য করেন।

দ্বিতীয় পার্থক্য

পাপিষ্ঠ ও পুণ্যবান উভয়ের ওপর বিপদাপদ আসে। কিন্তু পাপিষ্ঠর ওপর বিপদ আসার রূপ হলো, কারও উদরে ছুরি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে আর অধিক রক্তপাতের দরুন তার মৃত্যু এসে গেছে। আর পুণ্যবানদের দৃষ্টান্ত হলো, কারও গায়ে ফোঁড়া হলো আর বিজ্ঞ ডাক্তার ছুরি দিয়ে সেটা অপারেশন করল। ফলে ফোঁড়া থেকে সে নিরাময় পেল। দেখুন, উভয়ের দেহেই তো ছুরি দ্বারা আঘাত করা হয়েছে। কিন্তু এতে একজনের মৃত্যু হয়েছে, আরেকজন কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়েছে। বাহ্যত দেখতে একই রকম; কিন্তু মূলত অনেক পার্থক্য রয়েছে।

নাফরমান ব্যক্তি রিযিক পায়; কিন্তু তার রিযিকের দৃষ্টান্ত হলো, কেউ ইঁদুর শিকার করার জন্য খাঁচার মধ্যে রুটির টুকরা ঝুলিয়ে রাখল। এবার ইঁদুর মনে করল, খুব সুন্দর রুটির টুকরা রাখা হয়েছে। সে একথা অনুভব করতে পারছে না যে, এই রুটি খাওয়ার পরিণামে আমার ঘাড় পাকড়াও করা হবে। আমার প্রাণ শেষ হয়ে যাবে। তেমনিভাবে নাফরমানরাও রিযিক পাচ্ছে।

---

১৬৪. সূরা ইউসুফ : আয়াত ১১০

তাতে তার এই অনুভূতি হচ্ছে না যে, এই রিযিক আমার প্রাণের ঘাতক হচ্ছে। তার প্রাণের জন্য বিপদ হচ্ছে। পক্ষান্তরে অনুগত বান্দাদের আল্লাহ রিযিক দিয়ে থাকেন। যেমন– কেউ ঘি ও চিনিমিশ্রিত রুটির গুঁড়ো দিয়ে তোতা পাখিকে কথা বলায়। সেই তোতা কখনো সালাম করে, কখনো আল্লাহ শব্দ উচ্চারণ করে। এই যে তোতা ঘিমিশ্রিত খাবার পেল, এটা তার পুরস্কার। তেমনিভাবে পুণ্যবানদের আহার্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার। অপর দিকে নাফরমানদের আহার্য হচ্ছে তাদের প্রাণনাশক মেডিসিন। তাই নাফরমানদের যে আহার্য দেওয়া হয়, সেগুলোর নাম আল্লাহ তা'আলা فتح ابواب রেখেছেন। অর্থাৎ– দরজাসমূহ (শাস্তির) খোলা।

ছাত্রদের জন্য সূক্ষ্ম বিষয়

নাফরমানদের আল্লাহ তা'আলা যে-সমস্ত নেয়ামত দিয়ে থাকেন, সেগুলোর নাম রেখেছেন فتح ابواب বা দরজা খুলে দেওয়া। আল্লাহ বলেন–

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ

'তারপর তারা যখন সেই উপদেশ ভুলে গেল, যা তাদের দেওয়া হয়েছিল। তখন আমি তাদের সামনে সবকিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম। পরিশেষে যখন তাদের প্রদত্ত বিষয়াদির জন্যে তারা খুব গর্বিত হয়ে পড়ল, তখন আমি আকস্মিক তাদের পাকড়াও করলাম। তখন তারা নিরাশ হয়ে গেল।'[১৬৫]

সবকিছুর দ্বার খুলে দিলেন কেন? যাতে তারা পূর্ণরূপে গর্ব করতে থাকে। তারপর সেই গর্বিত অবস্থায় তাদের পাকড়াও করা হয়।

পক্ষান্তরে অনুগত্য বান্দার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

'অবশ্যই আমি খুলে দেই তাদের জন্য আসমান ও জমিনের বরকতের দরজা।'[১৬৬]

সুতরাং এদের জন্য খোলার রূপরেখা হয় বরকত ও কল্যাণ।

---

১৬৫. সূরা আন'আম : আয়াত ৪৪
১৬৬. সূরা আ'রাফ : আয়াত ৯৩

ঈমানদারদের কষ্ট পরীক্ষাস্বরূপ

দেখুন, ঈমানদারদেরও কষ্ট আসে। মসিবত আসে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে তাদের পরীক্ষা বলেছেন। এর মাধ্যমে আমি তাদের পরীক্ষা গ্রহণ করি। আমরা দুই টাকার পাতিল ক্রয় করলে টোকা দিয়ে সেটা যাচাই করি, ভালো আছে, নাকি ত্রুটিযুক্ত আছে। সুতরাং আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে মানুষকে গ্রহণ করেছেন। তাই তিনিও নিরীক্ষণ করেন। মুমিন ও পাপিষ্ঠের পরীক্ষার ভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। পাপিষ্ঠের ওপর এলে সেটা আল্লাহ তা'আলার শাস্তির রূপ ধারণ করে। আল্লাহ বলেন– আমি নাফরমানদের ওপর আমার শাস্তির উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করি। সেটা কেমন হয়? আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

'গুরু শাস্তির পূর্বে আমি অবশ্যই তাদের লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।"[১৬৭]

সুতরাং নাফরমানদের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা عذاب বা শাস্তি শব্দ ব্যবহার করেছেন আর ঈমানদারদের ক্ষেত্রে বলেন, আমি তাদের পরীক্ষা করব। আল্লাহ বলেন–

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

'অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের।[১৬৮]

অতএব, স্মরণ রাখবেন, আল্লাহ তা'আলার মোয়ামালা ভিন্ন। আমাদের উচিত আমরা নিজের আমল সংশোধিত করব এবং আল্লাহর অনুগত বান্দার অন্তর্ভুক্ত হতে সচেষ্ট হব।

অলসতা শয়তানের একটা ফাঁদ

যেব্যক্তি ইবাদাতে অলসতা করে, শয়তান তার ওপর একটু আছর করেই চলে যায়। কারণ, তার কাজ সিদ্ধি হয়ে গেছে। সে তাকে আল্লাহর যিকির

---

১৬৭. সূরা সাজদা : আয়াত ২১

১৬৮. সূরা বাকারা : আয়াত ১৫৫

থেকে উদাসীন বানিয়ে দিচ্ছে। পৃথিবীর সাধারণ নিয়ম হলো, শত্রুকে কাবু করতে পারলেই সর্বপ্রথম তার থেকে ওই জিনিসটা ছিনিয়ে নেওয়া হয়, যা দ্বারা সে পরবর্তী কালে আক্রমণ করতে পারে। তাই সৈনিকরা শত্রুকে গ্রেফতার করার সঙ্গে-সঙ্গে বলে Hands up তার হাতে কোনো ক্ষতিকারক বস্তু আছে কিনা দেখো, যাতে সে পুনরায় আক্রমণ করতে না পারে। মিস্টার ইবলিসও এরকমই করে থাকে। কারও ওপর কবজা করার সঙ্গে-সঙ্গে সে তার থেকে ধ্বংসাত্মক হাতিয়ার সরিয়ে নেয়। অর্থাৎ– আল্লাহ তা'আলার যিকিরের প্রতি উদাসীন করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ

'শয়তান তাদের ওপর বিজিত হয়েছে এবং আল্লাহর যিকির থেকে তাদের উদাসীন করে দিয়েছে।'[১৬৯]

সুতরাং শয়তানের সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে মানুষকে আল্লাহর যিকির থেকে উদাসীন করে দেওয়া। কারণ, সে ভাবে, যদি আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে, তাহলে তার ওপর আমার আক্রমণ চলবে না। সুতরাং মুমিন শয়তানের আক্রমণ থেকে বেঁচে থাকে। দেখুন, শয়তানের আক্রমণ হতে বাঁচার জন্য আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্টভাবে আমাদের একটি কথা বলে দিয়েছেন। এভাবে করলে (উদাসীনতার সাথে) শয়তান আসবে, আক্রমণ করবে, তোমাদের প্রতারণায় ফেলবে।

কতিপয় উদাহরণ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মানুষ খাবার খেতে বসে যদি বিসমিল্লাহ না বলে, তাহলে শয়তান তার খাবারে শরীক হয়ে যায়। দেখুন, শয়তানের ছিদ্র করার কী-কী পন্থা রয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলো সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করে দিয়েছেন। সুতরাং খাওয়ার পূর্বে দু'আ ও বিসমিল্লাহ পড়া অনেক জরুরি, যাতে আমরা শয়তানের প্রভাব থেকে বেঁচে যাই। যদি খাওয়ার সময় শয়তান তোমার সঙ্গে শরীক হয়ে হয়ে যায়, তাহলে সুস্পষ্ট কথা যে, তোমার সেই খাবার দ্বারা যে শক্তি সঞ্চয় হবে, তা তোমাকে পাপের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে। সুতরাং খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ বললে শয়তান সেই খাবারে শরীক হতে পারে না।

---

১৬৯. সূরা মুজাদালা : আয়াত ১৯

জনৈক সাহাবি খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠ করা ভুলে গিয়েছিলেন। মধ্যখানে স্মরণ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বিসমিল্লাহ পাঠ করেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসি দিলেন। কেউ জিজ্ঞাসা করল, হুজুর হাসছেন কেন? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার আহারে শয়তান শরীক ছিল। যখন সে বিসমিল্লাহ পাঠ করল, তখন শয়তান আহারকৃত সমস্ত খাবার উগলে ফেলে এখান থেকে পালিয়ে গেল। সুতরাং দেখুন, খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠ করা অনেক জরুরি।

হাদীছ শরীফে এসেছে, যেব্যক্তি রাতের বেলা বিসমিল্লাহ বলে দরজা বন্ধ করবে। ওই রাতে শয়তান তার ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না।

ব্যাপারটা কত সহজ; কিন্তু কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। যখনই কোনো পুরুষ বা মহিলা রাতে দরজা বন্ধ করবে, তখন যেন বিসমিল্লাহ বলে বন্ধ করে। তাহলে আল্লাহ তার ঘরে শয়তান প্রবেশ করতে বারণ করবেন। বর্তমানে অধিকাংশ গুনাই রাতের বেলায় হয়ে থাকে। সুতরাং যদি বিসমিল্লাহ বলে দরজা বন্ধ করা হয়, তাহলে শয়তান ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না। এতে অনেক গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে। তাহাজ্জুদ ও ফজরে উঠা সহজ হয়ে যাবে। কেননা, শয়তান ঘরে নেই। অন্যথায় সে পা টিপে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। শেষে কানে প্রস্রাব করে চলে যায়।

হাদীছের ভাষ্য হচ্ছে, যেব্যক্তি ফজরের নামাযের জন্য জাগ্রত হয় না, শয়তান তার কানে প্রস্রাব করে যায়। এর জন্য তার চোখ খোলে না। সুতরাং ভাই! শয়তানকে প্রতিহত করার কত উত্তম পদ্ধতি যে, মানুষ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত মোতাবেক বিসমিল্লাহ বলে ঘরের দরজা বন্ধ করবে আর শয়তানের আক্রমণ থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে।

শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচার হাতিয়ার

হাদীছ শরীফে এসেছে, যেব্যক্তি বাথরুমে প্রবেশ করার পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠ করবে, মাসনূন দু'আ পড়বে। শয়তান তার সঙ্গে বাথরুমে প্রবেশ করতে পারবে না। আর যদি তা পড়তে ভুলে যায়, তাহলে শয়তান তার সঙ্গে বাথরুমে প্রবেশ করে তার লজ্জাস্থানের সাথে খেলা করতে শুরু করে। তার লজ্জাস্থানের সঙ্গে কাতুকুতু করতে থাকে। তারপর তার যৌনাকাঙ্ক্ষা জাগতে থাকে। দেখুন! নবীজি একটা-একটা করে খুলে-খুলে বর্ণনা দিয়েছেন, যাতে আমরা শয়তানের আক্রমণ হতে রক্ষা পাই।

বিসমিল্লাহর বরকত

হাদীছ শরীফে এসেছে, মানুষ বিশেষ প্রয়োজনের সময় যখন তার দেহ থেকে কাপড় সরাবে, তখন যেন বিসমিল্লাহ পাঠ করে; তাহলে এই বিসমিল্লাহ পাঠ করার কারণে কোনো জিন বা শয়তান তার লজ্জাস্থান দেখতে পারবে না। এটা কত ছোট আমল; কিন্তু তার প্রভাব কত! অথচ কজন তার কাপড় খোলার সময় বিসমিল্লাহ পাঠ করে? অনেকেই ভুলে যায়। স্ত্রী লোক যদি গোসল করার সময় বিসমিল্লাহ পাঠ না করে, তাহলে তাকে শয়তান দেখে, জিন দেখে, এরপর কাঁদ কেন যে, আমার ওপর খারাপ আত্মা আছর করেছে? আমাকে ভূতে ধরেছে?

ভাই! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোট একটি আমল বলে দিয়েছেন। এত উপকার যে, তার ওপর শয়তান ও জিন কারও নজর লাগবে না। আমরা এ আমল ভুলেই গেছি। এমনকি যদি স্বামী-স্ত্রী একত্রিত হয়, সহবাস করে আর তখন কাপড় খোলার সময় বিসমিল্লাহ পাঠ করতে ভুলে যায়, তাহলে শয়তান তাদের কাজে শরীক হয়। ফলাফল কী হয়? ভবিষ্যৎ প্রজন্ম (সন্তানাদি) আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি করে। মাতাপিতার অবাধ্য হয়। কথা সংক্ষিপ্ত ও ছোট; কিন্তু প্রভাব কোথায় যাচ্ছে একটু ভেবে দেখুন।

শয়তানি প্রভাবসমূহের কারণ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন যে, স্বামী-স্ত্রীর মিলনের সময় তোমরা এ দু'আটি পাঠ কর নেবে। আল্লাহু আকবার! মুহাদ্দিছীনে কেরাম লিখেছেন, এ দু'আটি পাঠ করে সহবাসের ফলে যদি স্ত্রী গর্ভবতী হয়, তাহলে এ গর্ভকে আল্লাহ তা'আলা শয়তানের প্রভাব থেকে হেফাযত রাখেন। আজ অধিকাংশ মানুষকে দেখবেন, সন্তান তার অবাধ্য হচ্ছে। ভাই! সে অবাধ্য হবে না তো কী হবে? তুমি হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে কতটুকু মান্য করছ? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত পন্থা আমরা ছেড়ে দিচ্ছি। তোমার চাষকৃত ফসল আজ তোমার সামনে আসছে। যেখানে মানুষ আল্লাহ তা'আলার বিধান লঙ্ঘন করছে, সেখানেই শয়তান তার শাসন প্রতিষ্ঠা করছে।

فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ

'শয়তান তার সঙ্গী হয়ে যায়।'[১৭০]

---

১৭০. সূরা যুখরুফ : আয়াত ৩৬

শয়তান তার সঙ্গী হয়ে যায়। আর উদাসীনতার জীবন এমন হয় যে, একসময় আল্লাহ নিজেই তার ওপর শয়তানকে চাপিয়ে দেন। তার জীবন শয়তানের হাতে অর্পণ করে দেন।

আল্লাহ বলেন–

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ

'আমি তাদের ওপর তাদের সাথি নিযুক্ত করে দেই।'[১৭১]

فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ

'তারপর সঙ্গীরা তাদের অগ্র ও পশ্চাতের সকল আমল তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে দিয়েছে। তাদের ব্যাপারেও শাস্তির আদেশ বাস্তবায়িত হলো, যা বাস্তবায়িত হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী জিন ও মানুষের ব্যাপারে। নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত।'[১৭২]

সুতরাং মাত্র একটি বিসমিল্লাহর আমলের ওপর অভ্যস্ত হলে কত ক্ষেত্রে শয়তানের প্রভাব থেকে বেঁচে থাকা যায়!

সন্তানদের বিসমিল্লাহ পাঠে অভ্যস্ত করুন

শৈশবকালেই সন্তানদের বিসমিল্লাহ পাঠ করতে অভ্যস্ত করা আবশ্যক। সমস্ত ভালো কাজে বিসমিল্লাহ পাঠ করো। দরজা খুলতে, বন্ধ করতে বিসমিল্লাহ পড়ো। গাড়িতে চড়তে, খাবার খেতে এক কথায় প্রত্যেক কল্যাণকর কাজে বিসমিল্লাহ পাঠে অভ্যস্ত হয়ে যাও। এটি ছোট একটি আমল। কিন্তু তার প্রভাব খুবই শক্তিশালী। সুতরাং এতক্ষণের আলোচনায় আমাদের জানা হলো, আমরা পুণ্যের কাজকে আমাদের জীবনসাথি বানিয়ে নেব। তাহলে আমরা শয়তানের প্ররোচনা থেকে বেঁচে যাব। আর যদি নেক আমল না করতে পারি, তাহলে দুনিয়াতেও আমরা শয়তানের চক্রান্ত থেকে বাঁচতে পারব না। আর পরকালেও আল্লাহ তা'আলার শাস্তি ও জাহান্নাম থেকে বাঁচা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

---

১৭১. সূরা ফুসসিলাত : আয়াত ২৫

১৭২. সূরা হামীম আস-সাজদা : আয়াত ২৫

উজুর বরকত

বিভিন্ন আমল থেকে বঞ্চিত হওয়ার দরুণ কেয়ামতের দিন বিভিন্ন প্রকার শাস্তি হবে। তাফসীরে ইবনে কাছীরে এই হাদীছটি বর্ণনা করা হয়েছে যে, একদা নবীজি স্বপ্নযোগে জাহান্নাম দেখেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, আমি জাহান্নামে কতিপয় লোককে দেখেছি। তাদের শাস্তি হচ্ছে। উক্ত হাদীছ ইমাম তিরমিযী (রহ.) 'নাওয়াদিরে উসূল' কিতাবে বর্ণনা করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি এক লোককে দেখলাম, তাকে কবরে রাখা হচ্ছে আর আল্লাহর শাস্তি তার দিকে অগ্রসর হয়ে তাকে গ্রাস করে নেবে। এমন সময় তার উত্তমরূপের উজু তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করেছে। সুতরাং এতে প্রতীয়মান হয় যে, যেব্যক্তি উত্তমরূপে উজু করবে। অর্থাৎ– প্রকৃতির প্রয়োজন তথা পায়খানা প্রস্রাব শেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত মোতাবেক ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করবে অথবা টয়লেট পেপার ব্যবহার করবে, যা একমাত্র সেই উদ্দেশ্যেই প্রস্তুত করা হয়েছে। তারপর উজু করবে, তার উজু তাকে বিভিন্ন প্রকার আযাব থেকে রক্ষা করবে।

যিকিরের বরকত

পানি ব্যবহার করে শান্ত হয়ে গুরুত্বের সাথে উজু করবে। সেই পানি যাতে কাপড়ে না লাগে, সেদিকে সতর্ক থাকবে। সকল অঙ্গ ঘষে-ঘষে ধোবে। মাসনূন দু'আসমূহ পড়বে। এভাবে শান্ত ও সুষ্ঠুভাবে উজু করার অভ্যাস করলে ফলাফল কী হবে? সেই উজুর বদৌলতে আল্লাহ তাকে কবরের আযাব থেকে মুক্তি দেবেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এরপর দেখলাম, এক লোকের ওপর শয়তান আক্রমণ করতে চাচ্ছে। তখন ওই লোক আল্লাহ তা'আলার যিকির করছে। সঙ্গে-সঙ্গে শয়তান লজ্জাবনত মস্তকে তাকে ছেড়ে দূরে চলে যাচ্ছে। সুতরাং যিকিরের কারণে শয়তান মানুষের ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারে না, শয়তান তার অন্তরে প্ররোচনা দিতে পারে না। অতএব, ভেবে দেখুন, আল্লাহর যিকির ছোট আমল; কিন্তু এর দ্বারা শয়তানের সমস্ত চক্রান্ত থেকে বেঁচে থাকা যায়।

বিনয় ও নম্রতার সাথে নামায আদায় করার বরকত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি দেখলাম, কেয়ামতের দিন এক বান্দার প্রতি আল্লাহর আযাবের ফেরেশতা অগ্রসর হচ্ছে। তখন তার নামায তার উপকারে আসছে। নামায সেই আযাবের ফেরেশতাদের এদিকে আসতে বারণ করছে। সুতরাং যেব্যক্তি উত্তমরূপে বিনয় ও নম্রতার সাথে নামায আদায় করবে, সেই নামাযের দরুণ আল্লাহ তাকে আযাবের ফেরেশতাদের হাত থেকে রক্ষা করবেন।

খুশুখুজু বা বিনয় ও নম্রতা বলা হয় যে, বান্দা তার অন্তরে আল্লাহ তা'আলার মহাত্ম্য অনুধাবন করে শান্ত-সুষ্টভাবে নামায আদায় করবে। নামাযের সমস্ত রোকন ধীরস্থিরভাবে আদায় করবে।

রোযার বরকত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি দেখলাম, কেয়ামতের দিন এক বান্দা পিপাসায় কাতরাচ্ছে। এমন তৃষ্ণা যে, সহ্য করতে পারছে না। প্রাণ বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে। তখন তার রোযা তার এ কঠিন মুহূর্তে উপকারে আসছে। রোযার বিনিময়ে সে হাউজে কাওছারের পেয়ালা পাচ্ছে। সুবহানাল্লাহ!

বর্তমান যুগে মহিলাদের অসতর্কতা

বর্তমান যুগের মেয়েরা মেহেদি বর্জন করছে আর নখ পালিশ, আলতা আর লিপষ্টিকের প্রতি ধাবিত হচ্ছে। সাধারণ ঘরের মেয়েরা মাশাল্লাহ নখ লম্বা করারও অভ্যাস করছে। নখ যতটুকু লম্বা হয়, ততটুক ময়লা তাতে জমে থাকে। ময়লার স্থানে পানি পৌঁছে না। সুতরাং তার গোসল পরিশুদ্ধ হবে কীভাবে? সুতরাং ভাই! দেখতে ছোট-ছোট জিনিস; গোসল করলে চুল খুলে সঠিকভাবে ধুইছে না। আর গোসলের ফরজের ব্যাপারে তো খবরই থাকছে না।

একদা কোনো এক মহিলাকে কেউ জিজ্ঞাসা করল, আরে তোর তো বিয়ে হতে যাচ্ছে। গোসলের ফরজ জানিস? সে উত্তর দিল, হ্যাঁ বোন সে কথা তো আমার স্মরণই নেই। বলো তো গোসলের ফরজ কী-কী? সে বলল, শোন; বিয়ের পর গোসলের ফরজ হলো তিনটি। সাবান, তেল, তোয়ালে। এই তিনটি হলো গোসলের ফরজ। মাসাল্লাহ এম. এ পাস মেয়ে আর গোসলের ফরজ বলছে সাবান, তেল, তোয়ালে।

বর্তমান যুগে মেয়েরা দীন থেকে দূরে কেন?

একদা এক তরুণী আমাদের প্রতিষ্ঠানে এসে আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, আমার আম্মা-আব্বা আমার বিয়ের তারিখ নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং আমি গোসলের ফরজ জানতে এসেছি। আমাকে গোসলের ফরজ বলে দিন। আমার স্ত্রী তাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার বয়স তো প্রায় ২০/২২ হবে। তাহলে এত দিন কীভাবে গোসল করেছ? বলল, গোসল আবার কীভাবে করতে হয়। আমার স্ত্রী বলল, আরে! প্রতি মাসে ঋতুস্রাবের পর গোসল করতে হয়। সেগুলো কীভাবে করছ? বলল, সেগুলো তো আমি এমনিতেই করে নিয়েছি।

দেখুন, যে-মেয়ের ২০/২২ বছর বয়স হয়েছে। সাধারণত মহিলাদের ১৫ বছর বয়স থেকে তাদের ওপর নিয়মিত গোসল ফরজ হয়। আর এই ৬/৭ বছর পর্যন্ত মহিলা সেই গোসলের ফরজও জানতে পারেনি। সে ভাবছে, গোসল ফরজ হয় শুধু বিয়ের পর।

এক বৃদ্ধার অসতায়ত্ব

একদা এক হাজী সাহেব আমার নিকট এসে বললেন, হুজুর! গতরাত আমরা মিলন করেছি। আমি গোসল সেরে নামাযে চলে গেলাম। নামায পড়ে এসে দেখলাম, স্ত্রীও নামায পড়ছে। কিন্তু তার মধ্যে গোসলের কোনো আলামত পাচ্ছি না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি গোসল করনি? সে বলল, না অধিক ঠান্ডার কারণে আমি গোসল করিনি। তা ছাড়া আমরা তো স্বামী-স্ত্রী। সুতরাং আমাদের এ আমোদ-প্রমোদের পরে কি গোসল করা জরুরি? আমরা তো কোনো পাপ করিনি। অন্য কারও সঙ্গে এমন হলে সেটা জরুরি হতে পারে।

ভেবে দেখুন, বৃদ্ধ হয়ে গেছে, জীবন শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু কেমন মূর্খ জীবন কাটাচ্ছে। এখনো জানে না, স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পর গোসল জরুরি কি-না?

পবিত্রতার ফযিলত

পবিত্রতার মাসয়ালা শিখবেন, সহবাসের পর ফরজ গোসলের নিয়ম-কানুন শিখবেন। বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে নবীগণের মজলিসে বসার সৌভাগ্য দান করেছেন।

হজ ও ওমরার ফযিলত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি দেখলাম, কেয়ামতের ময়দানে এক লোক অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। এমন অন্ধকার যে, তার চতুর্দিক ছেয়ে আছে যে, সে কোনো রাস্তা-ই দেখছে না। সে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় তার হজ ও ওমরাহ সামনে এসে উপস্থিত হলো। এতে তার চারপাশ আলোকিত হয়ে গেছে। রাস্তা সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সে চলতে শুরু করল।

সুতরাং দেখুন, হজ ও ওমরার বদৌলতে আল্লাহ তাকে কেয়ামতের দিন সঠিক রাস্তা প্রদর্শন করবেন।

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার প্রতিদান

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কেয়ামতের দিন এক লোক অত্যন্ত অস্থির অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে না। আতঙ্ক, ভীতি ও নিঃসঙ্গতা তার ওপর ছেয়ে বসেছে। এতক্ষণে তার আত্মীয়তার সম্পর্ক এসে তার সামনে উপস্থিত হলো। এতে তার আতঙ্ক, ভীতিও নির্জনতার অবস্থার অবসান হলো।

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার অর্থ হচ্ছে, স্বজনদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা। উত্তম চরিত্রের সাথে তাদের সঙ্গে জীবন যাপন করা। ঈমানদারদের সঙ্গে ভদ্র আচরণ করা। এই আমল কেয়ামতের দিন তোমার নিঃসঙ্গ অবস্থার অবসান ঘটাবে।

সদকার প্রতিদান

তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি দেখলাম, এক লোক জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে গেছে। আগুনের স্ফুলিঙ্গ তাকে যেন গ্রাস করে নেবে। তার চেহারার নিকট পর্যন্ত এসে যায়। আগুনের তাপে চেহারার মধ্যেও তার প্রভাব পড়ে যায়। এমন সময় তার দান-সদকা তার সামনে উপস্থিত হলো। তার ও জাহান্নামের মাঝখানে সেগুলো আড়াল হয়ে তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিয়ে দেয়। সুতরাং আল্লাহর রাস্তায় দান করা, দীনের কাজে অর্থ ব্যয় করা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাত পাওয়ার কারণ হয়ে যায়। এটা জরুরি নয় যে, প্রত্যেক মানুষ লাখ-লাখ টাকা আল্লাহর রাস্তায় দান করতে হবে। কোনো-কোনো সময় আল্লাহর রাস্তায় এক

টাকা ব্যয় করা জান্নাতে যাওয়ার কারণ হয়ে যায়। সুতরাং আল্লাহর রাস্তায় দান জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার কারণ হয়।

আল্লাহর ভয়ের ওপর পুরস্কার

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারপর আমি দেখলাম, এক লোক জাহান্নামের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে। অতি শীঘ্রই যেন সে জাহান্নামের আপতিত হয়ে যাবে। এমন সময় তার আল্লাহর ভয় নামক আমলটি সামনে এসে উপস্থিত। সেই আমল তাকে বলল, আমি আল্লাহর নাফরমানি করব না। তাই সেই আমল এসে তাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারপর আমি দেখলাম, এক লোককে উল্টামুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। অসংখ্যা গুনাহ করেছিল। কিন্তু আল্লাহর ভয়ে একদিন তার চোখ দিয়ে একটু পানি বের হয়েছিল। সেই অশ্রু উপস্থিত হয়েছে এবং যেভাবে সাগরে নিমজ্জমান ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হয়, ঠিক তেমনিভাবে তার সেই আমল জাহান্নামে নিমজ্জমান ব্যক্তিকে সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

দরূদ শরীফের বরকত

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারপর আমি দেখলাম, একলোক পুলসিরাতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। জাহান্নামের ওপর পুলসিরাত স্থাপন করা হয়েছে। লোকটি তা পার হওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। বারবার পা সামনে বাড়াচ্ছে। কিন্তু তার পা পিছলে যাচ্ছে। সে ভয়ে কাঁপছে, কী জানি জাহান্নামে পতিত হয়ে যাই। এমন সময় দেখলাম, সে যে আমার ওপর দরূদ পাঠ করেছিল, সেই আমল তার সামনে উপস্থিত হয়ে বাতাসের গতিতে তাকে জাহান্নামের ওপরে স্থাপিত পুলসিরাত পার করিয়ে দিয়েছে।

সুতরাং দরূদ শরীফ পাঠ করা কেমন জরুরি? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এরপর আমি দেখলাম, একলোক জান্নাতের দরজা পর্যন্ত পৌঁছেছে। কিন্তু দরজা বন্ধ থাকায় সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে প্রবেশ করতে পারছে না। সে-ও অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। এমন সময় তার কালেমা পাঠ করার আমল উপস্থিত হয়ে জান্নাতের দরজা খুলে তাকে ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দিল।

উত্তম চরিত্রের ওপর পুরস্কার

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারপর আমি দেখলাম, একলোকের প্রতি আল্লাহ তা'আলা নারাজ রয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ও তার মধ্যে একটি পর্দা আড়াল হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ

'কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথাও বলবেন না, তাদের পরিশুদ্ধও করবেন না।'[১৭৩]

এমতাবস্থায় সে অত্যন্ত অস্থিরতা অনুভব করল। তখন তার উত্তম চরিত্র তার সামনে উপস্থিত হয়ে তার ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যকার পর্দা সরিয়ে দিল। সে আল্লাহর দর্শন লাভ করল।

সফলতার ভিত্তি আমলের ওপর

এতক্ষণের আলোচনায় প্রতিভাত হয় যে, সফলতা অর্জিত হয় আমলের দ্বারা। আমল ব্যতীত মুক্তি নেই, বিজয় নেই, সফলতা নেই। কাজেই আমরা যারা ঈমান গ্রহণ করেছি। আমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে একটি অঙ্গীকার করেছি। আমরা যে-ঈমানে মুফাস্সাল পাঠ করেছিলাম, তার দ্বারা আমরা আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে বিরাট প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়েছি। একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন, আমরা ঈমানে মুফাস্সালে কী ওয়াদা করেছি। আমরা সর্বপ্রথম ওয়াদা করেছি امنت بالله আমি আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি।

সফলতার ভিত্তি

আমি আল্লাহর ওপর ঈমান আনলাম। ঈমান আনয়নের মর্ম কী? ঈমানের মর্ম হচ্ছে, হে আল্লাহ! প্রকৃত কর্তা আপনার সত্তা। এই পৃথিবী বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে চলে। আর তুমি সমস্ত উপকরণের মূল। এ পৃথিবীতে যা কিছু হচ্ছে, আপনার ইশারায় হচ্ছে। আমাদের কোনো বস্তুর আশা নেই, কোনো জিনিসের প্রয়োজন নেই। আপনাকে সন্তুষ্ট করা আমাদের কাম্য। উপকরণ ছাড়া আল্লাহ তা'আলা সবকিছু করতে পারেন। কোনো বস্তু আল্লাহ তা'আলাকে ছাড়া কিছুই করতে পারে না।

---

১৭৩. সূরা বাকারা : আয়াত ৭৪

উপকার ও ক্ষতির মালিক কে?

উপরিউক্ত বিষয়টি আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর ওপর বিকাশিত করেন। আল্লাহ তাঁর দুটি মুজেযা বা অলৌকিক বিষয় দান করেন।

প্রথম মুজেযা : হাতের লাঠি জমিনে রাখলেন। তা বিরাট অজগর হয়ে গেল। পুনরায় যখন সাপকে ধররেন সেটা লাঠিতে পরিণত হয়ে গেল। এখানে আল্লাহ তা'আলা বিষয়টি স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেন, হে আমার প্রিয় বান্দা মূসা! তুমি বলছ, এটা তোমার লাঠি। এটা দিয়ে তুমি অনেক কাজ কর। পবিত্র কুরআন এ সম্পর্কে বলছে–

قَالَ هِيَ عَصَايَ ۖ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ

'আমি তার ওপর ভর করি। সেটা দ্বারা আমি আমার বকরিগুলোকে গাছের পাতা ছিড়ে দিই। এছাড়া এর দ্বারা আমার আরও অনেক উপকার হয়।'[১৭৪]

সুতরাং তুমি যে জিনিসকে নিজের উপকারের বস্তু মনে করছ, যখন তুমি তাকে আমার নির্দেশে জমিনে রাখলে, তখন সেটা এমন ক্ষতিকর বস্তু হয়ে গেল, যা দেখে তুমি পালিয়ে যাচ্ছ। তারপর যাকে তুমি ক্ষতিকর ভেবে পলায়ন করছিলে, আমার নির্দেশে যখন তুমি তাকে পুনরায় ধরলে, তখন সেটা আবার তোমার উপকারী বস্তু হয়ে গেল। সুতরাং এতে প্রমাণিত হয়, উপকার ও ক্ষতি বস্তুর কোনো কৃতিত্ব নয়। তা আমার নির্দেশেই হয়ে থাকে। আল্লাহ চাইলে দুধকে বান্দার জন্য নিরাময় বানিয়ে দেন। তা পান করে মানুষ সুস্থতা লাভ করে। তার স্বাস্থ্যের উপকার হয়। আর আল্লাহ চাইলে এই দুধই মানুষের ক্ষতির কারণ হয়। তা পান করলে ডায়রিয়া হয়ে যায়। একই দুধ মানুষের জীবনের উপকরণ, একই দুধ তার মরণের কারণ। এই দুধের মধ্যে জীবনের প্রভাব কে দিয়েছেন? মহাশক্তিধর পালনকর্তা।

মুমিনের দৃষ্টি

মুমিনের দৃষ্টি সর্বদা আল্লাহ তা'আলার প্রতি থাকে। সে আল্লাহর ওপর আশা রাখে। বান্দার দানের প্রতি অভিলাষী হয় না। বর্তমানে আমাদের বিশ্বাস কী আল্লাহ তা'আলার ওপর, নাকি আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের কারখানা আমাদের লালন করছে? আমাদের অফিস, আমাদের

---

১৭৪. সূরা তাহা : আয়াত ১৮

ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান আমাদের লালনপালন করছে? আমাদের চাষাবাদ ও উৎপাদিত শষ্য আমাদের আহার্য দিচ্ছে? আমরা আসবাবপত্রের প্রতি তাকিয়ে আছি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, কেউ তোমাদের পালন করছে না। একমাত্র আমিই তোমাদের প্রতিপালন করছি। বর্তমানে আল্লাহ তা'আলার প্রতি আমাদের দৃষ্টি নেই। বান্দার যদি আল্লাহর প্রতি দৃষ্টি থাকে, তাহলে সে হারামের প্রতি হাত বাড়াবে কেন? সে জানে, আল্লাহই যদি আমাকে দান করেন, তাহলে তিনি অবশ্যই আমাকে হালাল বস্তু দেবেন। বৈধ পন্থায় দান করবেন। সে কাউকে ধোঁকা দেবে না, ঘুষ নেবে না, মিথ্যা বলবে না। আমানতে আত্মসাৎ করবে না। সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, তার অন্তরে এই বিশ্বাস থাকবে যে, আমার মালিক আমাকে অবশ্যই রিযিক দান করেন। এ-বিষয়টা আল্লাহ হযরত মূসা (আ.)-এর ওপর বিকশিত করেছেন।

দার্শনিক সূক্ষ্মতা

আল্লাহ হযরত মূসা (আ.)কে দুটি মুজেযা দান করেছেন। একটি ছিল লাঠি থেকে সাপ হয়ে যাওয়া। একে অধিকাংশ সময় এভাবে বলা হয় যে, লাঠি সাপ হয়ে গেছে। তারপর সাপ লাঠি হয়ে গেছে। বিষয়টাও সহজে অনুধাবন হয়ে যায়। আল্লাহ আরেকটি বিষয় বলেছেন, তোমার হাত বগলের নিচে ঢুকিয়ে বের করো, তা জ্যোতির্ময় হয়ে যাবে। তা থেকে আলো বিকশিত হতে থাকবে। এই জ্যোতির্ময় হওয়ার মর্ম কী? এর মর্ম হচ্ছে, হে মূসা! আমি কোনো-কোনো সময় বস্তুর আকৃতি পরিবর্তন করে দিই। ছড়িকে সাপে পরিণত করি আর সাপকে ছড়িতে পরিণত করি। আবার কোনো-কোনো সময় বস্তুর বৈশিষ্ট্য পাল্টিয়ে দিই। এটা তোমার হাত। একে যখন তুমি তোমার বগলে রেখে কিছুক্ষণ পর বের করলে, তখন তাকে জ্যোতির্ময় করে দিলাম। তার বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করে দিলাম। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা দুটি বিষয়ই হযরত মূসা (আ.)-এর ওপর প্রকাশ করে দিলেন।

বিশ্বাসের বরবাদি

আল্লাহ তা'আলার প্রতি মুমিনের পূর্ণ বিশ্বাস হলো, আল্লাহ আমার সঙ্গে উত্তম আচরণ করবেন। আচ্ছা বলুন তো, আল্লাহর সঙ্গে যার সাক্ষাতের পূর্ণ বিশ্বাস আছে, সে কি কোনো কিছু চাওয়ার জন্য কারও কবরে যাবে? সে মাজারে গিয়ে প্রার্থনা করবে? সে তাজিব-কবচ ও ঝাড়-ফুঁকের পেছনে ঘুরবে

যে, হুজুর! এ-কাজটা আমার হতে যাচ্ছিল। কে জানি জাদু-টোনা করে ফেলেছে। নাউযুবিল্লাহ! কত বড় কুফরি কথা। মনে হয় যেন তারা ছোট-ছোট খোদা হয়ে গেছে। অমুক আমেল আমার অমুক কাজটা ফিরিয়ে রেখেছে। একজন আমেলের কী ক্ষমতা আছে যে, মানুষের রিযিক বন্ধ করে রাখবে? আল্লাহ বলেন–

وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ

'তোমাদের রিযিক আকাশে।'[১৭৫]

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢١﴾

'যা কিছু রয়েছে, সবকিছুর কোষাগার আমার নিকট। আমি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে তা অবতরণ করিয়ে থাকি।'[১৭৬]

সুতরাং রিযিক তো আল্লাহ তা'আলা অবতরণ করেন। আল্লাহ বলেন–

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ

'আমি তার জীবনোপায়কে বণ্টন করে দিয়েছি।'

আর আমরা কী মনে করি? হুজুর! মনে হচ্ছে, কেউ কোনো কিছু করে ফেলেছে। এটা একেবারে শিরকের নিকটতম কথা। এমন ধারণাও কোনোদিন করবেন না। কেউ কাউকে বান মারতে পারে না। এ অধিকার একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। সুতরাং সাধারণ মানুষের পেছনে যাওয়ার দরকার কী? এটা ঈমানের বরবাদি।

অবাধ্য আত্মা

তাবিজ-কবচের পেছনে দৌড়ানোর প্রয়োজন কী? নিজের আমলের প্রতি তো গুরুত্ব দিচ্ছ না। বলছ, জনাব! শত্রুরা আমাকে খুব হয়রান করছে। আমার কতিপ্রয় বন্ধুকে আমি বলেছি, তোমার শত্রুরা তোমাকে পেরেশান করছে না। তোমার নিজের খারাপ আত্মা তোমাকে অস্থিরতায় নিক্ষেপ করছে। এদিকে ভ্রূক্ষেপও করছ না যে, আমার অবাধ্য আত্মা আমাকে অশান্তিতে নিপাতিত করছে।

---

১৭৫. সূরা যারিয়াত : আয়াত ২২

১৭৬. সূরা বাকারা : আয়াত ৭৪

সুতরাং ভাই! আমরা যে امنت باللہ বলেছিলাম, এর দ্বারা আমাদের সমস্ত আশা আমরা আল্লাহ তা'আলার ওপর ন্যস্ত করেছিলাম। আমরা যা পাব তা কার থেকে পাব? আল্লাহর কাছ থেকে পাব। এবার চিন্তা করুন, আপনার আশা কার প্রতি তাকিয়ে আছে? তাই কোনো কবি বলেন–

بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے ناامیدی

مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟

দেবতা থেকে আশা আর খোদা থেকে নিরাশা।
তাহলে বলো, তুমি আর কাফেরদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

সুতরাং আমরা যখন امنت باللہ বলেছিলাম, তখন যেন আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদা করেছিলাম, হে আমার মালিক! আজকের পর থেকে আমরা সকল কাজের প্রকৃত কর্তা আপনাকেই মনে করব। তিনি যা চান তা-ই করার ক্ষমতা রাখেন।

হে আল্লাহ! আপনার মাহাত্ম্য যে, আপনি যা চান তা-ই করব। আমরা আপনার প্রতি প্রত্যাবর্তন করব।

আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়ার ফলাফল

যারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি ধাবিত হয়, তার অস্থিরতার মধ্যে আল্লাহ রহমত নাযিল করেন। শিশুরা তো আমাদের থেকে উত্তম। শিশুরা তার অধিকার আদায়ের জন্য মায়ের পেছনে লেগে থাকে। মা বলে, আমি খুব ব্যস্ত; তুই আমাকে বিরক্ত করিস না। অনেক সময় মা রাগান্বিত হয়ে তাকে থাপ্পড় মারে। এরপরও সে মায়ের পিছ ছাড়ে না। সুযোগ পেলে মায়ের বুক জড়িয়ে ধরে। আফসোস! যদি আমরা ওই শিশুদের মতো হতাম, বিপদাপদে আক্রান্ত হয়ে যদি আমাদের মালিকের দরবার ছেড়ে পলায়ন না করতাম! হে আল্লাহ! আমরা তোমাদের দরজা ছাড়ব না। অথচ আমাদের থেকে নামায ছুটে যায়। নামায পড়লেও মসজিদে যাচ্ছি না। জিজ্ঞাসা করলে বলে, অবস্থা বেশি ভালো নয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের ঝামেলাটা সেরে নিই; তারপর মসজিদে আসব। আল্লাহ মাফ করুন। ব্যবসা-বাণিজ্য ভালো হচ্ছে না; তাই সর্বপ্রথম যে দরজা ছাড়লাম, তা হলো মহান আল্লাহর দরজা। নিজের ঘরের দরজা তো ছাড়ছেন না। সেখানে তো প্রতিদিন যাচ্ছেন। শ্বশুর বাড়িতেও ঠিকমতো যাচ্ছেন। ছাড়ছেন কী? মহামহিম পালন কর্তার দরজা।

মানুষের আশ্চর্য কথা!

মানুষের আশ্চর্য আচরণ হলো, চাওয়ার জন্য হাত পাতে মানুষের নিকট। কিন্তু যখন সেখান থেকে নিরাশ হয়, তখন আল্লাহ তা'আলার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। কেমন আশ্চর্য ব্যাপার! ভাই! আল্লাহর দরবারে হাত বাড়াও; তার পরে দেখো ফলাফল কী হয়। উপকরণের ওপর যদি আমরা এক ছটাক মেহনত করি, তা হলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে এক মন মেহনত করা দরকার।

অদৃশ্য ব্যবস্থাপনার পেছনে আশ্রয়

এ-কারণে এই জগতের ভূগোল দিনে বদলায় না। এটা বদলায় রাতে। যখন হাত উঠানো হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা যুগের ভৌগোলিক অবস্থা পরিবর্তন করে দেন। তাকদীরের ফয়সালা বাস্তবায়িত করেন। সুতরাং امنت بالله এর দ্বারা আমরা সেই অঙ্গীকারই করেছিলাম।

তারপর আমরা বলেছিলাম وملئكته, তার ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান আনলাম। এর মর্ম কী? মর্ম হচ্ছে, ওই সময় তার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, দুনিয়ার বাহ্যিক ব্যবস্থাপনা কার্যকরি হোক বা না হোক। ঈমান ও আমলে আমি প্রতিষ্ঠিত হব। তারপর অদৃশ্য ব্যবস্থাপনা আমাকে তার আড়ালে আশ্রয় দেবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা সাহায্য না কর, তাহলে জেনে রাখো! আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মালিক এবং জিবরাঈল (আ.)-এরও মালিক এবং জিবরাঈল (আ.)-এর বন্ধু। আল্লাহ তা'আলা মানুষের সাহায্যের জন্য ফেরেশতা প্রেরণ করেন। সুতরাং যদি এই বিশ্বাস থাকে যে, আমি শরীয়তের বিধানের ওপর অটল থাকব। তাহলে দুনিয়ার বাহ্যিক ব্যবস্থপনা তোমার অনুকূলে হোক বা না হোক। আল্লাহ তা'আলার অদৃশ্য সাহায্য ও ব্যবস্থাপনা তোমার সাথি হবেই। আল্লাহ সাহাবায়ে কেরামকে তাঁর গায়েবি ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করেছেন। তাদের বিজয় দান করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

'বদর প্রান্তরে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন। অথচ তোমরা লাঞ্ছিত হতে যাচ্ছিলে।'[১৭৭]

---

১৭৭. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১২৩

আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন–

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ

'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অনেক স্থান হুনাইনের (যুদ্ধের) দিন তোমাদের সাহায্য করেছেন।'[১৭৮]

তারা দেখলেন, ফেরেশতারা অবতীর্ণ হচ্ছেন। তাই কবি বলেন,

فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو

اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی

বদরের সেই ঔজ্জ্বল্য তৈরি করে ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যের জন্য অবতরণ হচ্ছে, যার যোগসূত্র আজও রয়েছে।

আজও ফেরেশতা অবতরণ করেন যদি আমরা ঈমান গ্রহণ করে নেক আমলের ওপর অটল থাকতে পারি। বন্ধুগণ! এরপর আমরা বলেছিলাম, وكتبه তাঁর কিতাবের ওপর ঈমান আনলাম। এর অর্থ হে আল্লাহ! আমরা আপনার প্রভুত্বের জ্ঞানের ওপর ঈমান এনেছি। আমরা সেটা বিশ্বাস করেছি, যা আপনি পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন যে, এটা করো। এর মধ্যে কামিয়াবি রয়েছে। ওটা করো না। এর মধ্যে রয়েছে তোমাদের ধ্বংস। আল্লাহ তা'আলার বিধানের ওপর যেন আমাদের এমন বিশ্বাস হয়ে যায়।

সুন্নতের অনুসরণ

এরপর আমরা বলেছিলাম, ورسوله তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনলাম। এর মর্ম হলো, অন্তরে এর বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আমরা নবী করীম (সা.)-এর সুন্নতের অনুসরণ করব; তাহলে আমরা কৃতকার্য হব। আর যদি সুন্নতের বিরোধিতা করি, তাহলে আমাদের জীবনে ধ্বংস নেমে আসবে। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ

'যে রাসূলের অনুসরণ করল, প্রকৃত পক্ষে সে আল্লাহর অনুসরণ করল।'[১৭৯]

---

১৭৮. সূরা তাওবা : আয়াত ২৫

১৭৯. সূরা নিসা : আয়াত ৮০

সুতরাং নবীজির সুন্নতের গুরুত্ব অন্তরে বসাতে হবে। সুন্নতের ওপর আমল করলে আল্লাহর রহমত আমাদের জীবনসাথি হবে। والیوم الاخر এবং পরকালের ওপর। কেয়ামতের দিনের ওপর ঈমান আনলাম। এর মর্ম হচ্ছে, আমরা যদি পরকালের ওপর ঈমান আনয়ন করি, তাহলে কেয়ামতের দিন আমাদের নেক আমলের প্রতিদান পাব। পক্ষান্তরে যদি খারাপ কাজ করা হয়, তাহলে পরকালে আমাদের আপমানিত হতে পবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ

'কেয়ামতের দিন আল্লাহ রাসূলকে এবং যারা তার সঙ্গে ঈমান গ্রহণ করেছে, তাদের লজ্জিত করবেন না।[১৮০]

বর্তমানে তো আমরা দুজন মানুষের সামনে অপমানিত হওয়া সহ্য করতে পারি না। এমনকি স্বামী যদি তার স্ত্রীকে দুয়েকজনের সামনে শাসন কিংবা কটু কথা বলে, তাহলে সে সারাদিন কাঁদতে থাকে। আজ তুমি মানুষের সামনে আমাকে অপমানিত করলে? সুতরাং ভাই! একটু ভেবে দেখুন। কাল কেয়ামতের ময়াদানে যখন অসংখ্য মানুষের সামনে অপমানিত করা হবে, তখন আমাদের অবস্থা কী হবে?

এজন্য কোনো কবি বলেন–

تو غنی از ہر دو عالم من فقیر * روز محشر عذر ہائے من پزیر

گر تو می بینی حسابم ناگزیر * از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔

'হে আমার মালিক! আপনি দোজাহানের ধনী। আমি অধম! তাই কেয়ামতের দিন আমার ওজর কবুল করো। আর যদি আপনি এ সিদ্ধান্তই নেন যে, আমার হিসাব গ্রহণ করবেন। তাহলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমার হিসাব গোপন রাখুন। তাঁর সামনে আমাকে লজ্জিত করবেন না।'

বন্ধুগণ! কেয়ামতের দিন সম্মান ও অপমান কীভাবে পাওয়া যাবে? এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখার নামই হচ্ছে পরকালের ওপর ঈমান অনয়ন করা।

---

১৮০. সূরা তাহরীম : আয়াত ৮

তারপর আমরা বলেছিলাম–

وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى

'আমরা ঈমান আনলাম তাকদীরে ওপর।'

এর মর্ম হলো, হে বান্দা! তোমার সুখ-শান্তির অবস্থা আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে এবং দুঃখ কষ্টের অবস্থা ও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই আগমন করে। সুতরাং সুখের অবস্থায় উল্লসিত হবে না এবং দুঃখের সময়ও হীনবল হবে না । আল্লাহ তা'আলার সত্তার ওপর এমন বিশ্বাস থাকতে হবে।

তারপর আমরা বলেছিলাম–

وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

'আমরা ঈমান আনলাম মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার ওপর।'

এর মর্ম হলো, মৃত্যুর পর আমাদের হাশরের মাঠে উপস্থিত হতে হবে। সুতরাং যখন মৃত্যুর পর কেয়ামতের দিন বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর বিশ্বাস হবে, তখন ওই বান্দা পরকালের জন্য কিছু সঞ্চয় করবে। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। যদি তোমার এ বিশ্বাস হয় যে, এই পৃথিবীই আমার শেষ। এটাই আমার সম্বল, তাহলে সারাদিন এর পেছনেই লেগে থাকবে। আর যদি পরকালের প্রতিও কিছু চিন্তা থাকে, তাহলে সেই দিনের জন্যও কিছু কাজ করবে, যাতে আল্লাহ তাকে জান্নাতে ঘর দান করেন। সুতরাং আমরা যে এই কালেমা পাঠ করেছি, তার সমস্ত আমলের ওপর বান্দাকে বিশ্বাস রাখতে হবে। বান্দা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পুরস্কার পাবে। আল্লাহর রহমত তার জীবনের সাথি হবে। সাহাবায়ে কেরাম ঈমানের ওপর কেমন শ্রম দিয়েছেন। তাঁরা বলতেন–

تَعَلَّمْنَا الْاِيْمَانَ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْاٰنَ

'আমরা প্রথমে ঈমান শিক্ষা করেছি। তারপর কুরআন শিক্ষা করেছি।'

সুতরাং যেহেতু তাদের ঈমান কামেল হয়েছিল, তাই এ পৃথিবীতেও তারা সম্মানের জীবন যাপন করেছেন।

সায়্যেদুনা ওমর ফারুক (রহ.)-এর শাসন

একটু ভেবে দেখুন! হযরত ওমর (রাযি.) সমকালের শাসক ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন মর্যাদা দান করেছিলেন যে, জমিনে তার শাসন

চলত। দেখুন, আগুন, পানি, মাটি, বাতাস এ চারটি বস্তু দিয়ে আল্লাহ মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এ চারটি বস্তুর ওপরই তার শাসন কার্যকর করেছেন। এজন্যই একদিন জমিনে ভূমিকম্পন শুরু হলে হযরত ওমর (রাযি.) পা দ্বারা জমিনে আঘাত করে বললেন, হে জমিন! কাঁপছ কেন? ওমর কি তোমার ওপর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি? একথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে ভূমিকম্প থেমে গেল। তারপর একদা হযরত ওমর (রাযি.) দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছেন। সহসা বলে উঠলেন,

يَا سَارِيَةُ الْجَبَلَ

হে সারিয়া! পাহাড়ের পাদ দেশে যাও।

বাতাস তার এ নির্দেশ শত-শত মাইল দূর বহন করে মুসলিম সেনাপতি হযরত সারিয়া (রাযি.)-এর কানে পৌঁছিয়ে দেয়।

নীল দরিয়ার পানি বন্ধ হয়ে গেল। সামান্য পানিও উঠছে না। মানুষ ও পশু-পাখি পানির জন্য হাহাকার করছে। তিনি নীল দরিয়ার নিকট চিঠি পাঠালেন, হে নীল! তুমি যদি তোমার আপন ইচ্ছায় প্রবহমান হও, তাহলে তোমার পানি আমার প্রয়োজন নেই। আর যদি তুমি মহান স্রষ্টার আদেশে প্রবাহিত হও, তাহলে মুসলমানদের বাদশাহ তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছে, তুমি আল্লাহর হুকুমে প্রবহমান হয়ে যাও। চিঠি পেয়ে আল্লাহর ইচ্ছায় নীল দরিয়া প্রবাহিত হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত আর কোনোদিন নীল দরিয়ার পানি শুকায়নি। মদীনার হররা নামক অঞ্চল থেকে মাঝে-মাঝে আগুন নির্গত হতো, সেই আগুন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে জনসাধারণের বিরাট ক্ষতি হতো। হযরত ওমর (রাযি.)-এর শাসনামলে সেই আগুন প্রজ্বলিত হয়ে আশেপাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে। হযরত ওমর (রাযি.) হযরত দাহিয়াতুল কালবী (রহ.)কে পাঠালেন যাও। এ আগুন তার নিজ স্থানে ফিরিয়ে দিয়ে আস। হযরত দাহিয়াতুল কলবী (রহ.) সেখানে গিয়ে দু-রাকাত নফল নামায আদায় করেন। তারপর মানুষ যেভাবে কোনো কিছুর দ্বারা পশু-পাখি তাড়িয়ে দেয়, সেভাবে হযরত দাহিয়াতুল কলবী (রহ.) নিজের চাদর দ্বারা আগুনকে প্রতিহত করতে লাগলেন। পরিশেষে আগুন তার উৎপত্তি স্থলে ফিরে যায়। সুবহানাল্লাহ!

দেখুন, ঈমান তৈরি করার কারণে আগুন, পানি, মাটি, বাতাস, সব কিছুতে শাসন চলে। একে প্রকৃত বাদশাহি বলে।

তাই কবি বলেন,

ہم فقیروں سے دوستی کر لو

گر سکھا دیں گے بادشاہی کے

'আমরা ফকিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করব যদি বাদশাহি শেখায়।'

ফকিরের মধ্যে বাদশাহি

মানুষ যখন আল্লাহ তা'আলার প্রতি মনোনিবেশ করে এবং পুণ্যের কাজকে তার জীবনের সাথি বানায়, তখন আল্লাহ তার দরিদ্রতার মধ্যে শাহি রূপ দান করেন। এজন্যই সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযি.) নামে এক সাহাবি ছিলেন। তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে যাচ্ছেন। সামনে শত্রুদল। মাঝখানে আছে একটি নদী। তিনি আল্লাপাকের নাম নিয়ে ঘোড়াসহ নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সঙ্গে-সঙ্গে সকলেই নদীতে নেমে যান। আল্লাহর দয়ায় সবাই নিরাপদে নদী পার হয়ে যান। ওপারে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, নদীতে কারও কোনো কিছু পড়েছে কী? এক সাহাবি বললেন, আমার একটা কাঠের পেয়ালা পড়ে গেছে। তিনি নদীর পানিকে আদেশ করলেন, আমার সাথির কাঠের পেয়ালাটা ফিরিয়ে দাও। সঙ্গে-সঙ্গে নদীতে এক বিশাল ঢেউ উঠল। তার মাধ্যমে সাহাবির পেয়ালাটা ডাঙ্গায় এসে যায়। সুবহানাল্লাহ! তাই কোনো কবি বলেন–

لگاتا تھا تو ج تعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا

حکم دیتا تو دریا کو تو راستہ چھوڑ دیتا تھا

নারায়ে তাকবীরের আওয়াজ দিলেন। তাতে খায়বারের ঘাঁটি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। আদেশ করছেন; নদী তাঁদের রাস্তা ছেড়ে দিচ্ছে।

প্রভুর সঙ্গ

ঈমান তৈরি করতে পারলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের পৃথিবীতে এমন সফলতা দান করেন। এখানে ছাত্রদের জন্য একটি দার্শনিক সূক্ষ্মতা রয়েছে। বনী ইসরাইলও নদী পাড়ি দিয়েছিল এবং সাহাবায়ে কেরামের একটি জামাতও নদী পাড়ি দিয়েছিলেন। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। একটু মনের কানে শোনো।

প্রথম বিষয় হচ্ছে, হযরত মূসা (আ.) তাঁর সাথিদের নিয়ে লোহিত সাগরের কিনারে দাঁড়িয়ে আছেন। পেছনে ফেরাউন তার বাহিনী নিয়ে আসছে। তখন মূসা (আ.)-এর সঙ্গীরা বলল, আমরা ধরা পড়ে যাব। তখন বিশ্বাসপূর্ণ একটি আওয়াজ ধ্বনিত হলো–

إِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ

'আমার সঙ্গে আমার প্রভুর রয়েছেন।'[১৮১]

তিনি অবশ্যই পথ প্রদর্শন করবেন। দেখুন, হযরত মূসা (আ.) معي শব্দ ব্যবহার করেছেন। আমার সঙ্গে আমার মালিক রয়েছেন। সুতরাং জানা গেল, নবীগণের সাথে আল্লাহর সঙ্গ থাকে। ফলে আল্লাহ নদীর বুক দিয়ে রাস্তা তৈরি করে দিলেন। তা-ও একটি নয়। বারোটি রাস্তা হয়ে গেল। বারোটি দিয়ে বারো দল নদী পার হয়ে গেল।

উম্মতে মুহাম্মদীর বিশেষ পুরস্কার

এদিকে উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর আল্লাহ তা'আলার বিশেষ পুরস্কার দেখো! হিজরতের সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওর গুহায় আশ্রয় নেন। হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে, কী জানি কাফেররা আবার এসে পড়ে কিনা। এসে তারা নবীজিকে কষ্ট দেয় কিনা। মায়ের প্রতি যেমন ভালোবাসা থাকে, তার চেয়ে বেশি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য অস্থির হচ্ছেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর ভালোবাসা সবচেয়ে গভীর ছিল। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তার অস্থিরতাও বেশি ছিল। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে, তখন তিনি কী বলেছিলেন? পবিত্র কুরআন বলে, নবীজি বললেন,

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا

'তুমি চিন্তা করবে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সঙ্গে আছেন।'[১৮২]

---

১৮১. সূরা তাহরীম : আয়াত ৬২

১৮২. সূরা তাওবা : আয়াত ৪০

এখানে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)কেও অন্তর্ভুক্ত করলেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর সঙ্গ শুধু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নয় বরং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুণ্যবান উম্মতদের সঙ্গেও রয়েছে। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে معنا তথা 'আমাদের সঙ্গে' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এটিও কথা আর পূর্বেরটিও কথা।

দেখুন, হযরত ইউসুফ (আ.) স্বপ্ন দেখলেন। পিতাকে শোনালেন, আমি খাবে এগারোটা তারকা দেখেছি।

إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سٰجِدِيْنَ

'আমি এগারোটা তারকা ও চাঁদ-সুরুজ দেখেছি। সেগুলো আমাকে সেজদা করছে।'[১৮৩]

হযরত ইয়াকুব (আ.) স্বপ্নের ব্যাখ্যা বুঝে গেলেন। সন্তানকে বলছেন-

وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ

'এভাবে তোমার প্রভু তোমাকে মনোনীত করবেন।'[১৮৪]

এখানে তিনি ভবিষ্যৎসূচক শব্দ ব্যবহার করছেন।

দেখুন, যিনি বলছেন, তিনিও নবী। আর যিনি হবেন, তিনিও নবীই হবেন। তারপরও ভবিষ্যৎসূচক শব্দ ব্যবহার করেছেন। يَجْتَبِيْكَ তোমার প্রভু তোমাকে নিযুক্ত করবেন। কিন্তু যখন এই উম্মতের বিষয় এল, তখন আল্লাহ বর্তমান বা ভবিষ্যৎসূচক শব্দ ব্যবহার করেননি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

هُوَ اجْتَبٰكُمْ

'আল্লাহ তোমাদের মনোনীত করেছেন।'[১৮৫]

অতীতকালীন শব্দ ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তার জন্য তোমাদের চয়ন করেছেন। আল্লাহু আকবার! এ উম্মতকে কেমন বৈশিষ্ট্য দান করেছেন।

---

১৮৩. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৪
১৮৪. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৬
১৮৫. সূরা হজ : আয়াত ৭৮

এরপর দেখুন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণও নদী পার হয়েছেন এবং হযরত মূসা (আ.)ও নদী পার হয়েছিলেন। উভয়ের মধ্যে একটু পার্থক্য লক্ষ করুন। সেখানে নদী পার হওয়ার সময় তাদের নবী সাথে ছিলেন। তারা নবীর সঙ্গে নদী পার হয়েছে। আর এরা নবী ব্যতীত শুধু সাহাবিগণ পার হয়ে যাচ্ছেন। আরও দেখুন, এখানে সাহাবায়ে কেরাম শুধু নিজেই পার হননি, সঙ্গে তাদের ঘোড়াও পার করেছেন। আরও পার্থক্য দেখুন, হযরত মূসা (আ.)কে তার রূহানি শক্তি তুর পাহাড়ে নিয়ে গেলেন।

وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا

'যখন মূসা এল আমার সাক্ষাতের জন্য আমাদের নির্ধারিত স্থানে।'[১৮৬]

তুর পাহাড়। সেখানে হযরত মূসা (আ.)-এর আগমনের কথা বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে যখন আমাদের নবীর আলোচনা এল, তখন বলা হয়েছে–

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا

'পবিত্র সেই সত্তা, যিনি তাঁর প্রিয় বান্দাকে রাতের স্বল্প সময়ে ভ্রমণ করিয়েছেন। পৌঁছিয়ে দিয়েছেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত।'[১৮৭]

সেখানে বলা হয়েছে, তিনি এলেন আর এখানে বলা হচ্ছে, তাঁকে পৌঁছিয়ে দিলেন। এমনিই তো হয়ে থাকে যে, কোনো-কোনো মানুষ সাক্ষাৎ কতে চায়; তাকে ঠিকানা বলে দেওয়া হয়, ভাই! আপনি এই ঠিকানায় এসে যাবেন। পক্ষান্তরে কোনো প্রিয়জনকে সর্বপ্রথম বাড়িতে আনতে হলে তার হাতে ধরে সঙ্গে নিয়ে আসা হয়, চলো বন্ধু! আজ আমরা আমাদের বাড়িতে একসঙ্গে খাবার খাব। ওইদিকে শুধু রাস্তা বলে দেওয়া হয়েছে আর এদিকে প্রিয়জনের হাত ধরে বাড়িতে নিয়ে আসা হচ্ছে। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা সম্ভাষণ জানিয়েছেন হযরত জিবরাঈল (আ.)কে পাঠিয়ে।

হযরত মূসা (আ.) প্রার্থনা করলেন–

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ

'হে আল্লাহ! আমার বক্ষ খুলে দাও।'

---

১৮৬. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৪৩

১৮৭. সূরা ইসরা : আয়াত ১

পক্ষান্তরে নবীজির আলোচনায় আল্লাহ বলেন–

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

'আমি কি আপনার বক্ষ খুলে দেইনি।'[১৮৮]

আরও ভেবে দেখুন, ওইদিকে হযরত মূসা (আ.) তাঁর ভাই হারুন (আ.)কে জাতির দেখাশোনার জন্য রেখে গেলেন। তার সম্প্রদায় হারুন (আ.)-এর কথার অবাধ্য হয়ে গেল। তখন হযরত হারুন (আ.) ভয় করছেন, আমি ফেঁসে যাব কি? আমাকে দোষারোপ করা হবে না তো? হযরত মূসা (আ.) এসে হযরত হারুন (আ.)কে দমক দিচ্ছেন, তুমি তাদের একাজ হতে বারণ করনি কেন? এতে আতঙ্কিত হয়ে হারুন (আ.) জবাব দিলেন–

يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَأْسِيْ

'হে আমার মায়ের ছেলে! আপনি আমার দাড়ি ও মস্তক ধরবেন না।'[১৮৯]

সুতরাং এতটুকু বলতে হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেমন উজির বা প্রতিনিধি হযরত আবুবকর (রহ.)কে নিযুক্ত করেছিলেন। দীনের ওপর তার অটলতার রূপরেখা কেমন ছিল? যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুমূর্ষু অবস্থায় হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রহ.)কে সেনাপতি নিযুক্ত করে কোনো কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য প্রেরণ করতে প্রস্তুত করলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা একেবারে দুর্বল হয়ে গেছে। উসামার স্ত্রী তাকে সংবাদ পাঠালেন, জিহাদে যেতে তড়িঘড়ি করো না। হতে পারে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবেন। এতক্ষণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহজগত ত্যাগ করেন। সৈন্যদল বের হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। হযরত আবুবকর (রহ.) ও সেই দলে শরীক ছিলেন। এখন তাদের জিহাদে প্রেরণ করা মুশকিল। কারণ, এদিকে রোমের বাদশাহ হিরাক্লিয়াস দুই লাখ সৈন নিয়ে মদীনায় আক্রমণের জন্য অগ্রসর হচ্ছে। এখন সাহাবায়ে কেরাম হযরত আবুবকর (রহ.)কে পরামর্শ দিলেন, এ মুহূর্তে অন্য দিকে মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করবেন না। আর পাঠাতে হলেও স্বল্প বয়সি উসামাকে সেনাপতির

---

১৮৮. সূরা ইনশিরাহ : আয়াত ১

১৮৯. সূরা ত্বহা : আয়াত ৯৪

দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে বুদ্ধিমান বয়স্ক কোনো সাহাবিকে সেনাপতি নিযুক্ত করে প্রেরণ করুন। হযরত ওমর (রাযি.) এসে বললেন, আমীরুল মুমিনীন! এ মুহূর্তে অন্য দিকে সেনাবাহিনী প্রেরণ করলে আমার ভয় হচ্ছে, মদীনা অভিমুখী রোমসম্রাট হিরাক্লিয়াসের বাহিনী আমাদের নারী ও শিশুদের ওপর আক্রমণ করবে। তার কথা শুনে হযরত আবুবকর (রাযি.) তার বুকে হাত মেরে বললেন, হে ওমর!

أَجَبَّارٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اَخَوَّارٌ فِي الْاِسْلَامِ

'তুমি কি বর্বর যুগে বীরপুরুষ ছিলে আর ইসলামের যুগে এসে কাপুরুষ হয়ে গেলে? তারপর বললেন,

اَيُنْقَصُ الدِّيْنُ وَاَنَا حَيٌّ .

'এটা কীভাবে সম্ভব যে, দীনের ক্ষতি সাধন করা হবে; অথচ আমি জীবিত আছি!'

হে ওমর! রোমান সৈনিকদের বিরুদ্ধে যদি আমার একা যুদ্ধ করতে হয়, তবে আমি একাই যুদ্ধ করব; তবু আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করব? তিনি আরও বলেন, যদি আমার এ-বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস হয় যে, জঙ্গলের হিংস্র প্রাণীরা এসে মদীনার নারী ও শিশুদের ওপর আক্রমণ করছে। তাদের লাশ টেনেহ্যাঁচড়ে জঙ্গলে নিয়ে যাচ্ছে, তবে আমি তা-ও মেনে নেব; তবু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজহাতে প্রস্তুতকৃত সৈন্যবাহিনীকে আমি বারণ করবে না। আল্লাহর রাস্তায় তাদের প্রেরণ করবই।

সাহাবায়ে কেরাম বলেন, হযরত আবুবকর (রহ.)-এর দৃঢ়তা হুবহু হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃঢ়তার অনুরূপ ছিল। হযরত আবুবকর (রাযি.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যের পূর্ণ হক আদায় করেছেন। পক্ষান্তরে হযরত মূসা (আ.)কে যখন নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, আপনি আপনার সম্প্রদায়কে নিয়ে স্বদেশে যান; আপনাদের বিজয় হবে, তখন বনী ইসরাইল হযরত মূসা (আ.)কে বলেছিলেন–

فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ

'হে নবী! আপনি আর আপনার প্রভু সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে রইলাম।'[১৯০]

---

১৯০. সূরা মায়েদা : আয়াত ২৪

অথচ যখন আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা এল, তখন কী হলো? বদর যুদ্ধের সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের নিয়ে পরামর্শ করলেন, সামনে লোহার প্রাচীরের ন্যায় শত্রুবাহিনী অবস্থান নিয়ে আছে। সুতরাং এক্ষেত্রে কী করা যায়? তখন হযরত সা'দ (রাযি.) বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আপনি আমাদের সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়তে আদেশ করেন, তাহলে আমরা সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমরা বনী ইসরাইলদের মতো একথা বলব না, আপনি আর আপনার প্রভু সেখানে গিয়ে যুদ্ধ করুন; আমরা এখানে বসে থাকব। আমরা আপনার সঙ্গ ছাড়ব না। আমরা আপনার জন্য আমাদের প্রাণ উৎসর্গ করে দিতে প্রস্তুত রয়েছি।

নবীজির প্রস্তুতকৃত জামাত

দেখুন, আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেমন ঈমানদার ও সুদৃঢ় বাহিনী দান করেছিলেন, যেমনভাবে ছাত্রদের দক্ষতার দরুণ ওস্তাদ বিজ্ঞতার চূড়ায় পৌঁছে যান। তেমনিভাবে সাহাবায়ে কেরামের দক্ষতার দরুণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং আমরা উত্তম জীবন গড়তে হলে আমাদের নিজ সত্তার ওপর আমাদের শ্রম-সাধনা করতে হবে। আমরা মেহনত কীভাবে করব? যখন আমরা আমলকে আমাদের জীবনসাথি বানিয়ে নেব। সুতরাং ভাই! আমাদের আজকের আলোচনার সারসংক্ষেপ হলো, আমরা ঈমান গ্রহণ করেছি। এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। এবার আমাদের আমলের প্রয়োজন। আমাদের জীবনকে আমরা আমল দ্বারা সজ্জিত করব। মানুষ যেভাবে হারানো বস্তুর সন্ধান করে, সেরকম আমরা পুণ্যের কাজ সন্ধান করব এবং তার ওপর আমল করব।

তিনটি মূল্যবান কথা

আমাদের মনীষীগণ বলেছেন, তিনটি কথা লোহার ন্যায় শক্ত। একটু মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন।

(১) যেব্যক্তি পরকালের জন্য আমল করে, তার পার্থিব কাজের জন্য আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলা তার পার্থিব কাজের জিম্মাদার হয়ে যাবেন। তোমরা নিজের জন্যই পার্থিব কাজ করছ আর আল্লাহ তা'আলা

বলেছেন, আমি তোমার জীবনের পার্থিব সকল কাজের জামিন হয়ে গেলাম। দুনিয়ার সমস্ত কাজে আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবেন।

(২) যেব্যক্তি তার নির্জনতার অবস্থা পরিশুদ্ধ করবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর পার্থিব সকল কাজ পরিশুদ্ধ করবেন।

(৩) যেব্যক্তি তার ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যকার সম্পর্ক উত্তম করবে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টজীবের অন্তরে তাঁর ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন এবং গবাদি বা হিংস্র প্রাণীকেও আল্লাহ তা'আলা শোভনীয় ও তার সাথি বানিয়ে দেন।

শ্রমের মাঠ

এতক্ষণের আলোচনায় বোঝা যায়, আমাদের বাতেন আমরা সংশোধিত করা চাই। তাহলে আল্লাহ আমাদের বাহ্যিক সংশোধন করে দেবেন। আমরা যদি আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক করি, তাহলে মাখলুকের জন্য মেহনত করলে আল্লাহ আমাদের পার্থিব অবস্থা সুসজ্জিত করে দেবেন। সুতরাং আমাদের শ্রমের মাঠ কী? আমাদের আপন সত্তা। কেননা, বর্তমানে আমাদের দৃষ্টি অন্যের ওপর পতিত হয়। আমরা অন্যের ত্রুটি সন্ধান করি। আফসোস! যদি সেই চোখ বন্ধ হয়ে যেত। আমাদের দৃষ্টি সীনায় পড়ত। তাহলে আমার জীবন কতই-না স্বচ্ছ হতো। আমাদের ঘাড় খাড়া থাকে, সেটা অবনত করা কঠিন। চোখ অন্যকে দেখার জন্য ব্যস্ত– নিজেকে দেখছে না। সুতরাং সবকিছুর নির্যাস হলো প্রত্যেক বস্তুর নিজস্ব প্রভাব থাকে। এটা মানুষের পরীক্ষিত। আর আমলের মধ্যে প্রভাব হওয়া এটা আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি।

আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা

ভাই! নিজের গবেষণা থেকে বেড়ে আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতির ওপর ভরাস করা চাই। আমরা যদি আমাদের যাচাইয়ের কারণে বিদ্যুতে হাত না দেই। আমাদের অভিজ্ঞতার কারণে বিষ পান না করি। কারণ, এগুলো আমাদের প্রাণনাশক। তাহলে গুনাহ করলে শাস্তি পাব; এটি আল্লাহর ওয়াদা। সুতরাং আমরা সেই কাজে অগ্রসর হই কীভাবে। সুতরাং ভাই! আমরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা চাই। আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করি। মানুষের পাপের দরুণ আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ আসে।

সাধারণ প্রকৃতি

বর্তমানে সারা পৃথিবী আপনি ঘুরে দেখুন, মানুষের সাধারণ স্বভাব হচ্ছে গ্রহণ করা। সবাই নিতে চায়, দিতে চায় না। অন্যের কাছ থেকে পাওয়া মানুষের স্বভাব। সুদ গ্রহণ, ধোঁকা দেওয়া, আত্মসাৎ করা, প্রতারণা করা, চুরি করা, ডাকাতি করা, মাপে কম দেওয়া, নেওয়ার সময় বেশি নেওয়া সবকিছুর প্রতি মানুষ আকৃষ্ট। এটা মানুষের সাধারণ স্বভাব হয়ে গেছে।

শরীয়তের স্বভাব

শরীয়তের দিকে তাকাও। শরীয়ত মুমিনকে বলে, তুমি দানের স্বভাব গ্রহণ করো। ইয়া আল্লাহ! দানের স্বভাব কোথায়? অথচ তোমরা মুমিন। গ্রহণের স্বভাব পরিহার করো। কীভাবে দেবেন? আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা যাকাত দাও; তোমাদের সম্পদে গরিবের হক রয়েছে।

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴿١٩﴾

'তোমাদের মালে যাচঞাকারী ও বঞ্চিত অসহায়দের হক রয়েছে।'

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তোমরা যাকাত দাও। জমিনের উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশ (ওশর) আল্লাহর রাস্তায় দান করো। এছাড়াও অতিরিক্ত সদকা প্রদান করো। আরও বলেন, তোমরা একে অপরকে হাদিয়া দাও। তোমাদের পরস্পরে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। অতএব, দীনের স্বভাব দেখো। যাকাত দাও, ওশর দাও, সদকা দাও, হাদিয়া দাও। আল্লাহ তা'আলা মুমিনের শুধু দাও, দাও বলেছেন। শুধু দেওয়ার কথাই রয়েছে– নেওয়ার কথা কোথায়? কোথা থেকে তুমি গ্রহণ করবে? আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আমার বান্দা, বিষয়টা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। গ্রহণ করবে কোথা থেকে? আমার সামনে হাত বিছিয়ে দাও। আমি তোমাদের থলি ভরে দেব। তোমরা আমার থেকে গ্রহণ করো এবং অন্যের থলি ভরে দাও। আমার কাছে চাও; আমার প্রিয় বান্দা হয়ে যাও। মানুষদের দাও; তোমরা পৃথিবীর প্রিয় হয়ে যাও। সম্মানের জীবন গড়ার পদ্ধতি আমি তোমাদের বলে দিলাম। এটা হচ্ছে মুমিনের জিন্দেগি। আল্লাহ তা'আলা থেকে নেবে এবং আল্লাহর মাখলুককে দেবে। এজন্যই শরীয়ত বলেছে, দেওয়ার মেজাজ বানাও। সুতরাং ভাই! আমরা আমাদের জীবন থেকে গুনাহ অপসারণ করব। আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইব। আল্লাহ তা'আলা আমাদের অতীতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।

গুনাহের ওপর সাক্ষী

কেয়ামতের দিন প্রত্যেক গুনাহের ওপর চারটি সাক্ষী উপস্থাপন করা হবে। একটি সাক্ষী হবে ফেরেশতা কেরামুন কাতিবীন। দ্বিতীয় সাক্ষী হবে মানুষের অঙ্গপ্রতঙ্গ। তৃতীয় সাক্ষী হবে জমিন, যেখানে গুনাহ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝

'জমিন সেদিন তার সমস্ত সংবাদ সুস্পষ্ট বর্ণনা করবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাকে সেগুলো বলার প্রত্যাদেশ করবেন।'[১৯১]

চতুর্থ সাক্ষী হবে মানুষের আমলনামা। এ চারটি সাক্ষী উপস্থিত করা হবে। কিন্তু যে-বান্দা সত্যিকারের তাওবা করবে, তার সম্পর্কে হাদীছ শরীফে এসেছে। মানুষ যখন তাওবা করে, তখন তার গুনাহ আল্লাহ ফেরেশতাদের পর্যন্ত ভুলিয়ে দেন। তার অঙ্গকেও সেই গুনাহ ভুলিয়ে দেন এবং জমিনের অংশকেও তার গুনাহ ভুলিয়ে দেন। পরিশেষে সে আল্লাহর সঙ্গে এমনভাবে সাক্ষাৎ করে, তার গুনাহের কোনো সাক্ষী থাকে না।

একটি দার্শনিক সূক্ষ্মতা

এখানে ছাত্রদের জন্য দুয়েকটি সূক্ষ্মতা বর্ণনা করছি। দুনিয়ার নিয়ম হচ্ছে, যদি কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করা হয়, তারপর তাওবাকারী কর্মকর্তা এই মামলা মিথ্যা বলে প্রতিবেদন পেশ করে, তাহলে আদালত রায় ঘোষণা করেন, তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত মামলার সংশ্লিষ্ট আসামিকে আদালত বেকসুর খালাস দিচ্ছে। এখানে যদি আসামি দাবি করে, মহামান্য আদালত! যেহেতু আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে; সুতরাং মেহেরবানিপূর্বক রেজিষ্ট্রি খাতা থেকে মামলার রেকর্ড বিলুপ্ত করে দিন, তাহলে আদালত তার আবেদন গ্রহণ করবে না। বরং বলবে, আমাদের রেজিষ্ট্রি খাতায় এই মামলার রেকর্ড থাকতে হবে। কারণ, এটিও একটি মামলা; যদিও মিথ্যা। এই রেকর্ড সারা জীবন এখানে থাকবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলার মোয়ামালা দেখুন। এক বান্দা গুনাহগার। তারপর আল্লাহর আদালতে অনুগ্রহের আপিল করেছে। হে আমার মালিক! আমার অপরাধের ওপর আমি লজ্জিত, অনুতপ্ত। আমার

---

১৯১. সূরা যিলযাল : আয়াত ৪

তাওবা কবুল করো। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আমার বান্দা! তুমি অপরাধ স্বীকার করে আমার আদালতে আপিল করেছ। সুতরাং দেখো; আমি এমন ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক যে, আমি শুধু তোমাকে সসম্মানে মুক্তি দেইনি; বরং তোমার এই অপরাধের সমস্ত রেকর্ড আমি মুছে দিলাম।

আমলানামা থেকে রেকর্ড মুছে দেওয়ার মর্ম কী? একটু মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করো।

এক. যদি আমলনামায় গুনাহ রেখে তার শুধু কার্যকারিতা মওকুফ করা হতো, শুধু একটা লম্বা দাগ দিয়ে সেটা কেটে দেওয়া হতো, তাহলে কেয়ামতের দিন যখন প্রত্যেক মানুষ একে অপরের আমলনামা পাঠ করবে, কুরআনে বলা হয়েছে–

هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ۝ اِنِّيْ ظَنَنْتُ اَنِّيْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ ۝ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝ فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝

'তারপর যার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, নাও; তোমরা আমার আমলনামা পাঠ করো। আমি জানতাম, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। তারপর সে সুখময় জীবন যাপন করবে।'[১৯২]

সুতরাং তার নিকটতম লোকজন গুনাহগারদের আমলনামা দেখে বুঝে নেবে, সে এরকম গুনাহ করেছিল। তাই দয়াময় আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আমার বান্দা! আমি যদি তোমার গুনাহের নিদর্শন তোমার আমলনামায় রেখে দিই, তাহলে আমলনামা অন্য কেউ দেখে বলবে, মিয়া! তোমার কর্ম এরকম ছিল। পরে ক্ষমা চেয়ে মুক্তি পেয়েছ। এতে ক্ষমা চাওয়ার পরও তোমাকে অপমানিত হতে হতো। আমি মহামহিম তোমাকে এমন অপমান থেকেও রক্ষা করি। তাই তোমার আমলনামা থেকে গুনাহের লক্ষণ পর্যন্ত মিটিয়ে দিই। কেউ জানতে পারবে না, ওই লোক গুনাহ করছিল কি-না।

আল্লাহু আকবার! আমলানামা থেকে তো গুনাহ মিটিয়ে দেবেনই। সাথে-সাথে বলছেন-

اَنْسَى اللّٰهُ حَفَظَتَهٗ

'আল্লাহ সেটা ফেরেশতাদের স্মৃতিপট থেকেও বিলুপ্ত করে দেন।'

---

১৯২. সূর আল হাক্কাহ : আয়াত ১৯: আয়াত২২

বন্ধুগণ! একাজ তো আল্লাহ ফেরেশতাদের মাধ্যমেও করাতে পারেন। দুনিয়ার বিচারক কোনো কাজ করাতে হলে তার পি.এস স্যারের মাধ্যমে করায়। কিন্তু বান্দার গুনাহে অনুতপ্ত হওয়ার পর আল্লাহ স্বয়ং নিজহাতে ওই বান্দার গুনাহ মার্জনা করে দেন। আল্লাহ বলেন, আমি তো মিটিয়ে দিই। সুতরাং মুহাদ্দিছীনে কেরাম বলেন, একাজ আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের দিকে সম্পর্কিত করেছেন। আল্লাহ বলেন, হে আমার বান্দা! একাজ আমি নিজে এজন্যই করি যে, এতে আমি তা ফেরেশতাদের স্মৃতিপট থেকে মুছে দেই। কারণ, ফেরেশতাদের মাধ্যমে একাজ সম্পাদন করলে কাল কেয়ামতের দিন তারা তোমাদের আমলানামা দেখে ভাবত, সম্ভবত আমি এই আমলনামা থেকে কিছু গুনাহ মুছে দিয়েছিলাম। এতেও তোমাদের ওপর ফেরেশতাদের সন্দেহ সৃষ্টি হতো। তাই আমি এ সামান্য পরিমাণ সন্দেহের অবকাশ থেকেও তোমাদের হেফাযত করি। এতে তোমাদেরকে ফেরেশতাদের দয়ার পাত্র বোঝা যেত। না হয় তারা তোমাদের অপবাদ দিত। আমি মহামহিম নিজহাতে তোমাদের অপরাধ মিটিয়ে দিয়ে এসব কিছু থেকে তোমাদের হেফাযত করেছি। আল্লাহু আকবার! কেমন দয়াময় মালিক। এজন্য বলা হয়েছে, কোনো মানুষ গুনাহের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইলে সাথে-সাথে দু'আ করবে-

وَاعْفُ عَنَّا ۖ وَاغْفِرْ لَنَا ۖ وَارْحَمْنَا

'হে আল্লাহ! আমার গুনাহের চিহ্ন মিটিয়ে দাও।'[১৯৩]

যাতে কেয়ামতের দিন আমরা লজ্জিত না হই। হে আল্লাহ! আমার গুনাহের চিহ্ন মিটিয়ে দাও, যাতে কেয়ামতের দিন আমরা লজ্জিত না হই।

وَاغْفِرْ لَنَا ۖ

'আমাদের অপরাধ আপনার ক্ষমার পর্দা দিয়ে আবৃত্ত করে দাও, যাতে অন্যের সামনে প্রকাশ না পায় এবং পুণ্যের কাজ বিকশিত করে দাও।

তারপর আরও আশ্চর্য কথা শুনুন। বলা হয়েছে, দু'আতে তোমরা পাঠ কর وَارْحَمْنَا 'হে আল্লাহ! আমাদের ওপর দয়া করো। একথা কেন বলা হলো? কারণ, কোনো পিতা যদি তার সন্তানের প্রতি নারাজ হয়, তখন তার

---

১৯৩. সূর আল হাক্কাহ : আয়াত ২৮৬

সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করার সাথে-সাথে তার খরচের পয়সা দেওয়াও বন্ধ করে দেয়। তারপর যখন সন্তান তার পিতার হাতে-পায়ে ধরে ক্ষমা চায়। তখন পিতা তাকে ক্ষমা করে দেয়। সাথে-সাথে তার খরচের টাকাও জারি করে। সুতরাং হে আল্লাহ! আমি গুনাহ করেছিলাম, যার ফলে তোমার রহমতের দরজাও আমার প্রতি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন আমি ক্ষমা চাচ্ছি। আব্বার নিকট ক্ষমা চাইলে তো তিনি খুশি হয়ে তার পকেটও খুলে দেন। সুতরাং আপনি আমার মালিক। আপনিও আমাদের জন্য পকেটখরচ চালু করে দিন। এটা কোন পকেটখরচ? মুফাসসিরীনে কেরাম বলেন, وَارْحَمْنَا (আমার ওপর দয়া করুন।) وَارْحَمْنَا -এর অধীনে বান্দার জন্য চারটি পুরস্কার রয়েছে।

আল্লহপাকের চারটি পুরস্কার

প্রথম পুরস্কার : পুনরায় ইবাদাতের তাওফীক প্রদান করেন। গুনাহ করলে বান্দা থেকে ইবাদাতের তাওফীক ছিনিয়ে নেওয়া হয়। বান্দা সঠিকভাবে নামায আদায় করতে পারে না। তেলাওয়াত করতে মন চায় না। তাহাজ্জুদ পড়ার সুযোগই পায় না। তারপর যখন সে তাওবা করে, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আমার বান্দা! তুমি আমার সঙ্গে আপস করেছ; তুমি আমার বন্ধু হয়ে গেছ। সুতরাং আমি আবারো তোমাকে ইবাদাতের তাওফীক প্রদান করলাম।

দ্বিতীয় পুরস্কার : আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রশান্তি পাওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আমার বান্দা! গুনাহ করার কারণে আমি তোমার থেকে আমার বিশেষ প্রশান্তি হরণ করেছিলাম, তোমার রিযিক হ্রাস করেছিলাম। তোমার জীবন সংকীর্ণ করে দিয়েছিলাম। এবার তাওবা করার কারণে আমি তোমাকে পুনরায় প্রশান্তি ও প্রশস্ত রিযিক দান করলাম। প্রশান্তির আহার্য গ্রহণ করে এর শক্তি দিয়ে পুণ্যের কাজ করো। আমার রাস্তায় বের হও। সেই সম্পদ দিয়ে আমার ঘরের যিয়ারত করো। অর্থাৎ– হজ করো। আমার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজায় উপস্থিত হও। এর জন্য তোমার খরচ জারি হয়েছে। তা সঠিক খাতে ব্যয় করো। হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার ঘর দেখার সৌভাগ্য দান করুন। আল্লাহ ডাকেন। হে আমার বান্দা! এসো আমার ঘরে। এর জন্য সফর করো। কত দয়াময় মালিক! বান্দার ওপর এত অনুকম্পা তাঁর।

তৃতীয় পুরস্কার : আল্লাহ তা'আলা বলেন, সত্যিকারে তাওবাকারীকে আমি বিনা হিসাবে ক্ষমা করব। বিনা হিসাবে জান্নাত দান করব। আল্লাহু আকবার! বিনা হিসাবে কীভাবে হয়? আমি একবার হজের সফরের সময় বিমান বন্দরে দেখলাম। কাষ্টমস অফিসার আমাদের এই দুরবস্থা দেখে কোনো মালসামানা চেক না করে ট্রলির ওপর রেখেই এতে কাষ্টমসের সিল লাগিয়ে দিচ্ছে, যাও আপনাদের মাল চেক করতে হবে না। বিনা চেকে তোমরা এখান থেকে পার হয়ে যাও। সুতরাং এ পৃথিবীর মালিকও যদি আমাদের আমলনামায় চেকপোস্টের সিল লাগিয়ে দেন। তাই তো আমরা বিনা হিসাবে বেহেশতে চলে যাব। একে বলে বিনা হিসাবে বেহেশতে যাওয়া।

চতুর্থ পুরস্কার : আল্লাহ বলেন, জান্নাতে প্রবেশ করা তোমাদের জন্য সহজ করে দেব। হাদীছ শরীফে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন এক বান্দাকে ডাকবেন। তার পাশে একটি রহমতের পর্দা টাঙিয়ে দেওয়া হবে। তারপর তার জীবনের সমস্ত বড় অপরাধ গণনা করা হবে। (হে আল্লাহ!) সে এমনও করেছে, এমনও করেছে। এটাও করেছে, সেটাও করেছে। এ সমস্ত অপরাধ সে করেছে। সবকিছু গণনা করা হবে। এতে ওই বান্দা ভাবতে থাকবে, আজ জাহান্নাম ছাড়া আমার উপায় নেই। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে আমার বান্দা! তুমি এ সমস্ত গুনাহ করেছ। সাথে-সাথে তুমি আমার নিকট ক্ষমা চেয়েছিলে, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য চেষ্টা করেছিলে। আমি তোমার সেই চেষ্টা কবুল করে আজ তোমার জীবনের সমস্ত গুনাহ নেকি দ্বারা পরিবর্তন করে দিলাম। তারপর আল্লাহ তা'আলার রহমতের পর্দা উঠিয়ে দেওয়া হবে। সৃষ্টিকুল তার আমলনামা একেবারে স্বচ্ছ দেখে মনে করবে, সম্ভবত সে কোনো নবী বা সিদ্দীক হবে, যে জীবনে কোনো গুনাহ করেনি। সুতরাং ভাই আমাদের দু'আ হলো وَارْحَمْنَا আমার ওপর দয়া করো। এই বাক্যের অধীনে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত নেয়ামত দান করবেন। সব শেষে আল্লাহ বলেন,

أَنْتَ مَوْلٰنَا

'তুমি আমাদের মালিক।'

দেখুন, একটি দু'আ শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ বান্দার সবকিছু কত সহজ করে দিয়েছেন। কী পরিমাণ দয়া করেছেন! সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো,

নিজের পরিশুদ্ধির চেষ্টা করা। নিজের আমল সুচারু করা। যখন আমরা পরিশুদ্ধ হয়ে যাব, তখন আল্লাহ্ আমাদেরকে দীন প্রচারের মাধ্যম বানাবেন। আমরা যেদিকে যাব, মানুষ আমাদের দেখে ইসলামের দিকে ধাবিত হবে।

খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (রহ.)-এর বাংলা মুলুক সফর

হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.) একবার বাংলা মুলুক সফর করেন। এতে সাত লাখ মানুষ তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করে এবং সত্তর লাখ মানুষ গুনাহের জন্য তার হাতে তাওবা করে বায়'আত গ্রহণ করে। যেভাবে কোনো কারিগর অনেক সাধনা করে কোনো মাস্টারপিস তৈরি করে, সেটা মানুষকে দেখিয়ে বেড়ায়, তেমনিভাবে যে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়, কারিগরের মাষ্টারপিসের মতো তার সকল শৈলী সারা পৃথিবীতে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়। দুনিয়ার মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা জানিয়ে দেন, দেখো, বর্তমান যুগে তো তোমরাও এমন হতে পার। এরপর আল্লাহ্ তার জন্য সকল রাস্তা খুলে দেন। তাই আমরা দীনের কাজ করব। দীনের পথে জীবন ব্যয় করব। স্মরণ রাখবেন, বর্তমান যুগে যেব্যক্তি দীনের ওপর জীবন যাপন করে, দীনের প্রচার-প্রসার করে, সে আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয়পাত্র। কেননা, বর্তমান যুগে ইসলাম এতিমের রূপ ধারণ করেছ।

দীনকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরো

স্মরণ রাখবেন, হযরত হালীমা সাদিয়া (রহ.) এক এতিমকে বুকে তুলে নিয়েছিলেন। তারপর আল্লাহ্ নিজের খাস রহমত দ্বারা তার ঘর ভরপুর করে দেন। আজ আমরা এই দীনকে বুকে জড়িয়ে নিলে আল্লাহ্ আমাদের ঘর, আমাদের প্রতিষ্ঠান তাঁর বিশেষ রহমত দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেবেন। সৃষ্টির অন্তরে আল্লাহ্ এমন ভালোবাসার উদ্রেক করে দেবেন যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের কবরের পাশে এসে কাঁদবে। আল্লাহ্ আমাদের অন্তরে আমাদের নিজের জীবনকে সুসজ্জিত করার ভালোবাসা সৃষ্টি করে নিন।

গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে কান্না

নিজের গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হওয়ার পর কাঁদা মুমিনের ওপর আল্লাহ্ তা'আলার অনেক বড় নেয়ামত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে মুমিন বান্দার চোখে যে-অশ্রু ঝরে, সেটি তার জন্য দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে, তার চেয়েও উত্তম।

কোনো কবি বলেন–

جیڑا لطف ہے رووں اندر

او وچ بیان نہ آوے

رونا دل دی میل اتارے

نالے رو ٹھڑے یار مناوے

تے یاد خدا وچ رووں والہ

کدے دوزخ وچ نہ جاوے

কান্নার মধ্যে যে দয়া রয়েছে, তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কান্না অন্তরের ব্যথা দূর করে দেয়। ক্রোধান্বিত ব্যক্তিকে বন্ধুত্ব পরিণত করে। আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারী জাহান্নামে যাবে না।

আল্লাহ্ তাঁর স্মরণে আমাদের কান্নার সৌভাগ্য দান করুন। কেয়ামতের দিন লাঞ্ছিত হওয়া থেকে আমাদের হেফাযত করুন। আমীন।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ওপর আল্লাহর শাস্তি

'আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন, বন্ধুগণ! গুনাহের প্রতি তাকাবে না, এটা বড়, নাকি ছোট। বরং ওই সত্তার মহত্ত্বের প্রতি তাকাও, তুমি যার আদেশ অমান্য করছ। তিনি মহান সত্তা। তিনি এ পৃথিবীতেও প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন। আর যখন আল্লাহ প্রতিশোধ নিতে চান, তখন হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকলেও বান্দার জীবনে লাঞ্ছনা নেমে আসে।'

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ওপর আল্লাহর শাস্তি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ۭ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ -

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

মানবজাতির পরীক্ষা

মহা প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা এ পৃথিবীতে মানুষকে পুণ্য ও পাপের স্বাধীনতা দিয়েছেন। সে চাইলে সৎ কাজ জরবে, চাইলে অসৎ কাজ করবে। এটা মানুষের জন্য পরীক্ষা। মানুষের কুপ্রবৃত্তি তাকে গুনাহের কাজের প্রতি আহ্বান করে। শয়তান মানুষকে পাপের দিকে ডাকে। পক্ষান্তরে আল্লাহ মানুষকে পুণ্যের দিকে আহ্বান করেন। এটা হক-বাতিলের চিরন্তন দ্বন্দ্ব। পুণ্যবান লোকেরা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মেনে জীবন যাপন করেন আর পাপিষ্ঠরা নিজের নফসের বেড়াজালে বন্দি হয়ে মনচাহি জীবন যাপন করে। আল্লাহ তা'আলার নীতি হচ্ছে, প্রতিদান ও শাস্তি। যে পুণ্যের কাজ করবে, সে পুরস্কারের উপযোগী হবে, যে পাপে লিপ্ত হবে, সে শাস্তির উপযোগী হবে। এই শাস্তি ইহকালেও পাবে, পরকালেও পাবে। কোনো-কোনো সময় আল্লাহ তা'আলা বান্দার পাপের শাস্তি পৃথিবীতেও দিয়ে থাকেন।

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ۭ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ

'শাস্তি এরকমই এবং নিশ্চয় পরকালের শাস্তি কঠিন।'[১৯৪]

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার নীতিমালা হচ্ছে, প্রতিদান ও শাস্তি। সুস্থ মাথায় চিন্তা করলে মানুষ পৃথিবীতে এর বহু দৃষ্টান্ত দেখতে পাবে।

---

১৯৪. সূরা কলম : আয়াত ৩৩

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত

পৃথিবীর ইতিহাসের প্রতি তাকালে অসংখ্য সম্প্রদায় পাবেন, যাদের ওপর আল্লাহ তা'আলা রহমত বর্ষণ করেছেন তাদের আনুগত্যের কারণে। অপর দিকে যারা আল্লাহর নাফরমানি করেছে, শেষ ফলে তারা আল্লাহর শাস্তির শিকার হয়েছে।

আপনারা ভেবে দেখুন, প্রাথমিক অবস্থায় মিস্টার ইবলিসকে 'আযাযীল' বলা হতো। এত পরিমাণ ইবাদত করেছিল যে, সে ফেরেশতাদের মধ্যে গণ্য হয়েছিল। কিন্তু যখন আল্লাহর হুকুমের অবাধ্য হয়ে গেল, নাফরমানি করল, এবার আল্লাহ বললেন–

فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۝

'তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। নিশ্চয় তুমি বিতাড়িত।'[১৯৫]

তারপর বললেন,

وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ۝

'কেয়ামত পর্যন্ত তোমার ওপর আমার অভিশাপ।'[১৯৬]

এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে কত বড় শাস্তি!

নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের প্রতি কিঞ্চিৎ আলোকপাত

হযরত নূহ (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে প্রায় সাড়ে নয়শত বছর দীনের প্রতি আহ্বান করেন। কিন্তু নামমাত্র কয়েকজন মানুষ তার দাওয়াত গ্রহণ করে। অবশিষ্ট সকলেই অস্বীকার করে। ফলে তাদের ওপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসে। এ পৃথিবীতে সেই আযাব তুফানের রূপ ধারণ করে আগমন করে। এমনকি আল্লাহ হযরত নূহ (আ.)কে বললেন–

وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ

'তুমি জালেমদের সম্পর্কে আমার সঙ্গে কথা বলো না। নিশ্চয় তারা নিমজ্জিত।'[১৯৭]

---

১৯৫. সূরা ছোয়াদ : আয়াত ৭৭

১৯৬. সূরা ছোয়াদ : আয়াত ৭৮

১৯৭. সূরা হূদ : আয়াত ৩৭

অর্থাৎ– তোমার সহৃদয়তা দেখে কাফেররা যেন তোমাকে আমার নিকট প্রার্থনা করতে বাধ্য না করে। সুতরাং তুমি আমার নিকট প্রার্থনা করবে না। আল্লাহ তাদের সমূলে উৎখাত করে দিলেন।

বাতাসের শাস্তি

এ পৃথিবীতে আদ নামে একটি সম্প্রদায় এসেছিল, যাদের দৈহিক শক্তির ওপর তাদের খুব অহংকার ছিল। তারা বলত–

مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً

'আমাদের চেয়ে শক্তিশালী আর কে আছে?'[১৯৮]

আল্লাহ বলেন–

لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۞

'এর আগে এমন সম্প্রদায় আর সৃষ্টি করা হয়নি।'[১৯৯]

তারা আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি করেছে। আল্লাহ তাদের ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা শাস্তি প্রদান করেন।

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا

'আমি তাদের ওপর ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করলাম।'[২০০]

তা এমন বাতাস ছিল, যা কোনো ঈমানদারের গায়ে লাগলে সে তা আরামদায়ক অনুভব করত। যেমন– প্রচণ্ড গরমের মধ্যে শীতল বাতাস আরামদায়ক হয়। কিন্তু কাফেরদের জন্য সেটা এমন শীতল যে, তাদের মাটিতে নিক্ষেপ করত। ফলে তারা সবাই কাঁপতে-কাঁপতে নিচে পড়ে যায় এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাদের মরদেহ এভাবে জমিনে পড়েছিল যে, আল্লাহ বলেন–

كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۞

'যেমন কর্তিত খেজুরকাণ্ড জমিনে পড়ে রয়েছে।'[২০১]

---

১৯৮. সূরা সাজদা : আয়াত ১৫
১৯৯. সূরা ফাজর : আয়াত ৮
২০০. সূরা সাজদা : আয়াত ১৬
২০১. সূরা হাক্কা : আয়াত ৮

সামুদ সম্প্রদায়ের ভুল

আল্লাহ হযরত সালেহ (আ.)কে সামুদ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করলেন। তারা এমন দেহবিশিষ্ট লোক ছিল যে, আল্লাহ বলেন–

وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ

'তারা পাহাড় খোদাই করে তাদের ঘরবাড়ি নির্মাণ করত।'[২০২]

আল্লাহ আমি অধমকে ওই লোকালয়টি দর্শনের তাওফীক দান করেছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, তারা পাহাড় কেটে কীভাবে ঘরবাড়ি তৈরি করত। এর মধ্যে আবার বিভিন্ন কক্ষ থাকত। আল্লাহু আকবার! কত শক্তিশালী জাতি ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের একটি উটনী দান করেছিলেন। সালেহ (আ.) তাদের বলেছিলেন–

وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

'এ উটনীকে তোমরা খারাপ উদ্দেশ্যে স্পর্শ করো না। (অর্থাৎ একে বধ কর না) অন্যথায় কঠিন শাস্তি তোমদের গ্রাস করবে।'[২০৩]

অবশেষে তাদের কতিপয় দুষ্কৃতিকারী লোক তাকে জবাই করে ফেলল। ফলে তাদের শাস্তি প্রদান করা হলো। আল্লাহ বলেন–

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جٰثِمِينَ ﴿٧٨﴾

'(আল্লাহর শাস্তি) ভূমিকম্প তাদের গ্রাস করে। ফলে তারা অধঃমুখী হয়ে জমিনে পড়ে থাকে।'[২০৪]

হযরত লুত (আ.)-এর সম্প্রদায় এবং আল্লাহর পাকড়াও

হযরত লুত (আ.) এ পৃথিবীতে আগমন করলেন। তাঁর সম্প্রদায়ে একটি কবীরা গুনাহ ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। তারা নিজের যৌনচাহিদা আপন স্ত্রী ব্যতীত তরুণ বালকদের সঙ্গে পূর্ণ করত। অবশেষে আল্লাহ বলেন–

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا

---

২০২. সূরা হিজর : আয়াত ৮২
২০৩. সূরা আ'রাফ : আয়াত ৭৩
২০৪. সূরা আ'রাফ : আয়াত ৭৮

'যখন আমার নির্দেশ এল, তখন আমি তাদের উপরিভাগ নিচের দিকে রেখে দিলাম।'[২০৫]

হযরত জিবরাঈল (আ.) পৃথিবীতে আগমন করলেন এবং লুত সম্প্রদায়ের সেই ভূখণ্ড তাঁর পাখা দ্বারা উঠিয়ে শূন্যে নিয়ে ওপরের দিক নিচের দিকে করে সেখান থেকে ফেলে দিলেন। আরও বলা হয়েছে–

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ

'তাদের ওপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছে।'[২০৬]

মাপে কম দেওয়ার পরিণাম

হযরত শুয়াইব (আ.)-এর সম্প্রদায় মাপে কম দিত। পরিশেষে তাদের ওপর আল্লাহর শাস্তি চলে এল। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ

'জালেমদের গ্রাস করল বিকট আওয়াজ।'[২০৭]

ফেরাউন ও কারুনের অবস্থা

ফেরাউন নিজে খোদায়ী দাবি করল, বরং বলল, আমি সবচেয়ে বড় খোদা। তার সম্প্রদায় তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করল। পরিণাম কী হলো?

وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ۝

'আমি ফেরাউনের সম্প্রদায়কে তোমাদের চোখের সামনে নিমজ্জিত করলাম।'[২০৮]

কারুন তার সম্পদের অহমিকায় বিভোর ছিল। সে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করল। ফলাফল কী হলো,

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ

'আমি তাকে এবং তার ঘরকে জমিনে ধসিয়ে দিলাম।'[২০৯]

---

২০৫. সূরা হুদ : আয়াত ৮২
২০৬. সূরা হুদ : আয়াত ৮২
২০৭. সূরা হুদ : আয়াত ৯৪
২০৮. সূরা বাকারা : আয়াত ৫০
২০৯. সূরা কাসাস : আয়াত ৮১

তারা জমিনের নিচে ঢুকে যায়। জমিন তাদের খেয়ে ফেলে। আমি অধম আফ্রিকার জঙ্গলে ধসেযাওয়া একটি স্থান দেখছি। সেখানে যা কিছু পতিত হয়, সব কিছু জমিন খেয়ে ফেলে। আমার সাথি প্রায় ১০/১৫ ফুট লম্বা একটি ডাল দূরে থেকে সেখানে নিক্ষেপ করে। দেখলাম, কয়েক মিনিটের ভেতরে সেই ডাল জমিনের নিচে ঢুকে গেছে। তারপর আমার সাথি বলল, মানুষ কিংবা পশু-পাখি যা কিছু এখানে পতিত হয়, আর বেরিয়ে আসতে পারে না। এটা আল্লাহ তা'আলার কুদরত।

সুতরাং ভাই! আমরা সর্বদা আল্লাহকে ভয় করতে হবে। হে আল্লাহ! আমরা যদি তোমার নাফরমানি করি, তাহলে আপনি অবশ্যই শক্তি রাখেন যে, আমাদের জমিনে ধসিয়ে দেবেন। জমিন আমাদের খেয়ে ফেলবে।

ধর্ম হচ্ছে উপদেশ

বনী ইসরাইল আল্লাহর নাফরমানি করেছিল। আল্লাহ ইরশাদ করেন–

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ

'তাদের ওপর আরোপ করা হলো লাঞ্ছনা ও মুখাপেক্ষিতা। তারা আল্লাহর রোষানলে পতিত হয়ে ঘুরতে লাগল।"[২১০]

সুতরাং এটা সর্বজনবিদিত কথা যে, যেব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হবে, এ পৃথিবীতেও আল্লাহ তার ওপর আযাবের উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করবেন এবং পরকালেও তাকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন।

কুরআন মাজীদের শর্তসাপেক্ষ অনুমান

পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে এই আলোচনা এসেছে। কোনো-কোনো আয়াতে 'ان' শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা শর্তের শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে 'যদি'। আল্লাহ তা'আলা একস্থানে বলেন,

اِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا

'যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর, তাহলে তিনি তোমাদের 'ফুরকান' দান করবেন।'[২১১]

---

২১০. সূরা বাকারা : আয়াত ৬১

২১১. সূরা আনফাল : আয়াত ৩৩

ফুরকান একটি নূর, যা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকরণের কাজ করে। এর দ্বারা মানুষ পাপ-পুণ্যের পার্থক্য করতে পারে। ভালো-মন্দ অনুধাবন করতে পারে।

এক আয়াতে আল্লাহ বলেন,

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ؕ

'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শাস্তি দিয়ে কী করবেন? যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ঈমান আনয়ন কর।'[২১২]

সুতরাং এখানে কথাটির সাথে শর্ত লাগানো হয়েছে যে, তোমরা যদি ঈমান আন আর শুকরিয়া আদায় কর, তাহলে তোমাদের শাস্তি দিয়ে আল্লাহ কী করবেন? তাতে তাঁর কী লাভ হবে? আয়াতের বাচনভঙ্গি হলো তোমাদের শাস্তি দিলে আল্লাহর কী লাভ হবে যদি তোমরা ঈমান গ্রহণ করে নাও।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا

'যদি তোমরা আনুগত্য কর, তাহলে হেদায়াত পেয়ে যাবে।'[২১৩]

এগুলো শর্তসাপেক্ষ কথা।

لو (যদি) فلما (যখন) শব্দদ্বয়ের চমৎকার বিকাশ

এমনিভাবে لو শব্দ দ্বারা কুরআন মাজীদে এর আলোচনা করা হয়েছে–

وَاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ۙ

'যদি তারা সঠিক রাস্তায় প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলে আমি তাদের পান করাব সুস্বাদু পানি।'[২১৪]

আরেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

'যদি তারা মেনে নিত, যা যাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল (উপদেশ), তাহলে সেটা তাদের জন্য খুবই উত্তম হতো।'

---

২১২. সূরা নিসা : আয়াত ১৪৭

২১৩. সূরা নূর : আয়াত ৫৪

২১৪. সূরা জিন : আয়াত ১৬

সুতরাং দেখুন, আমলের সাথে তার পরিণামের সম্পর্ক আছে।

কোনো-কোনো জায়গায় فلما শব্দ দ্বারা এর আলোচনা করেছেন।

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ

'যা থেকে তাদের নিষেধ করা হয়েছিল, যখন তারা তার সীমালঙ্ঘন করল।'[২১৫]

قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ

'আমি তাদের বললাম, তোমরা নিকৃষ্ট বানরে রূপান্তিত হয়ে যাও।'[২১৬] তারপর আল্লাহ তা'আলা সেই মানুষদের বানর বানিয়ে রেখে দিলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রার্থনা

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতগুলো দু'আ আছে, যেগুলো আমাদের নিরাপদ রেখেছে। মসজিদে আজাযায় যে-দু'আগুলো কবুল হয়েছিল, তার মধ্যে এই দু'আটিও ছিল যে, হে আল্লাহ! আমার উম্মতের আকৃতি এভাবে বিকৃত করো না, যে রকম বনী ইসরাইলকে করেছিলে। সেই দু'আটি কবুল হয়, যার ফলে আমরা আজ পর্যন্ত সুস্থ আকৃতিতে জীবন যাপন করে করছি।

দানের প্রতিদান

আমরা যদি পুণ্যের কাজ করি, তাহলে তার প্রতিদান পাব। আর যদি পাপের কাজ করি, তাহলে পরিশেষে তারও শাস্তি পাব। এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَلَمَّا اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ

'যখন তারা আমাকে ব্যথিত করল, তখন আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম।'

এবার আল্লাহর সাহায্যের সামনে মনকে একটু হাজির করো। এ আয়্যাত পাঠ করলে শরীরটা শিউরে ওঠে। আল্লাহ বলেছেন, আমি প্রতিশোধ নিয়েছি।

---

২১৫. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৬৬

২১৬. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৬৬

ইবনে কায়্যিম (রহ.)-এর উপদেশ

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন, বন্ধুগণ! গুনাহের প্রতি তাকাবে না, এটা বড়, নাকি ছোট। বরং ওই সত্তার মহত্ত্বের প্রতি তাকাও, তুমি যার আদেশ অমান্য করছ। তিনি মহান সত্তা। তিনি এ পৃথিবীতেও প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন। আর যখন আল্লাহ প্রতিশোধ নিতে চান, তখন হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকলেও বান্দার জীবনে লাঞ্ছনা নেমে আসে।

কুরআনের আলোকে পাপ ও পুণ্যের পরিণাম

এমনিভাবে পবিত্র কুরআনে, فاء দ্বারা এর আলোচনা করা হয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে–

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ

এখানে প্রথম ف হরফে আত্ফ। যদি তারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে। فاخوانكم তাহলে তারা তোমাদের ভাই। এখানে فاء কারণ বর্ণনার জন্য এসেছে। এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً

'সুতরাং তারা আল্লাহর রাসূলের নাফরমানি করেছে। আল্লাহর শাস্তি তাদের পাকড়াও করেছে।'[২১৭]

فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ

'তারা তাদের (মূসা ও হারুন) অস্বীকার করেছে। ফলে তারা ধ্বংসশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।'[২১৮]

আল্লাহ কখনো ذلك শব্দ ব্যবহার করে এরূপ আলোচনা করেছেন।

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْكُمْ

'এটা তোমাদের নিজে হাতে আগে প্রেরণকৃত বিষয়।'[২১৯]

---

২১৭. সূরা হাক্কা : আয়াত ১০
২১৮. সূরা মুমিনূন : আয়াত ৪৮
২১৯. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৮২

إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا

'তারা আমার আয়াত অস্বীকার করেছে।'

সুতরাং কুরআন আমাদের সুস্পষ্ট বলে দিচ্ছে, যদি মানুষ আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি করে, তাহলে তার পরিণাম খুবই মন্দ হবে। আর যদি পুণ্যের কাজ করে তাহলে আল্লাহর রহমত ও নেয়ামতের উপযোগী হবে। আমাদের আমলের বিনিময়ে আমরা আল্লাহর প্রেমিক হয়ে থাকি। হাদীছে এসেছে, মানুষের প্রত্যেক আমল আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছে। তার আমল দেখেই আল্লাহ তার অবস্থান দান করেন। যেমন আমল তেমন জীবন। তাই কোনো কবি বলেন–

جب کہا میں نے یا اللہ تو میرا حال دیکھ

حکم آیا میرے بندے نامہ اعمال دیکھ

'আমি যখন বললাম, হে আল্লাহ! আমার দুর্দশার প্রতি তাকাও। হুকুম এল, হে আমার বান্দা! তোমার আমলনামা দেখো।'

সুতরাং আমাদের আমলনামার প্রতি তাকালে আমরা উপলব্ধি করতে পারব আমাদের এই অস্থিরতার কারণ কী? আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

'আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর জুলম করেননি। বরং তারা নিজেরাই নিজেদের নফসের ওপর জুলুম করেছে।'

পাঁচের বদলা পাঁচ

ইবনে মাজা শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'পাঁচটি বস্তুর প্রতিদানে পাঁচটি বস্তু বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

১. যখন নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা ব্যাপক আকার ধারণ করে, তখন ধ্বংসাত্মক ব্যাধি ব্যাপক করে দেওয়া হয়।

বর্তমানে আপনারা লক্ষ করবেন, দুই-চার দিন পরপরই একটি নতুন রোগের নাম শোনা যায়, যে-নাম আমাদের বাপ-দাদারা কোনোদিনও শোনেননি। এ হচ্ছে বেহায়াপনা ও গর্হিত কাজের পরিণাম।

সুবিচারের মূলতত্ত্ব

২. যে সম্প্রদায়ে পরিমাপে কম দেওয়া হবে, আল্লাহ তাদের ওপর অত্যাচারী শাসক নিযুক্ত করে দেবেন। সাধারণত আমরা মনে করি, দোকানে পাল্লায় এক দিকে পাথর আরেক দিকে পণ্য রেখে কম দিলেই পরিমাপে কম দেওয়া হয়। অথচ আমাদের জীবনটাও একটা দাঁড়িপাল্লা। এখানেও পরিমাপে কম দেওয়া হয়। যেমন– স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জন্য পাল্লা। স্বামী চায়, আমার স্ত্রী পুণ্যবতী হোক। অথচ সে নিজে আমলের ধারেকাছেও থাকে না। স্বামী মনে করে, আমার স্ত্রী আমার জন্য প্লাষ্টিকের তৈরী একটি খেলনা গাড়ি। আমি সেটা যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে চালাব। আর আমি আমার ইচ্ছেমতো চলব। এখানে আপনি পরিমাপে কম দিলেন। এমনিভাবে স্ত্রী মনে করে, আমি যা দাবি করি, তা-ই আমার স্বামী আমাকে প্রদান করে। সুতরাং আমার আঙুলের ইশারায় তাকে পরিচালিত করব। আর নিজে স্বামীর হক আদায় করে না। এখানে স্ত্রী পরিমাপে কম দিল। এরাও আল্লাহর বাণী–

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۝١ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۝٢ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۝٣

'ধ্বংস পরিমাপে কম প্রদানকারীদের, যারা মানুষের কাছ থেকে গ্রহণের সময় পূর্ণ মাত্রায় নিয়ে থাকে এবং মানুষকে মেপে দেওয়ার সময় কিংবা ওজন করে দেওয়ার সময় কম দেয়।'[২২০]

এ আয়াতের ধমকের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۝٤

'তারা কি মনে করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে?'[২২১]

মাতাপিতা ও সন্তানাদির মধ্যে রয়েছে দাঁড়িপাল্লা। সন্তান চায়, আম্মা-আব্বা আমার সঙ্গে স্নেহপূর্ণ আচরণ করবেন। সন্তানের ওপর এ দায়িত্ব নেই যে, সে মাতাপিতার কল্যাণকর আদেশ শুনবে। তাদের প্রদর্শিত রাস্তায় জীবন গড়বে। এদের মধ্যে এটাই পাল্লা।

---

২২০. সূরা তাতফীফ : আয়াত ১-৩

২২১. সূরা তাতফীফ : আয়াত ৪

এক মুসলমান আরেক মুসলমানের জন্য দাঁড়িপাল্লা। প্রত্যেকের হক আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করে দিয়েছেন। এখন আমরা যদি শুধু নিজের অধিকার আদায় করতে চাই। আর অন্যের অধিকার প্রদান করতে ভ্রূক্ষেপও না করি, তাহলে এখানে আমরা পরিমাপে কম দিলাম। আমরাও সেই আয়াতের যোগ্যপাত্র হলাম। ছাত্র ও ওস্তাদের মধ্যে দাঁড়িপাল্লা স্থাপিত রয়েছে। ছাত্র চায়, শিক্ষক মেহনত করে পড়াবেন। এরপর কি সে ওই ইল্মকে সংরক্ষণ করার জন্য মেহনত করে? এখানে সে-ও পরিমাপে কম প্রদানকারীদের অনুর্ভুক্ত হলো। গভীরভাবে তাকালে দেখবেন, আমাদের নিজেদের মধ্যে অনেক বিষয় রয়েছে, যেখানে আমরা পরিমাপে কম প্রদানকারী হয়ে যাই। এভাবে পরিমাপে কম প্রদানকারী হলেই আল্লাহ মানুষের ওপর অত্যাচারী শাসক নিযুক্ত করে দেন।

যাকাত না দেওয়ার কুফল

৩. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মানুষ যখন যাকাতকে জরিমানা ও বোঝা মনে করবে, তখন আল্লাহ তাদের ওপর দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দেবেন। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে। বৃষ্টি হলেও এর দ্বারা রোগব্যাধি বৃদ্ধি পাবে। ফল-শস্য হ্রাস পাবে। আমরা অনেক সময় পত্রিকায় পড়ি, এ বছর ইরি ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। কিন্তু যখন ফসল কাটার সময় হয়, তখন আবার সংবাদ প্রকাশ হয়, কালবৈশাখীর আঘাতে অমুক অঞ্চলের বোরে ধান শেষ হয়ে গেছে। কৃষকরা জমির কাছে গিয়ে হাহুতাশ করছে। আবার অনেক সময় বিভিন্ন পোকামাকড়ের আক্রমণে ধানের শীষ ঠিকমতো গজায় না। ধানে চিটা ধরে যায়।

এসব ক্ষেত্রে কারও অধিকার নেই। এটা একমাত্র আল্লাহর ক্ষমতা। এতে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফসল আমরা পাইনি। তাই ফসলে হ্রাস হওয়া দুর্ভিক্ষের লক্ষণ। কখনো বৃষ্টি হয় না। আবার কখনো বৃষ্টির পানিতে সব তলিয়ে যায়। কোনো-কোনো শহর পানি পাচ্ছে না। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষ যখন যাকাতকে বোঝা মনে করবে, তখন তারা দুর্ভিক্ষের শিকার হবে।

ওয়াদা ভঙ্গের ওপর আল্লাহর শাস্তি

৪. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মানুষ যখন অঙ্গীকার ভঙ্গ করা শুরু করবে, তখন আল্লাহ তাদের ওপর শত্রুদের চাপিয়ে

দেবেন। নিজের চোখে সেই দৃশ্য দেখতে পাবেন। আজ কথার কোনো মূল্যায়নই দেয়া হচ্ছে না। মুখে শপথ করে, তারপর তা পূরণ করে না। মুমিনের বৈশিষ্ট্য তো এটা যে, মুখ দ্বারা কোনে কথা বের হয়ে গেলে তা পূর্ণ করবেই। মিথ্যা শপথ করা খুব ব্যাপক হয়ে গেছে। ওয়াদা ভঙ্গ করা সাধারণ ব্যাপার হয়ে গেছে। এর ফলাফল হলো, বর্তমানে শত্রুরা আমাদের ওপর ঝেঁকে বসছে।

আল্লাহর বিধানের অবাধ্যতা

৫. পাঁচটি জিনিসের প্রতিদানে পাঁচটি জিনিস। এর পঞ্চম জিনিস হলো, মানুষ যখন আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করবে, তখন আল্লাহ তাদের পরস্পর ঐক্যের পরিবর্তে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে দেবেন এবং তাদের গৃহযুদ্ধে লিপ্ত করবেন। আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করার অনুভূতি তাদের থাকবে না। ফলাফল কী হবে? আল্লাহ তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে দেবেন এবং গৃহযুদ্ধে লিপ্ত করবেন। হাদীছ শরীফে এসেছে–

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِذَنْبٍ يُصِيْبُهُ

'মানুষ তার গুনাহের কারণে এমন রিযিক হতে বঞ্চিত হয়, যা তার নিকট পৌঁছার কথা ছিল।'

মানুষ পাপ করছে। আল্লাহ তার রুজি কমিয়ে দিচ্ছেন। দেখবেন, লাখ টাকা উপার্জন করছে; তবু হাত খালি। অভাব পিছু ছাড়ছে না। আমার মনে হয়, বর্তমানে স্বল্প উপার্জনের মানুষের অভাবও স্বল্প হয়। আর মিল-ফ্যাক্টরির মালিকের অভাব বেশি হয়। যে যত বড় ধনী, সে তত বড় ঋণী। আল্লাহর নাফরমানির কারণে তার জীবন সংকীর্ণ করে দেয়া হয়েছে। তাকে আল্লাহ যে-সমস্ত নেয়ামত দিয়েছিলেন, সেগুলো নিয়ে যাচ্ছেন।

একটি আশ্চর্য ঘটনা

বলা হয়, অনেক বড় এক ব্যবসায়ী ছিল। আল্লাহ তাকে প্রচুর ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তির মালিক বানিয়েছিলেন। নিজের ইচ্ছেমতো সে কালের শ্রেষ্ঠ বাড়ি বানিয়েছিল। যুগশ্রেষ্ঠ বিশ্বসুন্দরীকে বিয়ে করেছিল। একদা তার স্ত্রীকে নিয়ে খাবার খাচ্ছে। এমন সময় কোনো ভিক্ষুক এসে দরজায় হাঁক দিল, আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু দান করুন। তার স্ত্রী একজন ধার্মিক রমণী ছিল। সে কোনো ভিখারীকে খালি হাতে ফেরত দিত না। বলল, ওগো আমার জান! লোকটিকে

খুব ক্ষুধার্ত দেখাচ্ছে। আপনি অনুমতি দিলে আমাদের খাবার থেকে একটা রুটি তাকে দিয়ে দিই। স্বামী বলল, ঠিক আছে দিয়ে দাও।

স্ত্রী ভিক্ষুককে রুটি দিয়ে আসতে যে একটু সময় লাগল, এতে তার মেজাজ বিগড়ে যায়। সে বলতে লাগল, বদমায়েশ কোথাকার! কাজ করতে পার না। মানুষের দুয়ারে-দুয়ারে ভিক্ষা করতে লজ্জা করছে না। আরও যা কিছু বলার বলছে। সে তার নিজের সম্পদের আত্মগরিমা দেখাচ্ছে। ভিক্ষুক মনঃক্ষুণ্ন হয়ে তার দরজা থেকে চলে গেল। কিন্তু আল্লাহর নিকট তার এই অহমিকা পছন্দনীয় হয়নি। আল্লাহর সত্তা এই ভিক্ষুকের অপমান সহ্য করতে পারেনি। তার জীবনে দুর্ভোগ নেমে এল। ব্যবসায় লোকসান হতে থাকে। অল্প দিনের মধ্যেই তার সম্পদ শেষ হয়ে যায়। স্বর্ণকোমল বাড়িটিও বিক্রি করে দেয়। আসহায় হয়ে আদরের স্ত্রীকেও তালাক দিয়ে দেয়। বেচারী আল্লাহর ওপর ভরসা করে পিত্রালয়ে চলে যায়।

যেহেতু সে অতিশয় সুন্দরী ছিল, তাই কিছুদিন পর আরেক বড় ব্যবসায়ী তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। নতুন সংসারে স্বচ্ছন্দ্য জীবন কাটাচ্ছে। পূর্বের ন্যায় এ স্বামীর সঙ্গে একদিন একসঙ্গে বসে খাবার খাচ্ছে। এমন সময় কোনো ভিক্ষুক এসে দরজায় হাঁক দিল, দয়া করে আমাকে কিছু দান করুন। আমি খুব ক্ষুর্ধাত। স্ত্রী তার অভ্যাস অনুযায়ী ভিক্ষুককে একটি রুটি দেওয়ার জন্য স্বামীর নিকট অনুমতি চাইল। স্বামী অনুমতি দিলে সে রুটি নিয়ে ভিক্ষুককে দিতে যায়। দরজা খুলে সে অবাক হয়ে যায়। কী দেখল? সে দেখল, তার পূর্বের স্বামী ভিক্ষুক হয়ে তার দরজায় উপস্থিত হয়েছে! দৃশ্য দেখে মহিলা একটা চিৎকার মারল। তার চিৎকার শুনে স্বামী অগ্রসর হলো, ওগো আমার জান! তোমার কী হয়েছে?

বলল, ওই দেখো, আমার আগের স্বামী তার সব কিছু হারিয়ে আজ ভিখারীর বেশে আমার দরজায় উপস্থিত হয়েছে। তাই আমি চিৎকার দিচ্ছি। সে-ও তাকে চিনে ফেলল। জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ? আমি ওই ভিখারী, তোমার আদরের স্ত্রীর সঙ্গে বসে খাবার খাওয়ার সময় হাঁক দেওয়ার পর তুমি যাকে অপমান করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলে।

আল্লাহু আকবার! দেখুন, সেই আল্লাহ তা'আলা ভিক্ষুককে এমন ঘর ও সেই সুন্দরী রমণীর মালিক বানিয়ে দিলেন। আর এমন ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তির মালিককে ভিক্ষার জন্য রাস্তায় নামালেন।

চিন্তার বিষয়

সুতরাং অসংখ্য নেয়ামত রয়েছে যে, গুনাহের কারণে আল্লাহ মানুষকে সেগুলো থেকে বঞ্চিত রাখেন। আমরা অন্যের ওপর অপবাধ চাপিয়ে দিই। ভাই! মনে হয় কেউ যাদু করেছে। সাবধান! কেউ কিছু করেনি। রিযিক আল্লাহর হাতে। কাউকে দোষারোপ করবেন না যে, অমুক আমার ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দিয়েছে। আল্লাহ দিতে চাইলে সমস্ত সৃষ্টজীব একত্রিত হয়েও তা প্রতিরোধ করতে পারবে না। আর আল্লাহ বারণ করতে চাইলে কেউ দিতে পারবে না। কেউ আমাদের প্রশান্তি হনন করেনি। আমাদের আমল আমাদের প্রশান্তি দূরীভূত করেছে।

একটি শিক্ষণীয় স্থান

হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বর্ণনা করেন, কাবরাস বিজয়ের পর কোনো সাহাবি হযরত আবুদ্দারদা (রাযি.)কে কাঁদতে দেখলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কাঁদছেন কেন? আবুদ্দারদা (রাযি.) উত্তর দিলেন, এটি শিক্ষণীয় স্থান। আল্লাহ বনী ইসরাইলকে অসংখ্য নেয়ামত দান করেছিলেন। তারা সেগুলোর মূল্যায়ন করেনি। আজ আল্লাহ বায়তুল মাকদিসের মতো মূল্যবান নেয়ামতের চাবি মুসলমানদের হাতে অর্পণ করেছেন। সুতরাং এটি শিক্ষণীয় স্থান।

আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতার পরিণাম

হযরত ইবনে দীনার (রহ.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ যখন মানুষ থেকে প্রতিশোধ নেন, তখন তার সন্তানাদির মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পায়। তার স্ত্রী বন্ধ্যা হয়ে যায়। মানুষ তাদের কর্তার সমালোচনা করতে থাকে। নিজের অধীনদের সমতুল্য হয়ে যায়। আলেমগণ বলেন, আল্লাহ যখন কাউকে অভিশপ্ত করেন, তখন সেই অভিশাপ তার পৃষ্ঠদেশে লেপ্ট গিয়ে পিছে-পিছে চলতে থাকে।

সায়্যেদা আয়েশা (রাযি.)-এর নসীহত

হযরত আমীরে মু'আবিয়া (রাযি.) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর নিকট প্রস্তাব পাঠালেন, আম্মাজান! আপনি উম্মতের মা। অনুগ্রহপূর্বক আমাদের কিছু উপদেশ দিন।

তিনি বললেন, দেখো! যদি তোমরা মানুষের সন্তুষ্টির দরুণ আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন কর, তাহলে আল্লাহ মানুষের অন্তরে তোমাদের ব্যক্তিত্ব ও

ভাবমূর্তি বিলুপ্ত করে দেবেন। তোমাদের অপমানিত করবেন। পক্ষান্তরে যদি মানুষের মনোবাসনা এক প্রান্তে রেখে দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশমতো চল, তাহলে যারা তোমাদের ওপর নারাজ ছিল। এদের অন্তরে আল্লাহ্ তোমাদের মর্যাদা বদ্ধমূল করে দেবেন। ফলে তারাও তোমাদের ভালোবাসতে থাকবে।

সুতরাং ভাই! আমরা আল্লাহর বিধানকে বড় মনে করব। বর্তমানে আপনারা অবশ্যই দেখছেন, ঘরের মধ্যে স্বামী তুচ্ছ্য কথায় রাগ হয়ে স্ত্রীকে বিদায় করে দেয়। ভাই তার ভাইকে বের করে দেয়। পিতা সন্তানকে তাড়িয়ে দেয়। তারপর যার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা নারাজ হয়ে যান, তার অবস্থা কী হবে? কথায় বলে, 'থাকবে নদীতে আর কুমিরের সঙ্গে বৈরিতা!'

সুতরাং ভাই! পৃথিবীতে যদি আল্লাহর সঙ্গে শত্রুতা কর, তাহলে তোমার জীবন নামক গাড়ি কীভাবে পথ অতিক্রম করবে। পেরেশানি থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা-ই রাস্তা। আর তা হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্যের রাস্তা।

অপরাধের শাস্তি পাওয়ার পদ্ধতি

গুনাহের কারণে মানুষ আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি পায়। এ শাস্তির তিনটি পদ্ধতি রয়েছে–

এক. প্রথম পদ্ধতি নগদ। নগদ বলা হয়, এদিকে গুনাহ্ করছে অপর দিকে সঙ্গে-সঙ্গে থাপ্পড় খেয়েছে। কেউ-কেউ এমন কথা স্বীকারও করেন, আমার অমুক কর্মের প্রতিদানে এ বিপদ এসেছে। এটা নগদ শাস্তি। এটা খুবই নমনীয় আচরণ।

দুই. শাস্তি পাওয়ার দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে বিলম্বে। আল্লাহ্ তাকে সঙ্গে-সঙ্গে শাস্তি দেবেন না। তাকে আরও সুযোগ দেবেন। তোমার পাপের রশি ছাড়তে থাকবেন। তোমাকে পাপ করার অবকাশ দেবেন। এটা পূর্বের পদ্ধতি থেকে অধিক বিপজ্জনক। এজন্যই ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, মানুষ যখন পাপ করার পরও তার সামনে আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের বর্ষণ দেখতে পায়, তখন সেটা তার ধ্বংসের ঘণ্টা। অতি শ্রীঘই তার রশি টান দেওয়া হবে। পরিণামে কী হয়? বার্ধক্যে আল্লাহ্ তার বিবি-বাচ্চাকে তার অবাধ্য বানিয়ে দেন। সন্তানাদি তার মায়ের পক্ষ নিয়ে তাকে নির্যাতন করে। পরিশেষে তার বার্ধক্য অবস্থা খুবই করুণ রূপ ধারণ করে।

শিক্ষণীয় ঘটনা

জুনায়েদ বাগদাদি (রহ.) তাঁর শাগরেদদের নিয়ে কোথাও যাচ্ছেন। এমন সময় তাদের সামনে এক বালক আসতে থাকে। শাগরেদদের মধ্যে একজন তার প্রতি কুদৃষ্টিতে তাকালে জুনায়েদ বাগদাদি (রহ.) বললেন, ভাই! তুমি কবীরা গুনাহ করেছ। তাড়াতাড়ি তাওবা করো। সে তার অপরাধ মেনে না নিয়ে উল্টা তর্ক করতে থাকে, না; আমার উদ্দেশ্য এটা নয়। ফলে সে তাওবা করেনি। পরিণাম কী হলো? সে কুরআনের হাফেয ছিল। বিশ বছর পর সে পুরা কুরআন ভুলে গেল। বর্তমানেও ছাত্ররা বলে, হুজুর! আমার স্মরণ থাকে না। মুখস্থ করলে ভুলে যাই। এটাও পাপের আছর। সুতরাং ভাই! একটা হচ্ছে নগদ শাস্তি। আরেকটা বিলম্বিত শাস্তি। তবে দ্বিতীয়টা ভয়ানক।

তিন. আল্লাহর শাস্তির তৃতীয় পদ্ধতি হলো, আল্লাহ তা'আলার অভিসন্ধি। আল্লাহর অদৃশ্য প্রতিকার। এটা খুবই কঠিন শাস্তি। আল্লাহ বলেন–

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً

'তাদের যে-উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, যখন তারা সেটা ভুলে গেল, তখন আমি তাদের ওপর আমার সমস্ত নেয়ামতসমূহের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম। অবশেষে যখন তারা প্রাপ্ত নেয়ামতের ওপর উল্লসিত হলো, তখন আমি অকস্মাৎ তাদের ধৃত করলাম। আমি তাদের গ্রেফতার করলাম।'[২২২]

সুতরাং ভাই! এটা আল্লাহ তা'আলার নীতি। সাজা ও প্রতিদান। আমরা আল্লাহর বিধান মেনে চললে তাঁর রহমত আমাদের জীবনসাথি হবে। আর আল্লাহর নাফরমানি করলে অশান্তি ও বিপদাপদ আমাদের পিছু ছাড়বে না। তাসবীহের সুতা কেটে দিলে যেমন তার দানা একটির-ওপর-একটি পড়তে থাকবে, তেমনি আমাদের বিপদও একটির-পর-একটি লেগে থাকবে। অবশেষে অস্থির হয়ে মৃত্যু কামনা করবে। তবে মরেও শান্তি পাবে না। তাই কোনো কবি বলেন–

اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے
مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے

ভয়ে এখন তুমি বলছ, আমি মরে যাব।
মরেও যদি শান্তি না পাও, তবে কোথায় যাবে।

---

২২২. সূরা আন'আম : আয়াত ৪৪

আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের প্রতিপালন

এটা আল্লাহ তা'আলার দয়ার প্রতিপালন। আল্লাহ আমাদের গুনাহের কারণে সঙ্গে-সঙ্গে এ পৃথিবীতে পাকড়াও করেন না। বান্দাকে অবকাশ দেওয়া হয়। বিদ্যুত যেমন প্রথমবার ভুলক্রমে হাত দিলেই কাউকে ক্ষমা করে না, আল্লাহর রীতি এমন নয়। তিনি মানুষকে প্রথম সুযোগ দেন। এ সুযোগ এজন্য দেওয়া হয়, যাতে বান্দা নিজের ভুল বুঝে ফিরে আসে এবং নিজের লক্ষ্য বস্তু ঠিক করে। আমরা প্রত্যেকেই নিজের জীবনের প্রতি তাকাই। নিজের আমলকে যাচাই করি। তারপর জীবনের যে-যে অংশে অপরাধ হয়েছে, এর জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাই, তাওবা করি। তাওবার দরজা খোলা রয়েছে।

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কথা

মানুষ যদি তার কৃতকর্মের ওপর অনুতপ্ত হয়। খাঁটি নিয়তে তাওবা করে। তাহলে আল্লাহ চান তার জীবনের সমস্ত গুনাহ আমি নেকি দ্বারা পরিবর্তন করে দিই। এজন্য তিনটি কথা স্মরণ রাখার উপযোগী।

এক. তাকদীরের ওপর রাজি থাকা। রিযিকের পরিমাণ তোমার ভাগ্যে লেখা রয়েছে। সেটা তুমি পাবেই। তাহলে হারাম পন্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন কী? কারও পকেট কাটা, চুরি করা, সুদ খাওয়া, ঘুস নেওয়ার প্রয়োজন কী? ভাগ্যে যা আছে, তা তো আসবেই যদি একথার ওপর বিশ্বাস থাকে আর উত্তম জীবন যাপন করে পরিশ্রম করতে থাকে, তাহলে ভাগ্যে লেখা বস্তু তার হাতে আসবেই। এতে আল্লাহ তার ওপর খুশি হয়ে যাবেন। যা পাবে তার মধ্যেই বরকত হবে। বরকতপূর্ণ রিযিক পাবে। ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজনই হবে না। ঘরের মধ্যে অশান্তি আসবে না। প্রশান্তির জীবন গড়বে।

মালের হাকীকত

স্মরণ রাখবেন, যখন সম্পদ আসে, তখন সে তার সঙ্গে বিপদ নিয়ে আসে। কাজেই সর্বদা সম্পদ চাওয়া ভালো নয়। মাঝে-মাঝে চাইলেও বিপদমুক্ত সম্পদের প্রার্থনা করবে। বাস্তবতা হলো, হারাম মাল বিপদ নিয়েই আগমন করে। তাই এটা বুঝেই শান্ত হওয়া চাই যে, ভাগ্যে যা লেখা আছে, তা আসবেই।

দুই. 'শাস্তি পাপের সমান'। যেমন অপরাধ তেমন সাজা, তেমন পেরেশানি। অতএব, বেনামাযীদের দেখবেন, অধিকাংশ সময় অস্থিরতায় ভুগতে থাকে। বাহ্যিকভাবে সে সম্পদের মালিক হয়। কিন্তু একান্তে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন, সে সবসময় চিন্তায় মগ্ন থাকে। কখনো ব্যবসার দিক থেকে, কখনো পারিবারিক দিক থেকে অশান্তি তার লেগেই আছে। রাতে ঘুম আসে না। ঘুমের বড়ি খেয়েও উপকার হয় না। সুতরাং যেমন গুনাহের মজা, তেমন পাবে সাজা।

তিন. 'প্রেম সাধনার পরিমাণ।' আধ্যাত্মিক উন্নতি এ পরিমাণ হবে, যে-পরিমাণ সাধনা করবে। বর্তমানে আমরা চাই, আধ্যাত্মিক শক্তি যেন বিনামূল্যে পেয়ে যাই। এ রাস্তা পাড়ি দেওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা চাই। ইবাদাতের মাধ্যমে প্রচেষ্টা করা চাই। নফসের চাহিদা পরিহার করা চাই। যদি সুন্নতের ওপর আমল করে আল্লাহর বিধান মান্য করি, তাহলে এ পথ পাড়ি দেওয়া যাবে।

সুতরাং তিনটি কথা স্মরণ রাখবেন–

১. রিযিক ভাগ্যের সমপরিমাণ

২. শাস্তি গুনাহের পরিমাণ

৩. প্রেম সাধনা পরিমাণ।

অস্থিরতা কীভাবে কমবে

এই যে দেখুন, অস্থিরতা হ্রাস পায়। এর কারণ কী? কখনো এমন হয় যে, বান্দা আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চায়। আমার প্রিয়নবীর উসিলায় আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করে সুখময় জীবন যাপন করার সৌভাগ্য দান করুন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ

'হে আমার হাবীব! তুমি তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকতে আমি তাদের শাস্তি দেব না।'[২২৩]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

---

২২৩. সূরা আনফাল : আয়াত ৩৩

'যতক্ষণ তারা ইস্তেগফার করবে, আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন না।'[২২৪]

সুতরাং স্মরণ রাখবেন, অধিক পরিমাপে ইস্তেগফারের কারণে হৃদয়ে অনুতপ্ত হওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়। এর দ্বারা আল্লাহ তার জবানে ইস্তেগফার সর্বদা জারি রাখবেন। দ্বিতীয় কোনো-কোনো সময় মানুষ সদকা করে। এটা জরুরি নয় যে, লাখ টাকা আল্লাহর রাস্তায় দান করবে। অনেক সময় একটি খেজুরের বিনিময়ে সে পাহাড়পরিমাণ সওয়াবের অধিকারী হয়। পাহাড় পরিমাণ সোনা-রুপা আল্লাহর রাস্তায় দান করলেও এমন ছাওয়াব পায় না। একটি খেজুর বান্দার জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ হয়ে যায়। যদি এখলাসের সাথে দান করে। সুতরাং আল্লাহর রাস্তায় দান করা চাই। হাদীছ শরীফে এসেছে–

إِنَّ الصَّدَقَةَ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ

'সদকা আল্লাহর গোস্বাকে প্রশমিত করে।'

কারও সঙ্গে উত্তম আচরণ করা। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা। কাউকে কষ্ট না দেওয়া। হাদীছ শরীফে এসেছে, ওই সমস্ত কারণে বান্দার ওপর ধার্যকৃত আযাব দূরীভূত করা হয়। আমরাও নিজের গুনাহের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইব। আল্লাহ তা'আলা দয়াময়। তিনি বান্দার অনুতপ্ত হয়ে তাওবাকে অতি শীঘ্র কবুল করেন। ভাই! আমরা আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করি। আমরা সকাল-সন্ধ্যা গুনাহ করছি। সেগুলোর ওপর তাওবা করে জীবন শোধরানো চাই।

নবীগণের পন্থা

এই পৃথিবীতে যারা নিষ্পাপ, যারা পবিত্র জীবন যাপন করেছেন। এতদসত্ত্বেও তারা আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইতেন।

দেখুন, হযরত আদম (আ.) বলেছিলেন–

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾

'হে আমাদের প্রভু! আমরা আমাদের আত্মার ওপর জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের ওপর দয়া না করেন, তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব।'[২২৫]

---

২২৪. সূরা আনফাল : আয়াত ৩৩

২২৫. সূরা আ'রাফ : আয়াত ২৩

হযরত নূহ (আ.) সাড়ে নয়শত বছর পর্যন্ত আপন সম্প্রদায়কে দাওয়াত দিয়েছিলেন। শেষ ফলে কী হলো? নিজের সন্তান চোখের সামনে পানিতে ডুবে যাচ্ছে। তা দেখে এতটুকু বললেন–

إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ

'আমার ছেলে আমার পরিবারভুক্ত। নিশ্চয় আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য।'[২২৬]

হে আল্লাহ! আপনি বলেছিলেন, আমার পরিবারকে রক্ষা করবেন। সুতরাং এ তো আমার সন্তান। এ আমার পরিবারের লোক। আপনি তাকে রক্ষা করুন। জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ

'না; সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়।'[২২৭]

إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ

'তার আমল পরিশুদ্ধ নয়।'[২২৮]

فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

'যে-সম্পর্কে তুমি অবগত নও, সে সম্পর্কে তুমি আমার কাছে প্রার্থনা করো না।'[২২৯]

إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, যাতে তুমি অজ্ঞাদের অন্তর্ভুক্ত না হও।[২৩০]

আল্লাহ্ আকবার সাড়ে নয়শত বছর দাওয়াত দিলেন।

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا

'হে আমার প্রভু! আমার সম্প্রদায়কে আমি রাত-দিন দাওয়াত দিয়েছি।'[২৩১]

---

২২৬. সূরা হূদ : আয়াত ৪৫
২২৭. সূরা হূদ : আয়াত ৪৬
২২৮. সূরা হূদ : আয়াত ৪৬
২২৯. সূরা হূদ : আয়াত ৪৬
২৩০. সূরা হূদ : আয়াত ৪৬
২৩১. সূরা নূহ : আয়াত ৫

কিন্তু সামান্য কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ বলেন,

إِنِّيٓ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ

'আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, যাতে তুমি অজ্ঞাদের অন্তর্ভুক্ত না হও।' যখনই আদেশ হলো, তখন কোনো প্রকার ওজর ব্যতীত সঙ্গে-সঙ্গে বললেন,

وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَٰسِرِينَ

'যদি আপনি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমার ওপর দয়া না করেন, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে।'[২৩২]

হযরত ইউনুস (আ.)-এর দু'আ

হযরত ইউনুস (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহর শাস্তির ঘোষণা দিলেন। কিন্তু আল্লাহর নির্দেশ আসার পূর্বেই তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। পথে মাছ তাকে খেয়ে ফেলল। তিনি পড়তে লাগলেন–

لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ۖ

'হে আল্লাহ! আপনি ব্যতীত অন্য কোনো প্রভু নেই। আপনি পবিত্র। নিশ্চয় আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি।[২৩৩]

আল্লাহ তা'আলা বললেন–

فَلَوْلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ۝ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِۦٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝

'যদি সে (মাছের পেঠে) তাসবীহ পাঠকারী না হতো, তাহলে তাকে তার পেটে পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত অবস্থান করতে হতো।'[২৩৪]

বর্তমানে আমরা মাছের পেটের সেই অশান্তির মতোই আছি। সুতরাং আল্লাহর দরবারে তাসবীহ পাঠ করি, ক্ষমা চাই। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল। তিনি আমাদেরকে এই অশান্তি ও অস্থিরতা থেকে মুক্তি দান করেছেন। আমাদের প্রশান্তির জীবন দান করবেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমীন।

---

২৩২. সূরা হূদ : আয়াত ৪৭
২৩৩. সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৮৭
২৩৪. সূরা সাফফাত : আয়াত ১৪৪, ১৪৫

আম্মাজি (রহ.)-এর আখেরাতের সফর

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔

(١) أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ (٢) فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٣) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (٤) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (٥) أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ (٦) قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٧) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (٨) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔

(١) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ

(٢) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَمَا تَعِيْشُوْنَ تَمُوْتُوْنَ

(٣) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔

(১) তুমি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো এবং তোমার পিতামাতার।

(২) তারা উফ বলবে এমন কথা তাদের বলো না এবং তাদের ধমক দিয়ো না। তাদের নম্র-ভদ্র কথা বলো।

(৩) প্রাণীমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। তারপর আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করবে।

(৪) প্রত্যেক সত্তাই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতিদান পরিপূর্ণ প্রদান করব কেয়ামতের দিন। সুতরাং যাকে

জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ দিয়ে জান্নাতে প্রবিষ্ট করা হবে, সে কৃতকার্য। পার্থিব জীবন তো ধোঁকার সামগ্রী।

(৫) তোমরা যেখানেই থাক, মৃত্যু তোমাদের গ্রাস করবেই। যদিও তোমরা সুদৃঢ় প্রাচীরে আবদ্ধ থাক।

(৬) হে নবী! আপনি বলুন, নিশ্চয় সেই মৃত্যু যা থেকে তোমরা পলায়ন করছ। সে তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারী। তারপর তোমাদের প্রেরণ করা হবে অদৃশ্য ও দৃষ্ট সম্পর্কে জ্ঞাত সত্তার নিকট। ফলে তিনি তোমাদের কৃত আমল সম্পর্কে অবগত করবেন।

(৭) এ পৃথিবীতে যে কেউ আছে সকলেই ধ্বংসশীল। একমাত্র মহাপরাক্রমশীল ও মর্যাদার অধিকারী সত্তার চেহারা অবশিষ্ট থাকবে।

(১) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, পৃথিবীতে এমনভাবে বাস করো, যেন তুমি অসহায় কিংবা অপরিচিত পথিক।

(২) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেভাবে জীবন যাপন করবে, সেভাবেই মৃত্যুবরণ করবে।

(৩) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুমিনের উপঢৌকন হচ্ছে মৃত্যু।

এ পৃথিবী ধ্বংসের দাগে কলঙ্কিত

এ পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু নিঃশেষের দাগে কলঙ্কযুক্ত। প্রত্যেক বস্তুর শেষ পরিণাম মৃত্যু। যে-সমস্ত অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়, তা একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। যে-সন্তান জন্ম নেয়, সে একদিন মৃত্যু বরণ করবে। হাদীছ শরীফে এসেছে–

لِدُوْا لِلْمَوْتِ وَابْنُوْا لِلْخَرَابِ لَهُ مَلَكُ الْمُنَادِ كُلَّ يَوْمٍ لِدُوْا لِلْمَوْتِ وَابْنُوْا لِلْخَرَابِ

জন্মাও মৃত্যুর জন্য আর নির্মাণ করো বিধ্বস্ত হওয়ার জন্য। আল্লাহর একজন ঘোষণাকারী ফেরেশতা প্রতিদিন ঘোষণা করতে থাকে, জন্মাও তোমরা মৃত্যুর জন্য এবং নির্মাণ করো (প্রাসাদ) ধ্বংসের জন্য।

মহান আল্লাহর স্থিরীকৃত বিধান হচ্ছে, প্রত্যেক মানুষ তার অবকাশ অতিক্রান্ত করে একদিন এ নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়। আমাদের পূর্বে এ পৃথিবীতে আমাদের পূর্বপুরুষগণ বসবাস করেছেন। তারা আজ চলে গেছেন। বর্তমানে আমরা এ পৃথিবীতে মেহমান। কাল আমরাও

চলে যাব। নতুন প্রজন্ম আসবে। নতুন মুখ দেখবে। এ সমস্ত অঞ্চল ও দেশ আবাদ করবে। কোনো কবি বলেন–

کوئی آتا ہے جاتا ہے محفل کا رنگ ہے وہی

ساقی کی نوازش جاری ہے مہمان بدلتے رہتے ہیں

'কেউ আসছে, কেউ যাচ্ছে। আসরের অবস্থা-ই এমন। শরাব পরিবেশনকারীর অনুগ্রহ চলছেই। অতিথির পরিবর্তন হচ্ছেই।'

আজ আমরা এ পৃথিবীর মেহমান। গমনকারীরা চলে গেছেন। কাল আমরাও থাকব না। আল্লাহ বলেন–

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ

'তোমার পূর্বে আমি কোনো মানুষকে চিরঞ্জীব করিনি।'[২৩৫]

সাড়ে নয়শ বছরের জীবন পেয়েছেন। তারপরও চলে যেতে হয়েছে। এ পৃথিবী নশ্বর। এতে বিদ্যমান সকল বস্তু আমাদের সংবাদ দিচ্ছে, এটা বাসস্থান নয়। এটা যাত্রীছাউনি। এজন্যই এ পৃথিবীর সঙ্গে আকৃষ্ট হতে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। তাই কোনো কবি বলেছেন–

دنیا میں ہوں دنیا کا طلب گار نہیں ہوں

بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں

'পৃথিবীতে বাস করো তবে পৃথিবী সন্ধানকারী হয়ো না।
বাজার দিয়ে অতিক্রম করো; তবে বাজারের খরিদ্দার হয়ো না।'

সুতরাং এ পৃথিবীর বাজার থেকে আমরা অতিক্রমকারী। তাই মাখলুকের প্রতি আসক্ত হওয়ায় পরিবর্তে মহান মালিকের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া চাই। আর বাস্তবে যারা এ-বিষয়টা উপলব্ধি করেছে, তাদের সব কিছু সহজ হয়ে গেছে।

মৃত্যুর স্মরণ মহান নেয়ামত

মৃত্যুর স্মরণ মানুষের জন্য অনেক বড় নেয়ামত। এটি মানুষের বড়-বড় পেরেশানিকে সহজ করে দেয়। কারও বিচ্ছেদ অনেক বড় পেরেশানি ও ব্যথার কারণ হয়। এখানে আল্লাহ পড়তে বলেছেন,

---

২৩৫. সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৩৪

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

আয়াতের দুটি অংশ আছে। إِنَّا لِلّٰهِ মানে আমরা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ তা'আলা আমাদের মালিক। অতএব, মালিকের অধিকার আছে, সে তার মালিকানাধীন বস্তু যখন যেখানে ইচ্ছা তখন সেখানে রাখবে। এতে কারও প্রশ্ন করার অধিকার নেই যে, তুমি ফার্নিচার ক্রয় করে ওই রুমে রাখলে কেন? একটু পরে আবার অন্য রুমে নিলে কেন? এটা মালিকের ইচ্ছা। সুতরাং আমাদের মালিক যখন ইচ্ছা তখন আমাদের নিয়ে যেতে পারেন। চাইলে শিশুকালে নেবেন। চাইলে যৌবনকালে নেবেন। চাইলে দীর্ঘ হায়াত দান করে বৃদ্ধ বয়সে নেবেন। এটি তাঁর অধিকার। এটি তাঁর শান।

সুতরাং যখন আমরা انا لله পাঠ করব, তখন আমাদের এ প্রশান্তি আসা চাই যে, আল্লাহ যাকে নিয়ে গেছেন, তার এই সিদ্ধান্ত ১০০% সঠিক। তাঁর সিদ্ধান্ত আমরা নতশিরে মেনে নেওয়া চাই। এতদসত্ত্বেও হৃদয়ে ব্যথা অনুভব হয়। সেই ব্যথা নিরাময়ের জন্য দ্বিতীয় অংশে বলেছেন–

وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

'আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।'

তোমাদের বিচ্ছেদ স্থায়ী নয়। আমরাও এ আবাসনের মুসাফির। তারা যেখানে যাওয়ার চলে গেছে। একদিন তোমরাও সেখানে যেতে হবে।

আপনারা দেখে থাকবেন, এয়ারপোর্টে মানুষ তার স্বজনকে বিদায় দেওয়ার সময় কাঁদে। আমি একব্যক্তিকে দেখলাম, তার ভাইকে বিদায় দেওয়ার সময় হাসছে, কথা বলছে এবং তাকে জানিয়ে দিচ্ছে, তুমি যাও; এক সপ্তাহ পর আমিও আসছি। অন্যান্যরা কাঁদে কেন? আজ তোমার সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ হতে যাচ্ছে। সে হাসছে কেন? এক সপ্তাহ পর আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। সুতরাং যখন অন্তরে এ অনুভূতি হবে, আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করব, তখন মৃত্যুর কঠিন ব্যথা মানুষের জন্য সহজ হয়ে যাবে। আমাদের এই বিচ্ছেদ চিরস্থায়ী নয়। কিছুদিন পর আমরা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।

رحمن ও رحيم গুণের তাজাল্লি

এ পৃথিবীতে মাতাপিতা মানুষের জন্য মাথার ছায়া। নিষ্ঠার সাথে প্রার্থনাকারী তারা-ই হয়ে থাকেন। আল্লাহর রহমতের শিরোনামে দুটি গুণের

উল্লেখ রয়েছে। رحمن ও رحيم আল্লাহ তা'আলার رحيم নামের প্রভাব মায়ের মধ্যে বেশি থাকে আর رحمن নামের প্রভাব পিতার মধ্যে প্রাধান্য থাকে। এজন্যই আপনারা দেখবেন, পিতার মধ্যেও সন্তানের প্রতি ভালোবাসা থাকে; কিন্তু তার বিবেক সবল হয়। সেই বিবেক সব সময় সন্তানকে বেশি ভালোবাসে। সাথে-সাথে তাকে শাসনও করে। কিন্তু মায়ের মধ্যে আল্লাহর রহীম নামের প্রাধান্য রয়েছে। তাই এ পৃথিবীতে মায়ের জাতি-ই তার সৎ ও অসৎ উভয় সন্তানকে ভালোবাসে।

পাপীদের ভালোবাসা দানকারী কোনো জাতি থাকলে সেটা মায়ের জাতি। সন্তান অবাধ্য হয়ে গেছে। পিতা তাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন; কিন্তু মা এমন সত্তা যে, তারপরও সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সবাই তাকে ঘৃণা করছে। কিন্তু মায়ের মন তখনো সন্তানের জন্য কাঁদছে। এটা আল্লাহর রহীম নামের গুণ, যা সমস্ত মায়ের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।

ছোট্ট চড়ুই পাখির তার বাচ্চাদের প্রতি ভালোবাসা

আপনারা দেখে থাকবেন, ছোট চড়ুই পাখি তার বাচ্চাকে কেমন মহব্বত করে। ছোট-ছোট বাচ্চা নীড়ে আছে। সে বের হয়ে গিয়ে বাচ্চার জন্য দানা-পানি সংগ্রহ করে নিয়ে আসছে। যদি কোনো সময় ঘরের দরজা বন্ধ থাকে আর সে তার বাচ্চাদের জন্য দানা-পানি আনার প্রয়োজন হয়, তাহলে তার অস্থিরতা দেখবেন। সে ওড়াউড়ি করছে। চিঁ-চিঁ শব্দ করে ডাকছে। কখনো এ দেওয়ালে, কখনো সেই দেওয়ালে বসছে। এক কথায় সে প্রশান্তি পাচ্ছে না। কারণ, সে তার বাচ্চাদের জন্য দানা-পানি নিয়ে আসবে। এখন সে কোনো দিকে বের হতে পারছে না। দরজা সামান্য খুললেই বের হয়ে যাচ্ছে। বাচ্চাদের জন্য খাবার সংগ্রহ করে নিজের ঠোঁঠে করে নিয়ে আসছে। এখন যদি আবার দরজা বন্ধ থাকে, তাহলে পুনরায় সেই অবস্থা করছে, যা পূর্বে করেছিল। বারবার দরজা গুতা দিতে থাকে। এভাবে সে নিজের প্রাণে আঘাত দিতে থাকে। কেন? তার অন্তরে বাচ্চার ভালোবাসা বিরাজমান। আমার বাচ্চাদের দানা-পানি পান করাতে হবে।

সাধারণ একটা চড়ুই পাখি। সামান্য একটু প্রাণ। কিন্তু মহান আল্লাহ তার অন্তরে বাচ্চার ভালোবাসা এমন সৃষ্টি করেছেন যে, সে বাচ্চাকে পানি পান করানোর জন্য অস্থির হয়ে যায়। নিজের পানাহারের কথা ভুলে গিয়ে বাচ্চাদের চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে যায়।

নিজের বাচ্চাদের প্রতি মুরগির মহব্বত

মুরগি একটি দুর্বল প্রাণী। সে ভালো করেই জানে, বিড়ালের সঙ্গে আমি লড়তে পারব না। কিন্তু বাচ্চা নিয়ে বাইরে গেলে যদি বিড়াল তার বাচ্চার ওপর আক্রমণ করতে চায়, তখন সে তার পালক দিয়ে বাচ্চাদের আড়াল করে নিয়ে বিড়ালের সামনে দাঁড়িয়ে যায়। এতে সে প্রমাণ করতে চায়, তুমি আগে আমাকে হত্যা করো; তারপর আমার বাচ্চাদের আক্রমণ করবে। আমি বেঁচে থাকতে বাচ্চাদের ওপর আক্রমণ করতে দেব না। ছোট একটি প্রাণী তার মধ্যে আল্লাহ এমন ভালোবাসা দিয়েছেন যে, আমার চোখের সামনে তোমাকে আমার বাচ্চাদের ওপর আক্রমণ করতে দেব না।

আর মানুষ তো মানুষই। আল্লাহ তাদের বিবেক বুদ্ধি দিয়েছেন। তাদের ভালোবাসা কেমন হতে পারে? এমনকি সন্তান যদি কাফেরও হয়ে যায়, তবু তার প্রতি মায়ের ভালোবাসা গভীর থাকে।

রাশিয়ায় এক হৃদয়বিদায়ক ঘটনা

রাশিয়ায় একবার ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিল। অসংখ্য বাড়িঘর বিধ্বস্ত হয়েছে। লাখ-লাখ মানুষের প্রাণহানি হয়েছে। বিরাট যন্ত্রপাতি দ্বারা ধ্বংস্তূপের উদ্ধার কাজ চলছে। সাত দিন পর এক মহিলাকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। তার কোলে একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু। উভয়ের ভেতরে প্রাণ এখনো রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। উন্নত চিকিৎসার পর তারা জীবন ফিরে পেল। তারপর ডাক্তার তাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনাদের গোটা দেহ অক্ষুণ্ন দেখা যাচ্ছে। শুধু অনাহারের কারণে প্রাণ দুর্বল হয়েছে। তবে আপনার শুধু প্রত্যেক আঙুলের মাথায় ক্ষত দেখা যাচ্ছে। এর কারণ কী? মহিলা বলল, ভবনটি যখন ধসে যায়, তখন বিরাট একটা দেওয়াল ও ছাদের আড়ালে আমি আটকা পড়ি। আমার শিশুকে দুধ পান করাতে থাকি। দু-চার দিন পর আমার বুকের দুধ শুকিয়ে যায়। শিশুটি কান্না করছে। কখনো হাতে আঙুল, কখনো জিহ্বা ও ঠোঁঠ তার মুখে দিই। কিন্তু এগুলো থেকে তো আর কিছু বের হচ্ছে না। তাই শিশুর কান্না থামছে না। অবশেষে আমার মাথায় এল, আমার দেহে তো রক্ত আছে। সেই রক্ত দিয়ে আমার সন্তানকে লালন করব। তাই দাঁত দিয়ে আঙুলের মাথা কেটে বাচ্চার মুখে দিই আর সে তা চুষতে থাকে। এভাবে আমি এক-একটি করে প্রতিটা আঙুলের মাথা কেটে ফেলি। অবশেষে আমার দেহের রক্ত শেষ হয়ে যায়। আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। এরপর কোন হৃদয়বান ব্যক্তি আমাদের

উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসে। আপনাদের সুচিকিৎসায় আমরা পুনরায় জীবন ফিরে পাই। আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

দেখুন বন্ধুগণ! এ হলো মায়ের ভালোবাসা। নিজের রক্ত পান করিয়ে বাচ্চার জীবন রক্ষা করে! জন্ম থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা এরকমই থাকে।

বিয়ের পরে প্রথম কামনা

কোনো-কোনো দম্পতিকে দেখবেন, তাদের বিয়ে হয়েছে। টাকা-পয়সা, ঘরবাড়ি, গাড়ি কোনো কিছুর অভাব নেই। স্ত্রীর দৈহিক সৌন্দর্য ও আল্লাহ অপূর্ব দান করেছেন। স্বামী তাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। তারপরও তাদের মনে শান্তি নেই। বিশেষ করে মহিলা সারাক্ষণ ব্যথিত মনে সংসার চালাচ্ছে। কেউ জিজ্ঞাসা করল, তোমার কী হয়েছে। সারাক্ষণ ভারাক্রান্ত মনে বসে থাক কেন? উত্তর দিবে, বোন! দু-বছর হলো বিয়ে হয়েছে; কিন্তু এখনো ভবিষ্যতের কোনো আসা-ভরসা দেখতে পাচ্ছি না। আমার মনে তো সেই ব্যথা। আল্লাহ জানেন আমার ভাগ্যে কী লেখা আছে।

এ রমণী আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে। তাহাজ্জুদ পড়ে, রোযা রাখে, হজ্জ করে, ওমরাহ করে, আল্লাহওয়াদের মাহফিলে গিয়ে তাদের মাধ্যমে দু'আ করায়। নিজে তেলাওয়াত করে। লম্বা-লম্বা সিজদা দিয়ে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে, হে আল্লাহ! আমাকে একটি সন্তান দান করো। আমাকে সুখের মুখ দেখাও। সর্বপ্রকার চিকিৎসা ও তদবীর করায়। তারপর যদি আল্লাহর মেহেরবানিতে তার গর্ভে সন্তান আসে, তখন সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার আগেই তার হেফাযতের জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতে থাকে। এ হলো সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা।

হযরত ইমরান (আ.)-এর স্ত্রীর প্রার্থনা

ইমরান (আ.)-এর স্ত্রীর গর্ভে সন্তান এল। তিনি সন্তান গর্ভে থাকতেই আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা জানালেন–

رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي

'হে আল্লাহ! আমার গর্ভে যে সন্তান রয়েছে, তাকে আমি তোমার জন্য উৎসর্গ করে দিলাম। সুতরাং তাকে আপনি আমার পক্ষ থেকে কবুল করুন।'

মায়ের ভালোবাসার মেরুদণ্ড

ভেবে দেখুন বন্ধুগণ! সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার আগে থেকেই তার প্রতি মায়ের টান শুরু হয়ে যায়। মায়ের দু'আ তার প্রতি তখন থেকেই শুরু হয়ে যায়। সন্তান ভূমিষ্টের সময় মা তার আপন সত্তাকে ভুলে যায়। সন্তানের চাঁদমুখ দর্শন করে তার হৃদয় প্রশান্তি পায়। সন্তানকে এক রুমে শুইয়ে রেখে মা রান্না ঘরে খাবার পাকাচ্ছে। কিন্তু সামান্য একটু শব্দ হলেই মা দৌড় দিয়ে সন্তানের নিকট চলে আসে, আমার দুলালের কী হয়েছে। প্রথমে তার চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে দেখছে, ঘুম ভেঙে গেল কি-না। তারপর প্রয়োজন বোধ করলে দুধ প্রাণ করিয়ে আবার আপন কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়। সন্তানের কষ্ট তার কষ্ট হয়ে যায়। সন্তানের খুশিতে সেও খুশি।

সন্তান আল্লাহওয়ালা ও সচ্চরিত্রবান হওয়ার জন্য মা সব সময় আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে। সন্তান জন্ম নেওয়ার পূর্বে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে গভীর মহব্বত ছিল। এবার তার সমস্ত ভালোবাসা সন্তানের প্রতি নিবদ্ধ হয়ে গেল। তার সন্তানকে যারা ভালোবাসে, তাদের সে আপন মনে করে। সন্তানই যেন তার ভালোবাসার কেন্দ্র। সন্তানের ভালোবাসার ওপরই তার সবকিছু ন্যস্ত।

মায়ের ভালোবাসার অনুমান

সন্তান হওয়ার পূর্বে স্ত্রী তার স্বামীর সঙ্গে এখানে-সেখানে যাওয়ার আগ্রহ হতো। বাজারে যেত। নিজের জন্য অনেক কিছু কেনাকাটা করত। সন্তান জন্ম নিল। মায়ের নিজের প্রতি খেয়াল দূর হয়ে গেল। এবার বাজারে গেলে সন্তানের কেনাকাটা আগে, তারপর নিজের জন্য। সন্তানের জামাকাপড়, জুতা, খেলনা ইত্যাদি ক্রয় করছে। ঈদের সমস্ত খুশি যেন সন্তানের। বাড়িতেও মা প্রথমে সন্তানকে খাইয়ে দেয়, পান করায়। তারপর নিজে পানাহার করে। সন্তানকে আগে ঘুম পাড়ায়। তারপর নিজে ঘুমায়। সন্তান যৌবনে পদার্পণ করল। কর্মে ব্যস্ত হলো। রাতে বাড়ি ফিরতে দেরি হচ্ছে। ঘরের সবাই ঘুমিয়ে পড়ছে। পিতাও ঘুমিয়ে গেছে। কিন্তু মা খাটের ওপর ছটফট করছে। তার ঘুম আসছে না। কোন সময় জানি আমার সন্তান আসবে। বাড়িতে এসে যেন দরজায় তাকে অপেক্ষা করতে না হয়। সন্তান যেন ঠান্ডা খাবার খেতে না হয়। এজন্য মা গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থেকে সন্তানের খাবার গরম করে রাখে। সন্তানের সুস্থ জীবনের জন্য মা সর্বদাই আল্লাহর বিশেষ অবদান। সন্তানের প্রতি আল্লাহ মায়ের অন্তরে এই টান সৃষ্টি করে দেন। চলতে-ফিরতে সব সময় সন্তানের জন্য দু'আ করতে থাকে।

মায়ের মর্যাদা

এজন্যই আল্লাহ এ পৃথিবীতে মায়ের মর্যাদা শীর্ষে রেখেছেন। হাদীছ শরীফে এসেছে–

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ

'জান্নাত মায়ের পায়ের নিচে।'

যারা মায়ের সেবা করছে, মায়ের দু'আ নিচ্ছে, তারা সফলকাম হয়েছে। মায়ের দু'আ আল্লাহর দরবারে এভাবে কবুল হয় যেমন ওলীদের দু'আ কবুল হয়ে থাকে। এমনকি কিতাবে হয়েছে, মা যদি গুনাহগারও হয়, তারপরও মা মা-ই। মা যখন তার সন্তানের জন্য আল্লাহর দরবারে হাত উঠায়, তখন আল্লাহ আউলিয়ায়ে কেরামের দু'আর মতো তার দু'আ কবুল করে থাকেন।

মায়ের দু'আ জান্নাতের হাওয়া

মায়ের জবান থেকে যখন সন্তানের জন্য দু'আ বের হয়, তখন তার দু'আ ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যে কোনো পর্দা থাকে না। সেটা সরাসরি আল্লাহর দরবারে পৌঁছে যায় এবং আল্লাহ তা কবুল করেন। এজন্য লোকমুখে একথাটি প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, মায়ের দু'আ জান্নাতের হাওয়া। এর চেয়ে বেশি আরও কিছু বলা যেতে পারে। আল্লাহ মায়ের জাতির মধ্যে বিশেষ রহমত দান করেছেন। নিষ্ঠার সাথে শুভ কামনাকারী মা। মায়ের দু'আর ফলাফল সর্বদা প্রকাশ পেতে থাকে। আল্লাহ আমাদের মায়ের সেবা করার তাওফীক দান করুন। যাদের মাতাপিতা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, আমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ তাদের বিশেষ উপহার দান করুন। আমরা পুণ্যময় পবিত্র জীবন যাপন করে তাদের জন্য উপঢৌকন প্রেরণ করার তাওফীক দান করুন। আমরা যেন তাদের পরকালের সম্বল হতে পারি সেই সৌভাগ্য আল্লাহ আমাদের দান করুন।

মানবজীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা

মানুষের জীবনে তার মাতাপিতার বিচ্ছেদ সবচেয়ে মর্মন্তুদ। সবচেয়ে দুঃখের ও অসহনীয়। হযরত হাসান বসরি (রহ.) বলেন, যেব্যক্তি তার বাবার লাশ বহন করল, যেব্যক্তি তার মায়ের কফিন বা খাট কাঁধে নিয়ে যাচ্ছে, তার জীবনে যদি দীন না আসে, তাহলে এর চেয়ে হতভাগা আর কেউ হতে পারে না। এ ছাড়া তার জীবনে আর কোন সময়টি আসবে, যখন সে সতর্ক হবে?

আর কোন সময়টি আসবে তার আত্মশুদ্ধির? আর কোন সময়টি আসবে যে, সে আল্লাহর দরবারে মাথা নত করবে? মায়ের মতো এমন নেয়ামত যখন তার কাছ থেকে বিচ্ছেদ হচ্ছে, তখন সে তার দু'আ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এখন করুণ মুহূর্তে যদি সে আল্লাহর প্রতি ধাবিত না হয়, আল্লাহর রহমতে তার হৃদয়ে না গলে, আল্লাহর সামনে মাথা নত না করে, তাহলে তার দুর্ভাগ্যের আর কী প্রমাণ হতে পারে? সুতরাং ভাই! মায়ের বিচ্ছেদ অনেক বড় ব্যথা। এ সময় পরিশুদ্ধ হয়ে যান।

انا لله পাঠ করার প্রতিদান

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুমে প্রবেশ করেছেন। বাতিটা জ্বলছিল। এমন সময় বাতিটা নিভে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি انا لله وانا اليه راجعون পাঠ করলেন। হযরত আয়েশা (রাযি.) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ আয়াত তো কারও মৃত্যুতে পাঠ করা হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আয়েশা! মুমিন বান্দা যেকোনো বেদনার সময় এ আয়াত পাঠ করলে আল্লাহ তার ব্যথা দূর করে দেবেন। তার অন্তরকে খুশি করে দেবেন।

দেখুন, একটি বাতি নির্বাপিত হওয়ার মধ্যে মুমিনের প্রতিদান রয়েছে। সুতরাং যে-ঘরে তার মায়ের জীবনের বাতি নির্বাপিত হচ্ছে এবং সে নিজচোখে তা দেখছে। তার কফিন কাঁধে নিচ্ছে, যদি শরীয়তের বিধানমতো তা সহ্য করে, তাহলে আল্লাহ তাকে কেমন প্রতিদান দেবেন? তার প্রতি আল্লাহর কী পরিমাণ ভালোবাসা নেমে আসবে?

মায়ের দু'আর প্রতিদান কিছু নেই আল্লাহর রহমত ব্যতীত

বন্ধুগণ! মায়ের দু'আর প্রতিদান আল্লাহর রহমত ব্যতীত কিছু নেই। মায়ের বিচ্ছেদের পর শুধু একটি রাস্তাই বাকি থাকে, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ওপর রহম করুন। আমাদের জন্য প্রার্থনাকারীরা চলে গেছেন। তখন আপনার রহমতের ছায়াতলে আমাদের আশ্রয় দিন। এবার আপনি আমাদের ওপর দয়া করুন। এজন্যই বলা হয়েছে, কারও মৃত্যুর পর এই দু'আ পাঠ করা সুন্নত।

اَللّٰهُمَّ لَاتَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ وَلَاتَفْتِنَّا بَعْدَهٗ

'হে আল্লাহ! তার বিচ্ছেদে আমাদেরকে প্রতিদান হতে বঞ্চিত করো না এবং তার পরে আমাদের পরীক্ষায় ফেলো না। মায়ের ইন্তেকালের পর বলে

اَللّٰهُمَّ لَاتُحَرِّمْنَا اَجْرَهٗ وَلَاتَفْتِنَّا بَعْدَهٗ

'হে আল্লাহ! আমাদের মায়ের বিচ্ছেদে তার প্রতিদান হতে আমাদের বঞ্চিত করো না এবং তার পরে আমাদের পরীক্ষায় ফেলো না।'

হাদীছ শরীফে এই দু'আ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যাতে আমাদের ওপর আল্লাহ তা'আলার রহমত ও বরকতের ধারা বজায় থাকে। সুতরাং এখন মায়ের রহমতের প্রতিদান আল্লাহর রতমত। মায়ের রাত-দিনের দু'আর বদলা এখন আল্লাহর দয়া। সন্তান সম্পর্কে মা উদাসীন থাকলেও তার উসিলায় সন্তানের ওপর আল্লাহর রহমতের বর্ষণ হতে থাকে। আর যদি মা সতীসাধ্বী, পুণ্যবতী, তাহাজ্জুদগোজার হন, তাহলে তো তার দু'আ আল্লাহর দরবারে খুব কবুল হয়ে থাকে। এমন মায়ের বিচ্ছেদ মানুষের জন্য অবশ্যই দুঃখের কারণ হয়।

কিন্তু আমাদেরকে আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিচ্ছেদের কথাও মনে রাখতে হবে যে, সাহাবাদেরকে এক সময় তাঁর থেকে পৃথক হতে হয়েছে। প্রত্যেক মানুষকে তার ভালোবাসার বন্ধন হতে একবার পৃথক হতে হবে। অতএব, স্মরণ রাখবেন, মৃত্যুর স্মরণ মানুষের এই বেদনাকে সহজ করে দেয়। আল্লাহ আমাদের পুণ্যময় জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন। যাদের মাতাপিতা এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন, তাদের ঘাঁটিসমূহ আল্লাহ সহজ করে দিন। তাদের উসিলায় আমরা যে-কল্যাণ পেতাম, তা অক্ষুণ্ন রাখুন। তাদের দু'আর প্রভাব আমাদের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত জারি রাখুন এবং এর বদৌলতে আল্লাহ আমাদেরকে তার অনুগ্রহের ছায়াতলে আশ্রয় দান করুন।

দূরে বসে মানুষ দু'আ-ই দিতে পারে শুধু

এক বুযুর্গের ব্যাপারে একটি আশ্চর্য কথা বর্ণনা করা হয়। তার মায়ের মৃত্যুর পর আল্লাহ তাকে এলহাম করলেন, হে আমার বান্দা! যার দু'আর উসিলায় তুমি সুখময় ও সম্মানের জীবন যাপন করতে, সে আজ পৃথিবী থেকে চলে গেছে। সুতরাং এখন সাবধান! বুঝেশুনে পা বাড়িয়ো। কারণ, তোমাকে রক্ষাকারী দু'আ আজ বন্ধ হয়ে গেছে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের ওপর দয়া করুন। আমাদের যেন পরীক্ষায় না ফেলেন। মায়ের দু'আর বরকত আমাদের ওপর চিরকাল অব্যাহত রাখুন। এ পৃথিবীতে মায়ের দু'আর চেয়ে উত্তম প্রতিদান কিছু হতে পারে না। মায়ের ভালোবাসার ঊর্ধ্বে কোনো ভালোবাসা হতে পারে না।

মায়ের ভালোবাসা হিমালয় পর্বত

মায়ের ভালোবাসা হিমালয় পর্বত, যার উচ্চতা কেউ সঠিকভাবে পরিমাপ করতে পারে না। এটি এমন একটি গভীর সমুদ্র, যার গভীরতা কখনো নিঃশেষ হয় না। তার বসন্ত কখনো দূরীভূত হয় না। তাই দেখবেন, মা বৃদ্ধ হয়ে কঙ্কাল হয়ে গেছে। চুল সাদা হয়ে গেছে। তবু মা সন্তানকে সন্তানের দৃষ্টিতেই দেখে। সন্তান বলেই ডাকে। মায়ের বুকের ভালোবাসার শব্দ বর্ণনা করতে পারব না। এটি আল্লাহর খাস রহমত। আল্লাহর رحيم নামের ঝলক। মা যদি কেনো সময় সন্তানের প্রতি রাগ হয়ে বলে, আমি তার সঙ্গে কথা বলব না, তারপর সন্তান সেখান থেকে চলে আসে, তখন মায়ের হৃদয় শিউরে উঠে আর বলে, বাবা! তুমি কোথায় যাচ্ছ? আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। তুমি আমার কাছে আস। আর যদি একান্তই কষ্ট পেয়ে থাকে, তারপরও যদি সন্তান মায়ের পা ধরে বলে, মা! আমি ভুল করে ফেলেছি, তখন মায়ের আত্মা আর সহ্য করতে পারে না। সঙ্গে-সঙ্গে তাকে ক্ষমা করে দেয়। আল্লাহ মায়ের অন্তরে এত দয়া দান করেছেন। আল্লাহ আমাদের মায়ের সেবা করার তাওফীক দান করুন, আমাদের তাওবা কবুল করুন। মায়ের দু'আর বরকতে আমাদের জান্নাত দান করুন।

আমার সন্তানকে হেদায়াত দান করো আল্লাহ!

সন্তানের প্রতি মায়ের গভীর ভালোবাসা। আশ্চর্য সম্প্রীতি। হযরত হাসান বসরি (রহ.)-এর যুগে এক বিধবা মহিলার একটি সন্তান ছিল। বাবার মৃত্যুর পর সে তাকে লালনপালন করে বড় করেছে। সন্তান যৌবনে পদার্পণ করে মায়ের অবাধ্য হওয়া শুরু করল। দিন-রাত অন্যায় ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত থাকছে। মা তাকে অনেক বোঝাচ্ছে। কিন্তু সে মায়ের কথা এক কানে গ্রহণ করছে তো অন্য কানে বের করে দিচ্ছে।

মহিলা হযরত হাসান বসরির দরসে উপস্থিত হয়ে সন্তানের জন্য দু'আ দেয়। কিন্তু সন্তানের জীবনে কোনো পরিবর্তন আসছে না। ফলে মা তাকে নিয়ে একদিন হযরত হাসান বসরির নিকট উপস্থিত হয়। তিনি তাকে অনেক

বোঝালেন। কুরআন হাদীছের কথা শোনালেন। একান্তে তাকে নসীহত করলেন। কিন্তু-না; তার কর্মে কোনো পরিবর্তন আসছে না। মা-ও বারবার দু'আ করছে আল্লাহ আমার সন্তানকে হেদায়াত দান করো। শেষ ফলে কোনোভাবেই যখন তার জীবনের উন্নতি দেখা যাচ্ছে না, তখন হাসান বসরি বুঝে নিলেন, সম্ভবত তার কপালে হেদায়াত নেই। এজন্যই কোনো কথায় তার আছর হচ্ছে না।

কিছু দিন পর ওই যুবক অসুস্থ হয়ে যায়। মা তার সেবা-শুশ্রূষা করে। তারপর তার মা একদিন তাকে বলল, বাবা! নিজের জীবনটা তো শেষ করে দিলি; সাথে-সাথে আমাকেও কষ্ট দিলি। এখন তোর অবস্থা করুণ। বলা যায় না, কোন সময় কী হয়ে যায়। সুতরাং বাবা! আমি মা হয়ে তোকে উপদেশ দিচ্ছি, এখনো সময় আছে তুই তাওবা কর। হযরত হাসান বসরির নিকট তাওবা করে নিজের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা কর।

এবার সন্তানের অন্তর নরম হলো। ঠিক আছে মা! আমাকে হাসান বসরির নিকট নিয়ে যাও; আমি খাঁটি মনে তাওবা করব। মা বললেন, বাবা! আমি তোমাকে উঠিয়ে হাসান বসরির নিকট নিয়ে যেতে পারব না। আমার দেহে সেই ক্ষমতা নেই। তবে আমি একটা কাজ করতে পারি; হযরত হাসান বসরিকে এখানে নিয়ে আসি। তুমি তার নিকট তাওবা করবে। তোমার চলার বিধান তিনি বলে যাবেন। সেই অনুপাতে আমল করবে। ছেলে বলল, ঠিক আছে মা! তা-ই করো।

মা হাসান বসরির নিকট গিয়ে বললেন, হুজুর! এবার আমার সন্তান তাওবা করতে রাজি হয়েছে। কিন্তু সে অসুস্থ; এখানে আসতে পারবে না। অনুগ্রহপূর্বক আপনি আমাদের গরিবালয়ে চলুন, আমার ছেলেকে তাওবা করিয়ে তার চলার ব্যবস্থা বলে দিয়ে আসবেন। হাসান বসরি দরস দিয়ে সবে অবসর হয়েছেন। দুপরে বিশ্রাম নেওয়া তার অভ্যাস। এছাড়া সারাক্ষণ তিনি আল্লাহর ইবদাতে মশগুল থাকেন। তাই বললেন, আপনার ছেলেকে অনেক বলেছি। সে কোনো কথা শোনেনি। এখান সেখানে গিয়ে আমার সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই।

এতে তার মা বলল, আমার ছেলে বলেছে, সে মারা গেলে আপনি যেন তার জানাযা পড়ান। হযরত হাসান বসরি বললেন, তোমার সন্তান কোনোদিন নামায পড়েনি; সুতরাং তার জানাযায় আমি শরীক হব না। অবশেষে মা নিরাশ হয়ে সেখান থেকে চলে আসে। মাকে একা দেখে সন্তান

বলল, মা! শায়খ আসেননি কেন? মা বলল, বাবা! তিনি বলেছেন, তুমি তার অনেক সময় নষ্ট করেছ। এখন আবার অযথা সময় নষ্ট করে লাভ নেই। তিনি এ-ও বলেছেন, তুমি মারা গেলে তোমার জানাযায় তিনি শরীক হবেন না। কারণ, তুমি কেনো দিন নামায পড়নি।

মায়ের কথা শুনে তার অন্তরজগতের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায়। এত বড় বুযুর্গ আমার ওপর এমন নারাজ হয়েছেন! তিনি আমার জানাযায় উপস্থিত হতে অস্বীকার করেছেন! আমার মতো পাপিষ্ট মনে হয় এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই। দিলে-দিলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায়, তাওবা করে। আল্লাহর ভয়ে তার চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু বয়ে আসে। মাকে বলতে থাকে, মা সবশেষে আমার একটি অসিয়ত পালন করবেন?

কী অসিয়ত বাবা?

মা! আমি মারা যাওয়ার পর আপনার আঁচলটা আমার গলায় বেঁধে টেনেহ্যাচঁড়ে আমার মরদেহটা উঠানে ফেলে রাখবেন। পৃথিবীর মানুষ যেন আমার অবস্থা দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে যে, মাতাপিতার অবাধ্য সন্তান আল্লাহর রোষানলে পতিত হয়। পৃথিবীর সকলেই তাকে ঘৃণা করে। এদের পরিণাম এমনই হয়। আরেকটি কাজ করবেন। আমার লাশ কবরস্তানে দাফন করবেন না।

কেন বাবা?

আম্মাজান এ পৃথিবীতে আমার মতো পাপিষ্ঠ কেউ নেই। আমি মানুষকে অহেতুক কষ্ট দিয়েছি। সম্মানিত লোকদের মূল্যবান সময় অযথা নষ্ট করেছি। সুতরাং মরার পর আর কাউকে কষ্ট দিতে চাই না। কেননা, আমি মারা যাওয়ার পর আমার ওপর আল্লাহর শাস্তি আসবে। এতে কবরস্তানে পুণ্যবান লোকদেরও কষ্ট হতে পারে। তাই কবরস্তানের পুণ্যবান লোকদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে আমি তাদের কষ্ট দিবে চাই না। অতএব, আমার লাশ একাকী থাকা চাই। সুতরাং আমার লাশটা আমাদের ঘরেই সমাহিত করে দিয়ো।

একথা বলার সাথে-সাথে তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায়। মা শোকাতুর অবস্থায় সন্তানের পাশে বসে আছে। এতক্ষণে দরজায় করাঘাত হয়। মা এসে দরজা খুললে আগন্তুককে দেখে অবাক হয়ে যায়।

কে?

তিনি যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী হযরত হাসান বসরি (রহ.)।

হুজুর! আপনার শুভাগমন আমার বাড়িতে?

হযরত হাসান বসরি বললেন, আমি তোমাকে বিদায় করে ঘুমিয়ে যাই। তখন খাবে দেখি, আল্লাহ আমাকে বলছেন, হাসান বসরি! তুমি আমার কেমন বন্ধু? আমার বন্ধুর জানাযা পড়তে তুমি অস্বীকার করলে? সঙ্গে-সঙ্গে আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমি বুঝতে পারলাম, আপনার সন্তানের তাওবা আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন। তাই সাথে-সাথে আপনার বাড়িতে উপস্থিত হলাম আল্লাহর বন্ধুর জানাযা পড়তে।

সুবহানাল্লাহ! দেখুন ভাই! এ হলো মা। দুনিয়ার সকলেই তাকে ধিক্কার দিলেও মা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সন্তানের পাশে থাকে। সন্তানের মঙ্গলের জন্য দু'আ করে। এ পৃথিবীতে নিঃস্বার্থে ভালোবাসাকারী একমাত্র মা। সুতরাং তার বিরহে কেমন ব্যথিত হওয়া চাই, যাতে আল্লাহ আমাদের সকল বিপদাপদ আসান করে দেন। আমীন।

কুরআনি সংবাদ

কুরআন মাজীদের সংবাদ আমাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ আমাদের সমস্ত মসিবত আসান করে দিন। বিপদাপদকে ধৈর্যের সাথে বরণ করার তাওফীক দান করুন। মাথাপিতার মাধ্যমে আমরা যে নেয়ামত ও বরকতের ভাগীদার হতাম, সেগুলো আল্লাহ আমাদের ওপর জারি রাখুন। আমরা অসহায় ছিলাম। আমরা নিরাশ্রয় ছিলাম। যে হেফাযত আমাদের মায়ের দু'আয় আল্লাহ দান করতেন, ঈমানের হেফাযত, পৃথিবীর অন্যান্য বস্তুর অনিষ্ট থেকে সংরক্ষণ, আল্লাহ সেই দু'আর কল্যাণ হতে যেন আমাদের বঞ্চিত না করেন। তাদের দু'আর বরকতের ধারা আমাদের জন্য অব্যাহত রাখনু। আমাদের ও আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ঈমান কেয়ামত পর্যন্ত হেফাযত করুন। কেয়ামত পর্যন্ত আমাদের সকলকে, সকলের বংশধরকে তাঁর দীনের ওপর চলার তাওফীক দান দরুন। আমীন।

واخر دعونا عن الحمد لله رب العلمين

– সমাপ্ত –